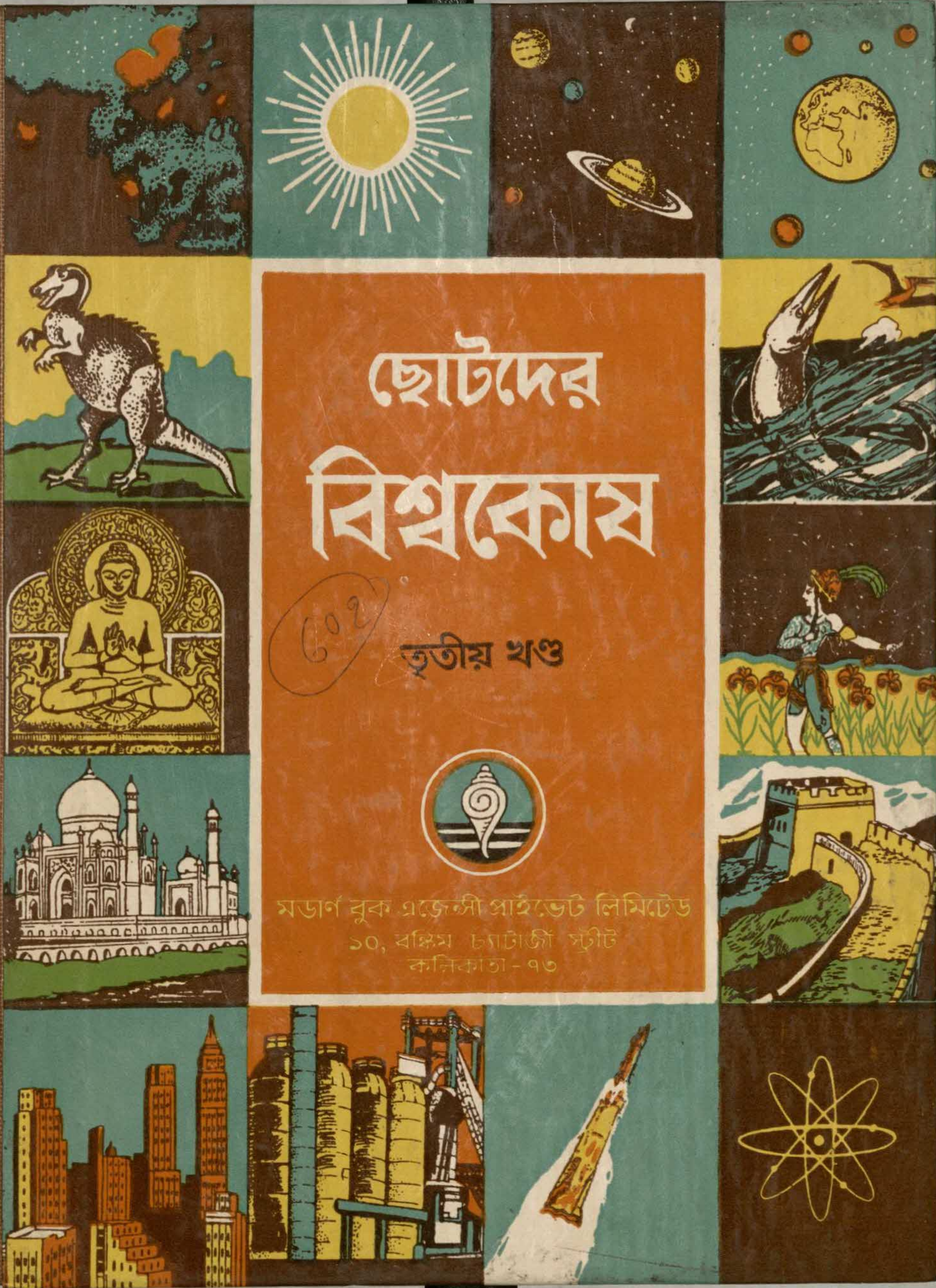


ছোটদের বিশ্বকোষ

তৃতীয় খণ্ড

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

ছোটদের

বিশ্বকোষ

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি. এ
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

তৃতীয় খণ্ড

সংশোধিত ৩য় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৯০

মূল্য : তিরিশ টাকা

মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

ছোটদের বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। ৪টি খণ্ডে আমরা এই বিরাট গ্রন্থ শেষ করব বলে প্রথমে পরিকল্পনা করেছিলাম। এই ধরনের একটি গ্রন্থে স্বভাবতই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং পরিমাণ এত বেশি থাকা উচিত যে মাত্র ৪টি খণ্ডে সব কিছু সংক্ষিপ্ত আকারেও পরিবেশন করা কষ্টকর। তাই কাজ শুরু হবার পর আর একটি খণ্ড বাড়িয়ে ৫টি খণ্ড করাই স্থির হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় মোটামুটি সার সংকলন করেই আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সীমিত রাখতে হয়েছিল—অবশ্য কোথাও প্রয়োজনীয় তথ্য পরিহার না করে। কিন্তু তাতেও অনেক কিছু বিষয়বস্তু বাদ যাচ্ছে দেখে পরবর্তীকালে আরও একটি খণ্ড—ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের মত এবারেও কয়েকটি নতুন বিভাগ সংযোজিত করা হয়েছে এবং স্থান সংকুলানের জন্য পূর্ব খণ্ডে পরিবেশিত কয়েকটি বিভাগ এ খণ্ডে প্রকাশ করা হয় নি। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে ঐ সমস্ত বিভাগের সামঞ্জস্য বিধান করে বইটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হবে।

সাধারণত দেখা যায় বিদেশী এন্‌সাইক্লোপিডিয়াগুলিতে আমাদের দেশ সম্পর্কে তথ্য খুব কমই থাকে—ওদেশের সব কিছুর ওপরই যা কিছু প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেজন্য এই বইটিতে আমরা এদেশের নানা খবরাখবর সাধ্যমত বেশি করে দেবার চেষ্টা করেছি।

প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডটিও পাঠকমহলে আদৃত হয়েছে এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে দেখে আমরা আনন্দিত। অভিভাবকদের অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি তাড়াতাড়ি বার করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ইন্‌ফরমেশন সেণ্টার চন্দ্র-অভিযান সম্পর্কে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ফটো ও তথ্য সরবরাহ করে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। মডার্ণ বুক এজেন্সীর কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে ৺দীনেশচন্দ্র বসুর (১ম দু'টি সংস্করণে) ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের (৩টি সংস্করণেই) সহযোগিতা এই সুযোগে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

প্রথম দু'টি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় এই খণ্ডের তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল—প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর। পাঠকমহল বইটি সাদরে গ্রহণ করায় আমরা আনন্দিত।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ফাল্গুন, ১৩৯০

তৃতীয় খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

বিশ্বসাহিত্যের কথা	**শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.** শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও বিভিন্ন বিষয়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা। ভারত সরকার কর্তৃক কিশোরদের জন্য ও সদ্যসাক্ষরদের জন্য গ্রন্থ রচনায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-রচয়িতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদক ও শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক ও মৌচাক পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রাক্তন বার্ষিক 'আনন্দ' পত্রিকার সম্পাদক। শিশুসাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি।
	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বিখ্যাত লেখক, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। হালিশহরের সাধক কবি রামপ্রসাদের বংশধর। প্রাক্তন শিক্ষক, বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সহকারী। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক। বাংলা সাহিত্য, রবীন্দ্রচর্চা, সমাজসমীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কবিতা, গল্প এবং ছোটদের জন্যও অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা।
ধর্মের কথা খেলাধূলার কথা	**৺অমলেন্দু সেন, এম্. এ., বি. এল্.** শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত লেখক। সদ্যসাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থ-প্রতিযোগিতায় তিন তিনবার ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। ছোটদের জন্যও অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট।
সঙ্গীতের কথা	**শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতপ্রভাকর** অধ্যক্ষ, ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ (সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়) ; বিশিষ্ট গায়ক ও লেখক। সম্পাদক, সুর-ছন্দা। প্রাক্তন সম্পাদক, সচিত্র ভারত। আকাশ-বাণী, কলকাতা কেন্দ্রের অডেশন্ বোর্ডের সদস্য।
আমাদের শরীরের কথা	**ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, এম্. বি., ডি. সি. এইচ্. (লণ্ডন) সি. এ. পি.** খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। বয় স্কাউট-মুখপত্র 'যাত্রী'র ও 'শিশুকল্যাণ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। ছোটদের জন্য কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের রচয়িতা। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত। 'শিশুবিচিত্রা' বার্ষিকীর অন্যতম সম্পাদক। শিশুসাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ।

সাধারণ বিজ্ঞানের কথা যানবাহনের কথা অঙ্কশাস্ত্রের কথা	**শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্‌-সি., এ. আই. সি.** শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের ভূতপূর্ব রাসায়নিক গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পসংগ্রহশালার (ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম) প্রাক্তন অধ্যক্ষ। শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-লেখক হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত (১৩৭২)। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক।
রঙ্গালয়ের কথা	**শ্রীবিশ্বতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ.** সুলেখক। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রকাশনা বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক। অমৃতবাজার পত্রিকার (এলাহাবাদ) প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক।
দেশবিদেশের রূপকথা	**অধ্যাপিকা ডক্টর সুচেতা মিত্র, এম্‌. এ., পি-এইচ্‌. ডি.** শিশুসাহিত্যে ও বয়স্কদের সাহিত্যে কবি, লেখিকা ও গ্রন্থরচয়িত্রী হিসেবে সুপরিচিতা। ছেলেমেয়েদের প্রখ্যাত মাসিক পত্র 'রামধনু'র সহযোগী সম্পাদিকা ও 'জীবনানন্দ' ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদিকা। কলকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা।
ইতিহাসের কথা	**শ্রীআশিস্‌কুমার রাহা** ঐতিহাসিক বহু প্রবন্ধের লেখক হিসেবে পরিচিত। ভারত সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত।
বাংলা সাহিত্যের কথা	**শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্‌. এ.** শিক্ষাব্রতী ও একাধিক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-রচয়িতা। দেশবন্ধু মহিলা কলেজের প্রাক্তন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক।
ভাষা ও লিপির কথা	**শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্‌-সি.** সাংবাদিক। মুদ্রণশিল্পে বিশেষজ্ঞ। শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক ও বিভিন্ন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা।
এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা	**৺সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি. এস্‌-সি., বি. ই., সি.ই.(কলকাতা), এম. এ. এস. সি. (টোরাণ্টো), এম. আই. ই. এস্‌. এ. ই. ই.** কবি, সাহিত্যিক ও প্রয়োগবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ। প্রয়োগবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা। কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিশনের প্রাক্তন প্রধান এঞ্জিনীয়ার।

সিনেমার কথা	**অধ্যাপক ডক্টর পলাশ মিত্র, এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.** সুপরিচিত শিশুসাহিত্যিক। ছোটদের জন্য ছড়া-কবিতা ও সাহিত্যগ্রন্থ-রচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমান্। বয়স্কদের সাহিত্যেও কবি হিসেবে সুপরিচিত। 'জীবনানন্দ' কবিতা-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। কলকাতা দেশবন্ধু মহিলা কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক। ডেপুটি ডিরেক্টর, ফোক্‌লোর ইন্‌স্টিটিউট্।
দেশবিদেশের ছড়া	**শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত, এম্. এ.** বাংলা শিশুসাহিত্যে ছড়া ও কবিতা-লেখক হিসেবে খ্যাতিমান্। ছড়া-কবিতার বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ অফিসার। শিশুসাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক।
দেশবিদেশের কথা জীবনী-বিচিত্রা জীবজন্তুর কথা মহাকাশের কথা মহাশূন্যের পথে দেশবিদেশের ছড়া (বাংলা)	**অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্.-সি.** প্রখ্যাত শিশু ও কিশোর-মাসিক 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক ও শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। কলকাতা আশুতোষ কলেজ, যোগমায়া দেবী কলেজ ও বি. ই. এস্. কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক। ছোটদের বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় খ্যাতিমান্। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগর ও জলপাইগুড়ি অধিবেশনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনে (বারাণসী) ও বর্ধমান অধিবেশনে শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধক। ১৯৮২ সালের শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার জন্য ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত। বাংলা শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক, রণজিৎ-স্মৃতি পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত ১৯৮৩ সালের বিদ্যাসাগর পুরস্কারপ্রাপ্ত।

শিল্পী-পরিচিতি

শিল্প-সম্পাদক	**শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী** লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত। ছোটদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-প্রণেতা হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত। শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত। শিশুপাঠ্য বহু সচিত্র গ্রন্থের রচয়িতা ও চিত্রকর। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।
সহকারী চিত্রশিল্পী	**লালা শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস ও শ্রীসিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত** বিশিষ্ট চিত্রকর।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা



মহাপ্রভু ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ

‘অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
ধরিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥’

জীবনী বিচিত্রা

—ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬৯৮



বিশ্বসাহিত্যের কথা

চীং

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে চীন একটি। কনফুসিয়াস ছিলেন সেখানকার ধর্মগুরু। তাঁর কথা তোমরা এই বই-এ আগেই পড়েছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ধর্মের কথা—পৃঃ ৫৩৫)। ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন—পাঁচখানি মহাকাব্য ও চারখানি ধর্মগ্রন্থ। ঐ পঞ্চ কাব্যকে চীনে ভাষায় বলা হয় চীং। ইচীং, সুচীং, সীচীং, লীচীং ও চুনচুই চীং। প্রথমটিতে লেখা হয়েছে পরিবর্তনশীল জগতের কথা, দ্বিতীয়টিতে প্রাচীন ইতিহাস, তৃতীয়টিতে নানা দেবতার স্তবস্তুতি, চতুর্থটিতে আচার-অনুষ্ঠানের কথা এবং পঞ্চমটিতে হেমন্ত ও বসন্তের বর্ণনা।

এ ছাড়া ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ধর্মোপদেশ, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে উপদেশ, সাম্য, মৈত্রী ও ছন্দ রক্ষা করে চলার কথা, আর প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত মেংয়ের নীতি ও সে সম্বন্ধে কনফুসিয়াসের মতবাদ। চীনে ভাষায় এ বইগুলির নাম লুন উ, তাসিয়ো, চাং উং আর মেংৎসী। তখনকার দিনে চীন শিক্ষাদীক্ষায়, পাণ্ডিত্যে, ললিতকলায় ও শিল্প-বাণিজ্যে কি রকম উন্নত ছিল এই বই-গুলিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাইবেলের কথা

খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বাইবেল। বাইবেলই বোধ হয় এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বই। শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নয়, সাহিত্য হিসেবেও বাইবেলের মূল্য বড় কম নয়।

বাইবেলে দু'টি খণ্ড—ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট। প্রথমখানি লেখা হিব্রু ভাষায়, দ্বিতীয়খানি গ্রীক ভাষায়।

ওল্ড টেস্টামেণ্ট ইহুদীদের পুরাণ, তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগে আছে পুরোনো পৃথিবীর বিবরণ, দ্বিতীয় ভাগে মহাপুরুষদের জীবনী আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে স্তোত্র, মন্ত্র ও কবিতার সঙ্কলন। এই তিনটি খণ্ড আবার ভাগ করা আছে সবশুদ্ধ ৩৯টি বইএ। ইহুদী ধর্ম ও সমাজ, তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান এবং মুশা, সলোমন, ডেভিড, যোসেফ প্রভৃতির জীবন-কাহিনীও আছে এই গ্রন্থে।

নিউ টেস্টামেণ্ট প্রধানত যীশুখৃষ্টের জীবন-কথা। গ্রন্থখানিকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ

করা চলে। প্রথম ভাগে আছে যীশুর জীবনী ও বাণী, দ্বিতীয় ভাগে তাঁর শিষ্যদের কার্য-কলাপ, তৃতীয় ভাগে খৃষ্টধর্মের নীতি আর চতুর্থ ভাগে দৈববাণী। সর্বসমেত সাতাশখানি বই নিয়ে নিউ টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ হয়েছে।

বাইবেলে জানবার, শিখবার ও বুঝবার কথা আছে অনেক। কারও প্রতি কোনও বিদ্বেষ না রেখে, মানুষের সেবা করে, সৎ ও ধার্মিক হয়ে কি করে জীবন কাটানো যায় তাই হ'ল বাইবেলের মূল কথা। যীশুর মহান্ আত্মত্যাগ বাইবেলের আদর্শকে জীবন্ত করে রেখেছে। খৃষ্টান-অখৃষ্টান সকলকেই তাই বইটি প্রেরণা যোগায়।

এখানে আমরা ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট থেকে দু'টি গল্প তুলে দিচ্ছি।

মোজেস কি করে রক্ষা পেলেন : ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি গল্প

মিশরের লোকদের সঙ্গে ইহুদীদের একেবারেই বনত না। একদল সর্বদাই চেষ্টা করত কি করে অপর দলকে জব্দ করবে।

একবার মিশরের এক রাজা দেখলেন যে মিশরীয়দের চাইতে ইহুদীরা শুধু শক্তিশালীই নয়, সংখ্যায়ও তারা বেশি। কাজেই তিনি ভাবলেন ইহুদীদের আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি দেশময় হুকুম জারি করলেন—এখন থেকে কোন ইহুদীর ঘরে ছেলে জন্মালেই তাকে নদীর জলে ফেলে দিতে হবে।

হুকুম শুনে ইহুদীদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু রাজার হুকুম মানবে না এমন সাহস কারো নেই।

ইহুদীদের মধ্যে একজন ছিলেন লেভি। তাঁর বাড়িতে কোন বাচ্চাকাচ্চা হয় নি বহুদিন। অনেক দিন পরে তাঁর একটি সন্তান হ'ল। মেয়ে নয়, ছেলে। দেখতে চমৎকার, আর সর্বসুলক্ষণযুক্তও বটে। বাপ-মা'র মন চাইল না এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে। কিছুদিন ঘরে লুকিয়ে রাখা হ'ল ছেলেটিকে, কিন্তু তা যখন সম্ভব হ'ল না তখন ছোট্ট একটা ঝুড়ির মধ্যে বাচ্চাটিকে শুইয়ে নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে সেটা লুকিয়ে রাখা হ'ল, আর তার দিদি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল ঝুড়িটির দিকে।

মিশরের রাজাকে বলা হ'ত ফ্যারাও।



রাজকন্যা নিজেই দেখতে গেলেন ছেলেটিকে।

রাজার মেয়ে সেদিন সকালে নদীতে গেছেন স্নান করতে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে দাসীকে পাঠালেন ব্যাপারটা কি জানতে। দাসী এসে জানাল, ঝোপের মধ্যে খুব সুন্দর একটি কচি ছেলেকে কারা ফেলে রেখে গেছে। শুনে রাজকন্যা নিজেই দেখতে গেলেন ছেলেটিকে। কচি, সরল, সুন্দর মুখখানা দেখে তাঁর ভারি মায়া হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন এ নিশ্চয়ই কোন ইহুদীর ঘরের ছেলে। তিনি ঠিক করলেন এমন সুন্দর ছেলেটিকে মরতে দেবেন না, নিজেই ওকে মানুষ করবেন।

ঠিক ঐ সময় ছেলেটির দিদি, যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সব দেখছিল, রাজকন্যার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকন্যা ছেলেটিকে দেখাশোনা করার জন্য একটি ইহুদী ধাই-এর খোঁজ করছেন বুঝে সে বলল, "আমার জানা লোক আছে, খবর দেব কি?" সম্মতি পেয়ে সে ছুটল তার মায়ের কাছে। মা তো তখনই রাজী। রাজকন্যা তো অতশত জানেন না, তিনি ছেলের মাকেই ছেলের ধাইএর পদে নিয়োগ করলেন।

ছেলেটির নাম রাজকন্যাই রাখলেন মোজেস। এঁকেই বলা হয় মুশা। এই মোজেসই বড় হয়ে ইহুদীদের নেতা হয়ে তাদের জন্যে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টে সে সব কাহিনী লেখা আছে।

নিউ টেস্টামেন্টের একটি গল্প

যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের যে সব উপদেশ দিতেন তার ধরনটা ছিল ভারি সুন্দর। তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা গল্প বলতেন, তারপর তার ভিতরকার উপদেশটুকু বুঝিয়ে দিতেন।

সেণ্ট পিটার ছিলেন যীশুর একজন বড় ভক্ত। একদিন শিষ্যরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন লোক অন্যায় কাজ করলে তাকে ক'বার ক্ষমা করা যেতে পারে? সেণ্ট পিটার বললেন, আমার মনে হয় সাত বার পর্যন্ত ক্ষমা করা যায়। শুনে যীশু একটি গল্প বললেন:

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। রাজা বড় দয়ালু। চাকরবাকরেরা মাইনে ছাড়াও সময়-অসময়ে বহু টাকা ধার নেয় রাজার কাছ থেকে। একবারের ধার শোধ না করে আবার ধার চায়। রাজা ভাবেন, আহা, নিক না ধার। বড় গরীব বেচারারা।

কিন্তু এমনি করে করে ধারের অঙ্ক বেড়ে চলে। এদের মধ্যে একটি লোক ক্রমাগত ধার নিয়ে নিয়ে এত টাকা করে ফেলল যে শেষে রাজাও বুঝলেন তার পক্ষে আর কস্মিন্ কালেও তা শোধ দেওয়া সম্ভব হবে না। তখন তিনি আদেশ দিলেন, লোকটিকে তার স্ত্রী ও সন্তান সমেত বিক্রি করে দেওয়া হোক। লোকটি ছিল ক্রীতদাস। আর সে যুগে ক্রীতদাস-প্রথা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই বিবেচনা করা হ'ত।

লোকটি ছিল ভারি ধূর্ত। রাজার কাছে থেকে এতদিন সে দিব্যি আরামে ছিল। তাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে বসল। নতুন মনিব না জানি কেমন হবে! সবাই যে রাজার মত দয়ালু হবে তার তো কোন মানে নেই। সে তখন রাজার পায়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

রাজা বড় বিচলিত হলেন। লোকটিকে



'আচ্ছা, তোমাকে এবারেও মাপ করছি।'

থামিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে এবারেও মাপ করছি। তোমাকে ধার শোধ করতে হবে না।"

লোকটি চোখ মুছে ঘরের বাইরে চলে গেল। সেই সময় সেখান দিয়ে আর একটি ক্রীতদাস যাচ্ছিল, আর এই ক্রীতদাসটি কয়েক দিন আগে প্রথম লোকটির কাছে সামান্য কয়েকটা টাকা ধার নিয়েছিল। লোকটি তাকে দেখেই তার টাকা ফেরৎ চেয়ে বসল।

দ্বিতীয় ক্রীতদাসটির তখন ভারি কষ্টে দিন যাচ্ছে। সে হাতযোড় করে বলল, "আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দাও, আমি কথা দিচ্ছি কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার টাকা আমি শোধ দিয়ে দেব।"

কিন্তু প্রথম লোকটি নাছোড়বান্দা। আজই তার টাকা চাই। নইলে—নইলে উপযুক্ত সাজা দেবে সে। কি সাজা? না, শ্রীঘর। তাই করল সে। সে যুগের আইন অনুযায়ী বাকি টাকার দাবী করে সত্যিই তাকে কারাগারে পুরে দিল।

অন্যান্য চাকরদের কাছে ঘটনাটা অজানা রইল না। তারা তো অবাক্। যে লোককে স্বয়ং রাজামশাই অত টাকার দেনা মাপ করে দিয়েছেন, সে-ই কিনা সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে এই কাজ করল! ব্যাপারটা তারা রাজার কানে তুলল।

সব শুনে রাজা তো রেগে আগুন। লোকটা এত বড় নিমক-হারাম! একে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না,—করা উচিত নয়। তিনি তখন তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

গল্প শেষ করে যীশু বললেন, গল্পের রাজার মতই ভগবান্‌ও আমাদের প্রতি ব্যবহার করেন। প্রতিদিন মানুষ কত অন্যায় করে চলেছে ভগবানের কাছে, তিনি তা নির্বিকারচিত্তে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি সব সময়ে সে ক্ষমা পাবার যোগ্য? অন্য কেউ সামান্য অন্যায় করলেই আমরা ক্ষেপে যাই, একবারও তাকে ক্ষমা করার কথা ভাবি না। আমাদের মনেও থাকে না যে ভগবান্ আমাদের কত অন্যায় ক্ষমা করে চলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ দুষ্ট ক্রীতদাসটির মত ব্যবহার করলে ভগবান্ আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না।

ইয়োরোপের সাহিত্য ঃ গোড়ার কথা

এবার আমরা আবার ফিরে যাব খৃষ্টজন্মের আনুমানিক আটশ' থেকে হাজার বছর আগে। প্রকৃত পক্ষে ইয়োরোপে প্রথম সভ্যতার আলো জ্বালেন গ্রীকরা। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে মানুষকে তাঁরা হাজার বছর সঞ্জীবিত করে রাখেন। তারপর ওঠেন রোমানরা। অর্ধেক এশিয়া ও অর্ধেক ইয়োরোপ যুড়ে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে নতুন নতুন সম্পদ্ এনে দেন মানুষকে। রোমানদের দিন শেষ হ'লে খৃষ্টীয় ৫ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বলা চলে অন্ধকার যুগ। তখন শুধু লোকগাথা, গান ও ছড়া রচিত হতে থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে, আর পণ্ডিতেরা লিখতে থাকেন ল্যাটিনে ধর্ম ও নীতিবিষয়ক বইপত্র। তারপর আসে নতুন আলো—যাকে বলা হয় নবজাগরণ। মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে।

এর পর জার্মেনীতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব আর ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাহিত্য এগিয়ে চলে নানা ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে। ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজ্ঞানে ইয়োরোপ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়। এইসবের ফলেও সাহিত্যে নতুন চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। শুধু ইয়োরোপ নয়, আমেরিকার ইতিহাসও ঐ একই।

ইয়োরোপের এই সাহিত্যধারা আজও অব্যাহত গতিতে চলেছে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের মাটি ও মনকেও তা ছুঁয়েছে বিশেষ ভাবে। আমাদের একালের সাহিত্যই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের এই সাহিত্যিক অগ্রগতির কথা এবারে তাই সংক্ষেপে আলোচনা করব আমরা।

গ্রীক সাহিত্য

সংস্কৃত যেমন ভারতের আদি ভাষা, ইয়োরোপের আদি ভাষা তেমনি গ্রীক। সংস্কৃতের মত গ্রীক ভাষাতেও দর্শন, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ বই যেমন লেখা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে মহাকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক এবং উপকথাও। সাধারণ ভাবে যদিও এর সবটুকুকেই গ্রীক সাহিত্য বলতে হয়, তবু এখানে আমরা বলব শুধু শেষোক্ত রচনাগুলির কথা, কারণ খাঁটি সাহিত্য বলতে সাধারণত এইগুলিই আমরা বুঝি।

গ্রীক সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক হোমারের কথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তাঁর রচিত দু'টি মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডিসির কথা। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪১-৫৪৫)

হোমারের সমসাময়িক যুগে বা অল্প পরে উঠেছিলেন কবি হেসিয়ড। কাজ ও সময় (ইংরেজিতে ওয়ার্ক্‌স্ অ্যাণ্ড ডেজ্) নামে একখানি কাব্য লিখেছিলেন তিনি। এ কাব্যে কোন কাহিনী নেই, এতে বর্ণিত হয়েছে কৃষিকার্য ও গ্রাম্য সুখ-দুঃখের কথা। নীতি-উপদেশপ্রধান বলে কবিত্ব বেশি ফোটে নি এর সব জায়গায়। তবে সেকালে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা বেশ টের পাওয়া যায় কাব্যটি পড়লে।

লিরিক বা গীতিকবিতার জন্ম

এর পর খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ওঠেন তিনজন কবি—এঁরা সত্যিকার মহৎ কবি। এঁরা

কাহিনীকাব্যও লেখেন নি, তত্ত্বকথা বিষয়ক কাব্যও লেখেন নি। এঁরা নিজ নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকেই কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এই রকম কবিতাকে বলে লিরিক বা গীতিকবিতা। লায়ার বা বীণার মত একটি বাদ্যযন্ত্র যোগে গাওয়া হ'ত বলেই এই নাম। এঁরা হলেন স্যাফো, আলকিয়াস এবং এনাক্রিয়ন। স্যাফো লেসবস দ্বীপের বিখ্যাত মহিলা-কবি এবং আলকিয়াস তাঁর প্রতিবেশী। এঁরা দু'জন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রেমের কবিতা লিখেছেন। এনাক্রিয়ন লিখেছেন হাফেজের মত সুরার গান।

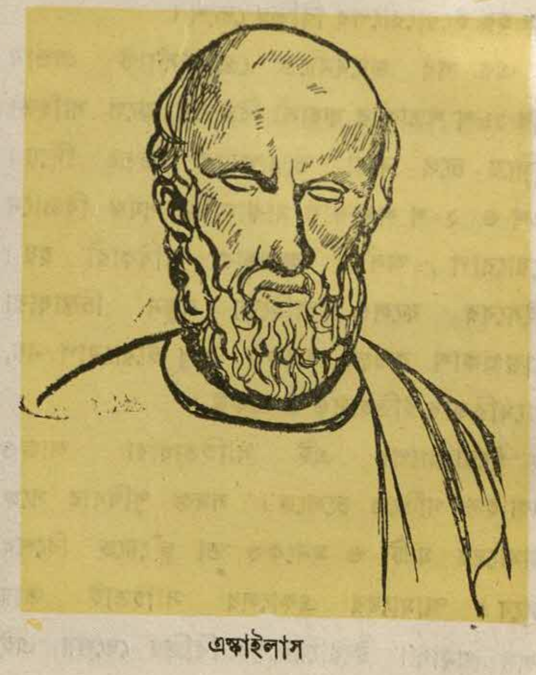
গীতিকবিতার আরো অনেক বিভাগ আছে গ্রীক ভাষায়। অলিম্পিক খেলা বা ঐ রকম কোন বড় ঘটনা নিয়ে যে উচ্ছ্বাসবহুল কবিতা লেখা হ'ত তাকে বলা হয় ওড্। পিণ্ডার বলে একজন কবি এই রকম কবিতার জন্যে প্রসিদ্ধ। পিণ্ডার ও এনাক্রিয়ন স্যাফোর অল্প পরের লোক। পল্লীজীবনের —বিশেষ করে চাষীদের কথা নিয়ে লেখা হ'ত যে সব কবিতা—তাকে বলা হয় প্যাস্টোরাল। থিওক্রিটাস (৩১০ খৃঃ পূঃ-২৫০ খৃঃ পূঃ) নামে একজন কবির অনেক বিখ্যাত প্যাস্টোরাল আছে। এলিজি বা শোক-কবিতাও লিখতেন গ্রীক কবিরা। বিয়ন এবং মস্কাস্ নামে দু'জন কবি লিখেছেন সে রকম কবিতা।

বলা দরকার যে স্যাফো ও আলকিয়াসের কবিতা প্রায় সবই লুপ্ত হয়ে গেছে। সামান্য যা টুকরো টুকরো পাওয়া যায় তা থেকেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায়। ছোটবড় আরো অনেক কবি উঠেছিলেন, যাঁদের লেখা একত্র করে অ্যান্থলজী বা সংকলন তৈরি হয়েছিল একখানি। সেখানি অমূল্য বই।

গ্রীক নাটক : ট্র্যাজেডী আর কমেডী

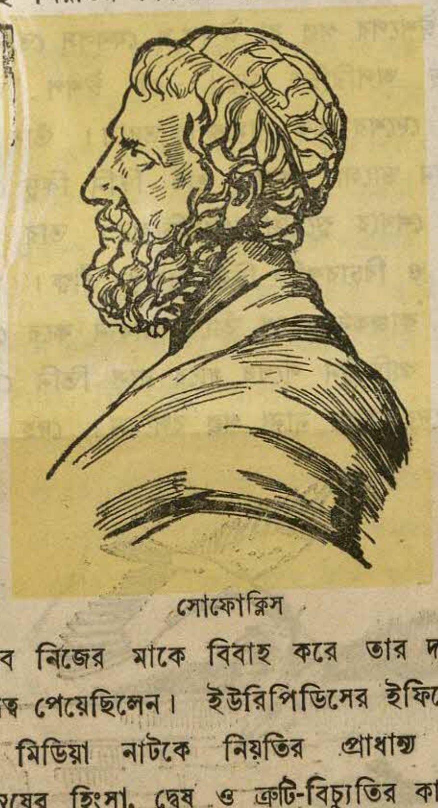
কাব্যের মত নাটকেও গ্রীকরা ছিলেন অসাধারণ। পৃথিবীতে বোধ হয় তাঁরাই প্রথম নাটক লিখেছেন। ডায়োনিসাস দেবতার উৎসবে মুখোস পরে নৃত্যগীত করতেন তাঁরা। তা থেকেই ক্রমে পালা লেখা শুরু হয়। তার পর মঞ্চে তা অভিনীত হ'তে থাকে বিশেষ বিশেষ পর্বে। দু'রকম নাটক লিখতেন তাঁরা: ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্ত, আর কমেডী বা মিলনান্ত বা মঙ্গলান্ত। নাটকে দু'টি, বড় জোর তিনটি চরিত্র আনতেন তাঁরা একসঙ্গে এবং আমাদের যাত্রায় যেমন বিবেক বা নিয়তি আসে, ওঁরা তেমনি আনতেন কোরাস্‌কে। সে এসে ঘটনার পরিণাম সম্বন্ধে মন্তব্য করত।

তিনজন প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডী-লেখক ছিলেন প্রাচীন গ্রীক ভাষায়—এস্কাইলাস (খৃঃ পূঃ ৫২৫-৪৫৬), সোফোক্লিস (খৃঃ পূঃ ৪৯৫-৪০৬) ও ইউরিপিডিস



এস্কাইলাস

(খৃঃ পূঃ ৪৮০-৪০৭) এবং পরের পরে এঁরা অজস্র নাটক রচনা করেছেন—যার সামান্য কিছুই আজকের মানুষেরা হাতে পেয়েছেন। এস্কাইলাসের প্রধান বই ছিল বন্দী প্রমিথিয়াস বা প্রমিথিয়ুস। প্রমিথিয়ুস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন মানুষের জন্যে। দেবতাদের আদেশে তাই তাঁকে সীথ মরুভূমির পাহাড়ে বন্দী করে রাখা হয়। একদিকে লোকহিত, অন্যদিকে নিয়তি,—দুইয়ের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন কবি। সোফোক্লিসের ইডিপাস নাটকেও দেখানো হয়েছে নিয়তির বিধানে ইডিপাস না জেনে কি



সোফোক্লিস

ভাবে নিজের মাকে বিবাহ করে তার দণ্ডরূপে অন্ধত্ব পেয়েছিলেন। ইউরিপিডিসের ইফিগেনিয়া ও মিডিয়া নাটকে নিয়তির প্রাধান্য নেই, মানুষের হিংসা, দ্বেষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কাহিনীই নাটকে সাজিয়েছেন কবি।

কমেডী লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এরিষ্টোফিনিস (খৃঃ পূঃ ৪৫০-৩৮৬), এবং 'ভেকগণ' নামে একটি নাটকে তিনি এস্কাইলাস ও সোফোক্লিসকে, আর 'মেঘ' নাটকে সক্রেটিসকে ব্যঙ্গ করে গেছেন। ইনিও বিরাট শক্তিমান্ নাট্যকার। বেশির ভাগ ট্র্যাজেডীতে একটু একঘেয়েমি ও নিয়তি সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস থাকলেও গ্রীকদের নাটকে মানুষের জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসাগুলি ঠাঁই পেয়েছে বলেই তা পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমাদর পেয়েছে।

গ্রীক পণ্ডিতদের গদ্য রচনা

গ্রীকদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে তাঁদের গদ্য রচনায়। দর্শনে হিন্দুরা তাঁদের চেয়ে প্রাচীন এবং গভীরতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসে তাঁরাই অগ্রগণ্য। পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার ইতিহাস লেখেন হেরোডোটাস (খৃঃ পূঃ ৪৮৪-৪২৮)। কিন্তু তাঁর সে বই লুপ্ত হয়েছে, শুধু তার কিছু অংশ পাওয়া গেছে। তাতে সুমের ও ব্যাবিলনের পুরাকাহিনী পাওয়া যায়। স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধ নিয়ে থুকিডিডিস লিখেছিলেন



হেরোডোটাস



ঈশপ

তাঁর পেলোপনিসিয়ার যুদ্ধের বই। ইনি হেরোডোটাসের কিছু পরের মানুষ। আর একজন ইতিহাসকার হলেন জেনোফোন (খৃঃ পূঃ ৪৩০-৩৫৪), ঐ স্পার্টা ও এথেন্স যুদ্ধেরই 'দশ হাজারের পশ্চাদপসরণ' কাহিনী লিখে অমর হয়ে আছেন তিনি। ইনি সক্রেটিসের শিষ্য।

সক্রেটিস নিজে কোন বই লেখেন নি কিন্তু জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর শিষ্য প্লেটোর জন্যে। প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৮-৩৪৭) তাঁর সঙ্গে গুরুর কথোপকথনের ডায়েরি লিখে গেছেন। প্লেটোর আগে হেরাক্লিটাস ও পরে অ্যারিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) দার্শনিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। হেরাক্লিটাস বলেছেন, জগতে সর্বদা সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, তাই জগতের আসল রূপ অজ্ঞাত। প্লেটো বলেছেন, সব জিনিসই আছে ভাবরূপে আমাদের মনে। বাইরে আমরা যা দেখি তা খাঁটি দেখা নয়। অ্যারিস্টটল দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব—সর্ববিদ্যায় অসামান্য ছিলেন। তাঁর নন্দনতত্ত্ব বা 'ইস্থেটিক্স' এবং প্লেটোর সাধারণ তন্ত্র বা 'রিপাব্লিক' বই আজও ছাত্রদের পড়তে হয়।

গ্রীকরা আর একটি জিনিস জগৎকে দিয়েছেন। তা হ'ল আমাদের পঞ্চতন্ত্রের মত জীবজন্তু নিয়ে রচিত উপকথা। এই রকম গল্পকে বলা হয় ফেব্‌ল্। ঈশপ ছিলেন এই ফেব্‌ল্‌গুলোর লেখক।

ঈশপের গল্প

ঈশপের গল্প বা ঈশপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্ তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। এই ঈশপ ছিলেন গ্রীস দেশের এক সামান্য ক্রীতদাস। তাঁর মনিব ছিলেন ভালো লোক, তাই তিনি কিছু লেখা-পড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার ওপর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি ছিল তাঁর খুব তীক্ষ্ণ। মনিব তাঁর কাজকর্ম দেখে তাঁকে স্বাধীন করে দেন। তখন প্রতিদিন পথের ধারে বসে তিনি ছেলে-মেয়েদের কাছে নানা গল্প বলতেন। দেহ ছিল



পাতাটি ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে পিঁপড়ের সামনে ফেলে দিল।

বিকলাঙ্গ, দেখতেও ছিলেন কুৎসিত, কিন্তু সে জন্যে ছেলেমেয়েদের কিছু এসে যেত না। তারা প্রতিদিন তাঁর চারপাশে ভিড় জমাত গল্প শোনার জন্য।

ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ঈশপ চমৎকার গল্প বানাতে পারতেন। তাঁর তৈরি একটি গল্প এখানে তুলে দিচ্ছি।

একটা ছোট্ট পিঁপড়ের ভারি জলতেষ্টা পেয়েছিল। জল খাবার জন্যে সে একটা ঝরণার ধারে এগিয়ে এল। ঝরণার জল তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছিল। পিঁপড়ে জল খাবার জন্যে যেই একটু মুখ বাড়িয়ে এগিয়ে গেছে, অমনি প্রবল স্রোতের টানে ভেসে চলল। বহু চেষ্টা করেও সে যখন আর সাঁতরে ডাঙার দিকে যেতে পারল না তখন সে প্রাণের আশা ছেড়ে দিল।

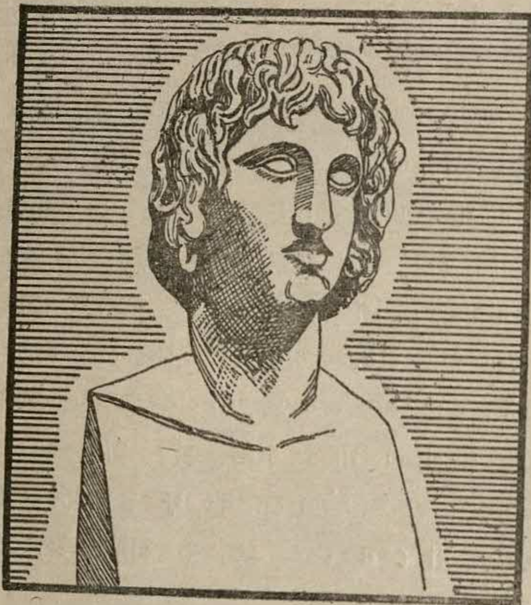
ঝরণার ঠিক ওপরেই ছিল একটা গাছ, সেই গাছের ডালে বসে ছিল একটি ঘুঘু। বেচারা পিঁপড়ের বিপদ্ দেখে তার ভারি দয়া হ'ল, সে একটা গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি পিঁপড়ের সামনে ফেলে দিল। পিঁপড়েও তাড়াতাড়ি পাতাটার ওপর উঠে বসল। একটু পরেই পাতাটা যখন ভাসতে ভাসতে ডাঙায় গিয়ে ঠেকল তখন পিঁপড়ে নেমে পড়ল, আর ঘুঘুটির দয়ার কথা ভেবে মনে মনে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

এর কয়েক দিন পরে এক শিকারী এল সেই বনে। তার কাজ হচ্ছে পাখি ধরা। সেই ঘুঘুটি তখন অন্যমনস্ক হয়ে একটা গাছের ডালে বসে ছিল, শিকারী চুপি চুপি নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে এল তাকে ধরবে বলে। ঘুঘু কিছুই জানে না, কিন্তু মাটিতে ছিল সেই পিঁপড়েটা—যার প্রাণ সে একদিন বাঁচিয়েছিল। দয়ালু জীবনদাতার বিপদ্ দেখে পিঁপড়ে আর স্থির থাকতে পারল না, সেও চুপি চুপি এগিয়ে এল শিকারীর পায়ের কাছে। তার পর যেই শিকারী ঘুঘুটিকে ধরতে যাবে অমনি তার পায়ে বসিয়ে দিল কুটুস করে এক বিষ-কামড়। শিকারী উঃ বলে যন্ত্রণায় যেই ফিরে দাঁড়িয়েছে, অমনি ঘুঘুটি শব্দ শুনে চমকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গেল। গল্পের নীতি হচ্ছে—তুমি যদি কারুর উপকার কর তা হ'লে সে যত ক্ষুদ্র—যত দুর্বলই হোক না কেন, সেও একদিন তোমার উপকার করতে পারে।

ঈশপ ও লুসিয়ান নামে একজন ব্যঙ্গরচয়িতা দু'জনেই গ্রীক সভ্যতার শেষ দিকে জন্মান। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লুটার্ক বলে আর একজন গ্রীক লেখেন গ্রীক ও রোমান মহৎ ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে একখানি প্রসিদ্ধ বই—'প্যারালাল লাইভ্‌স্' (এটি অবশ্য ইংরেজি নাম)। এই বইটি শেক্সপীয়ার প্রভৃতি মহান্ লেখকদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

ল্যাটিন সাহিত্য

খৃষ্টজন্মের আনুমানিক আটশ' থেকে হাজার বছর আগে ইয়োরোপে গ্রীকরা জ্বেলেছিলেন সভ্যতার বাতি। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁদের ক্ষয় শুরু হয়। তার কিছু আগেই উঠেছিলেন রোমানরা। তাঁরা এবার হলেন সভ্যতার ধারক ও বাহক। তাঁদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। ফলে তখন থেকে এই ভাষাতেও লেখা হয় প্রচুর পরিমাণে কাব্য, নাটক, ইতিহাস ও



ভার্জিল

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। প্রকৃতপক্ষে গ্রীক আর ল্যাটিন সাহিত্যই ইয়োরোপকে মনুষ্যত্বের দীক্ষা দেয়। এই সাহিত্যের কথা এবার বলি।

ভার্জিল লিখলেন ইনিড

হোমারের মত ভার্জিল (খৃঃ পূঃ ৭০-১৯) হলেন ল্যাটিন ভাষার মহাকবি। তাঁর 'ইনিড' কাব্য রোমান জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যে লেখা।

ইতালির উত্তরে মনটুয়া নগরে এক বর্ধিষ্ণু চাষীর ঘরে ভার্জিলের জন্ম। প্রথমে ক্রিমোনো ও মিলান শহরে লেখাপড়া শিখে তিনি রোমে যান উচ্চশিক্ষার জন্যে। তখনও দিগ্বিজয়ী জুলিয়াস্ সীজার বেঁচে, রোম তখন বিজয়গৌরব আর সমৃদ্ধিতে জমজমাট।

তার পর সীজার নিহত হলেন, কিছুদিন ধরে সারা দেশব্যাপী চলল অশান্তি। ভার্জিলও তার আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। পরে অগষ্টাস রোমের সম্রাট্ হলেন, ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে এল রোমে। ভার্জিল তখন কবিতা লিখতে শুরু করলেন এবং অল্পদিনে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। শোনা যায় সম্রাট্ অগষ্টাসের অনুরোধেই এর পর ভার্জিল মহাকাব্য লিখতে শুরু করেন। এই কাব্যই ইনিড।

ইনিডের নায়কের নাম ইনিয়াস। গ্রীকরা যখন ট্রয় আক্রমণ করে ইনিয়াস ছিলেন তখন একজন ট্রোজান যোদ্ধা। যুদ্ধশেষে গ্রীকরা যখন ট্রয় নগর ধ্বংস করে, ইনিয়াস তখন বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে নিয়ে ও বালক পুত্রের হাত ধরে সাগর-তীরে পালিয়ে যান। তার পর কয়েক দিন সমুদ্রতীরে লুকিয়ে থাকার পর একখানি নৌকো জোগাড় করে একদিন ভেসে পড়েন সমুদ্রের বুকে। কত ঝড়তুফান ঠেলে নৌকো একদিন এসে লাগল আফ্রিকার উপকূলে।

কার্থেজের রাণী ডিডোর সঙ্গে সেখানে ইনিয়াসের দেখা হ'ল। রাণীর তাঁকে ভালো লাগল, তিনি তাঁকে সেইখানেই থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইনিয়াস সে অনুরোধ রাখতে পারলেন না, আবার একদিন নৌকো নিয়ে ভেসে পড়লেন সাগরের বুকে। ইনিয়াস চলে গেছেন শুনে রাণী ডিডো মনে এত কষ্ট পেলেন যে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন।

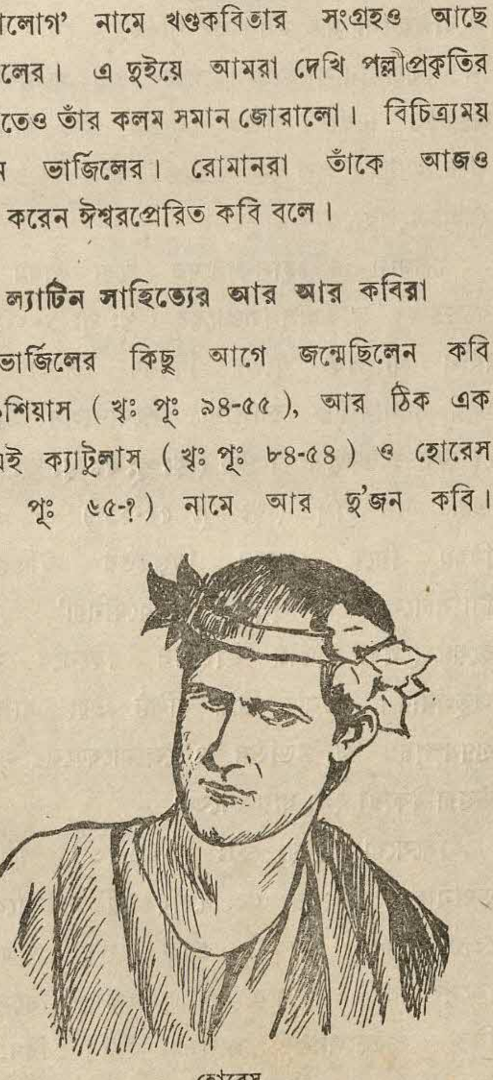
নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে সাত বছর বাদে ইনিয়াস এসে পৌঁছলেন ইতালিতে। টাইবার নদীর তীরে ল্যাটিয়াম নগর। সেখানকার রাজা ল্যাটিনাম তাঁকে আদর করে নিয়ে গেলেন রাজবাড়িতে। রাজার এক মেয়ে ছিল,—

ল্যাভিনিয়া, তারই সঙ্গে ইনিয়াসের বিয়ে হয়ে গেল। টারনাস নামে আর একজন লোক রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে ইনিয়াস ও ল্যাটিনামকে একদিন আক্রমণ করল। কিন্তু শেষ অবধি জিততে পারল না, নিজেই নিহত হ'ল। পরে ইনিয়াসই হলেন ল্যাটিয়াম নগরীর রাজা।

মহাকাব্য লিখলেও 'জিওরজিক' এবং 'ইকোলোগ' নামে খণ্ডকবিতার সংগ্রহও আছে ভার্জিলের। এ দুইয়ে আমরা দেখি পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনাতেও তাঁর কলম সমান জোরালো। বিচিত্র্যময় জীবন ভার্জিলের। রোমানরা তাঁকে আজও স্মরণ করেন ঈশ্বরপ্রেরিত কবি বলে।

ল্যাটিন সাহিত্যের আর আর কবিরা

ভার্জিলের কিছু আগে জন্মেছিলেন কবি লুক্রেশিয়াস (খৃঃ পূঃ ৯৪-৫৫), আর ঠিক এক সময়েই ক্যাটুলাস (খৃঃ পূঃ ৮৪-৫৪) ও হোরেস (খৃঃ পূঃ ৬৫-?) নামে আর দু'জন কবি।



হোরেস

লুক্রেশিয়াস আসলে ছিলেন দার্শনিক এবং 'রেরাম ন্যাচুরা' নামক কাব্যে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। ক্যাটুলাস গীতিকবিতা-লেখক হিসেবে আদৃত এবং তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলি পাঠককে আল-কিয়াস বা এনাক্রিয়নের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হোরেসের 'ওড্' প্রসিদ্ধ এবং এখনও ল্যাটিন ভাষার আদর্শ রচনা হিসেবে তা পড়ানো হয়। তিনি গদ্যে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধেও একখানা বই লিখেছিলেন। হোরেসের চেয়ে সামান্য ছোট ছিলেন ওভিড (খৃঃ পূঃ ৪৩-খৃঃ অঃ ১৮)। বীরাঙ্গনাদের পত্র বা 'হেরোয়িক এপিসিল্স্' নামক বইয়ে কাব্যাকারে ইনি বিখ্যাত মহিলা-দের জবানীতে সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখেন। এ থেকেই আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রেরণা পান। এ ছাড়া 'মেটামরফোসিস' বা রূপান্তর নামে কতকগুলি কাহিনীও তিনি লেখেন কবিতার ছাঁদে। জুভেনাল এবং মার্শাল খৃষ্টীয় প্রথম শতকের আর দু'জন কবি, যাঁরা স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গকবিতা লিখে প্রসিদ্ধ।

কিন্তু গ্রীকরা যে রকম কল্পনাপ্রবণ ছিলেন, তাঁদের সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং জীবন সম্বন্ধে ধারণা যে রকম অকপট ছিল রোমানদের তা ছিল না। তাই তাঁরা গ্রীকদের মত অসামান্য কবিতা লিখতে পারেন নি। হোরেস, ওভিড, জুভেনাল তাই আজকের মানুষকে খুব বেশি আনন্দ দিতে পারেন না। ওমর খৈয়ামের কবিতার মত লুক্রেশিয়াসের কবিতার গভীরতা অবশ্য মনকে স্পর্শ করে, আর জুভেনালের ব্যঙ্গকবিতাগুলো পড়েও মজা পাওয়া যায়। একমাত্র ক্যাটুলাসই

ল্যাটিন ভাষার অদ্বিতীয় কবি। তাঁর গীতিকবিতা এবং ভার্জিলের ইকোলোগ ল্যাটিন কাব্যসাহিত্যের ঐশ্বর্য।

রোমান নাটক

গ্রীকদের অনুসরণে রোমানরা নাটকও লিখেছিলেন। তাঁদের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন প্লটাস (খৃঃ পূঃ ২৫৪-১৮৪)। তিনি কমেডী বা কৌতুকনাটক লিখেছিলেন অনেকগুলি। তাঁর 'মিনেক্‌মি' নামক বইটির ছায়া নিয়ে শেক্‌স্‌পীয়ার লেখেন তাঁর 'কমেডী অব এরার্স', আর অন্য একটি বইএর (ইংরেজি নাম 'পট্ অব্ গোল্ড') অনুকরণে মলেয়ার লেখেন তাঁর কৃপণ ('মাইজার') নাটক। জগতের দু'জন সেরা নাট্যকারকে বিষয় জুগিয়ে তিনি যতটা বিখ্যাত, অতটা কিন্তু নিজের রচনাগুলির জন্যে ন'ন। টেরেন্স (খৃঃ পূঃ ১৯৫-১৫৯) নামে আর একজন নাট্যকার ছিলেন। তাঁর 'এণ্ড্রিয়া' বই এক সময়ে খুব অভিনীত হ'ত।

কিন্তু দার্শনিক ও নাট্যকার সেনেকাই (খৃঃ পূঃ ৪-৬৯ খৃঃ অঃ) ছিলেন সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর 'মিডিয়া', 'হিপোলিটাস' ও 'ফেড্রিয়া' ট্র্যাজেডী ; আসলে কিন্তু ইউরিপিডিস রচিত এই নামের তিনখানি নাটকের কাহিনী নিয়েই এগুলি লেখা। কিন্তু কবি এই বইগুলিতে হিংসা, হত্যা ও রক্তারক্তির কাহিনীকে এমন ভীষণ করে দেখিয়েছেন যে তা পড়ে কিংবা অভিনয় করে—কোনটাতেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সেনেকার এই হত্যাপ্রধান ট্র্যাজেডী কিন্তু এক সময়ে ইয়োরোপের নাট্যকারদের ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ারও এর প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

রোমানদের গদ্যসাহিত্য

কিন্তু রোমানরা অসামান্য গদ্য-লিখিয়ে ছিলেন। বৈষয়িক যোগ্যতা ও বাস্তব জ্ঞানে অসাধারণ ছিলেন বলে ইতিহাসে, বক্তৃতায়, পত্র-সাহিত্যে ও তত্ত্ববিচার-মূলক প্রবন্ধে তাঁরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা আজও অতুলনীয়। প্লিনির মত পণ্ডিত, ট্যাসিটাস ও লিভির মত ইতিহাসকার, সিসেরোর মত বক্তা ও প্রাবন্ধিক, মার্কাস অরেলিয়াসের মত নীতিবিদ্ পৃথিবীতে বেশি জন্মান নি। রোমান সাহিত্যের গৌরব এই গদ্যসম্পদের জন্যেই। একজন পণ্ডিত বলেছেন, গ্রীক ট্র্যাজেডী আর ল্যাটিন গদ্য না পড়লে শিক্ষিতই হয় না ইয়োরোপের কোন মানুষ।

রোমান ইতিহাসকারদের মধ্যে প্রথম নাম করতে হয় জুলিয়াস্ সিজারের (খৃঃ পূঃ ১০০-৪৪), যিনি গ্যালিক যুদ্ধের বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক স্যালাস্ট লিখেছিলেন প্রাচীন রোমের ইতিবৃত্ত। লিভি (খৃঃ পূঃ ৫৯-খৃঃ অঃ ১৭) এবং ট্যাসিটাস্ (খৃঃ পূঃ ৫৫-১১) ঐ একই বিষয় নিয়ে লেখেন বিস্তৃততর ইতিহাস। ট্যাসিটাসের 'এনাল্‌স্' ও 'জারমেনিয়া' প্রাচীন ইয়োরোপের জাতীয় ইতিহাস হিসেবে সত্যি অতুলনীয়। রচনাও তাঁর বলিষ্ঠ এবং সাহিত্য-গুণসম্পন্ন। থুকিডিডিস ও জেনোফোনের সার্থক উত্তরাধিকারী বলা যায় তাঁকে।

সিসেরো (খৃঃ পূঃ ১০৬-৪৩) ছিলেন তদানীন্তন কালের এবং বোধ হয় সর্বকালেরই শ্রেষ্ঠ বক্তা। একমাত্র গ্রীক বক্তা ডেমোস্থি-নিসের নাম করা হয় তাঁর সমকক্ষ হিসেবে। কিন্তু প্রবন্ধলেখক রূপেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর বন্ধুত্ব বা 'ডু অ্যামিটিকা' নামক রচনা পড়লে

মুগ্ধ হতে হয়। জ্যেষ্ঠ প্লিনি (খৃঃ অঃ ২৩-৭৯) লিখেছিলেন বিশ্বকোষ। দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা—এমন কোন বিদ্যা ছিল না যা তিনি না জানতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কনিষ্ঠ প্লিনি ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী। তাঁর অপূর্ব চিঠিপত্র আছে, যা সাহিত্য হিসেবেও সুখপাঠ্য। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তাও দার্শনিক নিবন্ধ হিসেবে মূল্যবান্। কিন্তু তাঁর এই মেডিটেশন ল্যাটিনে নয়, গ্রীক ভাষায় লেখা।

ইয়োরোপে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ

পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতন হ'ল। তারপর থেকে একটানা প্রায় হাজার বছর যুড়ে ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ। ভ্যাণ্ডাল ও অন্যান্য বর্বর জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে। আস্তে আস্তে সারা ইয়োরোপে ছোটবড় অসংখ্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং গ্রীক, ল্যাটিনের বদলে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাগুলি মাথা তুলতে থাকে। এইভাবেই তৈরি হয় আধুনিক ইয়োরোপের দেশজ ভাষাগুলি। ধর্মে এঁরা সবাই খৃষ্টান ছিলেন, সেই কারণে পোপ ছিলেন এঁদের কর্তা। কিন্তু আসলে কাটাকাটি মারামারি করেই দিন কাটাতেন এঁরা।

গ্রীক ও রোমানদের আচার-আচরণ ছিল সহজ, ধর্মবিশ্বাসও তাঁদের ছিল বেশ সরল। তাঁদের সভ্যতাকে বলা হয় পেগান সভ্যতা। খৃষ্টান সভ্যতায় এই সরলতা থাকল না। গির্জার হাতে চলে গেল জ্ঞান-বিদ্যার সমস্ত কর্তৃত্ব এবং পাদ্রীরাই হলেন সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষের লেখাপড়া বন্ধ হ'ল এবং তাঁরা নিরক্ষর চাষী ও পেশাদার সিপাই হয়েই রইলেন। গ্রীক ও রোমানরা যে ধরনের সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা করার লোকই রইলেন না তাই কেউ। পাদ্রীরা ও তাঁদের সমর্থকরাই শুধু ল্যাটিনে বই-পুঁথি লিখতেন, যা সাধারণ মানুষ পড়ে বুঝতেন না। এইজন্যেই এ সময়কে বলা হয় অন্ধকার যুগ।

অন্ধকার যুগের লোকগাথা, গান আর কাহিনী

তবে মানুষের কল্পনা তো কোন অবস্থাতেই হার মানে না। এই হাজার বছরেও তৈরি হয়েছে এক রকম সাহিত্য, যা সাধারণ মানুষরা রচনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন অনেক গান, বীর-গাথা, কাহিনী। লেখা বললে হয়তো ভুল বলা হয়, মুখে মুখেই রচিত ও প্রচলিত হয়েছে এই সব সাহিত্য। আগেই বলা হয়েছে ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান প্রভৃতি আজকের ভাষা-গুলির জন্ম হয় এই সময়ে এবং এই সব ভাষাতেই গ্রাম্য কবিরা সাহিত্যসৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন।

ইংরেজরা লেখেন আর্থারের কাহিনী, ফরাসীরা রোলাণ্ডের এবং স্প্যানিশরা কীডের। এঁরা সবাই গল্পকথার রাজা এবং এঁদের সিপাহী-সামন্তদের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনীই পুষ্ট করেছে কাব্যগাথাগুলিকে। এ সব গাথা অনেকটা রাজস্থানের চারণ সঙ্গীত এবং বাংলার মঙ্গল-কাব্যের মত। এ ছাড়া আরো এক জাতের সাহিত্য রচিত হয়েছে এ সময়। তা হ'ল প্রেম-সঙ্গীত। ভ্রাম্যমাণ চারণরা তা গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতেন। ফ্রান্সে এই গাইয়েদের বলা হ'ত ক্রুবাদুর, জার্মানীতে মিনেসিংগার বা জংগুলিয়ার। এক সময় খুব আদর ছিল এ-সব গানের।

সাগা, এড্ডা ইত্যাদি

উত্তর ইয়োরোপে—নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যাণ্ডে সাগা নামে আর এক ধরনের কাব্য-কাহিনী তৈরি হয়েছিল। সিগুর্ড নামক কোন অর্ধ-পৌরাণিক বীরের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় ভোলসাং সাগা। এ ছাড়া বিচিত্র দুঃসাহসিক অভিযান ও প্রেমের গল্প একত্র করা হয় এড্ডা নামক সংগ্রহ-পুস্তকে। এড্ডার একটা পুরোনো রূপ ছিল, পরে নতুন আর একটা ছাঁচ বানানো হয় তার। এই বড় এড্ডা ও ছোট এড্ডা দুই-ই অপূর্ব কাহিনীসংগ্রহ রূপে বেঁচে আছে, যা আজও সানন্দে পড়া যায়।

উত্তরের এই সব কাহিনী কিছু কিছু এসেছিল জার্মেনীতে এবং তা নিয়ে জার্মানরা তৈরি করেছিলেন 'নিবলানজেন' লোক-মহাকাব্য। বর্তমান ইংরেজি ভাষার আদি কাঠামো যে অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষা, তাতে লেখা হয়েছিল 'বীউল্‌ফ্‌' নামক কাব্য-কাহিনী এবং বীউল্‌ফ্‌ কর্তৃক গ্রুথগার নামক দৈত্যবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল এতে। এই রকম কাহিনী-কাব্য তৈরি হয়েছিল ফ্রান্সেও। ফরাসীরা তাকে বলতেন 'চাসোঁ দ্য গেস্ত'। রেনার্দ্‌ শৃগালের কাহিনী তার একটা। এই হ'ল আজকের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আদি ইতিহাস এবং এ সাহিত্য তৈরি হয়েছিল অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রামের মানুষদের হাত দিয়ে।

ল্যাটিনের চর্চা বন্ধ হ'ল না

আগেই বলা হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যার চর্চা বেশি ছিল না সে সময়ে। পাদ্রী ও মঠাধ্যক্ষেরা সর্ববিদ্যার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁরা ও তাঁদের অনুগামীরা ল্যাটিনেই সব বই-পুঁথি লিখতেন। এই ল্যাটিনে বই লেখা চলেছে অনেকদিন পর্যন্ত। তাই দেখি এলিজাবেথের যুগেও বেকন ল্যাটিনে 'নোভাম অর্গানাম' লিখেছেন। তাঁরও ঢের পরে নিউটন লিখেছেন 'প্রিন্সিপিয়া'। ফ্রান্সেও দেকার্তের বই অধিকাংশই ল্যাটিনে। আমাদের দেশে যেমন মধ্যযুগে মাতৃভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতে লেখাই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল, এও ঠিক তাই। ন্যায়, দর্শন, আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ বাঙালীরা সেদিন লিখেছেন সংস্কৃতে, আর মাতৃভাষায় লিখেছেন ছড়া, পাঁচালী, মঙ্গল-কবিতা।

সাহিত্যে নবজাগরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হঠাৎ নতুন আলো ফুটল ইয়োরোপে। খৃষ্টান গির্জার প্রভুত্ব সরিয়ে ফেলে মানুষ হারানো গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতিকে নতুন করে ফিরে পেল। তার ফলে এল মানুষের মনে চিন্তার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা একদিকে যেমন শিল্পে ও সাহিত্যে শতমুখে বিস্তার লাভ করল, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানে, দর্শনে ও জীবন-চিন্তায় নতুন পথে মানুষকে পা বাড়াবার প্রেরণা জোগাল। একদিকে তাই র‍্যাফেল, মিকেল এঞ্জেলো, দান্তে, শেক্সপীয়ার, অন্যদিকে গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, নিউটন নতুন যুগকে তাঁদের চিন্তায় রূপ দিতে এগিয়ে এলেন।

এই যে নবজাগরণ বা রেনেশাঁস, আধুনিক ইয়োরোপের ইতিহাস এখান থেকেই শুরু। সাহিত্যে ও শিল্প-বিজ্ঞানে ইয়োরোপ যেমন এই সময় থেকে নিজেকে শতমুখে প্রকাশ করেছে,



বোকেচিও

তেমনি দিকে দিকে বিরাট সাম্রাজ্যও গড়েছে। আমেরিকা আবিষ্কার, এশিয়া-আফ্রিকার সঙ্গে ইয়োরোপের যোগ—সবই ঘটেছে এই সময় থেকে। অর্থাৎ এই সময় থেকেই সভ্যতার ভূগোল বড় হয়ে যায় মানুষের।

ইতালিয়ান সাহিত্য

রেনেশাঁস বা নবজাগরণ প্রথম শুরু হয় ইতালিতে, সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং তিনশ' বছরে তার প্রভাবেই গড়ে ওঠে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইমারত।

মোটের ওপর ইতালিতে এই সময় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতি মহাশিল্পীদের যেমন জন্ম হয়, তেমনি হয় দান্তে, পেতরার্ক ও বোকেচিওর মত কবিদেরও। প্রাচীন মহাকবিদের পর এঁরাই হলেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ কবি এবং ইতালীয় মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও গোটা মহাদেশেই এঁরা স্বীকৃতি পান এঁদের রচনার গুণে।

কবি দান্তে

দান্তে আলেঘিয়েরী (১২৬৫-১৩২১) বিখ্যাত তাঁর 'ডিভাইন কমেডী' নামক মহাকাব্যের জন্যে। বিয়াত্রিচ বলে একটি তরুণীর মৃত্যু হ'লে তাঁর আত্মার অনুসরণ করে কবি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন ঘোরেন। ভার্জিলের আত্মা হয় তাঁর পথপ্রদর্শক। এই তিন ভুবনের প্রসঙ্গই হ'ল কাব্যের তিনটি খণ্ড এবং এই যাত্রায় কবি বহু পাপী ও পুণ্যাত্মার দেখা পান। জীবনমৃত্যু ও ধর্মাধর্মের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এই কাব্যে।

দান্তে ছিলেন ফ্লোরেন্সের টসকান অঞ্চলের বাসিন্দা। এই টসকান ভাষাতেই লেখেন তিনি



কবি দান্তে

কমেডী, আর এ থেকেই তা হয় গোটা ইতালিতে সাহিত্যের ভাষা। তাঁর বই বিশ্ব-সাহিত্যের এক মহান্ সৃষ্টি বলে ধরা হয় এবং তারই জন্যে দান্তেকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন বলেই গণ্য করা হয়। বিয়াত্রিচকে যে মর্যাদা দিয়েছেন দান্তে, কোনও নারী কখনও কোনও কবির কাছে এত সম্মান পান নি। 'ভিটা নুভা' বা নবজীবন নামেও আর একখানি কাব্য আছে তাঁর।

ইতালির অন্যান্য কবিরা

দান্তের পরেই করতে হয় পেতরার্ক ও বোকেচিওর নাম। এঁরাও জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ফ্রান্সিস্কো পেতরার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম সংগঠকদের একজন। তাই চতুর্দশপদী কবিতার শুরুতে মধুসূদন এঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন। ল্যরা নামে পরিচিতা কোন সুন্দরীর উদ্দেশে লিখিত হয় তাঁর সনেটগুলি। বোকেচিও (১৩১৩-'৭৫) 'ডেকামিরন' বা দশ রাত্রির গল্প নামে একখানি গল্পের সংগ্রহ লিখে বিখ্যাত। আজ পৃথিবীর সব দেশেই ছোট গল্পের খুব আদর। বলতে গেলে গিওভনী বোকেচিওই প্রথম ইতালিতে তার সূত্রপাত করেন। নানা জাতের গল্প লিখেছেন তিনি, কোনটা করুণ, কোনটা হাসির।

আরিয়াস্তো (১৪৭৪-১৫৩৩) ও তাসো (১৫৪৪-'৯৫) নামে আর দু'জন কবির উদ্ভব হয় এঁদের অল্প পরে। রোলাণ্ডের বীরত্ব ও সাহসিকতার কাহিনী নিয়ে আরিয়াস্তো লেখেন 'অরল্যাণ্ডো ফিউরিয়েরসো' নামক কাব্য। আর তাসো জেরুজেলামে অবস্থিত যীশুর কবর সারাসেনদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য খৃষ্টানরা যে ক্রুসেড করেছিলেন সেই যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লেখেন 'জেরুজেলাম ডেলিভার্ড' বা জেরুজেলামের মুক্তি। এ দু'টি বইকে সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়। কিন্তু মহাকাব্য বলতে যে শ্রেণীর গাম্ভীর্যপূর্ণ ঘটনার কাব্য বোঝায় তা কিন্তু নয় অরল্যাণ্ডো। ওকে তাই রোমান্স বা রম্যকাব্যই বলা উচিত। তাসোর বই অবশ্য মহাকাব্যই। তার বিষয় এবং রচনা দু'দিকেই মহত্ত্বের পরিচয় আছে। ইংল্যাণ্ডে মিল্টন ছাড়া তাঁর সমকক্ষ কবি আধুনিক ইয়োরোপে আর হন নি।

ইতালির গদ্যসাহিত্য ও নাটক

কিন্তু ইতালীয় সাহিত্যে শুধু কবিতাই লেখা হয় নি এ সময়, লেখা হয়েছে কিছু কিছু নাটক এবং উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থও। গদ্যে শিল্পী ও শিল্প-রসিক বেনভেনুতো সেলিনীর (১৫০০-'৭১) আত্মজীবনী এবং নিকোলো মিকিয়াভেলীর (১৪৬৯-১৫২৭) রাজকুমার (ইংরেজিতে 'প্রিন্স') নামক রাজনীতিক গ্রন্থ খুব প্রসিদ্ধ। শেষের বইটিতে দেশশাসনে কূটবুদ্ধি ও চতুরতা কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তার অনেক নির্দেশ আছে, যা আজও মানুষের কাজে লাগতে পারে। আমাদের চাণক্যের সঙ্গে অনেকে তাই তাঁর তুলনা করেন। নাটকে ইতালিয়ানদের খুব প্রশংসনীয় কাজ কিছু নেই। কবি আরিয়াস্তো 'নেকরোমেন্সার' বা ভূতুড়ে জ্যোতিষীদের নিয়ে একখানা প্রহসন লিখেছিলেন। মিকিয়াভেলীও লিখেছিলেন একখানা মিলনান্তক নাটক 'ম্যানড্রেক' বলে। জিরালডী

সিনথিও, ত্রিসিনো প্রভৃতি আরো অনেক নাট্যকার ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁদের শুধু নামই আছে। বীভৎস খুনোখুনির কাহিনী লেখেন এঁরা।

রেনেশাঁসের পর

কিন্তু রেনেশাঁসের জোয়ারে ইতালিতে যে সাহিত্য ও শিল্পের প্রেরণা এসেছিল তা আড়াইশ’-তিনশ’ বছরেই ফুরিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল। তার রাজনৈতিক গৌরবও যেমন কমল, সাহিত্যিক গরিমায়ও তেমনি ভাঁটা পড়ল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে আবার আমরা পাই শ্রেষ্ঠ ইতালীয় লেখক ও সংস্কৃতি-নেতাদের দেখা। মাঝের এই সময়টিতে অবশ্য লেখাপড়া চলেছে, সাহিত্যও রচিত হয়েছে। কিন্তু তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়াতে পারে নি, কেন না তত বড় লেখক জন্মান নি কেউ।

ভিটটোরিও আলফিয়েরি (১৭৪৯-১৮০৩), গিয়াকিমো লিওপার্দি (১৭৯৮-১৮৩৭) এবং গ্র্যাবিয়েল দ্যনানজিও (১৮৬৩-১৯৩৮) প্রমুখ অল্প কয়েকজন নাট্যকার ও কবির রচনা মাত্র আমরা হাতে পাই এই দীর্ঘ সময়ের সাহিত্য হিসেবে।

বিংশ শতকে ইতালিতে কবি কার্দ্চি, নাট্যকার পিরেন্দেলো এবং ঔপন্যাসিক গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা ও ইগনেজিও সিলোনির আবির্ভাব হয়। প্রথম তিনজনই সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। পিরেন্দেলোর নাটক ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’ বাংলাতেও অভিনীত হয়েছে। দেলেদ্দার উপন্যাস ‘মা’ এবং সিলোনির চাষীজীবনের কাহিনী ফন্তামারা বহুজন পড়েছেন। নন্দনতত্ত্বের পণ্ডিত বেনিদেতো ক্রোচের এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ তুচ্চির নামও আমাদের কাছে পরিচিত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সংস্রবে এসেছিলেন।

উনিশ শতকে মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডী এক সময় ভারতের রাজনীতিক নেতাদের প্রভাবিত করেছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের নায়করা গ্যারিবল্ডীর সাহায্যও চেয়েছিলেন। আজ আবার নতুন ইতালি জাগছে। তার সাহিত্য ও শিল্পকলাও জাগবে নতুন করে, এ আশা তাই করা যেতে পারে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই।

ফরাসী সাহিত্য

রেনেশাঁসের ঢেউ ইতালি থেকে ফ্রান্সে ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ স্পেনে পৌঁছায়। সাগর পার হয়ে তা যায় ইংল্যাণ্ডে। তার ফলে সর্বত্র আসে নবজীবনের জোয়ার। নাটকে, সাহিত্যে, চিত্রকলায় নতুন চেতনা আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। অন্যান্য দেশের চেয়ে এ জায়গায় ফ্রান্সের ভূমিকা বেশ একটু অগ্রসর।

আমরা আগেই বলেছি যে শার্লেমাঁ ও রোলান্দের বীরত্বকাহিনী—অর্থাৎ চাসোঁ দ্য গেস্ত, রেনার্দ্ শৃগালের কাহিনী এবং ক্রবাদুর সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের ফরাসী সাহিত্যের যাত্রা। তারপর, খাঁটি অর্থে যাঁদের সাহিত্যিক বলা যাবে, একে একে উঠলেন সে রকম মানুষরা। এই দলের মধ্যে রাবল্যে (১৪৯৬-১৫৫৩), মতেঁ (১৫৩৩-’৯২), ভিয়ঁ (১৪৩১-’৭২), রসার্দ (১৫২৫-’৮৫)—এই চারটি নাম অগ্রগণ্য।

রাবল্যে লেখেন গরগনতুয়া ও পেঁতাগ্রুয়েল

নামে এক ব্যঙ্গ-উপন্যাস। এতে তখনকার পণ্ডিতসমাজ, পাদ্রীসমাজ এবং সৌখীন সামন্ত-সমাজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে। যে শ্রেণীর রচনাকে আজ আমরা প্রবন্ধ বলি তার সূত্রপাত করেন মতেঁ। লঘুগুরু নানা বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লেখেন তিনি, যা আজও সমান সুখপাঠ্য। ভিয়ঁ ছিলেন চোর ও দুশ্চরিত্র অপরাধী। একবার তাঁর ফাঁসির হুকুমও হয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ কবি ছিলেন তিনি। তাঁর ফাঁসিকাঠের গান (ব্যালাড্ অব্ দি জিবেট্) অকপট আন্তরিকতার জন্যে আজও পড়তে ভালো লাগে। রসার্দ ওড্, সনেট ও গীতিকবিতা —সব রকম রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'তারা গোষ্ঠী' নামে এক কবিদলের তিনি ছিলেন দলপতি। তাঁর কবিতায় ক্যাটুলাসের প্রভাব দেখা যায়।

ফরাসী নাটক

কাব্য ও কথাসাহিত্যের মত নাটকেও ফরাসী সাহিত্যে বিরাট শক্তিমান্ লেখকদের আবির্ভাব হয়। প্রথম দেখা দেন কর্নেই (১৬০৬-'৮৪), তারপর মলেয়ার (১৬২২-'৭৩), এবং শেষে রাসিন (১৬৩৯-'৯৯)। কর্নেই এবং রাসিন দু'জনেই গ্রীক ছাঁদের ট্র্যাজেডী-লেখক। কর্নেইএর কীড নাটক এক সময়ে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। রাসিনের ইফিগেনিয়া, ফেড্রিয়া প্রভৃতি নাটক ইউরিপিডিস ও সেনেকার বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত হলেও এতে পড়েছে রেনেশাঁসী মানবতার ছোঁয়া। তাই এগুলি হয়েছে অপরূপ ট্র্যাজেডী।

তিনজনের মধ্যে মলেয়ারের আসনই সর্বোচ্চ। মলেয়ারের আসল নাম জঁা বাপ্তিস্তে পোকেলেঁা। ছদ্মনামে তিনি নাটক লেখেন সমাজকে ঘা দেবেন বলে এবং নাট্যকার হিসেবে পৃথিবীতে তিনি শেক্সপীয়ারের সমকক্ষ—অনেকেই



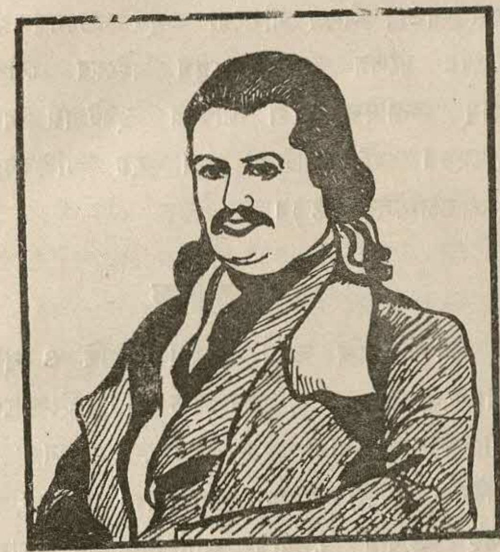
রুশো

বলেন এ কথা। মলেয়ার অবশ্য কমেডী-লেখক এবং মানুষের ভণ্ডামি, মূর্খতা, কার্পণ্য ও অসাধুতাকে ব্যঙ্গের আলোয় উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি তাঁর নাটকে। কৃপণ এবং বোকা বড়লোক (ইংরেজিতে মাইজার ও দি বুর্জোয়া জেন্টলম্যান) তাঁর বিখ্যাত বই। মলেয়ারের প্রতিভা তিনশ' বছর পরেও আজও সমান উজ্জ্বল মনে হয়— তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হলেই।

প্যাসকাল, ভোলতেয়ার, রুশো প্রভৃতির আবির্ভাব

সৃষ্টিমূলক রচনায় যেমন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাতেও তেমনি ফরাসীদের প্রতিভা মধ্যযুগ থেকেই পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। দার্শনিক

প্যাসকাল (১৬২৩-৬২), প্রবন্ধকার মন্তেস্ক (১৬৮৯-১৭৫৫) প্রভৃতির বহু মূল্যবান্ বই বেরুতে থাকে। তা ছাড়া যাঁদের রচনা ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে উদ্দীপনা দিয়েছিল,



ব্যালজাক

সেই ভোলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), রুশো (১৭১২-'৭৮) এবং দিদেরো (১৭১৩-'৮৪) ওঠেন অল্প পরেই।

ভোলতেয়ার একদিকে যেমন কাঁদিদ উপন্যাস লেখেন, অন্যদিকে তেমনি লেখেন মানুষের অধিকার নিয়ে বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ। রুশোও নিউ এলইজ নামে উপন্যাস লেখেন, আবার লেখেন সামাজিক সম্পর্ক নামক সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক বইও। তাঁর আত্মজীবনীও অকপট স্বীকারোক্তির জন্যে একই সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসা পেয়েছে প্রচুর। দিদেরো বহুজনের সহযোগিতায় সম্পাদন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বিশ্বকোষ এবং এ থেকেই ঐ দলটির নাম হয় বিশ্বকোষবাদী বা এনসাইক্লোপিডিষ্ট। এই বিশ্বকোষে যে ভাবে সাধারণ মানুষের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তা ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে।

ফরাসী বিপ্লবের পরে

ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী সাহিত্যে আসে কথাসাহিত্যের বান এবং একে একে দেখা দেন ব্যালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), ফ্লবেয়ার (১৮২১-'৮০), জোলা (১৮৪০-১৯০২), মোপাসাঁ (১৮৫০-'৯৩), দোদে (১৮৪০-'৯৭), হুগো (১৮০২-'৮৫), গতিয়ে (১৮১১-'৭২)। ব্যালজাক মানুষের পাপ-তাপের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন (যার ইংরেজি নাম হিউম্যান কমেডী)। জোলার জার্মিনল বইয়েও দরিদ্র শ্রমজীবীদের জীবন চিত্রিত হয়েছে। ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারী, গতিয়ের মাদমোয়েজেল গু মোপাইন এবং দোদের সাফো উপন্যাস এক সময় মনস্তত্ত্বপ্রধান রচনা হিসেবে খুব বিখ্যাত



আলেকজান্দার দ্যুমা

ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত ভিক্তর হুগোর লা মিজারেবল, যাতে দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মোপাসাঁ লিখেছেন অজস্র ছোট গল্প, যাতে আছে মানুষের বিচিত্র স্বভাবের ছবি আর রকমারি মনস্তত্ত্বের খেলা। পৃথিবীতে বোধ হয় এত ঘটনাসৃষ্টির কৌশল আর কেউ দেখাতে পারেন নি। জমজমাট কাহিনী লিখে বিখ্যাত আলেকজান্দার দ্যুমা (১৮০২-'৭০)। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, ব্ল্যাক্ টিউলিপ, কর্সিকান ব্রাদার্স প্রভৃতি বহু বই তাঁর। তাঁর কাউন্ট অব্ মন্টেক্রিস্টোর গল্প এই বইতেই তোমরা পড়েছ। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯, ১৭৫, ২৪৫)। এগুলি অবশ্য ইংরেজি নাম। আমরা এ সব বইএর ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গেই বেশি পরিচিত, তাই এই প্রবন্ধে বেশির ভাগ বইএর ইংরেজি নামই উল্লেখ করব।

গল্পলেখকদের পাশাপাশি উঠেছিলেন বিরাট শক্তিশালী কবিরাও। তাঁদের মধ্যে আলফ্রেড দ্য মুসে (১৮১০-'৫৭), চার্লস বোদলেয়ার (১৮২১-'৬৭), স্তেফান মালার্মে (১৮৪২-'৯৮), পল ভার্লেন (১৮৪৪-'৯৬), র‍্যাঁবো (১৮৫৪-'৯১) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ভার্লেন এবং দ্য মুসে মনোরম আবেগের কবি। তাঁরা লিখেছেন অপূর্ব সুন্দর প্রেমের কবিতা। মালার্মে জগতের নৈরাশ্য, বেদনা ও হাহাকারকে কাব্যে তুলে ধরেছেন। বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবো পাপ, অন্যায় ও ঘৃণাকেই কাব্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। তাঁদের তাই বলা হয় পঙ্কলোকের শিল্পী।

আধুনিক ফরাসী সাহিত্য

দু'টি মহাযুদ্ধ মাথার উপর দিয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রান্সের সাহিত্যধারা এখনও সমান গতিতেই চলেছে। দার্শনিক বার্গসোঁ এবং আনাতোল ফ্রাঁস, রোমা রোলাঁ প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা চলে গেলে এসেছেন কবি পল এলুয়ার এবং সার্তর, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ গদ্যলেখকরা। এঁদের দলের অন্যতম প্লেগ বইয়ের লেখক কামু অল্পদিন হ'ল রাস্তার দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এই দলটিকে বলা হয় অস্তিত্ববাদী (এক্সিষ্টানসিয়ালিষ্ট)।

ইংরেজি সাহিত্য

যে ইংরেজি ভাষা আমরা লিখি ও পড়ি, আদিতে তার রূপ এ রকম ছিল না। ইংল্যাণ্ডের সাবেকী ভাষা হ'ল অ্যাংলো-স্যাক্সন। যে বীউল্‌ফ্ কাব্যের কথা আগে বলা হয়েছে, তা সেই ভাষায় লেখা। অ্যাংলো-সাক্সন ভাষায় আরো অনেক রচনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে ক্যাডমনকৃত বাইবেলের অনুবাদ (অংশ বিশেষ) উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে ঐ ভাষা বদলাতে বদলাতে ইংরেজি ভাষার রূপ নেয়, যেমন চর্যাপদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

প্রথম ইংরেজি ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয় তাতেও লোকগাথা, গান ও বীর-কাহিনীরই প্রাধান্য দেখা যায়। এ সবের মধ্যে রাজা আর্থার ও তাঁর বীর নাইট গ্যালাহেড, গাওয়েন প্রভৃতির কথা আছে, আছে রবিন হুডের কথা, আর আছে বাইবেলের ঘটনা নিয়ে রচিত অভিনয়যোগ্য পালা, যাকে বলা হ'ত মিরাক্‌ল্ প্লে। এই শেষোক্ত পালা থেকেই ইংরেজি নাটকের জন্ম।

ইংরেজি সাহিত্যে রেনেশাঁসের প্রভাব : শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব

নবজাগরণ বা রেনেশাঁসের প্রভাবে যে নতুন জীবন-চেতনা এল রাণী এলিজাবেথের সময়কার ইংল্যাণ্ডে, তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন হ'ল অসাধারণ উন্নতি, তেমনি ইংরেজের প্রতিভাও নানা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় যে সাহিত্য রচিত হ'ল, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। আবার এই সাহিত্যের স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের মধ্যমণি হলেন উইলিয়াম শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), যাঁকে শুধু ইংরেজ নয়, জগতের সকল জাতিই সর্বকালের মহান্ স্রষ্টা বলে মানেন।

সবশুদ্ধ ছত্রিশখানি নাটক লিখেছিলেন শেক্সপীয়ার। তিনভাগে ভাগ করা হয় এগুলিকে : ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্তক, কমেডী বা মিলনান্তক ও ইতিহাস। ট্র্যাজেডীর মধ্যে ওথেলো, হ্যামলেট, কিং লীয়ার ও ম্যাকবেথ প্রসিদ্ধ। কমেডীর মধ্যে অ্যাজ ইউ লাইক্ ইট্ বা যেমনটি চাও, মীড সামার নাইট্স্ ড্রীম্ বা মধ্যগ্রীষ্মের নিশীথ-স্বপ্ন, কমেডী অব্ এরার্স বা ভ্রান্তিবিলাস, মার্চেন্ট অব্ ভেনিস বা ভেনিসের সওদাগর এবং টেম্পেস্ট্ বা ঝড় প্রসিদ্ধ। ইতিহাস অংশ প্রধানত বড় বড় ইংরেজ রাজাদের জীবন-কাহিনীমূলক। এ ছাড়া আছে তাঁর দু'খানি কাব্যকাহিনী ও কতকগুলি সনেট। শেক্সপীয়ার জগতের অতুলনীয় কবি। মানবচরিত্র-জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পনৈপুণ্যে তাঁর যুড়ি মেলা ভার।



শেক্সপীয়ার

শেক্সপীয়ারের একটি নাটক

শেক্সপীয়ারের নাটকের একটি কাহিনী এখানে দিলে তোমাদের ভালো লাগবে। মার্চেন্ট অব্ ভেনিসের কাহিনীটাই বলা যাক।

ভেনিস শহরে শাইলক নামে একজন সুদখোর ইহুদী ছিল। সুদে টাকা খাটিয়ে সে বিস্তর পয়সা করেছিল, আর সেই সুদ আদায়ের জন্যে খাতকের ওপর অসম্ভব জুলুম করত সে। এজন্যে কেউ তাকে পছন্দ করত না, কিন্তু সময়ে অসময়ে টাকার দরকার পড়লে সে ছাড়া গতি নেই, তাই কিছু বলতেও সাহস পেত না। কিন্তু একজন লোক বাদে। সে ছিল ঐ ভেনিস শহরেরই এক উদারহৃদয় সওদাগর—অ্যাণ্টনিও। অ্যাণ্টনিও লোকের বিপদ্ দেখলে বিনা সুদেই তাকে টাকা ধার দিত। এতে শাইলকের ব্যবসার ক্ষতি হ'ত। শুধু তাই নয়, সুবিধা পেলেই অ্যাণ্টনিও শাইলককে তার কশাইএর মত আচরণের জন্য দু'-চার কথা শুনিয়েও দিত। শাইলকের এজন্যে তার ওপর ছিল ভীষণ রাগ।

মুখে সে কিছু বলত না কিন্তু তলায় তলায় সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

অ্যান্টনিওর বন্ধু ছিল ব্যাসানিও। পোর্শিয়া নামে একটি বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে সে খুব ভালোবাসত এবং তাকে বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বিয়ের খরচের জন্যে সে অ্যান্টনিওর কাছে টাকা ধার চাইল। আন্টনিওর তখন হাতে নগদ টাকা ছিল না, কিন্তু তার কয়েকখানি জাহাজ সে সময়ে সমুদ্রে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিল। জাহাজ ফিরলেই বহু টাকা হাতে আসবে তার। ব্যাসানিও সবুর করতে চায় না ; বন্ধুর হয়ে অগত্যা অ্যান্টনিও নিজেই গেল শাইলকের কাছে টাকা ধার চাইতে।

শাইলক বুঝল এই তার সুযোগ। অ্যান্টনিওকে নিজের খপ্পরে পেয়েছে সে এইবার, এইবার সে তার অপমানের শোধ তুলবে। শাইলক বলল, "টাকা আমি দেব, কিন্তু এক শর্তে। নির্দিষ্ট সময়ে যদি তুমি তা শোধ করতে না পার তা হলে তার সুদ হিসেবে টাকার বদলে আমি তোমার বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেব। আসলও আমি ফেরৎ চাই না। কেমন, রাজী ?"

অ্যান্টনিওর জাহাজ কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরছে। সুদ কেন, আসল ফেরৎ দিতেও তার কোন অসুবিধে হবে না। নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগেই সে সব কিছু ফেরৎ দিতে পারবে। কাজেই শাইলকের এই অদ্ভুত শর্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে চুক্তিটা কাগজপত্রে লেখাপড়া করে দিল সে। ব্যাসানিও টাকা নিয়ে হাসিমুখে চলে গেল পোর্শিয়াকে বিয়ে করতে।

বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যাসানিও পোর্শিয়াকে নিয়ে তাদের বাড়িতে সুখে দিন কাটাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একখানা চিঠি এল অ্যান্টনিওর কাছ থেকে। ঝড়ে তার সমস্ত জাহাজ ডুবে গেছে। এখন সে কপর্দকহীন। শাইলকের টাকা সে সময় মত ফেরৎ দিতে পারে নি। চুক্তিমত শাইলক তার সুদ আদায় করার জন্যে আদালতে মামলা দায়ের করে দিয়েছে।

চিঠি পেয়ে ব্যাসানিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। পোর্শিয়া স্বামীর অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। জেরা করে সমস্ত ব্যাপার সে জেনে নিল।

নির্দিষ্ট দিনে আদালত লোকে লোকারণ্য। শাইলক আর অ্যান্টনিও দু'জনেই হাজির। ব্যাসানিওও এসেছে। শাইলক তার ছুরি শানাচ্ছে। বিচারকের হুকুম পেলেই চুক্তিমত তার সুদ সে আদায় করে নেবে। নির্দিষ্ট তারিখ উৎরে গেছে, এখন আর সে টাকা চায় না।

এমন সময় একটি তরুণ উকিল এসে বলল, সে অ্যান্টনিওর পক্ষে মামলা পরিচালনা করবে। কে এই উকিল, কেউ তাকে চেনে না। মনে হয় তার বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারি চালাকচতুর।

বিচার শুরু হ'ল। উকিলটি প্রথমে শাইলককে নানা কাকুতি-মিনতি করে তার শর্ত ফিরিয়ে নিতে বলল। তার টাকা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেই তো হ'ল! কিন্তু শাইলক নাছোড়বান্দা। টাকা সে চায় না— সুদের শর্তে যা লেখা আছে তাই কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নেবে সে। আর কিছু না, অ্যান্টনিওর বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংস চাই।

কিছুতেই যখন কিছু হ'ল না তখন উকিল জজ্ সাহেবের দিকে চেয়ে বলল, বেশ, শর্তে যা লেখা আছে তাই পাবে শাইলক। অ্যান্টনিওর বুকের এক পাউণ্ড মাংস। কিন্তু ঐ মাংসই পাবে, এক ফোঁটাও রক্ত নয়। যদি এক ফোঁটাও রক্ত সে বার করে নেয় তা হলে কোর্ট যেন তার উপযুক্ত শাস্তি দেন।

শাইলক বলল, "তা কি করে হয়? মাংস নিতে গেলে সঙ্গে তো রক্ত আসবেই!"

"কিন্তু তোমার শর্তে তো রক্তের কথা কিছু লেখা নেই! রক্ত তুমি পাবে না। রক্ত বাদ দিয়ে মাংস নিতে চাও, নাও।"

জজ্ সাহেবও এই চতুর উকিলের সওয়ালে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, উকিল ঠিকই বলেছে—শর্তে শুধু মাংসের কথাই আছে, রক্তের কথা তো নেই! সুতরাং শাইলক তা দাবী করতে পারে না।



'রক্ত বাদ দিয়ে মাংস নিতে চাও তো নাও।'

শাইলক মহা ফাঁপরে পড়ল। রক্ত ছাড়া মাংস! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! অগত্যা সে বলল, "বেশ, সুদ চাই না, আসল পেলেই আমি খুশি।"

উকিল বলল, "না, তাও তুমি পাবে না, শর্তে সে কথা নেই। সুদ যদি না নাও, মানে মানে সরে পড়। কিছুই তুমি পাবে না।"

জজ্ আবার তার কথায় সায় দিলেন।

শাইলক মাথা নীচু করে আদালত থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে কেউ দেখতে পারত না, সবাই তার অবস্থা দেখে টিট্‌কারী দিতে দিতে পেছন পেছন চলল।

এদিকে অ্যান্টনিও আর ব্যাসানিও প্রাণদাতা ঐ তরুণ উকিলটিকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না। তখন উকিল হাসতে হাসতে তার উকিলের পোশাক খুলে ফেলল! ও মা, এ যে পোর্শিয়া! ব্যাসানিওর স্ত্রী। পুরুষের ছদ্ম-বেশে উকিল সেজে সে এসেছে। কেউ তাকে চিনতে পারে নি। তখন কি মজাটাই না হ'ল!

বেন জনসন, মার্লো, বেকন

শেক্সপীয়ারের সমকালে আরো অনেক নাট্যকার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেন জনসন (১৫৭৩-১৬৩৭), মার্লো (১৫৬৪-'৯৩) প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। মার্লোর টম্বারলেন ও ডক্টর ফষ্টাস অদ্বিতীয় বই। বেন জনসনের ভল্‌পোনে নাটকও এক সময়ে খুব সমাদৃত ছিল। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনও (১৫৬১-

১৬২৬) এই সময়ের লোক। ফরাসী পণ্ডিত মতেঁর মত তিনিও 'এসে' বা প্রবন্ধ লেখার জন্য খ্যাতিমান্। তাঁর প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য ও সরলতায় অনুপম।

শেক্সপীয়ারের আগের দু'জন বড় কবি

শেক্সপীয়ারের আগে ইংরেজিতে যে দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের কথাও বলা দরকার। তাঁরা হলেন জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) এবং এডমণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-'৯৯)। চসারের সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের নাম ক্যান্টারবেরী টেল্‌স্। টারবাড সরাইখানা থেকে একদল যাত্রী রওনা হয় ক্যান্টারবেরীতে। পথে



এডমণ্ড স্পেন্সার

তারা যে সব গল্পগুজব করে তাই হ'ল এ কাব্যের বিষয়। এই কাব্য অসমাপ্ত। এর প্রস্তাবনাতে লোকচিত্র অঙ্কনে চসার অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইন কাব্যে রাণী এলিজাবেথের জীবনকে রূপকাকারে উপস্থিত করা হয়েছে। ইনিও অসাধারণ কবি।

শেক্সপীয়ারের পরে : মিল্টন

শেক্সপীয়ারের পর ইংরেজি সাহিত্যে এল একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তনের হাওয়া। এলিজাবেথীয়ান্ যুগের চিন্তার স্বাধীনতা ও কল্পনার অবাধ গতি বাধা পেল, কেন না প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমতের কড়াকড়ি সর্বক্ষেত্রের মত সাহিত্যেও ছায়াপাত করল। এই সময়ের কবি জন মিল্টন (১৬০৮-'৭৪)। তাঁর



মিল্টন

প্রধান বইয়ের নাম 'প্যারাডাইস লষ্ট' বা স্বর্গচ্যুতি, যাতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম ও ইভ কি ভাবে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিল সেই কাহিনী বলা হয়েছে। স্যামসন ও ডেলাইলার কাহিনী নিয়ে গ্রীকদের আদর্শে একখানি ট্র্যাজেডীও লিখেছিলেন মিল্টন। তা ছাড়া তাঁর খণ্ডকবিতা, সনেট এবং অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থও আছে। ভাষার গাম্ভীর্যে ও বর্ণনার চমৎকারিতায় মিল্টন সত্যিই এক মহান্ কবি।

পরবর্তী যুগের অন্যান্য কবিরা

মিল্টনের পর ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০), পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪)—এই দু'জন বড় কবি।

এঁদের মধ্যে ড্রাইডেন ভার্জিলের এবং পোপ হোমারের অনুবাদক হিসেবে বেশি খ্যাত, যদিও প্রথমের ম্যাকফ্লেকনো এবং দ্বিতীয়ের ডানসিয়েড বা মূর্খের মহাভারতও সবাই সাগ্রহে পড়েন। পোপের 'এসে অন্ ম্যান্' বা মনুষ্য-বিষয়ক রচনাও নামকরা কাব্য। এঁরা কৃত্রিমতার



বাইরন

কবি। এঁদের পর স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য কবি বার্ন্স্ (১৭৫৯-৯৬) সরল আবেগপূর্ণ গীতি-কবিতার অবতারণা করে। সেই ধারাই অল্প পরে—যাকে সাধুভাষায় বলা যায় "রসাবেশের পুনর্জাগরণ" বা "রোমান্টিক রিভাইভ্যাল"—তাতে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের সূত্রে একে একে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), বাইরন (১৭৮৮-১৮২৪), শেলী (১৭৯২-১৮২২), কীট্স্ (১৭৯৫-১৮২১) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জীবনের নানা কামনা, কল্পনা ও স্বপ্নকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন এঁরা। সংসার ও সমাজের নানা সমস্যাকেও দিয়েছেন কবিতায় স্বীকৃতি।

ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ প্রকৃতির কবি, কীট্স্ সৌন্দর্যের কবি, শেলী মানবমুক্তির কবি,



শেলী

বাইরন হৃদয়াবেগের কবি। কবি হিসেবে এঁরা বিশ্ববিখ্যাত। ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের 'লুসী গ্রে', কীট্সের 'নাইটিংগেল', শেলীর 'ওয়েষ্ট উইণ্ড', বাইরনের 'ওশান্' আমাদের অতি পরিচিত কবিতা।

এঁদের পর ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি হলেন ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯), টেনিসন (১৮০৯-৯২), সুইনবার্ন্ (১৮৩৭-১৯০৯), রসেটী (১৮২৮-৮২)। এঁরা সবাই হলেন ভিক্টোরিয়ান্ যুগের কবি। ব্রাউনিং জীবনের জটিলতার নানা দিক্ কবিতায়



কীট্স্



ব্রাউনিং

ফুটিয়েছেন, টেনিসন লিখেছেন মানব-মঙ্গলের কবিতা। রসেটী ও সুইনবার্ন শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দের কথাই কবিতায় গেঁথেছেন, কোনও দার্শনিকতা নিয়ে মাথা ঘামান নি তাঁরা। তাঁদের বলা হয় প্রি-র‍্যাফেলাইট।

গদ্যসাহিত্যের জয়যাত্রা

কবিতার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যে গদ্যেরও বিরাট জয়যাত্রা লক্ষ করা যায়।



টেনিসন

চসারের সময়েই পাদ্রী উইকলিফ (১৩২০-'৮৪) বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন। ম্যালোরি (১৩৯৪-১৪৭১) লিখেছিলেন আর্থারের কাহিনী—'মোর্ট ডি আর্থার'। তারপর বানিয়ান (১৬২৮-'৮৮) লেখেন 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' বা যাত্রীর লক্ষ্য, যাতে রূপকের আকারে খৃষ্টীয় ধর্মজিজ্ঞাসার কাহিনী বলা হয়েছে। এর পর ওঠেন দুই বন্ধু,



ডঃ স্যামুয়েল জন্‌সন্

জোসেফ এডিসন (১৬৭২-১৭১৯) ও রিচার্ড স্টীল (১৬৭২-১৭২৯)। এঁরা স্পেক্‌টেটর নামক পত্রিকায় রকমারি "এসে" বা প্রবন্ধ লিখে প্রসিদ্ধ। প্রথম লেখকের মীর্জার স্বপ্ন একটি বিখ্যাত রচনা। ড্যানিয়াল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) এবং জোনাথন্ সুইফ্‌টের (১৬৬৭-১৭৪৫) নামও এই সঙ্গে করতে হবে। দু'জনেই এঁরা দু'টি জগদ্বিখ্যাত বইয়ের লেখক। প্রথম জন লিখেছেন রবিন্‌সন্ ক্রুসো, দ্বিতীয় জন গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এ গল্প দু'টি তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। ডঃ স্যামুয়েল জন্‌সন্ (১৭০৯-'৮৪) এর পরে। তিনি নামকরা সমালোচক, অভিধান-

লেখক এবং প্রধান একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দলপতি ছিলেন।

পরের ধাপে আমরা পাই নামী গদ্য-লেখক রূপে কোলরীজ (১৭৭২-১৮৩৪), হেজলিট (১৭৭৮-১৮৩০), কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১), ল্যাম্ব (১৭৭৫-১৮৩৪), রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০)



কার্লাইল

ও ম্যাথু আর্নল্ডকে (১৮২২-'৮৮)। কোলরীজ, হেজলিট ও আর্নল্ড সাহিত্য সমালোচনায় খ্যাতিমান্। ল্যাম্ব ইলিয়ার রচনাবলী নামে হাল্কা সুরের প্রবন্ধলেখক। রাস্কিন করেছেন শিল্প সমালোচনা। কার্লাইল লিখেছেন ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস। আর একজন ছিলেন ডিকুয়েন্সী—যাঁর আফিংখোরের জবানবন্দী (ওপিয়াম্ ইটার) দেখেই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'।

নাটক ও উপন্যাস

ইংরেজি নাটক-উপন্যাসের কথাও একটু বলতে হবে। শেক্সপীয়ারের পর সামাজিক নাটক লেখার ধুম পড়ে রেস্টোরেশন যুগে। ড্রাইডেন, কনগ্রিভ (১৬৭০-১৭২৯), শেরীডন (১৭৫১-১৮১৬) ও গোল্ডস্মীথ (১৭২৮-'৭৪) এই সময় অনেক ভালো নাটক লিখেছিলেন। ড্রাইডেনের 'আওরেঙ্গজেব' খুব সুখপাঠ্য নয়, কিন্তু কনগ্রিভের 'ওল্ড ওয়াইফ্ স্ টেল' বা বুড়ো বউয়ের গল্প এবং শেরীডনের 'স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল্স্' বা অপবাদের পাঠশালা অপূর্ব কৌতুক-নাটক। গোল্ডস্মীথ কবিতা এবং উপন্যাসও লিখেছিলেন, কিন্তু নাটকেই তিনি বেশি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'শী স্টুপ্ স্ টু কন্কার' বা মহিলাটি জিততে চাইছেন বইটিও সরস এবং সুখপাঠ্য।

ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল গালিভারের ভ্রমণ ও রবিন্‌সন্ ক্রুসো দিয়ে। তারপর সামাজিক কাহিনীর অবতারণা করেন রিচার্ডসন প্যামেলা বই লিখে। তাঁর সমসাময়িক ফিল্ডিং (১৭০৭-'৫৪) লেখেন টম জোন্স। আইভান হো, কুইনটিন ডারওয়ার্ড প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) ওঠেন এঁদের কিছু পরে। কিন্তু ডিকেন্স (১৮১২-৭০) ও থ্যাকারে (১৮১১-৬৩) করেন সত্যিকার সামাজিক উপন্যাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'পিক্‌উইক্ পেপার্স', 'এ টেল্ অব টু সিটিজ্', 'অলিভার টুইস্ট' প্রভৃতি ডিকেন্সের প্রসিদ্ধ বই। ইনি দরিদ্র, দুঃখী মানুষদের কথা লিখেছেন। থ্যাকারের জন্ম কলকাতায়। তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' বইয়ে মানব-জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের ছবি স্থান পেয়েছে। এ দু'জনের পর হার্ডি ও মেরিডিথ গণনীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক। হার্ডির 'ফার ফ্রম্ দি ম্যাডিং ক্রাউড্' (পাগল-করা জনতা থেকে দূরে) উপন্যাস একখানি অপূর্ব রচনা।



ডিকেন্স

কিশোরপাঠ্য কাহিনী রচনায় লুই ক্যারল, লুই ষ্টিভেনশন প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগে

ইংরেজি সাহিত্যে একালেও মহান্ লেখকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নাটকে বার্নার্ড শ', উপন্যাসে গল্স্ওয়ার্দি, ওয়েল্স, হাক্সল্যে, মম্,



বার্নার্ড্ শ'

কবিতায় ব্রিজেস্, ইয়েট্স্, মাসফিল্ড, ত্য লা মেয়ার বিশ্ববিখ্যাত। বার্নার্ড্ শ' নাটকে এ যুগের জীবন-সমস্যার নানা দিক্ উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর নামী বইয়ের মধ্যে 'ম্যান্ অ্যাণ্ড সুপারম্যান্', 'পিগ্-মেলিয়ন', 'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান্', 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন্' বা শ্রীমতী ওয়ারেনের জীবিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওয়েল্স্ বৈজ্ঞানিক ও হাক্সল্যে দার্শনিক উপন্যাস লিখেছেন। জেম্স্ জয়েসের



এইচ. জি. ওয়েল্স্

ইউলিসিজ উপন্যাসও একখানি যুগান্তকারী বই —যা নিয়ে একদা নিন্দা-প্রশংসা দুইই হয়েছে প্রচুর। কবি এলিয়ট ও পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা রূপে সম্মানিত হলেও আসলে কিন্তু মার্কিন। এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' বা পড়ো-জমি কাব্য এবং 'মার্ডার ইন এ ক্যাথেড্রাল' বা গির্জায় হত্যাকাণ্ড নাট্য-কাব্য বহুপ্রশংসিত বই। পাউণ্ডের 'ক্যান্টো' কাব্যগ্রন্থ নিয়েও এক সময় খুব আলোচনা হয়েছে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা রাশিয়া, জার্মেনি, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।



দেশ বিদেশের কথা

মহাচীন

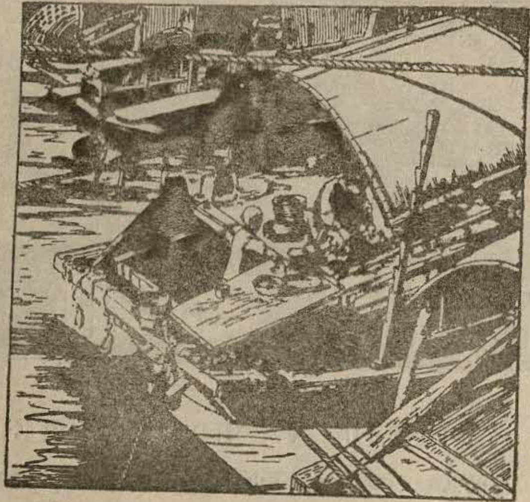
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক কোন্ দেশে? এর উত্তর তোমরা ভূগোলে নিশ্চয় পড়েছ। কেন, চীন দেশ! ১৯৬১ সালের লোকগণনায়ই দেখেছিলাম ওখানকার জনসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটির কাছে গেছে। এ কয় বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটির ওপর। দেশটির আয়তন অবশ্য কম নয়—প্রায় ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৭ বর্গ মাইল। সোভিয়েট রাশিয়া আর ক্যানাডা ছাড়া পৃথিবীতে অত বড় দেশ আর কোথাও নেই। ভারতবর্ষকেই আমরা বলি উপমহাদেশ, কিন্তু চীন ভারতবর্ষের চাইতেও অনেক বড়। তাই চীন না বলে মহাচীন বললেই মানায় ভালো।

চীনে থাকা-খাওয়ার সমস্যা

কিন্তু দেশের আয়তন অত বড় হলেও প্রায় সমস্ত ভিড়টাই কিন্তু গিয়ে জড় হয়েছে পূর্বাঞ্চলে। চীনের বাকি দুই-তৃতীয়াংশই এত পাহাড় আর শুকনো মরুভূমি দিয়ে ঠাসা যে খুব কম লোকেই সেখানে বাস করে। কোন কোন জায়গা তো একেবারেই ফাঁকা। যারা দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে তারাও উপকূলটাই বেছে নিয়েছে—ভিতরের দিক্‌টায় গিজ্ গিজ্ করছে পাহাড়।

উত্তরে মোঙ্গোলিয়া। শুধু পাহাড় নয়, সেখানে রয়েছে বিরাট, ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমি, পৃথিবীতে যার যুড়ি বেশি নেই।

সবাই এক জায়গায় ভিড় করলে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। চীনে এ সমস্যা বহুদিনের। লোকজন সবাই ডাঙ্গায় বাস করবার জায়গা পায় না। এমন অনেক লোক আছে যারা সপরিবারে নৌকোর ওপরেই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কাজের জন্য শহরে গেলে রাত্রে আবার ফিরে আসে নৌকোয়। অনেকে নিজের দেশে জায়গা না পেয়ে অন্য দেশে গিয়ে ঘরবাড়ি বাঁধে। পৃথিবীতে এমন দেশ বোধ হয় খুব কমই আছে যেখানে কিছু-না-কিছু প্রবাসী চৈনিক বাস করে না। আমাদের কলকাতা শহরেও এই রকম চীনেপট্টি আছে। এখানকার চীনে বাসিন্দারা অনেকেই পুরুষানুক্রমে এদেশে বাস করছে, স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে।



চীনের বহু লোক সারাজীবন নৌকোয় বাস করে।

থাকার মত খাওয়ার সমস্যাও কম নয়। তবে চীনেরা—বিশেষত চীনের কৃষক অসম্ভব পরিশ্রমী। চাষের জন্য যেটুকু জমি পায় তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার না করে তারা ছাড়ে না, কারণ ঐ জমি থেকেই তাদের সোনা ফলাতে হবে। কয়েক শ' বছর আগেও ছিল ঐ রকম। এক বিদেশী ভ্রমণকারী চীনে গিয়ে অবাক্ হয়ে লিখেছিলেন—চাষ করা যায় এমন একফুট জায়গাও চীনে চাষীরা কখনও ফেলে রাখে না।

পরিশ্রমী শুধু চাষীরা নয়, শ্রমিকরাও। বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় পৃথিবীর নানা দেশের কথা বলতে গিয়ে ছোট্ট একটি কথায় চীনের এই পরিচয়টুকু দিয়ে গিয়েছেন ঃ "প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান কর্ম-অনুরত।"

যেখানে মাটি নেই সেখানে গেলে দেখা যাবে পাহাড় কুপিয়ে পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে কেটে চীনে চাষী ফসল ফলাচ্ছে। যেখানে জল নেই সেখানে নদী থেকে লম্বা লম্বা খাল কেটে এনে ক্ষেতে জল সেচ করছে। শুধু চাষী নিজে নয়,—চাষী-বৌ, এমন কি তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বাপমায়ের কাজে সাহায্য করছে—চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জল টেনে তুলছে খাল থেকে ক্ষেতে।

সমস্ত দেশ এক রকম নয়

অত বড় একটা দেশ, তার এক এক জায়গায় জল-হাওয়া স্বভাবতই এক এক রকম। উত্তরে মাঞ্চুরিয়া গেলে দেখবে বেশির ভাগ সময়েই সেখানে শীত, গ্রীষ্ম যদি বা এল সেও খুব ক্ষণস্থায়ী। শীতের দিনে তুষার-ঝঞ্ঝা লেগেই আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, চীনেদের ঐ যে চ্যাপ্টা নাক, চর্বির ভারে বোঁজা বোঁজা চোখ, উঁচু গালের হাড়—এ সবেরই কারণ ঐ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। আত্মরক্ষার জন্যই প্রকৃতির নিয়মে ওদের মুখের গড়ন ঐ রকম হয়েছে। দক্ষিণ চীনে কিন্তু আবহাওয়া একেবারে অন্য রকম,—ইংরেজিতে যাকে বলে "ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট" (গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া)। আরও নীচে নেমে এস, হাইনান দ্বীপের কাছে একেবারে সামুদ্রিক আবহাওয়া। নারকেলকুঞ্জ, রবার, কফি আর আনারসের ছড়াছড়ি।



চীনের চাষীরা ধান বুনছে।



চীনের মানচিত্র

চীনের নদী ঃ
হোয়াং হো আর ইয়াং সি কিয়াং

উত্তর চীনের সব চাইতে বড় নদী হচ্ছে হোয়াং হো। হোয়াং মানে হলদে আর হো মানে নদী। তা হলে মানে দাঁড়ায় হলদে নদী —সাধুভাষায় পীত নদী। নামকরণের অবশ্যই একটা কারণ আছে। এই নদী যে অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তার অনেকটা জায়গায়ই মাটির রং হলদে। সে মাটি ধুয়ে-আনা জলও তাই হলদে। ২৯০০ মাইল লম্বা এই নদী বেঁকেচুরে অনেকটা জায়গা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সঙ্গে আছে অনেক-গুলি উপনদী আর শাখানদী—মাকড়সার জালের মত ঘিরে রেখেছে হোয়াং হোকে। হোয়াং হোর চাইতে বড় নদী পৃথিবীতে আছে মাত্র ৫টা।

বিরাট জায়গা যুড়ে পলি ফেলতে ফেলতে ছুটে চলেছে হোয়াং হো শতাব্দীর পর শতাব্দী। এত পলি যে একটা বিরাট অঞ্চল তাতে ভরাট হয়ে গিয়ে তৈরি করেছে সুবিশাল উর্বর এক রাজ্য। সঙ্গে সঙ্গে বিপদেরও যে সৃষ্টি করছে না তা নয়। যখন তখন বন্যা লেগেই আছে নদীতে। আর বান ডাকলে তো রক্ষা নেই, আশপাশের গ্রাম, শহর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধরে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীনেরা নদীর ধারে ধারে উঁচু উঁচু বাঁধ দিয়ে রেখেছে। বাঁধ ছাপিয়ে জল উঠলে আরও উঁচু বাঁধ তৈরি করছে। ফলে এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আশপাশের ডাঙ্গা থেকে হোয়াং হো অনেক জায়গায়ই বেশ খানিকটা উঁচু দিয়ে বয়ে চলেছে। বুঝতেই পারছ, এর পরেও নদী বাঁধ ভেঙ্গে ফেললে কি অবস্থা হয়।

তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক এই পীত নদীর উপত্যকায় বাস করে। নানা রকম ফসল ফলায়—গম, ধান, যব আর ওদের প্রিয়

আর এক রকম ফসল—ওদের ভাষায় যাকে বলে কাউ-লী-আং। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে বেশ বৃষ্টিও হয়।

কিন্তু এর চেয়েও বড় নদী আছে চীনে, চীনের সবচেয়ে বড় নদী ইয়াং সি কিয়াং—৩৪৩০ মাইল লম্বা, পৃথিবীর নদীগুলির মধ্যে দৈর্ঘ্যে যার স্থান ৪র্থ। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গভীর খাদ কেটে কেটে শত শত মাইল বয়ে চলেছে, তার পর এসে পড়েছে একটা বাটির মত ঢালু জায়গায়—যেখানে মাটির রং লালচে ইটের মত। বহু বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে এই নদীর ধারে। চুংকিং, হাংকাউ, নানকিং, সাংহাই। সাংহাই সবচেয়ে বড় শহর, বড় বন্দরও। আগেই ১ কোটি ৮ লক্ষ লোকের বাস ছিল এই শহরে, এখন আরও বেড়েছে। ইয়াং সি কিয়াং বেশ চওড়া নদী, গভীরও। সমুদ্রের উপকূল থেকে বড় বড় জাহাজ নদীর ভিতর ছ'শ' মাইলের ওপর ঢুকে যেতে পারে। মোহনার কাছে হাজার হাজার খাল। বহু লোক সেখানে ব্যবসা করে, নৌকোয় বাস করে আর মাছ ধরে।

ডাঙ্গায় স্থানাভাব

চীনে লোকসংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় অনেক লোককে আজীবন জলে বাস করতে হয় সে কথা আগেই বলেছি। ইয়াং সি নদীর নীচের দিকে আর তা থেকে কেটে-বার-করা অসংখ্য খালের মধ্যেই বেশি লোকের বাস। নৌকো বলতে সাধারণত দু'রকম নৌকো। জাঙ্ক আর শাম্পান। জাঙ্ক এক রকম বড় নৌকো, তার চারধারটা বেশ উঁচু। লম্বা লম্বা দাঁড় দিয়ে ধীরে ধীরে টানা চলে, তবে একজনে টানতে পারে না—দাঁড় বাইতে অনেক লোক লাগে। শাম্পান অনেক দ্রুতগতি, আকারেও অনেক ছোট,—প্রায় সাধারণ নৌকোর মতই দেখতে, তবে একটু চাপা। দু'জন—এমন কি একজন,—একটি ছোট ছেলেও দাঁড় টেনে



জাঙ্ক

এগুলিকে চালাতে পারে। তবে জাঙ্কেই বেশি লোক ধরে। দু' রকম নৌকোতেই লোক বাস করে—গোটা পরিবারকে পরিবার। এক একটা জাঙ্কে কখনও কখনও একাধিক পরিবারকেও থাকতে দেখা যায়। ঐখানেই তাদের জন্ম, ঐখানেই তাদের গৃহস্থালী পাতা, ঐখানেই তাদের মৃত্যু। এক নৌকোয় কয়েক পুরুষ ধরে লোক বাস করছে এও অনেক সময় দেখা গেছে।

কোন কোন জাঙ্কের মাথার দিকে বড় বড় মাছের মুখ, চোখ আর আঁশ আঁকা দেখলে

অবাক্ হয়ো না। কারণটা জান? দেখতে বাহার হবে সেইজন্য নয়, ওদের অনেকের ধারণা, জলের ওপর নৌকো নিয়ে সর্বক্ষণ উৎপাত করলে জলদেবতা হয়তো রেগে যেতে পারেন। মাছের ছবি দিয়ে নৌকোটাকে মাছের ছদ্মবেশ পরালে তাঁরা আর কিছু মনে করবেন না, কারণ মাছ তো জলে থাকবেই।

আজীবন নৌকোর সঙ্গে কাটিয়ে ছেলে-মেয়েরা শৈশব থেকেই পাকা সাঁতারু আর পাকা নাবিক হয়ে ওঠে। তবু একেবারে বাচ্চাদের সাবধানে রাখতে হয়—পাছে জলে পড়ে যায়। মায়েরা এজন্য সময় সময় বাচ্চাদের পিঠে লম্বা বাঁশের লগি বেঁধে দেন, যাতে জলে পড়ে গেলেও ডুবে না গিয়ে ভাসতে থাকে এবং তুলে নেওয়া যায়।

চীনে জেলের মাছ ধরার অদ্ভুত কৌশল

মাছ ধরায় এই সব নৌকোবাসীরা বেশ পটু। জীবিকা হিসেবেও এদের অনেকে মাছ ধরাটাকেই বেছে নেয়। মাছ ধরার কৌশলও এদের অদ্ভুত। সময় সময় এক একজন এক সঙ্গে ৪।৫টা জাল ছড়িয়েও বসে—জালগুলো বেতের সঙ্গে বেঁধে জলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তারপর একটার পর একটা জাল টেনে টপাটপ্ মাছগুলো তুলে ফেলে। মাছ ধরার জন্য ওরা আরও একটা অদ্ভুত কৌশল করে। রাজহাঁসের মত বড় এক রকম হাঁস জাতীয় জলচর পাখি পুষে ওরা তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়। এই পাখিগুলিকে ইংরেজিতে বলে করমোরান্ট্। এই করমোরান্ট্ খুব ভাল মাছ শিকার করতে পারে। হাঁসের মত যোড়া-পা নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এরা বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে জল থেকে টুক্ করে মাছ তুলে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর ঝুড়িতে ফেলে দেয়। তোমরা ভাবছ, শিকার করতে গিয়ে ওরা নিজেরাও তো মাছ খেয়ে ফেলতে পারে! চীনে জেলেরা সে বিষয়েও খুব সতর্ক। পাখিগুলির গলায় এমন হাঁসুলির মত শক্ত রিং পরিয়ে দেয় যে চেষ্টা করলেও তখন গলা দিয়ে মাছ গেলা যায় না। অবশ্য পাখিগুলি তাতে আপত্তি করে না, কেন না জেলেরা তাদের জন্যও পরিপাটি ভোজের ব্যবস্থা রাখে।

বড় পরিবার, গুণীর আদর

চীনে এতদিন আমাদের দেশের মতই একান্নবর্তী পরিবারের প্রথা ছিল—বরঞ্চ একটু বেশিই ছিল। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন কর্তা, সকলে তাঁকে মান্য করে চলত এবং পরিবারের উপার্জনশীল সকলের আয় একত্র করে তাঁর কাছে সব জমা হ'ত। তিনিই বুঝে-শুনে সকলের জন্য তা খরচ করতেন। অর্থাৎ যা কিছু আয় তা ছিল সমস্ত পরিবারের। পরিবারের কারও বিপদ্-আপদ্ বা মৃত্যু হলেও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সমস্ত দায়িত্ব ছিল গোটা পরিবারের। আমাদের দেশেও তো তাই ছিল। এখন যেমন আমাদের মধ্যে এই প্রথা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যাচ্ছে, চীনেও ঠিক তাই হচ্ছে। হয়তো এর ভালোমন্দ দু'দিক্-ই আছে।

চীন দেশে লেখাপড়ার আদর খুব বেশি। আজকে বলে নয়, গত আড়াই হাজার বছর ধরে এই রকম চলছে। অন্য দিক্ দিয়ে কৃতিত্ব থাকলেও বিদ্বান্ না হলে সমাজে তার আদর

হ'ত না। এখনও তাই, বিদ্বানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমে নি। আর সেইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন কাল থেকেই চীন জ্ঞানবিজ্ঞানে যথেষ্ট এগিয়ে ছিল।

প্রাচীন কালের চীন

চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব হয়, তখনও চীনের মানুষ আশপাশের প্রাণীদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে ছিল। তোমরা মানুষের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫) সিনান্‌থ্রোপাস্ বা পিকিংম্যান্‌দের কথা পড়েছ। তারাও চীনের মানুষ। আন্দাজ ৫ লক্ষ বছর আগেকার মানুষ তারা। তাদের সম্বন্ধে খুব বেশি জানা না গেলেও তারা যে পাথর ঘষে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল এবং আগুনের ব্যবহার জানত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে চীন দেশে যে সব মানুষ বাস করত তারা খুব নিখুঁত পাথরের অস্ত্র বানাতে পারত, চাষবাসেও ওস্তাদ ছিল। তখন পর্যন্ত অবশ্য তারা ধাতুর ব্যবহার শেখে নি, কিন্তু তার হাজার খানেক বছর পরে, অর্থাৎ আজ থেকে চার হাজার বছর আগে উত্তর চীনের অধিবাসীরা তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখে তা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে আশপাশের অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করতে শুরু করে এবং ক্রমে এক বিস্তৃত রাজত্ব বা সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। যীশু খৃষ্টের জন্মেরও দেড় হাজার বছর আগে শ্যাং নামে এক যোদ্ধৃজাত সমস্ত উত্তর চীন দখল করে ফেলে এবং প্রায়



কচ্ছপের খোলার ওপর পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা ভবিষ্যৎবাণী লিখে রাখতেন।

পাঁচশ' বছর ধরে রাজত্ব করে। এই শ্যাংরা লিখতেও জানত। হাড় বা কচ্ছপের খোলার ওপর তাদের পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা যে ভবিষ্যৎবাণী লিখে রাখতেন তা এখনও রয়ে গেছে। সে ভবিষ্যৎবাণী কতটা ফলত তা আজ আর জানা নেই ; কিন্তু সেই কচ্ছপের খোলার ওপর লেখা পড়ে, এ যুগের পণ্ডিতেরা, ভবিষ্যৎ নয়—প্রাচীন চীনের নানা কথা জানতে পেরেছেন।

শির্ হুয়াং তি ও চীনের বিখ্যাত প্রাচীর

চীনের ইতিহাস তোমরা অন্যত্র, ইতিহাসের বইতে পড়ে নিও, তবে একজন রাজার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তাঁর নাম শির্ হুয়াং তি। আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে তিনি ছিলেন চীনের সম্রাট্। নামের আগে তিনি একটি 'চিন্' শব্দ ব্যবহার করতেন



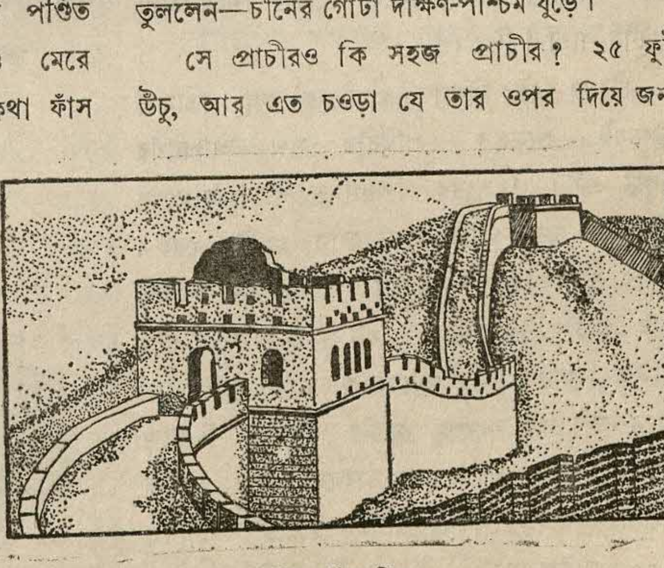
সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন।

—যার মানে হচ্ছে সকলের প্রথম বা আদি রাজা। আসলে তা না হলেও এ রাজার প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না, আর ছিল তাঁর খামখেয়ালী স্বভাব। তাঁর আগে যাঁরা চীন দেশে রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। যে সব পণ্ডিত সেকালের সব কথা জানতেন তাঁদেরও মেরে ফেলার হুকুম দেন, পাছে তাঁরা সব কথা ফাঁস করে দেন। কিন্তু এত করেও তাঁর সে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হ'ল না, সত্যি কথা যা তা রয়েই গেল।

শির্ হুয়াং তি ওদিক্ দিয়ে কোন কীর্তি স্থাপন করতে না পারলেও আর এক দিক্ দিয়ে এমন একটা কাজ করে গেছেন যা সত্যিই একটা দারুণ কীর্তি এবং যার জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

আমাদের দেশে কয়েকশ' বছর আগে বর্গীরা যেমন উপদ্রব করত তেমনি সে আমলে তাতার আর মাঞ্চুরা যখন তখন এসে শির্ হুয়াং তির রাজ্য আক্রমণ করত। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে, নিরীহ প্রজাদের হত্যা করে, তাদের সর্বস্ব লুঠপাট করে চলে যেত তারা। এদের হাত থেকে কি করে রাজ্যকে রক্ষা করা যায় ভাবতে লাগলেন শির্ হুয়াং তি। শেষে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত মতলব চাপল। সমস্ত চীন দেশটাকে তিনি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেবেন, যাতে প্রাচীর টপকে শত্রুরা রাজ্যে ঢুকতে না পারে। আর সত্যিই তাই করলেন তিনি। হাজার হাজার মজুরকে জোর করে কাজে লাগিয়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা এক প্রাচীর গড়ে তুললেন—চীনের গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম যুড়ে।

সে প্রাচীরও কি সহজ প্রাচীর? ২৫ ফুট উঁচু, আর এত চওড়া যে তার ওপর দিয়ে জনা



চীনের প্রাচীর



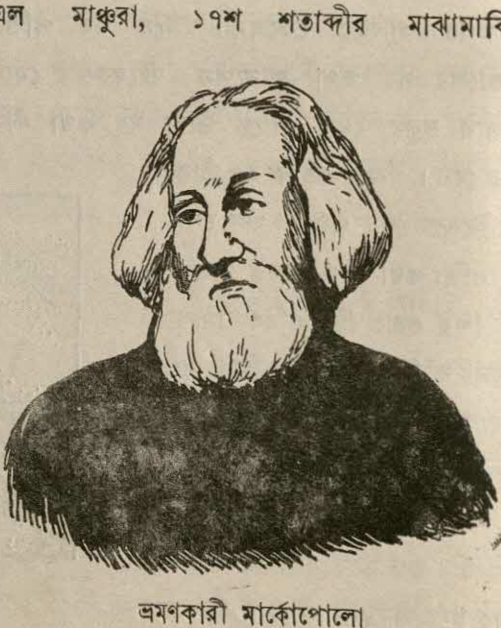
কুবলাই খাঁ

ছয়েক ঘোড়সওয়ার দিব্যি পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রাচীরটিকে শক্ত করবার জন্য একশ' গজ পর পর তৈরি করা হ'ল চওড়া চওড়া এক-একটা চৌকো স্তম্ভ বা গুম্‌টি—তার কোনটা দোতলা, কোনটা তেতলা। সবশুদ্ধ এ রকম স্তম্ভ তৈরি হ'ল প্রায় হাজারটা। এই স্তম্ভ বা গুম্‌টিগুলি ছিল শান্ত্রীদের পাহারা-ঘর। ঐখানে আড্ডা গেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা প্রাচীর পাহারা দিত।

চীনের এই বিখ্যাত প্রাচীরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের একটি এটি। মিশরের পিরামিড ছাড়া মানুষের গড়া এত বড় কীর্তি এখন আর একটিও নেই। অবশ্য দু' হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে প্রাচীরটির সবটাই এখন আর অক্ষত নেই। অনেক জায়গা ভেঙ্গেচুরে ধ্বসে গেছে, কোন কোন জায়গায় সবশুদ্ধু মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। তবে লোকের প্রয়োজনের জন্য অনেক জায়গা মেরামত করে রাখা হয়েছে। এখনও ১২০০ মাইল যুড়ে এই প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে—সেই সমুদ্রতীর থেকে মধ্য এশিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত।

চীনে মোঙ্গল আর মাঞ্চু সাম্রাজ্য

১২০৬ খৃষ্টাব্দে দুর্দান্ত মোঙ্গল সর্দার চেঙ্গিস খাঁ এসে চীন দখল করেন। শুধু চীন নয়, এশিয়ার অনেকখানি জয় করেন তিনি। তাঁর নাতি কুবলাই খাঁ ১২৬০ সালে চীনের সম্রাট্ হন। মোঙ্গল হলেও কুবলাই খাঁ চৈনিক রীতিনীতি গ্রহণ করেন। তবে দক্ষিণ চীনের চাইতে উত্তর চীনেই তাঁর প্রতাপ ছিল বেশি। তিনি রাজধানীও স্থাপন করেছিলেন উত্তর চীনের পিকিংএ। কুবলাই খাঁর আমলেই ইতালির বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কোপোলো চীনে এসে হাজির হন। অনেক দিন চীনে কাটিয়ে তিনি একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। তা থেকে সে-আমলের চীন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। মোঙ্গলদের পর এল মাঞ্চুরা, ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি।



ভ্রমণকারী মার্কোপোলো

মাঞ্চু সম্রাট্ই হলেন চীন-সম্রাট্। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই মাঞ্চুবংশই চীনে রাজত্ব করে গেছেন।

চীনে সাধারণতন্ত্র

ইতিমধ্যে বিদেশীরা—বিশেষ করে পোর্তু-গীজ, ইংরেজ, রুশরা—চীনে বাণিজ্য করবার চেষ্টা করতে থাকে। চীনেরা সাবধান হয়ে যায় এবং বিদেশীদের বিশেষ আমল দিতে রাজী না হওয়ায় ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধে। তখনকার চীনেরা ইয়োরোপীয়দের মত অত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে নি, ফলে অনেক জায়গায় তাদের পরাজয় ঘটতে থাকে। ক্যান্টন, হংকং ইংরেজদের হাতে চলে আসে, সাংহাই হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বন্দর। দুর্বল চীন-সম্রাট্ দেশকে রক্ষা করতে অপারগ হওয়ায় ভিতরে ভিতরে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে, দেখা দেয় বিদ্রোহ। চীন-সম্রাট্ তাঁর ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্র। সে হচ্ছে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের কথা।

সাধারণতন্ত্র হবার পরও গোড়ার দিকে অশান্তি একটুও কমে নি। অনেক দল, তাই তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেই ছিল। যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন তিনি নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করার তালে ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। এ সময়ে যিনি চীনকে নতুন নেতৃত্ব দিয়ে সত্যিকার সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলেন তাঁর নাম ডক্টর সান্ ইয়েৎ সেন (চীনে উচ্চারণ সুন্ য়াৎ সেন)। তাঁর দলের নাম ছিল কুওমিন্টাং বা জাতীয়



ডক্টর সান ইয়েৎ সেন

দল। সান্ ইয়েৎ সেনই নতুন চীনকে শিক্ষায়-দীক্ষায় যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। চীনের লোকেরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি ও সম্মান করত।

জাপানের আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ ও নতুন সরকার

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সান্ ইয়েৎ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য চ্যাং কাই শেক্ হলেন দলের নেতা। প্রথমটা ইনিও সান্ ইয়েৎ সেনের অনুসরণ করে চীনকে আধুনিক করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু একটার পর একটা বিপর্যয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। জাপান চীন আক্রমণ করে। ১৯৩১ সালে তারা মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়, তার পর দেখতে দেখতে একটু একটু করে পুরো পূর্ব চীন দখল করতে শুরু করে। তখন চীনের রাজধানী ছিল নানকিং, তা সরিয়ে আনা হয়



চ্যাং কাই শেক্

চুংকিংএ। তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটলে জাপানকেও পাততাড়ি গোটাতে হয়, কিন্তু তখন চীনে কমিউনিস্টদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেছে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তারা একত্র হয়ে যুদ্ধ করলেও এবারে শুরু হ'ল প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ—কুওমিন্টাং দলের সঙ্গে কমিউনিস্ট দলের। কমিউনিস্ট দলের নেতা মাও সে তুং ধীরে ধীরে জয়লাভ করতে থাকেন। ১৯৪৯ সালে তাঁরা পিকিং দখল করে নেন। পরে সেটাই হয় তাঁদের রাজধানী। কুওমিন্টাং দল হঠতে হঠতে মূল চীন-ভূভাগ ছেড়ে ফরমোসা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গোটা চীন দেশটা চলে আসে কমিউনিস্ট দলের হাতে। মাও সে তুং 'চীনের জনগণের সাধারণতন্ত্র' (ইংরেজি নাম পিপ্‌ল্‌স্ রিপাব্‌লিক্ অব্ চায়না) নাম দিয়ে নতুন সরকার গঠন করেন।

চ্যাং কাই শেক্ ফরমোসা দ্বীপে তাইপে শহরে তাঁর জাতীয় সরকারের রাজধানী স্থাপন করেন। ফরমোসা নামটা পোর্তুগীজদের দেওয়া। চীনে ভাষায় তার নাম তাই ওয়ান দ্বীপ। সেখানে আমেরিকানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সরকার বহুদিন টিকে ছিল। অর্থাৎ কাগজে-কলমে তখন থেকে চীন দু'টি। রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই তাই ওয়ানের সরকারই চীনের প্রতিনিধিত্ব করছিল—যদিও আসল চীনের ওপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। সেখানে মাও সে তুংএর সরকারই ছিল সর্বেসর্বা। বহুদিন পর্যন্ত এই আসল চীনের অর্থাৎ কমিউনিস্ট চীন সরকারের রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসন জোটে নি। কিন্তু এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাদেরকেই আসল চীন বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।



মাও সে তুং

নতুন চীনের অগ্রগতি

কমিউনিস্ট দল শাসনক্ষমতা গ্রহণ করার পর চীন নানা দিকে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গোড়ার দিকে সোভিয়েৎ রাশিয়া তাকে অস্ত্রশস্ত্র, কল-কারখানার যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি দিয়ে খুব সাহায্য করেছিল। কিন্তু এখন, চীন শক্তিশালী হবার পর, চীনের সঙ্গে তাদের সে সৌহার্দ্য চলে গেছে। চীন এখন নিজের বলেই বলীয়ান্। অস্ত্রশস্ত্র—এমন কি অ্যাটমিক বা পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে এখন সে পৃথিবীর একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হবার চেষ্টা করছে। দেশে কলকারখানা তৈরি হচ্ছে, চাষবাসের সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিরও চেষ্টা হচ্ছে প্রচুর। তুলো, চা, রেশম, তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়ে দেশবিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কাপড়, সিমেন্ট, লোহা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, টিনের খাবার, রাসায়নিক মালমশলাও তারা বাইরে পাঠাচ্ছে। তবে বড় বড় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদির জন্য এখনও তাদের বাইরের দেশের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। খাদ্যের ব্যাপারেও দেশকে আত্মনির্ভর করার চেষ্টা চলছে। ধান, গম ও অনুরূপ অন্যান্য ফসল, তরি-তরকারি, আখ—এ সবের চাষের ওপরেও সরকার থেকে জোর দেওয়া হচ্ছে বেশি। চীনেরা এমনিই তো খুব পরিশ্রমী জাত, তার ওপর সরকারী নির্দেশে তাদের কেউ আর এখন অলস ভাবে দিন কাটাতে পারে না—স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই খাটতে হয় প্রচুর।

শিক্ষার দিকেও নজর দিচ্ছেন সরকার। একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চীনের ছাত্রসংখ্যা এখন দশ কোটিরও বেশি। যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে তাদের সংখ্যাও ৯ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বয়স্কদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত না সরকার তাদেরও লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করছেন—ভবিষ্যতে যাতে একটি লোকও নিরক্ষর না থাকে।

তবে এত করেও চীনে সম্পূর্ণ শান্তি নেই। অন্তর্দলাদলি তো আছেই, পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গেও তার সদ্ভাব নেই। আগেই বলেছি, কমিউনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গেও তার সম্পর্ক তেমন মধুর নয়। ভারত স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের বেশ সদ্ভাব ছিল—'হিন্দি চীনি ভাই ভাই' করে কিছুদিন বেশ হৈ-হৈও হয়েছিল দু' দেশে, কিন্তু তার পরেই শুরু হয়েছিল তিক্ততা, যদিও তখনও এদেশে কিছু কিছু লোক চীনের ভক্ত ছিল। ইতিমধ্যে মাও সে তুং-এর মৃত্যু হয়েছে। এখন যাঁরা চীনের কর্তাব্যক্তি তাঁদের সুর অনেকটা নরম। ভারতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে—আরও হচ্ছে। সে তিক্ততা আর নেই।

চীনের ছেলেমেয়েরা

বছর চল্লিশেক আগেও চীনের ছেলেমেয়েরা একেবারে অন্য ভাবে মানুষ হ'ত। ছ' বছর বয়স হলেই মাথা কামিয়ে, পেছনে ঝুঁটি বেঁধে পাঠশালায় ছুটতে হ'ত। পাঠশালাও ছিল ভীষণ কড়া। কথায় কথায় বেত। পড়া বলতে হ'ত গুরু মশায়ের দিকে পিছন ফিরে, মুখোমুখি দাঁড়ানোটা ছিল অসভ্যতা।

ছেলেদের নামকরণটাও ছিল মজার। সবশুদ্ধ চার বার নাম বদলানো হ'ত। ছেলেবেলায় খুব একটা বিশ্রী নাম রাখা হ'ত—ধর কুকুর,



সেকালকার চীনে ছাত্র

বেড়াল কি ছারপোকা। ভালো নাম দিলে নামের লোভে যদি অপদেবতার দৃষ্টি পড়ে সেই জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা! ছ' বছর বয়সে পাঠশালায় ভর্তি হ'লে নামটা বদলে আর একটু ভালো নাম দেওয়া হ'ত। তৃতীয়বার নাম বদলাত বিয়ের সময়, আর শেষবার,—যখন সে মানুষ হয়ে সংসারে ঢুকবে,—তখন।

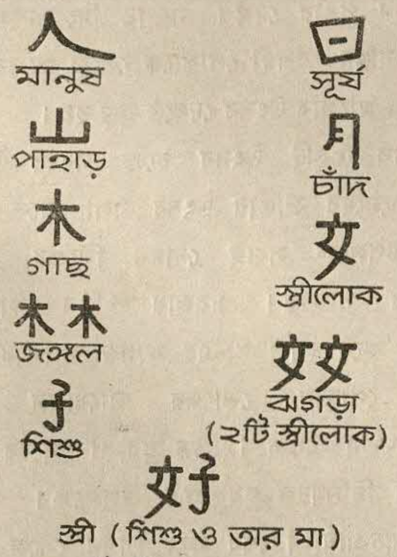
মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ বেশি ছিল না। অল্প বয়স থেকেই তাদের ঘরকন্নার কাজ শিখতে হ'ত, অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত। তার পর সংসার। আর একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল তখন মেয়েদের বেলা। পা ছোট করা। ছোট পা নাকি সৌন্দর্যের লক্ষণ। এজন্য শৈশব থেকেই মেয়েদের লোহার জুতো পরিয়ে রেখে পায়ের পাতা লম্বা হবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হ'ত। ফলে মেয়েরা সারা জীবন ক্ষুদে ক্ষুদে পা নিয়ে খুট্ খুট্ করে হাঁটত। চলতে-ফিরতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হ'ত, কিন্তু সুন্দরী হবার জন্য সে ব্যবস্থা তারা দিব্যি মেনে নিত। আমাদের ছেলেবেলায় এ রকম ক্ষুদে ক্ষুদে পা-ওয়ালা চীনে মেয়ে আমরা অনেক দেখেছি। এখন অবশ্য এ নিয়ম উঠে গেছে। এখনকার চীনের ছেলেমেয়েরা প্রায় বিলেতের ছেলেমেয়েদের মতই আধুনিক কেতাদুরস্ত ভাবে মানুষ হচ্ছে। খেলাধূলার জগতেও চীনের তরুণতরুণীদের প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চীনের ভাষা ও অক্ষর

চীনের ছেলেমেয়েদের একটা দুঃখ কিন্তু রয়েই গেছে। সেটা হচ্ছে তাদের অক্ষর-পরিচয়। অন্যান্য ভাষার মত চীনে ভাষার অক্ষর অত সহজ নয়। অনেকটা ছবির মত এই অক্ষর, আর সংখ্যায় তা হাজার হাজার। অন্তত ৭।৮ শ' অক্ষর না শিখলে কিছুই হয় না। চীনে ভাষায় ছাপা একখানা খবরের কাগজ ভালো করে পড়তে গেলে অন্তত ৩।৪ হাজার অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। সবশুদ্ধ



মেয়েদের ছোট পা ছিল সৌন্দর্যের লক্ষণ



কয়েকটি চীনে অক্ষরের নমুনা

চীনেদের যা শিখতে হয়

অক্ষরের সংখ্যা নাকি ৪০ হাজার, তবে এর কতকগুলি কালেভদ্রে ব্যবহার করা হয় এই যা! আমাদের মত পাশাপাশি সাজানো থাকে না সে অক্ষর, পড়তে হয় ওপর থেকে নীচে। সাধারণত একটা অক্ষর দিয়ে এক একটা শব্দ বোঝানো হয়। ওপরের ছবিটা দেখলেই এই অক্ষরের একটু নমুনা বুঝতে পারবে।

চীনে ভাষা খুব অনুস্বরবহুল। আমরা চুং চাং করে ওর অনুকরণ করি—একটু ঠাট্টার সুরেই। কিন্তু সত্যি ওতে ঠাট্টার কিছু নেই। কয়েকটি শব্দ আর তার মানে উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবে। যেমন ধর, কিয়াং মানে নদী (যেমন ইয়াং সি কিয়াং) কং মানেও নদী, হো মানেও নদী (যেমন হোয়াং হো); কাং মানে গ্রাম, কিং মানে রাজধানী, লিং মানে পাহাড়, শান্ মানেও তাই; নান্ মানে দক্ষিণ, শী মানে পশ্চিম, পে মানে উত্তর, টুং মানে পূব। তাই মানে বড়, তাও মানে দ্বীপ, চুং মানে মাঝখানে, চাও মানে শহর, হোয়াং মানে হলদে বা পীত (হোয়াং হো = পীত নদী)।

তবে উচ্চারণের বৈচিত্র্যে একই শব্দের নানা অর্থ হতে পারে, আর এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের উচ্চারণে বড় একটা মিল নেই। ফলে লিখিত চীনে ভাষা সমস্ত চীনের লোকই প্রায় বুঝতে পারে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলে দক্ষিণের লোকেরা উত্তরের লোকদের অনেক কথাই বুঝতে পারে না। সম্প্রতি কমিউনিস্ট সরকার চেষ্টা করছেন ছবির অক্ষর বদলে অন্যান্য ভাষার মত অল্প কয়েকটি অক্ষরে,—ধর মাত্র ২৫টি অক্ষর দিয়ে,—চীনে ভাষা ঢেলে সাজাতে। নতুন নতুন অনেক বই এ-ভাবে লেখাও হচ্ছে। এতে অবশ্য এখনকার ছেলেমেয়েদের সুবিধা হবে কিন্তু এ-যাবৎ-কাল-লিখিত সমস্ত বই-ই তা হলে বাতিল করে দিয়ে নতুন করে না লিখলে সেগুলি কোন কাজে লাগবে না। ব্যাপারটা যে সহজসাধ্য নয় তা তো বুঝতেই পারছ।

চীনে অনেক ধর্ম

চীনেরা ধর্ম সম্বন্ধে বেশ উদার। অনেকগুলি ধর্ম প্রচলিত আছে ওদেশে। যারা কন্‌ফুসিয়াস্‌কে মেনে চলে তাদের বলা হয় কন্‌ফুসিয়ান্। লাও-ৎজুর অনুরাগীদের ধর্মকে বলা হয় তাও ধর্ম। এ ছাড়া বহু দিন থেকেই বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রসার লাভ করেছে। চীনেদের মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা খুব বেশি। বুদ্ধদেবকে সবাই শ্রদ্ধা করে। বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তিও আছে অসংখ্য। এ ছাড়া কিছু কিছু লোক এখন ইস্‌লাম ও খৃষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছে।

চীনেদের খাওয়াদাওয়া

চীনেরা এমন অনেক জিনিস খেতে ভালোবাসে যা আমরা খাই না—বা খাওয়ার কথা শুনলে অবাক্ হই। যেমন ধর, সাপ ওদের একটা প্রিয় খাদ্য। যে সাপ যত বিষাক্ত সে সাপ নাকি তত খেতে ভালো! ব্যাঙও ওদের একটি প্রিয় খাদ্য। আর আরশোলা খাবার কথা তো শুনেছই। কিন্তু ওদের রান্না ভারি চমৎকার। ওদের চাউচাউ ময়দার তৈরি একটি উপাদেয় খাদ্য। ওদের খাওয়ার পদ্ধতিটাও বিচিত্র। আমাদের মত হাত দিয়ে খায় না ওরা, ছুরি-কাঁটাও ব্যবহার করে না, খায় দু'টি কাঠির সাহায্যে। পৃথিবীর সর্বত্রই চীনে রান্নার খুব কদর। প্রায় সব বড় বড় শহরেই চীনে রেস্তোরাঁ আছে এবং সেখানে বিদেশীদের ভিড় লেগেই আছে। কলকাতায়ও এ রকম কয়েকটা ভালো ভালো চীনে রেস্তোরাঁ খুব জনপ্রিয়।

উৎসবের দিনে

চীনেদের মধ্যে নানা উৎসব প্রচলিত। তার মধ্যে দু'-একটির কথা বলি। শরৎ কালে যখন ঝিল-বিল-পুকুরে রাশি রাশি পদ্মফুল ফোটে তখন ওদের পদ্মফুলের উৎসব। আমাদের দেওয়ালীর মত আলোরও উৎসব এটি, আর সে আলো বাড়ীর গায়ে সাজানো হয় না—সাজানো হয় জলের ভিতর ঐ সব পদ্মফুলের মধ্যে। প্রতি ফুলের মধ্যে ছোট্ট একটি করে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। গোল গোল পাতার পাশে ফুল, তার মধ্যে প্রদীপের আলো, জলে তার ছায়া ঝক্‌মক্ করে—মনে হয় যেন পরীর দেশ। সন্ধ্যার দিকে দলে দলে লোক রঙিন রেশমী পোশাকে সেজে জলের ধারে এই ফুল-আলোর উৎসব দেখতে জড় হয়।

আর একটি উৎসব হচ্ছে নববর্ষ উৎসব। এটি চীনেদের জাতীয় উৎসব বলা যেতে পারে। এই উপলক্ষে সবাই সেদিন নিজের নিজের বাড়িঘর সাজায়। দরজায় রঙিন কাগজ—বিশেষ করে লাল রং-এর কাগজ লাগিয়ে দেয়, বাজি পোড়ায়, ভোজের আয়োজন করে। আত্মীয়স্বজন একত্র মিলিত হয়, পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময়ও হয় এই উপলক্ষে। রাস্তায় চলে নাচ-গান, বিশেষ করে ড্রাগন সেজে নাচ। ড্রাগনের মুখ আর লেজ-লাগানো নৌকো নিয়ে নৌকো-দৌড় বা বাইচ খেলাও হয় এই দিনে। ড্রাগন হচ্ছে চীনের জাতীয় প্রতীক চিহ্ন—যদিও জন্তুটা নেহাৎই কল্পিত জীব।

চেরী ফুলের দেশ জাপান

চীন ছেড়ে এবারে আমরা চলে আসব আরও পূবে—পাহাড়-ঘেরা, ফুলে-ছাওয়া দ্বীপময় রাজ্য জাপানে। জাপানকে বলা হয় চেরী ফুলের দেশ। চেরী ফল নয় কিন্তু,—ফুল। এই ফুলকে জাপানের জাতীয় ফুল বলা হয়। বসন্তকালে, যখন চেরী গাছে কুঁড়ি ধরতে শুরু করে, তখন সারা দেশে পড়ে যায় উৎসবের সাড়া। ছেলে-বুড়ো সেজেগুজে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ফুল-উৎসব দেখতে। পক্ষকাল ধরে তখন জাপানের চেহারাই যেন যায় বদলে। শুধু চেরী ফুলই নয়, আরও কত রকমের ফুল! ফুলের দেশ জাপান। প্রত্যেকটি লোকে ফুল ভালোবাসে—ভালোবাসে বাগান।



দ্বীপের ঝাঁক

জাপানকে দ্বীপময় রাজ্য বলেছি। সত্যিই দ্বীপময়। হাজার হাজার ছোটবড় দ্বীপ যেন ঝাঁক বেঁধে গড়ে তুলেছে এই দেশটিকে। এর মধ্যে অবশ্য চারটিই প্রধান—হোনসু, শিকোকু, কিয়ুসু আর হোক্কাইডো। বাকি দ্বীপগুলো ছড়িয়ে আছে প্রায় দেড় হাজার মাইল জুড়ে। কিলোমিটারের মাপে প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার। সমস্ত দেশটির আয়তন কিন্তু দেড় লক্ষ বর্গ মাইলেরও কম (১৪২৭২৬·৫ বর্গ মাইল)। আমাদের ভারতবর্ষের আট ভাগের এক ভাগ বলা যেতে পারে। উত্তর-ঘেঁষা হলেও চারদিকে সমুদ্র থাকায় খুব শীতের রাজ্য বলা যায় না জাপানকে,—যাকে বলে নাতিশীতোষ্ণ এ হচ্ছে তাই। তবে উত্তর দিক্‌টা বেশ ঠাণ্ডা, শীতের দিনেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অন্যত্র গ্রীষ্মকালটা মনোরম আর শরৎ-বসন্ত তো জাপানের ঋতুরাণী !

জাপানের লোকসংখ্যা ১৯৭০ সালের হিসেবে ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ। এর মধ্যে শহর অঞ্চলে প্রচুর লোক বাস করে।—এক টোকিও শহরেই ১ কোটি ১৪ লক্ষ—অর্থাৎ মোট জন-সংখ্যার ৯ ভাগের এক ভাগ। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা আরও বেড়েছে, পৃথিবীর আর কোন শহরেই এত লোক নেই।

জাপানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জাপানী সভ্যতা অনেক দিনের পুরোনো হলেও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশি দিনের কথা নয়। একশ’ বছর আগেও জাপান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এবং কৌতূহল খুব বেশি ছিল না। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রধানত পূর্ব এশিয়া আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা অঞ্চল থেকে লোকেরা এসে জাপানে বসতি স্থাপন করে বর্তমান জাপানী জাতির

সৃষ্টি করেছে। অবশ্য সেও হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। জাপানের ইতিহাসে কোরিয়া এবং চীনের প্রভাবও বড় কম নয়। জাপানী ভাষার অক্ষরও এসেছে চীনে ভাষা থেকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়—সেও চীন দেশেরই মাধ্যমে। তারপর থেকে জাপানের ইতিহাস নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ। প্রথমে জাপানের রাজধানী ছিল নারা শহরে (৭১০ খৃঃ থেকে ৭৮৪ খৃঃ পর্যন্ত)। তার পর রাজধানী চলে আসে কিয়োটোতে। প্রায় হাজার বছর ধরে কিয়োটোই ছিল জাপানের রাজধানী। তার পর তা টোকিওয় স্থানান্তরিত করা হয়।

জাপানে সামন্ততন্ত্র

জাপানের সম্রাট্‌কে বলা হয় মিকাডো। কিন্তু রাজা হলেও এক সময়ে রাজ্যের কর্তৃত্ব চলে আসে শোগুনদের হাতে। এই শোগুনরা ছিলেন অনেকটা প্রধান সেনাপতির মত—সামরিক শাসনকর্তা বলা যেতে পারে তাঁদেরকে। মিকাডো নামে সম্রাট্ হলেও শোগুনরাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। প্রায় সাতশ' বছর ধরে এঁরা জাপানে কর্তৃত্ব করে গেছেন। এ ছাড়া ছিলেন জমিদার সম্প্রদায়—যাঁদের বলা হ'ত দাইমো। অসম্ভব ক্ষমতা ছিল তাঁদেরও হাতে। এত বেশি যে স্বয়ং শোগুনও তাঁদের খাতির করে চলতেন। এই দাইমোরা সামুরাই নামে এক বিশেষ ধরনের সৈন্য রাখতেন। অত্যন্ত সাহসী, বীর আর তেমনি কড়া বলে সামুরাইদের খ্যাতি ছিল। একটা তলোয়ারে তাদের কুলোত না, কোমরের দু'পাশে দু'টি তলোয়ার ঝুলিয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। নিয়ম ছিল, তলোয়ার একবার খাপ থেকে বার করলে তাকে রক্তপান না করিয়ে খাপে পোরা চলবে না।



সামুরাই
(একখানি প্রাচীন জাপানী চিত্র থেকে)

শোগুনদের আমলকে সামন্ততন্ত্র বললে ভুল বলা হবে না। কিন্তু সামন্ততন্ত্র যে কোনও দেশকে সত্যিকার বড় করে গড়ে তুলতে পারে না এ তো ইতিহাসের সর্বত্রই দেখা গেছে। জাপানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ষোড়শ শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধে জাপান ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে।

এদিকে পশ্চিমী দেশগুলি এবং আমেরিকা ইতিমধ্যে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৮শ শতাব্দী থেকেই তারা জাপানে ব্যবসার ঘাঁটি বসাবার চেষ্টা করতে শুরু করে। জাপানীরা অবশ্য বিদেশীদের আমল দিতে রাজী ছিল না, কিন্তু তখন পর্যন্ত তারা মোটামুটি দুর্বল রাজ্য—শক্তিশালী পশ্চিমী দেশগুলোকে ঠেকাবার মত

অস্ত্রশস্ত্র তাদের ছিল না। ১৮৫৩ সালে চাপটা এল আরও বেশি। কমোডোর পেরি নামে এক দুর্ধর্ষ মার্কিন সেনাধ্যক্ষ কয়েকখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে টোকিও উপসাগরে ঢুকে পড়লেন। শোগুনের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলে গেলেন, তিনি অন্যত্র যাচ্ছেন, ফিরবার পথে জবাব নিয়ে যাবেন। শোগুন পড়লেন ফাঁপরে।



কমোডোর পেরি জাপানে এসে নামলেন।

তিনি দাইমোদের পরামর্শ চাইলেন, তাঁরা কিন্তু রাজী হলেন না। শোগুন কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে, পেরি যখন আরও কয়েকখানা যুদ্ধজাহাজ সঙ্গে নিয়ে জবাব চাইতে এলেন, তখন তিনি তাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়ে বসলেন। আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিস্বাক্ষর হয়ে গেল।

দাইমোরা কিন্তু এ ব্যাপার মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা একত্র হয়ে শোগুনকে বললেন, তুমি কে বট হে? আসল রাজা তো মিকাডো! ভালো চাও তো মানে মানে তোমার কর্তৃত্ব ছেড়ে দাও—যাঁর সে কর্তৃত্ব প্রাপ্য সেই মিকাডোর হাতে।

সম্রাট্ মেইজি বা মিকাডো মুৎসোহিতো

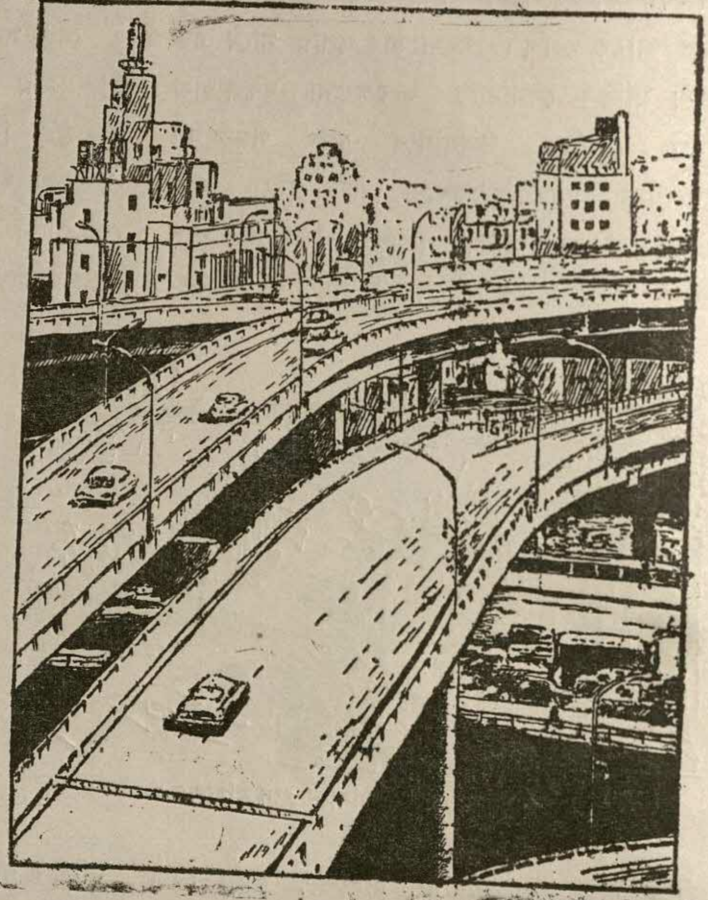
সেই সময়ে জাপানে যিনি মিকাডো হলেন তাঁর নাম মুৎসোহিতো বা মেইজি। বয়সে নিতান্তই কিশোর, কিন্তু বুদ্ধিতে, তেজে এবং প্রতিভায় অসামান্য। হাতে ক্ষমতা পেয়ে তিনি যেন গোটা জাপানকে রাতারাতি পাল্টে দিলেন। শিক্ষাদীক্ষায়, সামাজিক চালচলনে, শিল্পে, বাণিজ্যে—সমস্ত দিক্ দিয়ে তিনি জাপানকে এক সম্পূর্ণ আধুনিক জাতিতে পরিণত করে তুললেন। প্রায় ৪৫ বছর তিনি রাজত্ব করে গেছেন, কিন্তু এই ৪৫ বছরে তিনি জাপানকে দুর্বল জাতি থেকে এক পরম শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে দিয়ে গেলেন। এর পর সেই ছোট্ট জাপান প্রথমে চীনকে এবং তার পর রাশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দুনিয়ার সামনে পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

মেইজির পর রাজা হলেন তাইসো বা য়ুসোহিতো, যাঁর আমলে প্রথম মহাযুদ্ধ হয়। তার পর বর্তমান সম্রাট্ হিরোহিতো। ১৯০১ সালে এঁর জন্ম, রাজা হন ১৯২৪ সালে। রাজা হলেও পণ্ডিত লোক ইনি। সামুদ্রিক জীববিদ্যায় অগাধ জ্ঞান। এঁরই আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে জাপান ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে এবং এই যুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটে। জাপানের হিরোশিমা শহরে অ্যাটম্ বোমা ফেলে আমেরিকা যে ভয়াবহ

কাণ্ডের সৃষ্টি করে তা ইতিহাসের পাতা থেকে কখনও মুছে ফেলা যাবে না। পরাজিত জাপান প্রায় সাত বছর মিত্রশক্তির (চারটি বড় বড় দেশ নিয়ে যাকে বলা হ'ত চতুঃশক্তি) অধীনে থেকে ১৯৫২ সালে আবার স্বাধীন হয়েছে।

এত বড় একটা যুদ্ধে পরাজিত —বিধ্বস্ত হয়ে গেলে একটা জাতির আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কিন্তু জাপান দেখিয়ে দিয়েছে যে সে কিছুতেই দমে না। আবার সে বড় হবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে সে আবার বিশ্বের দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।



দোতলা-তেতলা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে দুরন্ত বেগে।

নতুন আর পুরোনোর সামঞ্জস্য

এশিয়ার সবচেয়ে প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের প্রতি কৌতূহল আমাদের স্বাভাবিক। নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়েও একটা দেশ কেমন করে যুগের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলতে পারে—আধুনিক সভ্যতার সব কিছু গ্রহণ করেও নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারে—তা বোধ হয় জাপানই প্রথম আমাদের দেখিয়েছে। তাই আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার পাশাপাশি দেখা যায় কাঠের তৈরি কাগজের দেয়াল-পর্দা-বসানো হাল্কা বাড়ি, দোতলা-তেতলা রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে-চলা দুরন্ত বেগের আধুনিক যানবাহনের পাশে মানুষ-টানা রিক্‌শ, আধুনিক বিজ্ঞানের শতচিহ্নের মধ্যে ছড়ানো ফুল-বাগানের সমারোহ।

ঘরের মধ্যেও তাই। জাপানী গৃহস্থের ঘরে আসবাবপত্রের বাহুল্য চোখে পড়বে না। সেই মেঝেতে মাদুর পেতে বসা, রাত্রে সেই মাদুরেই লেপ-তোষক পেতে বিছানা তৈরি, মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে চা খাওয়া, সবই যেমন বজায়

রয়েছে—তেমনি ঘরে ঘরে রয়েছে রেফ্রিজিরেটার, কাপড়-কাচা কল, স্বয়ংক্রিয় রান্নার যন্ত্র আর টেলিভিশন। মেয়ে-পুরুষ দরকার মত যেমন ইয়োরোপীয় পোশাক গ্রহণ করেছে তেমনি নিজেদের জাতীয় পোশাক কিমোনোও ত্যাগ করে নি।

জাপানে ভূমিকম্প খুব বেশি হয়। সেই কারণেই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, বেশির ভাগ বাড়িঘরই খুব হাল্কা কাঠ দিয়ে তৈরি। এমন কি জানালাগুলো পর্যন্ত কাগজের পর্দা দিয়ে তৈরি। এতে ভূমিকম্পের সময় যদিও নিরাপদ, কিন্তু আগুন লাগবার ভয়টা একটু বেশি। অবশ্য শহর অঞ্চলে আজকাল বিরাট বিরাট অট্টালিকার অভাব নেই—আমেরিকার মতই বহুতল প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে এবং ভূমিকম্প ঠেকানোর মত মজবুৎ করে বৈজ্ঞানিক কৌশলেই তা বানানো হচ্ছে।

জাপান দেশের ছেলে মেয়ে

জাপানের গল্প বলতে গেলে প্রথমেই ওখানকার ছেলেমেয়েদের কথা মনে আসে। অনেক দিন আগে একজন বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক জাপান ঘুরে এসে বলেছিলেন, "জাপানের ছেলেমেয়েদের মত অমন সুন্দর—অমন আনন্দের জীবন আমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখি নি।"

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। লেখাপড়া না শিখে পথেঘাটে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবে কিংবা রুজি-রোজগারের জন্য শৈশব থেকেই অমানুষিক পরিশ্রম করবে এটি সেখানে হবার যো নেই। বেলা সাড়ে সাতটা নাগাদ তুমি যদি জাপানের কোন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও দেখবে দলে দলে ছেলেমেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গান করতে করতে পথ দিয়ে চলেছে। তাদের কারও বয়স তিন, কারও চার, কারও বা বড় জোর ছয়। সব এক রকম পোশাক—এক রকম জামা, এক রকম জুতো, এক রকম টুপি, এমন কি কাঁধের ঝুলিগুলিও সব এক রঙের। ঝুলির মধ্যে কি আছে? আছে ওদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিস—যেমন ধর রঙিন কাগজের টুকরো, ছবির বই, রুমাল আর বিশেষ করে পুতুল। বেশির ভাগই মাথা কামানো (মাথা কামালে চুল শক্ত আর খোঁচা খোঁচা হবে—যা নাকি জাপানীদের খুব পছন্দ)। এরা কোথায় চলেছে জান? ইয়োটা ইন্-এ, অর্থাৎ শিশু-উদ্যানে। জাপানে এ রকম শিশু-উদ্যানের ছড়াছড়ি। সেখানে পড়াশোনা হয় না—হয় খেলাধূলা, গল্প, ছড়া শেখা, গান শেখা, প্রার্থনা শেখা এই সব। ছেলেমেয়েরা সেখানে নিজের হাতে রঙিন কাগজ দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরি করে। কাগজের খেলনা জাপানী ছেলেমেয়েদের ভারি প্রিয়। তা ছাড়া প্রতিটি শিশু-উদ্যানে আছে বড় বড় খেলার মাঠ, ফুলের বাগান। সেখানে লাফালাফি, ছুটোছুটি করে জাপানী শিশুদের দিন কাটে। বেলা বারোটায় ছুটি। তখন বাড়ি ফেরার পালা।

ছ' বছর বয়স হলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে যেতে হবে। নীচের দিকে এর জন্য কোন পয়সা লাগে না—সরকার থেকেই সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বেতন দিতে হয়। স্কুলে ছেলেমেয়েরা শুধু লেখাপড়াই শেখে না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম-চর্চা, কুস্তি, তলোয়ার খেলা, নৌকো চালানো,

সাঁতার কাটা, ছবি আঁকা—এ সবও শেখানো হয় স্কুলে। আর শেখানো হয় জাপানের জাতীয় কসরৎ যুযুৎসু। এই কসরতের সাহায্যে নানা রকম কায়দা-প্যাঁচের সাহায্যে নিতান্ত রোগা-পটকা ছেলেটাও বড় বড় হাতির মত পালোয়ানকে ঘায়েল করে দিতে পারে।

মেয়েরাও ছেলেদের মত ব্যায়াম-চর্চা করে। তা ছাড়া লেখাপড়ার সঙ্গে কয়েকটি জিনিস তাদের বিশেষ করে শিখতে হয়—যেমন ধর, চা বানাবার কায়দা, খোঁপা বাঁধা, ফুলের তোড়া বাঁধা। সেই সঙ্গে রান্নাবান্না এবং গানবাজনাও।

চা-পর্ব

চা বানাবার কায়দা মেয়েদের বিশেষ করে শিখতে হয় শুনে তোমরা হয়তো অবাক্ হচ্ছ। কিন্তু চা-পর্ব জাপানে একটা বিশেষ ধরনের উৎসব—যা নাকি নানা নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়ে সেখানে পালন করা হয়। একে ওদের ভাষায় বলা হয় চা-নো-য়ু। বড়লোকের বাড়িতে তো এই চা খাবার জন্য একটা ঘরই আলাদা করা থাকে। অতিথিদের চা খাওয়ার আগে সার বেঁধে বাগানে গিয়ে হাত ধুয়ে আসতে হয়—সেও একটা মিছিলের মত ব্যাপার! তার



জাপানী গৃহিণী অতিথি অ্যাপায়ন করছেন।

পর সবাই মেঝেতে মাদুরের ওপর কুশান বিছিয়ে গোল হয়ে বসা (হাঁটু গেড়ে বসাই ওদের বসার ধরন), মাঝে মাঝে নীচু টেবিলে গুঁড়ো চা স্যুপের মত করে তৈরি করা, আর তার পর তা পরিবেশন। ধীরে ধীরে, অল্প অল্প চুমুক দিয়ে কি ভাবে সে চা খেতে হবে তারও একটা বিশিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে।

চা তৈরির মত ফুল সাজানো বা ফুলের তোড়া বাঁধাও জাপানের একটি নিজস্ব শিল্পকলা। ওদের ভাষায় এর নাম ইকেবানা। তেমনি পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধাও একটি শিল্প। জাপানী মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই এগুলি ভালো করে শিখতে হয়।

জাপানী মেয়ে

জাপানী মেয়েরা এখন সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্য মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানে পুরুষের সংখ্যা অসম্ভব কমে যায়—যার ফলে পুরুষদের স্থান পূরণের জন্য মেয়েদের এগিয়ে আসতে হয়। জাপানী মেয়েরা এখন ছেলেদের মত সব কাজই করতে আরম্ভ করেছে। দোকান চালাচ্ছে, হোটেল চালাচ্ছে, আপিসে কেরাণীর কাজ করছে, কারখানায় শ্রমিকের কাজ করছে, এঞ্জিনীয়ারের কাজ করছে। বাসে কণ্ডাক্টারের কাজ, ড্রাইভারের কাজ, ডাক-পিয়নের কাজ—এক কথায় যত রকম পুরুষালি কাজ,—সবেতেই নেমে পড়েছে বা নামতে বাধ্য হয়েছে মেয়েরা। কিন্তু তাই বলে তাদের নারীসুলভ কমনীয়তা তারা হারায় নি। কাজের শেষে সন্ধ্যে বেলা যখন নিজেদের জাতীয় পোশাক পরে তারা বাগানে

বেড়াতে বেরোয় তখন আর তাদের চিনবার উপায় নেই।

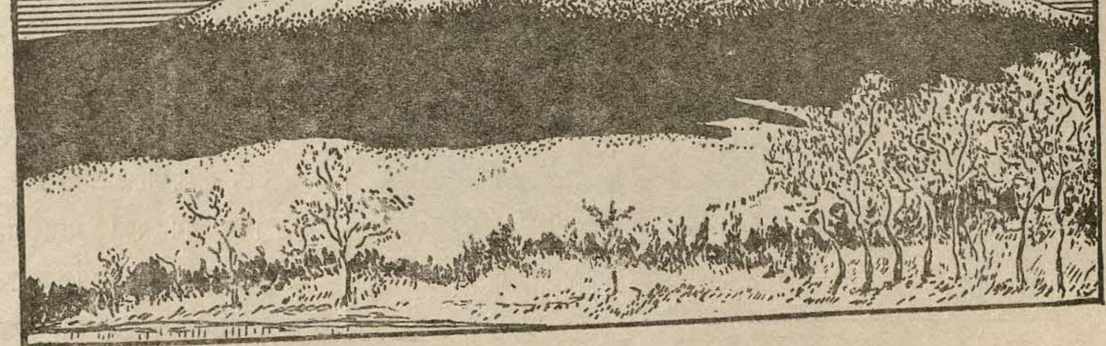
আগেকার দিনে কিন্তু মেয়েদের এ স্বাধীনতা ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারের অংশ হিসেবে তারা শাশুড়ীর অধীনে থাকত এবং শাশুড়ীরা, সব দেশেই যেমনটা হয়, বধূ নির্যাতনে বড় কম যেতেন না। অনেক সময় বৌদের তাঁরা ক্রীতদাসীর মত দেখতেন—অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে নিতেন তাদের দিয়ে। কিন্তু সে সব দিন-কাল এখন বদলে গেছে—যাচ্ছে। শাশুড়ীদের সে প্রতাপ আর এখন নেই। বৌরাও নতুন জীবেনের স্বাদ পেয়েছে।

চেরী-উৎসব

জাপানীরা খুব সৌন্দর্যপ্রিয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পেলে তারা আত্মহারা হয়ে যায়। জাপান এমনিতেই খুব সুন্দর দেশ, তার ওপর বাসিন্দাদের রুচিবোধের জন্য তা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বসন্তকালে যখন চেরীগাছে কুঁড়ি ফুটতে থাকে তখন সারা দেশ যুড়ে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এই চেরী ফুলের সমারোহ দেখা যায় বিশেষ করে দু'টি জায়গায়—ইয়ামাটো পাহাড়ের গায়ে ইয়োশিনো অঞ্চলে, আর কিয়োটো শহরের কাছে আরাশিয়ামায়। এই দু'টি জায়গাতেই তখন লোক যেন ভেঙে পড়ে।

ফুজিয়ামা

জাপানীদের আর একটি অতি প্রিয় জিনিস হচ্ছে ফুজিয়ামা—সংক্ষেপে ফুজি। এটি একটি আগ্নেয়গিরি—জাপানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। ১২,৩৮৫ ফুট উঁচু। ঠিক যেন তিনকোণা করে কাটা, মাথার ওপর সাদা বরফের টুপি—এই পাহাড়টি দেখতে সত্যি অপরূপ। জাপানীরা এটিকে একটি পবিত্র তীর্থস্থান ব'লে মনে করে। জাপানে এমন কোন চিত্রকর নেই যিনি কোন-



ফুজিয়ামা

না-কোন সময়ে এই ফুজির একটা ছবি আঁকেন নি। বিদেশী পর্যটক এলে জাপানীরা প্রথমেই তাকে ফুজি দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালই ফুজিয়ামা দেখবার সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। দলে দলে লোক এই সময় ফুজিয়ামার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। আজকাল গাড়ি করেই একেবারে ফুজিয়ামার প্রায় চূড়ো পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়, সামান্য একটু হাঁটতে হয় মাত্র। সূর্যাস্তের সময় ফুজিয়ামার বরফ-ঢাকা চূড়োয় যখন অস্তরবির ছটা এসে পড়ে আর পাহাড়ের নীচে হাকোন হ্রদে পড়ে তার ছায়া, তখন যে অপরূপ শোভার সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে নাকি অমন দৃশ্য খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।



কামাকুরার অতিকায় বুদ্ধমূর্তি

মন্দিরের দেশ

শুধু পাহাড় আর ফুল আর বাগান নিয়েই জাপান নয়, জাপানের মন্দিরগুলিও দেখবার মত। কিয়োটো অঞ্চলে এই রকম অসংখ্য মন্দির,—বেশির ভাগই বুদ্ধমন্দির,—ছড়িয়ে আছে। কামাকুরায় আছে খোলা আকাশের নীচে বিরাট এক বুদ্ধমূর্তি—ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি। মূর্তির ভিতরে সিঁড়ি আছে, তা দিয়ে মাথা পর্যন্ত উঠে যাওয়া যায়। এত বড় ব্রোঞ্জ-মূর্তি পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে শোনা যায় নি। জাপানে বৌদ্ধের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। এ ছাড়া শিন্টো মতবাদ মেনে চলে এমন লোকও বেশ কিছু আছে। তবে শিন্টোকে ঠিক একটি পৃথক্ ধর্ম বলা যায় না। বিশেষ করে পূর্বপুরুষদের অর্চনাই এর প্রধান অঙ্গ। কোন কোন ক্ষেত্রে এই



জাপানের একটি মন্দির



জাপানী বিয়ের শোভাযাত্রা

দুই ধর্ম যেন মিশে গেছে—অর্থাৎ একই লোক দু'টি ধর্মের প্রথাই মেনে চলছে। বিয়ের সময় হয়তো শিন্টো প্রথামত বিয়ে করল, কিন্তু পরিবারের কারও মৃত্যু ঘটলে তার সৎকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হ'ল বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুযায়ী। আজকাল খৃষ্টধর্মও জাপানে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে। কিছুদিন আগে স্বয়ং মিকাডোও ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

জাপানী উৎসব

জাপানীরা জীবনটাকে সত্যি করে উপভোগ করতে চায়, তাই উৎসব-অনুষ্ঠান সেখানে লেগেই আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান,—খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সেগুলি পালন করা হয়। তা ছাড়া আর কতকগুলি আছে যা সম্পূর্ণ ওদের নিজস্ব। যেমন ধর, জাপানের নববর্ষ উৎসব। কয়েক দিন ধরে এই উৎসব চলে। আমরা যেমন পূজোর সময় নতুন জামা-কাপড়ে সাজি, জাপানীরাও তেমনি তাদের নববর্ষ উৎসবে নতুন জামাকাপড় প'রে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই সময়ে রাশি রাশি নতুন কাপড়—কিমোনো ইত্যাদি বিক্রি হয়। ভোর বেলা উঠেই কাছাকাছি নদী, হ্রদ বা কূয়ো থেকে জল তুলে আনা হয়। এই জল ওদের কাছে খুব পবিত্র—নবীনতার প্রতীক বলতে পার। জাপানীদের বিশ্বাস, বছরের প্রথম দিন এই পবিত্র জল পান করলে সারা বছর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

নববর্ষের দিন প্রত্যেক বাড়িতেই খুব ভালো খাবারদাবারের আয়োজন করা হয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়, উপহার দেওয়া হয়, ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে পূজো দেয়।



জাপানের মিকাডো হিরোহিতো নাতিকে আদর করছেন।

ছেলেমেয়েরাও খেলাধূলায় মেতে ওঠে। বেড়াবার জায়গাগুলিতে সেদিন আর লোক ধরে না। নববর্ষের মত চন্দ্রোৎসবও ওদের আর একটা বড় উৎসব। এটা অনেকটা আমাদের নবান্নের মত। নতুন ফসল ওঠার সময় এই উৎসব পালন করা হয়।

শুধু বড়দের উৎসবই নয়, জাপানের শিশু-উৎসবগুলিও কম জাঁকালো হয় না। পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধ হয় কেবল ছোটদের জন্য এ রকম উৎসবের চলন নেই। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়ে এই সব উৎসবে যোগ দেয়—গোটা জাপান যুড়ে তখন হৈ হৈ পড়ে যায়।

জাপানী বছরের তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে "মোমো নো সেক্কু" উৎসব। মোমো-নো-হানা মানে পিচ্ ফুলের কুঁড়ি। বসন্তকালে যখন গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা দেয়, পিচ্ গাছের সারা গা ফুলের কুঁড়িতে ভরে ওঠে, তখন এই উৎসব হয়। এ উৎসবটি বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। ছোট ছোট মেয়েরা আগে থেকেই নানা রকম রঙ-বেরঙের জামাকাপড় ঠিক করে রাখে আর গুছিয়ে রাখে তাদের পুতুলগুলো। উৎসবের দিনে এই পুতুলগুলো সাজিয়েগুছিয়ে বাইরের লোকদের দেখাতে হয়। এই সময়ে অপরিষ্কার থাকা বা নোংরা, ভাঙ্গা পুতুল বের করা বড় নিন্দের কথা। তাই জাপানী ক্ষুদে ক্ষুদে মেয়েরাও সর্বদা পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চেষ্টা করে আর পুতুলগুলিকেও খুব যত্নে রাখে। বলা বাহুল্য এই পুতুলপ্রদর্শনী (হিনা-মাৎসুরি) এই উৎসবের একটা বড় অঙ্গ। অনেক বাড়িতে পুরুষানুক্রমে পুতুল সাজানো থাকে। অর্থাৎ দিদিমা যে পুতুল নিয়ে এক সময়ে খেলেছেন, মেয়ে এবং নাতনীও সেই পুতুল নিয়েই খেলে।

শুধু পুতুল সাজিয়েই উৎসব শেষ হয় না, বাড়ির সবাই—মা, বাবা, দাদা, দিদি—সকলেই সেদিন বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের অতিথি। ঐ সব শিশুগিন্নীরা সেদিন ভারিক্কী চালে অতিথিসৎকারে লেগে যায়।—অতিথিদের গল্প শোনায় আর সেই সঙ্গে নিজেরাও অনেক পুতুল-টুতুল উপহার পায়। উৎসবের শেষে মেয়েরা প্রার্থনা করে তারা যেন বড় হয়ে সুগৃহিণী হতে পারে।



জাপানের শিশু-উৎসব মোমো নো সেক্কুর একটি দৃশ্য

ছেলেদের উৎসব হয় পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে। তার নাম "টাঙ্গো নো সেক্কু"। ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলের দল সেদিন রঙচঙে পোশাক প'রে,-তাদের ভোর বেলাকার সূর্য-আঁকা জাতীয় পতাকা হাতে ক'রে

ঘুরে বেড়ায়। এই সময় দেশের যত বড় বড় বীর, যোদ্ধা, পালোয়ান, কুস্তিগির প্রভৃতির মূর্তি আর ছবি নিয়ে মিছিল বার করা হয়। ছেলেদের মধ্যে কৃত্রিম লড়াই আর ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতাও এই উৎসবের একটা অঙ্গ। তা ছাড়া সব ছেলেই কাগজের রুই মাছ তৈরি করে ওড়ায়। রুই মাছ হচ্ছে মাছের রাজা, গায়ে তার প্রচণ্ড জোর, ঢেউএর সঙ্গে সে সমানে লড়াই করতে পারে। জাপানী ছেলেরাও ঠিক সেই রকমটি হতে চায়।

ছেলেমেয়েদের যুক্ত উৎসব হচ্ছে "তানা বাতা"। সপ্তম মাসে এই উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় ভাইবোন একত্র হয়ে রঙিন কাগজের খেলনা তৈরি করে, কবিতা লেখে, রঙিন আলো দিয়ে বাড়িঘর সাজায়, আর নদীতে গিয়ে বাঁশের কঞ্চি ভাসিয়ে দেয়। অবশ্য উৎসবের সঙ্গে ভোজের আয়োজনটাও মন্দ হয় না।

কু গা কু সে

তাই বলে জাপানের ছেলে-মেয়েরা শুধু যে উৎসব নিয়েই মত্ত থাকে তা মনে ক'র না। সাংসারিক কাজকর্মেও তারা অংশ নেয় যথেষ্ট। স্কুলের বেঞ্চি-চেয়ার ঝাড়ার কাজ ছেলেদেরকেই পালা করে করতে হয়—তা সে যত বড়লোকের ছেলেই হোক না কেন। অনেক গরীবের ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্য বাপ-মা'র কাছ থেকে পয়সা না নিয়ে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে সে পয়সা রোজগার করে। এজন্য তারা দুধ বিক্রি করে, খবরের কাগজ ফেরি করে, এমন কি রিকৃশ টানতেও কসুর করে না। এই ধরনের ছাত্রদের জাপানী ভাষায় বলা হয় "কু গা কু সে"। সবাই এদের শ্রদ্ধা করে, কেউ হীন মনে করে না।



ইকেবানা—জাপানী তরুণীর ফুলের তোড়া দিয়ে ঘর সাজানো

গায়েশা

জাপানের কথা বলতে গেলে ওখানকার গায়েশাদের কথাও বলতে হয়। গায়েশাদের কেউ কেউ বলেন নর্তকী। আসলে এরা হচ্ছে

নাচে-গানে বিশেষ পারদর্শিনী একদল সুন্দরী মেয়ে—যাদের কাজ হচ্ছে অতিথিদের আনন্দ দেওয়া। চমৎকার পোশাকে সেজে, মাথায় পরিপাটি খোঁপা বেঁধে এরা বাজনার তালে তালে এমন সুন্দর নাচে যে দর্শকেরা মুগ্ধ না হয়ে পারে না। নিজেরাও চমৎকার বাজাতে পারে এরা, গাইতেও পারে চমৎকার। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সামিসেন নামে এক রকম তারের যন্ত্রের চল খুব বেশি। নাচের মধ্যে ওডোরি নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গায়েশা হতে হলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর শিক্ষা নিতে হয়। আমাদের দেশে এক সময়ে দেবমন্দিরে দেবদাসীর চল ছিল, কেউ কেউ গায়েশাদের তাদের সঙ্গে তুলনা করেন। তবে গায়েশাদের সঙ্গে দেবমন্দিরের কোন সম্পর্ক নেই, জনসাধারণ এবং বিদেশীদের আনন্দ বিতরণই এদের প্রধান কাজ।

জাপানী শিল্প

জাপানীরা এক কথায় জাতশিল্পী। তাদের গৃহসজ্জা, ফুল সাজানোর কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ—সবের মধ্যেই এমন একটা ছিমছাম ভাব আছে যা অন্য জাতির মধ্যে কমই দেখতে পাওয়া যায়। বাগান তৈরি, পুতুল তৈরি প্রভৃতি ব্যাপারে এরা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছে। গাছকে বাড়তে না দিয়ে 'বামন' চেহারায় এনে ঘরের মধ্যে ট্রে বা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার কৌশল এদের নিজস্ব। ট্রের মধ্যে এমন সব প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা থাকে যাতে ঐ ছোট্ট গাছটা তার সঙ্গে অদ্ভুত রকম খাপ খেয়ে যায়। ও জিনিস চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো কঠিন। মাদুরের ওপর চমৎকার ছবি আঁকে এরা, চীনেমাটির পাত্রের ওপরেও। গালার কাজ করে নিখুঁত। শিল্পে এদের সূক্ষ্ম রুচিবোধ দেখলে সত্যি অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

নবীন জাপানের অগ্রগতি

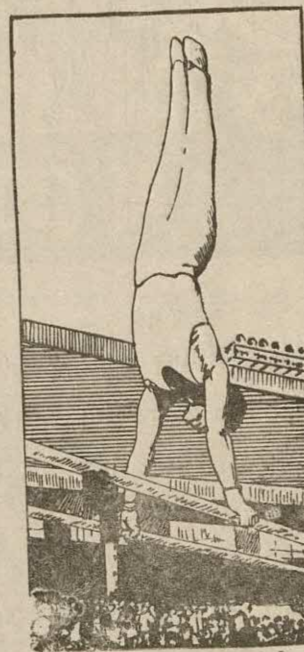
এত বড় একটা যুদ্ধে হেরে গিয়েও জাপান যে ভাবে তা সামলে নিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তা দেখলে মনে হয়—হ্যাঁ, একটা জাত



গাছকে বাড়তে না দিয়ে 'বামন' চেহারায় এনে ট্রে বা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার কৌশল জাপানীদের নিজস্ব।

বটে। শিল্পে, বাণিজ্যে আবার সে পৃথিবীর নানা দেশে প্রভাব বিস্তার করছে। জাপানের তৈরি যন্ত্রপাতি—রেডিও, ট্রান্‌জিস্টার, ক্যামেরা, টেলিভিশন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইয়োরোপের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। সবসেরা যন্ত্র হিসেবে তাদের প্রচুর সুনাম। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন—এমন কি জাহাজ তৈরিতেও তাদের সুনাম কম নয়। মোটর সাইকেল তৈরি ও রপ্তানিতে তার স্থান পৃথিবীতে প্রথম। নানা রকম রাসায়নিক শিল্পে তার কৃতিত্ব অসাধারণ। রাসায়নিক কাপড় (নাইলন, টেরিলিন, রেয়ন ইত্যাদি) আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে জাপানে। বড় বড় যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদি তৈরিতেও তার বাহাদুরি বড় কম নয়। মুদ্রণশিল্পেও তার সমকক্ষ খুব কম দেশই আছে। অথচ জাপানে কাঁচা মাল, খনিজ সম্পদের বড়ই অভাব। বাইরে থেকে সে সব আমদানি করে তা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে ওরা আবার তা বাইরে রপ্তানি করে। এক কথায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপরেই জাপানের সমৃদ্ধি প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল।

যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে কৃষি-শিল্প। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদ করে জাপান তার জমিতে "সোনা ফলাচ্ছে"। জমির তুলনায় এত বেশি ফসল ফলানো খুব কম দেশেই দেখা যায়। ক্ষেতে লাঙল দেবার কাজে পশুর ব্যবহার একদম উঠে গেছে, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে কলের লাঙল। জাপানের আর একটি বড় ব্যবসা হচ্ছে মাছ ধরার ব্যবসা। এতেও সে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চারদিকে সমুদ্র থাকায় এ ব্যাপারে তার সুবিধেও অনেক। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে মাছ ধরে আর সেই মাছ নানা দেশে রপ্তানি করে জাপানী জেলে নিজের দেশে প্রচুর সম্পদ্ সংগ্রহ করে আনছে।



জাপানী খেলোয়াড় শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছেন।

খেলাধুলায়ও জাপানী তরুণ-তরুণীরা পিছিয়ে নেই। নানা ধরনের খেলায় তারা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সাঁতারে তো তারা প্রায় অদ্বিতীয়। ১৯৬৪ সালে টোকিওতেই অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। জাপানী খেলোয়াড়েরা সেই প্রতিযোগিতায়ও গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তার পর এশিয়াড বা এশিয়ান্ গেম্‌স্‌-এও। যুযুৎসু, কুস্তি, অসিযুদ্ধ তাদের নিজস্ব খেলা, কিন্তু অন্য বিদেশী খেলায়ও তারা কম যায় না।



ধর্মের কথা

তাও ধর্ম

চীন দেশে প্রচলিত দু'টি বড় ধর্ম কনফুসিয়ান ধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম। প্রথমটির কথা আগেই আমরা আলোচনা করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫-৫৩৮)।

কনফুসিয়াসের ধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম ছাড়া চীন দেশে আরও একটি ধর্ম চলে, তার নাম তাও ধর্ম। তাও কথাটার অনেক মানে হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'পথ', আর একটা 'যুক্তি'। এই যুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন লাও-ৎসে বা লাও-ৎজু। তাঁর আসল নাম কিন্তু ছিল লি-এঢ় আর লাও-কুং।

৬০৩ কি ৬০৪ খৃষ্টপূর্ব অব্দে তাঁর জন্ম হয়। তার আগে তিনি নাকি ৬২, না ৭২, না ৮১ বছর মায়ের পেটে ছিলেন। তা শুনে তোমরা নিশ্চয় অবাক্ হবে না, কেন না মহাভারতের গরুড়ও নাকি তাঁর জন্মের আগে একটি হাজার বছর একটা ডিমের মধ্যে ছিলেন। সব দেশের পুরাণেই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এই ধরনের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

লাও-ৎসে যখন জন্মালেন তখনই তিনি বুড়ো মানুষটি—তাঁর চুল-দাড়ি সব পাকা। বুদ্ধিশুদ্ধিও বড়দের মত। তাই তাঁর ডাক-নাম হ'ল লাও-ৎসে বা লাওৎ-জু—যার মানে 'চুলপাকা খোকা' বা 'খোকা পণ্ডিত'।

চু-রাজ্যের রাজার বাড়িতে থেকে তিনি ঢের পড়াশোনা করলেন, তারপর একখানা বই লিখলেন—তার নাম হচ্ছে 'তাও-তেহ্-কিং'। তারপর বেরিয়ে পড়লেন একদিন। অনেক জায়গায় অনেক কিছু শিখলেন। অনেক শিষ্যও হ'ল তাঁর।

তাও ধর্মের উপদেশ 'তাও-তেহ্-কিং' বইয়ে আছে। তার মোট কথাটা এই যে টাকাকড়ি, মান-যশ সবই তুচ্ছ—আসল হচ্ছেন তাও। তাওয়ের মধ্যেই সব, আবার সবই শেষে তাও-য়ের সঙ্গে মিশে যায়। নিজেকে সামলে চলবে, কোনও কিছুতে অস্থির হবে না। বেশি কথা বলবে না, বেশি আশা করবে না। কাজ করে যাবে—দুঃখ আর কুচিন্তাকে মনে স্থান দেবে না। এই হচ্ছে সুখী হবার উপায়।



লাও-ৎসে

অমৃত দ্বীপ

লাও-ৎসের পর যাঁরা তাও ধর্মের গুরু হলেন তাঁরা বললেন যে পূব সমুদ্রের এক পরীর দ্বীপের এক গাছ থেকে তাঁরা অমর হবার ওষুধ তৈরি করেছেন। তার লোভে অনেক লোক তাঁদের শিষ্য হ'ল। তারপর যখন চ্যাং-ৎসো-লিং বলে এক যাদুকর গুরু হলেন, তখন চীন-সম্রাট পর্যন্ত তাঁর শিষ্য হলেন। তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। লু-হু পাহাড়ে এক আশ্চর্য প্রাসাদে তিনি রাজার মত চালে থাকতেন। ওষুধের গুণে তিনি নাকি কখনও বুড়ো হন নি। তাঁর পরে যাঁরা গুরু হলেন তাঁরাও ঐ সব ওষুধবিষুধ, ভেল্কি, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ-কবচ নিয়েই থাকতেন।

তাইতে, লাও-ৎসের উপদেশ থেকে তাও ধর্ম অনেক দূরে সরে গেল। তাও ধর্ম হয়ে দাঁড়াল দেবদেবী, ভূতপ্রেতের পূজো আর ওষুধ, তুকতাক ইত্যাদি দিয়ে অমর হবার চেষ্টা। লাও-ৎসে বলেছিলেন যে নিজের স্বভাবকে ভালো করাই মানুষের সুখী হবার উপায়। সে কথা এখন আর কে শোনে ?

পার্শী ধর্ম বা জরথুষ্ট্রবাদ

আজকাল যাকে ইরান দেশ বলে, সেই পারস্য দেশে একটি ধর্ম প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে প্রচলিত ছিল। তারপর সে দেশের সবাই মুসলমান হয়ে যায়—শুধু কয়েক দল লোক সেই ধর্ম নিয়ে আমাদের দেশে চলে আসে। বোম্বাইয়ের ওদিকে তাদের বংশধরেরা এখনও আছে ; তারা সেই পুরোনো ধর্মই মেনে চলে। তাদেরকে বলা হয় পার্শী।

পার্শীদের ধর্মকে বলা হয় জরথুষ্ট্রবাদ, ইংরেজি করে বললে জোরোয়াস্ট্রিয়ানিজ্‌ম্, কেন না খৃষ্টের জন্মের সাত-আটশ' বছর আগে মহাপুরুষ জরথুষ্ট্র বা জোরোয়াস্টার পারস্য দেশে এই ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জীবনী সঠিক জানা যায় নি। তবে 'জরথুষ্ট্র' মানে হচ্ছে 'বুড়ো উটওয়ালা'। হয়তো তিনি তাই ছিলেন।

জন্ম থেকেই তিনি নাকি ক্রমাগত হাসতে আর মাথা কাঁপাতে থাকেন। তারপর কোথায় যেন চলে যান। কুড়ি বছর বাদে তিনি এক পাহাড় থেকে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাকি আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়তে লাগল, তাতে তাঁর কিছু হ'ল না। এর বহুদিন পরে নাকি তাঁরই ইচ্ছায় আবার আকাশ থেকে আগুন পড়েই তিনি মারা গেলেন।



জরথুষ্ট্র

এই আগুনই পার্শী ধর্মে সব চাইতে পবিত্র জিনিস। তাদের মন্দিরে সর্বদা আগুন জ্বলে। তাইতে যজ্ঞ করবার জন্য পার্শীদের পুরোহিত আছেন, তাঁদের বলে দস্তুর। যজ্ঞকে তারা বলে যশ্ন। পার্শীদের অগ্নিপূজক বলা হয়, কিন্তু আগুন তাদের দেবতা নয়।

আবেস্তা

পার্শীরা একমাত্র ভগবান্‌কে মানে। তাদের শাস্ত্র 'জেন্দ-আবেস্তা'। তাতে ভগবান্‌কে বলেছে 'অহুর-মজ্‌দা', 'হোরমুজ্‌দ্' বা 'ওরমুজ'। তিনি শুধুই ভালো, তিনিই আলো। সূর্য ('মিথ্র') আর অগ্নি হয়ে তিনি আমাদের দেখা দেন। আর মন্দ একজন আছে,—তার সবই মন্দ, সব মন্দই সে। সে অন্ধকার—তার নাম 'আহ্‌রিমান'। এর সঙ্গে অহুর-মজ্‌দা সারাক্ষণ লড়াই করছেন। মানুষকে সব সময় ভালোর দিকে, অহুর-মজ্‌দার পক্ষে থাকতে হয়। নয়তো আহ্‌রিমান তাকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়, আর মরবার পর নরকের অন্ধকারে নিয়ে যায়।

টাওয়ার অব্ সাইলেন্স

পার্শীরা মরে গেলে মৃতদেহ পোড়ানোও হয় না, গোর দেওয়াও হয় না। কেন না, তা হলে আগুনের আর পৃথিবীর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তারা একটা গোল মঞ্চের মত উঁচু বাড়ি তৈরি করে তারই ছাদে মৃতদেহ ফেলে রাখে, শকুনিরা এসে তা খেয়ে যায়। এ রকম বাড়িকে বলে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' (অর্থাৎ নিস্তব্ধতার স্তম্ভ)।

পার্শী ধর্মের মধ্যে আবার দু'টো দল আছে—শাহান-শাহী এবং কাদ্‌মী। দলাদলি ছাড়া ধর্ম নেই।

ইহুদী ধর্ম

একটা আশ্চর্য কথা এই যে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল পশ্চিম এশিয়াতে। সে-তিনটি হচ্ছে ইহুদী বা ইব্রিয় (হিব্রু) ধর্ম, খৃষ্টধর্ম আর মুসলমানধর্ম। পৃথিবীর আর সব ধর্মই কোন না কোন মহাপুরুষ প্রবর্তন করেছিলেন—শুধু ইহুদী আর হিন্দুধর্মের বেলা সে কথা খাটে না।

ইহুদী জাতের ইতিহাস লেখা আছে বাইবেল বইয়ের প্রথম খণ্ড যে 'ওল্ড্ টেস্টামেন্ট'—তাতে। আর, এদের ধর্মের কথা পাওয়া যায় 'তালমুদ' বইয়ে।

ইহুদীদের এক ঈশ্বর। তাঁকে তারা বলে জিহোবা। তাদের বিশ্বাস, জিহোবা তাদেরই ভগবান্, শুধু তারাই তাঁর প্রিয়। হিন্দুদের ঋষিরা

যে সময়ে উপনিষদে ভগবান্‌কে এক বলে লিখেছিলেন, হয়তো তারও আগে ইহুদীরা জেনেছিল যে ঈশ্বর এক।

কিন্তু তারা সে-বিশ্বাস একটানা রাখতে পারে নি—মধ্যে মধ্যে তারা নানা দেবদেবীর পূজোয় মেতে যেত। তার একটা কারণ এই যে ইহুদীদের নিজের বলতে কোনও দেশ ছিল না—তারা দু'শ' বছর এখানে, তো পাঁচশ' বছর ওখানে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তাইতে, তারা যখন যেখানে থেকেছে, কিছুকাল বাদেই সেখানকার ঠাকুর-দেবতার পূজো করেছে। তখন সব দেশেই দেবদেবীর মূর্তির পূজো হ'ত কিনা!

তাই ভগবান্ বার বার মহাপুরুষদের দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে ইহুদীরা অন্য জাতের দেব-দেবীদের পূজো না করে একমাত্র তাঁর পূজো করুক, তিনি খুশি হলে তাদের একটি দেশে নিয়ে যাবেন। সে দেশটা তাদেরই হবে, সেখানে তারা চিরকাল সুখে থাকবে। সে দেশটির নাম তখন ছিল কানান, পরে তার নাম হয় প্যালেস্টাইন। ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে এই দেশেই যীশুখৃষ্ট জন্মেছিলেন, তা নিশ্চয়ই জান?

মোজেস্-এর আবির্ভাব

ইহুদী মহপুরুষদের মধ্যে মোজেস্-এর কথা বলি। তাঁর সময়ে ইহুদী জাতটা মিশরে থাকত। মিশরীরা তাদের খাটাত ক্রীতদাসের মত, আর মারধরও করত সাংঘাতিক। তারা জিহোবার পূজো ভুলে গিয়েছিল। মোজেস্ তাদের ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য ভাবে তিনি মিশরের রাজবাড়িতে মানুষ হন (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা দেখ)। তারপর তিনি ভগবানের আদেশ পান যে



মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি মোজেসের মূর্তি

ইহুদীদের মিশর থেকে কানান দেশে নিয়ে যেতে হবে।

মিশরের রাজাদের বলত ফারাও। অনেক কাণ্ড করে, অনেক কষ্টে তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল। তারপর ইহুদীদের নিয়ে মোজেস বেরিয়ে পড়লেন। জিহোবার এক দূত দিনে-রাত্রে পথ দেখিয়ে তাঁদের লোহিত সাগরের তীরে পেঁাছে দিলেন। এমন কি সমুদ্রও নাকি তাদের পথ ছেড়ে দিল, তারা সহজেই হেঁটে ওপারে

চলে গেল। গিয়েই কিন্তু তারা আনন্দ করে দেবদেবীদের পূজোয় লেগে গেল, জিহোবার কথা আর তাদের মনে রইল না। তাদের অন্যায় কাজ দেখে জিহোবা তখন আর তাদের কানানে নিয়ে গেলেন না, চল্লিশ বছর তাদের মরুপ্রান্তরে ঘোরালেন। এর মধ্যে মোজেস মারা গেলেন। শেষে জিহোবার দয়া হ'ল, তাদের কানানে নিয়ে গেলেন তিনি।

তার পরও ইহুদীরা জিহোবার কথা ভুলে গিয়েছে, জিহোবাও তাদের কষ্টে ফেলেছেন। একবার রাজা নেবুকাডনেজার তাদের সবশুদ্ধ্ বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কাল সেখানে থেকে, অনেক কষ্ট পাবার পর তারা ছাড়া পেয়ে কানানে ফিরে আসে।

ডেভিড ও সলোমন

ইহুদীদের মন্দির প্রথমে হ'ত একটা তাঁবুতে —তাকে বলা হত ট্যাবারন্যাক্‌ল্। তাতে অবশ্য জিহোবার কোনও মূর্তি থাকত না—থাকত



সলোমন (প্রাচীন চিত্র থেকে)

একটা আধারের মধ্যে 'ওলড্ টেস্টামেন্ট'-এর এক অংশ। তার সামনে ধূপ-ধুনো, প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালিয়ে উপাসনা করা হ'ত। ইহুদীদের রাজা ডেভিড পাকা মন্দির বানাতে চাইলে জিহোবাই নাকি মানা করলেন, বললেন, তোমার ছেলে সলোমন আমার মন্দির করে দেবে। তা-ই হ'ল। ইহুদীদের রাজাদের মধ্যে সলোমন সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। সে প্রায় ৩০০০ বছর আগেকার কথা। তাঁর রাজধানী ছিল জেরুসালেম।

রাজাদের পরে ক্রমে ক্রমে ইহুদীধর্মে অনেক দোষ ঢুকল। মহাপুরুষেরা তাদের সাবধান করে দিতেন। শেষ মহাপুরুষ হলেন যীশুখৃষ্ট। মোজেসের মত তাঁকেও নাকি ভগবান্‌ই তাঁর দূত করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর কথা মানল না। অল্প যে ক'জন মেনেছিল তারা নতুন আর একটি ধর্ম গড়ে তুলল, তারই নাম হ'ল খৃষ্টধর্ম।

খৃষ্টধর্ম

বাংলায় আমরা যাঁকে যীশু বলি তাঁর আসল নাম ছিল যোশুয়া। গ্রীকরা বলত যীসাস্। পর্তুগীজরা বলে যীশু, তা থেকেই বাংলায় তাঁর যীশু নামটি এসেছে।

যীশুর মা ছিলেন মেরী। মেরীর স্বামী জোসেফ একজন ছুতোর মিস্ত্রী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইহুদী। একবার তাঁরা একটা কাজে বেথেলহেম শহরে এসেছিলেন, সেখানে যীশুর জন্ম হয়। বিদেশী রাজার হুকুমে তখন ইহুদী শিশুদের মেরে ফেলা হচ্ছিল। তাই যীশুকে নিয়ে জোসেফ মিশরে পালিয়ে যান। তারপর অনেকদিন তাঁর খবর পাওয়া যায় না।



যীশুকে নিয়ে জোসেফ মিশরে পালিয়ে যান

যীশুর ধর্মপ্রচার

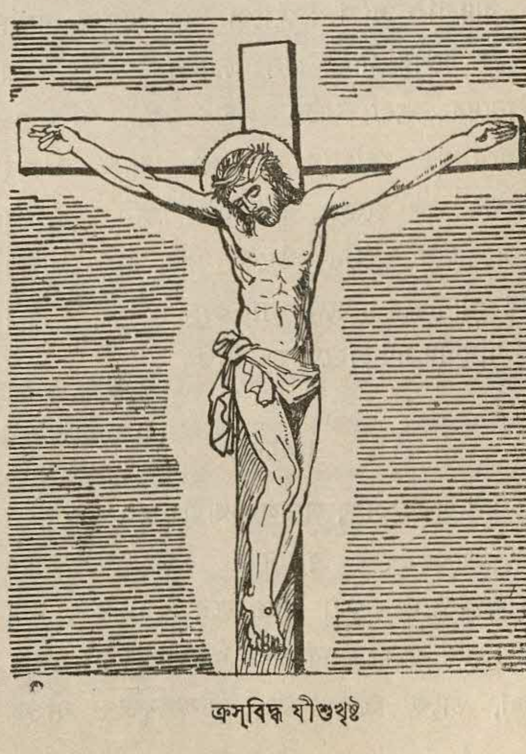
যীশুর যখন ৩০ বছর বয়স তখন হঠাৎ একদিন তিনি ফিরে এলেন। তিনি বলতে লাগলেন যে ভগবানের কথা বলতেই তিনি এসেছেন, ভগবান্‌ই তাঁকে পাঠিয়েছেন। ভগবান্‌ই সকলের পিতা, সকলে তাঁকে ভালোবাস, সব মানুষকে ভালোবাস। দয়ালু হও, সহিষ্ণু হও, ক্ষমাশীল হও, আর ইহুদীদের ধর্মে যে সব দোষ ঢুকেছে সেগুলোকে দূর কর।

তিন বছর ধরে তিনি এই সব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। অনেকেই তাতে চ'টে গেল, তারা বলতে লাগল যে এ লোকটা আমাদের ধর্মের নিন্দে করছে। শেষে তারা তাঁর নামে নালিশ করল, তাতে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল। একটা কাঠের ক্রস্ খাড়া করে, পেরেক ঠুকে তাঁকে তার সঙ্গে গেঁথে মেরে ফেলা হয়। ২৫শে ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন, আর গুড ফ্রাইডে তাঁর মৃত্যুদিন বলে ধরা হয়। ঐদিনই তাঁর পুনরুত্থান (রেসারেক্‌শন্) হয়। মাত্র ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর ছিলেন ১২ জন শিষ্য, তাঁরাই তাঁর কথা প্রচার করতে থাকেন। তাতে একটি নতুন ধর্ম গড়ে ওঠে—যার নাম হয় খৃষ্টধর্ম। নানা দেশে অনেক লোকে এই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম দিকে এজন্য তাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

খৃষ্টানদের মধ্যেও অনেক দল

যীশুকে 'খৃষ্ট' বলা হয়। ভগবান্ যীশুকে তাঁর দূত রূপে অভিষিক্ত করেছিলেন বলে এই নাম হয়। খৃষ্ট (ক্রাইষ্ট) মানে অভিষিক্ত।



ক্রস্‌বিদ্ধ যীশুখৃষ্ট

এখন তো খৃষ্টধর্মে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকই খৃষ্টান। অবশ্য তাদের মধ্যেও অনেকগুলি দল। তার মধ্যে তিনটি প্রধান—রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট আর ইস্টার্ন্ বা পূর্বদেশীয়। প্রথমে ইস্টার্ন্ দল আলাদা হয়ে যায়। তাদের গ্রীক চার্চ আর অর্থোডক্স্ চার্চও বলে। রাশিয়ায়, গ্রীসে, পশ্চিম এশিয়ায় এই দলই প্রবল।

তারপর, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে, জার্মেনীতে মার্টিন লুথার নামে একজন প্রচার করেন যে খৃষ্টধর্মে অনেক গলদ ঢুকেছে, সেগুলো দূর করা দরকার। তাই নিয়ে আবার বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি, কাটাকাটি হ'ল, নতুন একটা দল তৈরি হ'ল। তারা হ'ল প্রোটেস্ট্যান্ট। জার্মেনীতে ও ইংল্যাণ্ডে এই দলের লোক খুব বেশি।

বাদবাকি যারা পুরোনো মতে চলতে লাগল তাদের দলের নাম হ'ল রোম্যান ক্যাথলিক। খৃষ্টানদের মধ্যে এই দলটাই বড়। পৃথিবীতে যেখানে যত রোম্যান ক্যাথলিক আছে তাদের সকলের গুরু হচ্ছেন একজন। তিনি ইটালীর রোম শহরে থাকেন—তাঁকে বলা হয় পোপ। তাঁর প্রাসাদকে বলে ভ্যাটিক্যান। এটিই বোধ হয় পৃথিবীর সব চাইতে বড় বাড়ি।

বাইবেল

দল যা-ই হোক, আসল কথাটা তো সকলেরই এক—তফাৎ শুধু খুঁটিনাটি নিয়ে। খৃষ্টানদের সব দলই তাই একটা শাস্ত্র মেনে চলে, তার নাম বাইবেল। বাইবেলের প্রথম দিক্‌টা হিব্রু ভাষায় লেখা, তাকে বলে 'ওল্‌ড্ টেস্টামেন্ট'। যীশুর জন্মের আগে পর্যন্ত ইহুদী জাতির ইতিহাস তাতে আছে—একেবারে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আরম্ভ হয়েছে সেই ইতিহাস।

তার পরের অংশ 'নিউ টেস্টামেন্ট' গ্রীক ভাষায় লেখা। তাতে যীশুর কথা আর তাঁর শিষ্যদের কথা আছে। খৃষ্টধর্মের উপদেশ সব এই অংশে পাওয়া যায়। কিন্তু 'ওল্‌ড্ টেস্টামেন্ট'কেও খৃষ্টানরা মানেন। ইহুদীদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের মিল আছে।

ভগবানের শেষ দূত

মুসলমান ধর্মে বলে যে মানুষকে ঠিক ধর্মটি শেখাবার জন্যে ভগবান্ একবার মোজেস্‌কে, তারপর যীশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তাতেও যখন হ'ল না, তখন ভগবান্ তাঁর শেষ দূত করে পাঠালেন হজরত মহম্মদকে।

মুসলমান বা ইসলাম ধর্ম

প্রায় ১৪০০ বছর আগে আরব দেশে মক্কায় হজরত মহম্মদের জন্ম হয়েছিল। সে সময়ে আরব দেশের লোকেরা নানা রকম দেবদেবীর মূর্তি-পূজো করত। ভগবানের আদেশ পেয়ে হজরত মহম্মদ বলতে লাগলেন যে এটা বড়ই পাপ কাজ, একমাত্র ভগবানের উপাসনা করাই উচিত—এই কথা বলতে ভগবান্ তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিছু কিছু লোক তাঁর কথা মেনে নিয়ে তাঁর শিষ্য হ'ল বটে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তাঁর ওপর রেগে গেল। তাই শেষে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মক্কা শহর ছেড়ে য়াথ্রিব চলে গেলেন—এই যাওয়াকে বলে 'হিজ্‌রা'। তখন

য়াথ্রিবের নাম হয়ে গেল মদিনা—মানে, শহর। আট বছর সেখানে থাকবার পর তিনি শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে আবার মক্কায় ফিরে এলেন।

তিনি যে ধর্মের প্রচার করেছিলেন তাকে বলে ইসলাম বা মুসলমানধর্ম। এই ধর্মের উপদেশগুলি তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহ্‌র (ভগবানের) কাছ থেকে। আল্লাহ্‌র আদেশগুলি নিয়ে পরে একখানা বই হয়, তার নাম কোরান (আরবী কুর্‌আন)।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র

এই ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে—আল্লাহ্ একজনই, আর মহম্মদ তাঁর দূত ('লা আল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ মহম্মদর্ রসুলাল্লাহ্')। কোরান পড়া আর এই মূলমন্ত্রটি উচ্চারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

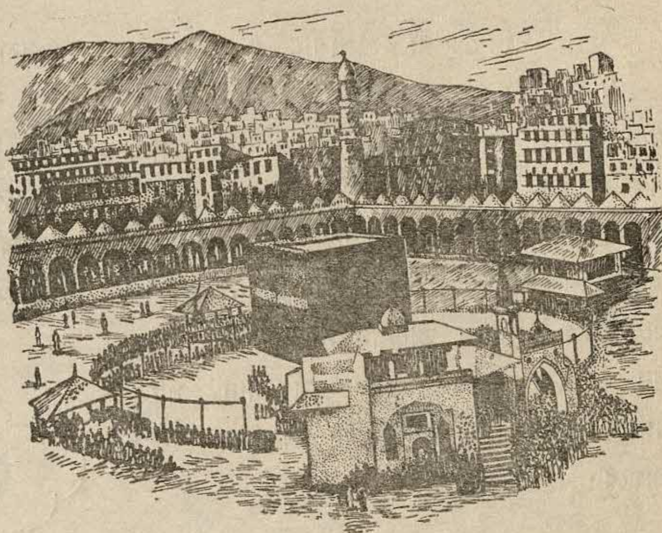
আর একটি কর্তব্য হচ্ছে, দিনে পাঁচবার ভগবান্‌কে ডাকা। একে বলে নামাজ।

মক্কা ও কাবা

মক্কা মুসলমানদের বড় তীর্থ, সেখানকার মসজিদের নাম কাবা। কোরানে আছে যে প্রথম মানুষ আদম এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন। সেটা বার বার নষ্ট হয়ে যায়, আবার গড়া হয়। একবার দেবদূত জেব্রাইল একখানা পবিত্র পাথর দেন, সেটিকে কাবার এক দেয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়। সেটির নাম 'হেজরাল-আস্ময়াদ'।

এই মক্কায় যাওয়া, আর কাবা প্রদক্ষিণ করে ঐ পাথরে চুমো খাওয়াও মুসলমানদের আর এক কর্তব্য। মক্কায় যাওয়াকে বলে 'হজ্'। 'হজ্' করে এলে তাকে বলা হয় 'হাজী'।

রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলমানকে সারাদিন উপোস করতে হয়। আর, দান করাও মুসলমানের একটা বড় কর্তব্য। এইসব কাজ করেই আল্লাহ্‌কে তুষ্ট করতে হয়।



কাবা

শিয়া আর সুন্নী

মুসলমানদের মধ্যেও নানা বিষয়ে মতভেদ হয়ে নানা দল হয়েছে। প্রধান হচ্ছে শিয়া আর সুন্নী। হজরত মহম্মদের পর একে একে অনেক গুরু হয়েছিলেন, তাঁদের বলে খলিফা। কার খলিফা হওয়া উচিত—তাই নিয়েই শিয়া আর সুন্নীদের মধ্যে ঝগড়া। তা নিয়ে একবার কারবালাতে যুদ্ধ হয়ে হজরত মহম্মদের মেয়ের ছেলে হজরত হোসেন মারা যান। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে আজও এক অনুষ্ঠান হয়—তাকে বলা হয় মহরম্।



সঙ্গীতের কথা

গান কে না ভালোবাসে ?

যদি জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তোমাদের মধ্যে গান ভালোবাস না কে?" আমি জানি, সকলেই এক সুরে বলবেঃ "সবাই ভালোবাসি।" সত্যিই তো, গান ভালোবাসে না পৃথিবীতে এমন লোক আছে নাকি? তাই তো শেক্সপীয়ার বলেছেনঃ যে গান ভালোবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। এমন যে গান, মানে সঙ্গীত, তার গল্পটাও নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।

সঙ্গীতের জন্মকথা ঃ পুরাণে যা আছে

সঙ্গীতের জন্ম যে ঠিক কবে হয়েছিল তা বলা মুশ্‌কিল। সঙ্গীতের জন্ম-রহস্য নিয়ে আমাদের দেশে যে সব মজার মজার গল্প শোনা যায় সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, কিংবা একটিও ঠিক কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। সঙ্গীত নাকি আগে মর্ত্যে—মানে পৃথিবীতে ছিলই না, শুধু স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই নাচ-গান-বাজনা প্রচলিত ছিল। দেবসভায় যাঁরা গান গাইতেন তাঁদের বলা হ'ত গন্ধর্ব, যাঁরা নাচতেন তাঁদের বলা হ'ত অপ্সরা আর যাঁরা গান এবং নাচের সঙ্গে নানা-রকম বাজনার সঙ্গত করতেন তাঁদের বলা হ'ত কিন্নর। নাচ, গান এবং বাজনা—এই তিনটিকে এক কথায় বলা হয় সঙ্গীত। এই তিনটির মধ্যে গান, অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীতই হ'ল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; তার পর বাজনা, তারপর



গন্ধর্ব (অজন্তার ১৭নং গুহাচিত্র থেকে)



কিন্নর (অজন্তা গুহাচিত্র থেকে)

নাচ। কেউ কেউ বলেন, গানের পরেই নাচের স্থান, তারপর বাজনা। তিনটির মধ্যে গান বড় ব'লে যাঁরা গান গাইতেন সেই গন্ধর্বদের নাম অনুসারেই সঙ্গীতকে বলা হয় 'গন্ধর্ববেদ'। তা ছাড়া চারটি বেদের মত সঙ্গীতকলাকেও সমান গুরুত্ব বা মর্যাদা দেওয়ার জন্য একে 'পঞ্চম বেদ'ও বলা হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা চারটি বেদের সার সংকলন করে এই পঞ্চম বেদ রচনা করেছিলেন।

অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা নাকি নারদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। হ্যাঁ, ইনিই সেই কলহপ্রিয় নারদ যিনি বীণা হাতে নিয়ে ঢেঁকির ওপর চড়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে বেড়াতেন আর ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। তা হ'লে গাইয়ে-বাজিয়েদের মধ্যে যে ঝগড়া-লড়াই মাঝে মাঝে দেখা যায় কলহ-প্রিয় নারদই বোধ হয় তার জন্য দায়ী! কি বল?

কেউ কেউ বলেন, ব্রহ্মা এবং তাঁর শক্তি সরস্বতী প্রথমে সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। তাই ব্রহ্মাকে বলা হয় সঙ্গীতের আদি গুরু এবং সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পূজো করা হয় বীণাপাণি সরস্বতীকে। সরস্বতীর হাতে যে বীণাটি থাকে সেটি নাকি তৈরি করেছিলেন ব্রহ্মার পুত্র (অথবা শিষ্য) নারদ। এই বাদ্য-যন্ত্রটিই ভারতের প্রাচীনতম বাদ্য। ব্রহ্মার প্রিয় নারদের তৈরি বলেই হয়তো মা সরস্বতীর হাতে বীণা দেখা যায়। আবার অনেকে বলেন, বিশাল সঙ্গীতসমুদ্রে ডুবে যাবার ভয়েই সরস্বতী তুম্বা (লাউয়ের খোল) ধারণ করে আছেন। নারদও ব্রহ্মার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

নারদ ছাড়া ব্রহ্মার আরো চারজন সঙ্গীতের প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই প্রধান শিষ্যদের নাম ছিল: ভরত, হুহু, রম্ভা ও তুম্বুরু। তুম্বুরুই নাকি 'তানপুরা' নামক যন্ত্রটির স্রষ্টা। তাই তানপুরার অপর নাম তম্বুরা। ভরত এবং



নারদ



বীণাপাণি সরস্বতী (হালেবিড্, মহীশূর)

নারদ—এঁরাই দু'জনে পৃথিবীতে সঙ্গীতের প্রচার করেন। পার্বতী ও মহাদেবের কাছে ভরত লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্য শিখেছিলেন।

বিজ্ঞানীরা কি বলেন

এতক্ষণ সঙ্গীত-সৃষ্টির ব্যাপারে পৌরাণিক কাহিনীর কথা বলা হ'ল। এবার বলছি বিজ্ঞানীদের মতবাদ।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের ভাষা সৃষ্টি হবার অনেক আগেই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হয়েছে নানা পশুপাখির স্বরের (বা গানের) অনুকরণ থেকে। পশু-পাখিরা যেমন তাদের মনের ভাব নানা অর্থহীন শব্দে প্রকাশ করে, ভাষাসৃষ্টির আগে মানুষও তেমনি করে তার মনের কথা জানাত কতগুলি শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গী দিয়ে। এই ভাবপ্রকাশের মধ্যে সুরের বা স্বরের যে ওঠা-নামা হ'ত তাই থেকেই নাকি পরে সঙ্গীতের জন্ম হয়। জীব-জন্তুর ঐ অর্থহীন শব্দের মধ্যে যে সুর ও ছন্দের আভাস মানুষ পেল, তার বুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে সেই অর্থহীন শব্দকেই তারা অর্থপূর্ণ করে তুলল সঙ্গীতের মাধ্যমে।

সঙ্গীতের কোষ্ঠী-ঠিকুজি

আজ গান-বাজনা শেখবার সময় আমাদের যে সা রে গ ম প ধ ও নি স্বরগুলি শিখতে হয় সেগুলির সৃষ্টি সম্বন্ধেও বেশ মজার কথা শুনতে পাওয়া যায়।

তোমরা জান তো যখনই কোন শিশুর জন্ম হয় তখনই মা-বাবা পণ্ডিত মশাইদের দিয়ে সেই শিশুর কোষ্ঠী-ঠিকুজি তৈরি করিয়ে নেন। এই কোষ্ঠী-ঠিকুজির মধ্যে লেখা থাকে ঐ শিশুর জাতি, কুল, গ্রহ, রাশি, প্রকৃতি ইত্যাদি। সা-রে-গ-ম প্রভৃতি স্বরগুলিরও তেমনি একটি জন্মপত্রিকা পরপৃষ্ঠায় দিয়ে দেওয়া হ'ল।

কেমন, বেশ মজা লাগছে না ? এর চাইতেও বেশি মজা পাবে যখন সঙ্গীতের ইতিহাস পড়বে তোমরা। হ্যাঁ, সঙ্গীতেরও ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস পড়েই তো আমরা জানতে পারি অতি প্রাচীন কালে সঙ্গীতের অবস্থা কি রকম ছিল।

স্বরের নাম	যে জীবজন্তুর স্বর থেকে নেওয়া	জন্মস্থান	জাতি	কুল	গ্রহ	রাশি	ঋতু	প্রকৃতি	রস	গুণ	রং	ঋষি	অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী	ছন্দ
ষড়্জ (সা)	ময়ূর	জম্বু দ্বীপ	ব্রাহ্মণ	দেবকুল	রবি, চন্দ্র	কর্কট	সর্বঋতু	পিত্ত	বীর, মধুর, কটু	সত্ব	সপ্ত রং, লাল	অগ্নি	ব্রহ্মা	অনুষ্টুপ্
ঋষভ (রে)	ঋষভ (ষাঁড়)	শাক দ্বীপ	ক্ষত্রিয়	ঋষি	চন্দ্র, বুধ	মিথুন, কন্যা	বসন্ত	বাত, কফ	রৌদ্র, লবণ	সত্ব	শ্বেত, সবুজ	ব্রহ্মা	লক্ষ্মী	গায়ত্রী
গান্ধার (গ)	মেষ (ভেড়া)	কুশ দ্বীপ	বৈশ্য	দেব	মঙ্গল, শুক্র	মেষ, তুলা	গ্রীষ্ম	পিত্ত	করুণ, তিক্ত	তমঃ	গৌর, রক্ত, কমলা	চন্দ্র	গণেশ	ত্রিষ্টুপ্
মধ্যম (ম)	ক্রৌঞ্চ (বক)	ক্রৌঞ্চ দ্বীপ	ব্রাহ্মণ	দেব	বুধ, রবি	সিংহ, মেষ	বর্ষা	বাত, পিত্ত, কফ	হাস্য, কটু, মধুর	রজঃ	হরিৎ সাদা	বিষ্ণু	বিষ্ণু	বৃহতী
পঞ্চম (প)	কোকিল	শাল্মলী দ্বীপ	ব্রাহ্মণ	পিতৃ	বৃহস্পতি মঙ্গল	বৃশ্চিক	শরৎ	কফ	শৃঙ্গার, মধুর	সত্ব	পীত, কালো	নারদ	মহেশ্বর	পঙ্ক্তি
ধৈবত (ধ)	অশ্ব (ঘোড়া)	শ্বেত দ্বীপ	ক্ষত্রিয়	ঋষি	বৃহস্পতি শুক্র	ধনু, মীন	হেমন্ত	বাত, কফ	অম্ল	রজঃ	শ্যাম পীত	তুম্বুরু	সরস্বতী	উষ্ণিক
নিষাদ (নি)	হস্তী (হাতি)	পুষ্কর দ্বীপ	বৈশ্য	অসুর	শনি	মকর, কুম্ভ	শিশির	বাত	ভয়ানক কষায়	তমঃ	কৃষ্ণ	ধনদ	কার্তিক	জগতী

স্বরের: জন্মপত্রিকা

সঙ্গীতের ইতিহাস

সঙ্গীতের এই ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে বৈদিক কাল থেকে। ঐ যুগে বেদ পাঠ করা হ'ত গান গেয়ে। এখনও ভারতের যে ছ'-একটি জায়গায় ঐ ভাবে বেদ পাঠ করা হয় তার মধ্যে বারাণসী অন্যতম। বৈদিক যুগে মাত্র তিনটি স্বর দিয়ে বেদগান গাওয়া হ'ত। তখনও তিনটির বেশি স্বর আবিষ্কৃত হয় নি।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার মোটামুটি প্রায় হাজার ছয়েক বছর আগের সময়কে বলা হ'ত বৈদিক যুগ। সেই যুগের গান বলতে বোঝাত শুধু সামগানকে, আর যে তিনটি স্বরে সামগান গাওয়া হ'ত সেই তিন স্বরের নাম দিল উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। সে সময় যেমন তিনটির বেশি স্বর ছিল না, তেমনি স্বরের নামও সা রে গ ম— এই ধরনের ছিল না। এমন কি 'সঙ্গীত' শব্দটিও সেই সময়কার কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রায় আটশ' খৃষ্টাব্দে লেখা 'সঙ্গীত মকরন্দ' নামক গ্রন্থপ্রণেতা নারদই প্রথম 'সঙ্গীত' শব্দটির উল্লেখ করেন। এ নারদ কিন্তু সেই ঢেঁকিবাহন নারদ ন'ন!



বেদ পাঠ করা হ'ত গান গেয়ে

বৈদিক যুগের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামক স্বর তিনটির মধ্যেই পরবর্তী কালের সাতটি স্বরের রেশ পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত সাতটি স্বরের মধ্যে কোন্ কোন্ স্বরের সঙ্গে সামগানের যুগের স্বরগুলির মিল ছিল তা বলা মুশ্‌কিল। তবে হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরের একটি তালিকা দিয়ে দিচ্ছি।

আর্চিক	যুগের	আদি স্বর	···	আজকের ম স্বর।
গাথিক	”	দুই স্বর	···	আজকের ম ও প।
সামিক	”	তিন ”	···	আজকের ম, প ও সা।
স্বরান্তর	”	চার ”	···	আজকের ম, প, সা ও গ।
উড়ব	”	পাঁচ ”	···	আজকের ম, প, সা, গ ও রে।
ষাড়্‌ব	”	ছয় ”	···	আজকের ম, প, সা, গ, রে ও নি।
সম্পূর্ণ	”	সাত ”	···	আজকের ম, প, সা, গ, রে, নি ও ধ।

সামিক (সামগানের) যুগের আগে আর্চিক যুগের এক স্বর দিয়ে গাওয়া হ'ত ঋক্‌ছন্দ। তারপর গাথিক যুগে যখন দুই স্বর আবিষ্কৃত হ'ল তখন সেই দু'টি স্বর দিয়ে গাওয়া হ'ত গাথা-গান। সামিক যুগের উদাত্ত স্বর ছিল সব চাইতে উঁচু আর অনুদাত্ত ছিল সব চাইতে নীচু স্বর। কিন্তু স্বরিত নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন স্বরিত ছিল উদাত্তের চাইতেও উঁচু, কেউ বলেন উদাত্ত ও অনুদাত্তের মাঝামাঝি। এই তিনটি স্বরকে ভিত্তি করেই পরে অন্যান্য স্বরগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা ছাড়া প্রচিত নামেও আর একটি স্বর ছিল বলে জানা যায়।

প্রথমে যখন সাতটি স্বর আবিষ্কৃত হ'ল তখন কিন্তু তাদের নাম ষড়্‌জ, ঋষভ ইত্যাদি ছিল না। আর আজকাল যেমন প্রথমে নীচু দিক্ থেকে সা রে গ ম বলে ক্রমশঃ উঁচু দিকে ওঠা হয়, আগে তেমনি ওপর দিক্ থেকে ক্রমশঃ নীচু দিকে নেমে আসা হ'ত। আগের দিনের সাতটি স্বরের নাম ছিলঃ ক্রুষ্ট (সব চাইতে উঁচু স্বর), প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অভিস্বার্য।

এর পর নামগুলিকে আর একবার বদল করা হ'ল। এবার খুব সাদাসিধে সরল নাম,—ক্রুষ্ট, অভিস্বার্য গোছের দাঁতভাঙা নাম নয়। এই নামগুলি বদল করলেন শিক্ষাকার নারদ ও বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ন। তাঁরা নাম দিলেনঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম।

'দেশী' সঙ্গীতের আমলে আর একবার নাম বদলানো হ'ল, আর সেই নামগুলিই এখনও পর্যন্ত চালু আছে। কে জানে আবার কোনদিন এদের নামও বদলানো হবে কিনা! এবার সাতটি স্বরের নাম রাখা হ'ল যথাক্রমে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে যাদের বলা হয় সা, রে, গ, ম, প, ধ ও নি (সা রে গা মা পা ধা নি)।

প্রথম গান

সকলেই স্বীকার করেন, ভারতবর্ষের বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রধ্বনিই হ'ল পৃথিবীর প্রথম গান। এমন কি ইতিহাস বলে, ভারতবর্ষ যখন সঙ্গীতের উৎকর্ষে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখনও গ্রীসে সঙ্গীতচর্চা মোটেই অগ্রসর হয় নি। অথচ এই গ্রীস থেকেই সারা ইয়োরোপে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। প্রাচীনত্বের দিক্ থেকেও গ্রীসের খুব নাম-ডাক। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন গ্রীকরা হিন্দুদের সঙ্গীতশাস্ত্র দেখেই তাঁদের দেশে সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার, প্রসার ও উন্নতিসাধন করেন। পারস্য ও আরব দেশও হিন্দুসঙ্গীতের পুঁথিপত্রাদি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তাদের সঙ্গীতের মান উন্নয়ন করেছে। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের উক্তি ও যুক্তি থেকেও এদেশীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব ও আন্তর্জাতিক ব্যাপকতার বিষয় অনুমান করা যেতে পারে।—

সঙ্গীতের দু'টি ভাগ

সামিক যুগের কিছু পরেই সঙ্গীতকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হ'ল। একটি হ'ল মার্গ, অপরটি দেশী। আগে যে গান্ধর্ব সঙ্গীতের কথা বলেছি, তারই অনুসরণে রচিত হয়েছিল মার্গ সঙ্গীত। অনেকে গান্ধর্বকেও মার্গ বলেন। মার্গ সঙ্গীত সীমাবদ্ধ ছিল আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিদের মধ্যে। তাঁদের আধ্যাত্মিক ও যাগযজ্ঞের প্রয়োজনে এই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল। এর নিয়ম-কানুন নাকি খুব কঠোর ছিল এবং এ গান শেখার ব্যাপারে অধিকারী-অনধিকারীরও প্রশ্ন ছিল। শুধু তাই নয়, পাছে মার্গ সঙ্গীতের শুচিতা নষ্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে আশ্রমিক জগতের বাইরের মানুষদের কাছে এর গূঢ় রহস্য গোপন রাখা হ'ত। এই সব কারণেই বোধ হয় মার্গ সঙ্গীতের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় হাজার বছর আগেই। এর চেহারা যে কেমন ছিল, কেমন ছিল এর প্রকৃতি আর কী ভাবেই বা এ গান গাওয়া হ'ত আজকের সঙ্গীত-গবেষকেরা সে সম্বন্ধে কিছুই নাকি জানতে পারেন নি। মধ্যযুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত অহোবল পর্যন্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত পারিজাত'-এ এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি।

দেশী সঙ্গীত ছিল আশ্রমের বাইরের মানুষদের জন্য। তারও নিয়ম-কানুন ছিল, শাস্ত্র ছিল এবং আজও আছে; কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তার মধ্যে একটু অদলবদল করলে খুব একটা দোষ ধরা হ'ত না। মার্গ সঙ্গীত দিয়ে যেমন প্রকৃতি দেবী বা দেবতাদের তুষ্ট করা হ'ত, দেশী সঙ্গীত তেমনি করত দেশবাসী জনসাধারণের মনোরঞ্জন। আজকাল ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতি যে সব গান 'ক্ল্যাসিকাল' বা উচ্চাঙ্গের রাগ-সঙ্গীত বলে পরিচিত, সে-গুলিকে কেউ কেউ মার্গ সঙ্গীত বলেন আর বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতকে বলেন দেশী সঙ্গীত। এ ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। যাঁরা সঙ্গীতের ইতিহাস বা শাস্ত্র ভালোভাবে পড়াশোনা করেন নি তাঁরাই এ রকম ভুল ধারণা পুষে রেখেছেন মনে মনে। তোমরা কিন্তু এ ভুল ক'রো না। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানগুলি আসলে ঐ দেশী সঙ্গীতেরই পরিবর্তিত চেহারা। দেশী সঙ্গীতে সামান্য অদলবদল

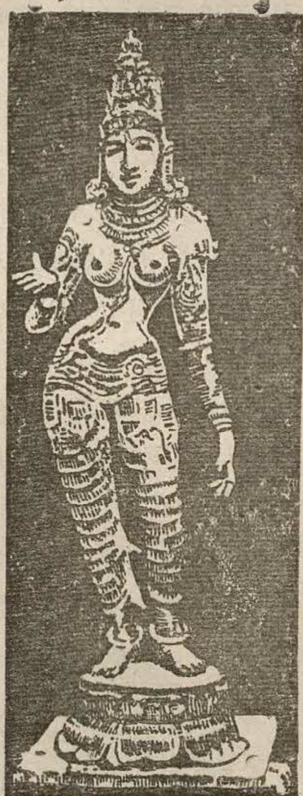
করার যে স্বাধীনতা মানুষের হাতে ছিল সেই স্বাধীনতা থেকেই ক্রমশ রূপান্তরিত হতে হতে আজকের ধ্রুপদ, খেয়ালের জন্ম হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, আজ যে ধ্রুপদ বা খেয়াল আমরা শুনি, কিছুকাল আগের ধ্রুপদ, খেয়ালের সঙ্গে তারও চেহারার কিছুটা অমিল লক্ষ করা যাচ্ছে। পুরোনো দিনের রাগ-রাগিণীর শুধু নাম ছাড়া, তার পরিবেশন-ভঙ্গী বা রীতি, রূপ-রস-ভাব ও তালের ছন্দ প্রভৃতি বেশ খানিকটা পাল্টে গেছে। রাগিণী বলে আজ আর কোন স্ত্রীলিঙ্গের কারবার রাগরাজ্যে নেই—সবই পুরুষ রাগের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে।



মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য (চিদম্বরম্)

এবার নাচের কথা বলি

এবার একটু নাচের কথা বলা যাক। আগেই তোমাদের কাছে বলেছিলাম যে ভরত মহাদেবের কাছে তাণ্ডব আর পার্বতীর কাছে লাস্য নৃত্য শিখেছিলেন। এ ভরত কিন্তু রামায়ণের ভরত ন'ন। ইনি অন্য ভরত। যাই হোক, নাচের স্রষ্টা বলা হয় মহাদেবকে। তাণ্ডব ও লাস্য নামে যে দু'টি নৃত্য-শৈলী আছে, তা প্রধানত পুরুষদের ও মেয়েদের জন্য বিভক্ত। তাণ্ডব নৃত্য বীররসাত্মক পুরুষ নৃত্য এবং কোমলতাযুক্ত শৃঙ্গাররসাত্মক নৃত্য হ'ল লাস্যের অন্তর্ভুক্ত। পুরোনো কাহিনীতে জানা যায় যে মহাদেব যখন গজাসুরকে (কোন কোন মতে ত্রিপুরাসুরকে) বধ করেছিলেন সেই সময় তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন আর এই যুদ্ধে যখন গজাসুর নিহত হ'ল তখন সেই আনন্দে পার্বতী নাচলেন লাস্য নৃত্য। অবশ্য এ হ'ল শৈব ও শাক্তদের মত। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের নিয়ে রাস নৃত্য করেছিলেন তখনই নাচ, গান ও তালের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময়েও মেয়েদের মধ্যে নাচগানের প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগে ঋষিরা যেমন যাগযজ্ঞের সময় গান গাইতেন, আশ্রমবাসিনী ঋষিকন্যারাও তেমনি দল বেঁধে যজ্ঞবেদীর চারপাশে ঘুরে



পার্বতীর লাস্য নৃত্য (চোল ব্রোঞ্জের মূর্তি)

দ্বারকায় গোপিনীদের। শ্রীকৃষ্ণ আবার এই গোপিনীদের নিয়ে এক নৃত্যমণ্ডলী রচনা করেছিলেন।

শুধু আদিকালেই বা কেন, এখনও পৃথিবীর বহু দেশের সভ্যসমাজে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে নৃত্য করে থাকেন। একবার নাকি একজন নিগ্রো তাঁর সঙ্গে নাচবার জন্য কাউকে না পেয়ে শেষে তাঁর নিজের ছায়াকেই সঙ্গী করে প্রায় দু'ঘণ্টা নেচেছিলেন।

মুদ্রা

ছায়ার কথায় আর একটি কাহিনী মনে পড়ে গেল। তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান যে হাতের আঙুলগুলোকে নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার ছায়া দেওয়ালে ফেলে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ছবি দেখানো যায়। হাতের ঐ ক্রিয়াগুলোকে বলা হয় মুদ্রা। বাড়িতে যখন কোনও পূজো হয় তখনও নিশ্চয়ই দেখেছ,

ঘুরে নৃত্য করতেন। মহাভারতের গল্পেও তোমরা পড়েছ যে অর্জুন 'বৃহন্নলা'র ছদ্মবেশে বিরাট রাজার মেয়ে উত্তরাকে গান-বাজনা শেখাতেন। তার মানে, সেই পুরাকালেও রাজা-মহারাজা প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

বলা হয় বাণাসুরের মেয়ে উষাকে নাচ শিখিয়েছিলেন পার্বতী, আর উষা শিখিয়েছিলেন



বৃহন্নলা রাজার মেয়েদের নাচ শেখাচ্ছেন।



রাস নৃত্য

পুরুত ঠাকুর তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে নানা রকম মুদ্রা রচনা করে মন্ত্রপাঠ করেন। এই ভাবে হাত, পা, মুখ, চোখ, ভুরু বা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা ভঙ্গীকেও বলা হয় মুদ্রা। নাচের ব্যাপারে মুদ্রা একটি অপরিহার্য ক্রিয়া। আদিমানবেরা এইভাবে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারকম মুদ্রার ছায়া দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করত। পরে ঐ অঙ্গভঙ্গীগুলোকেই অনুকরণ করে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা তাকে সুসংবদ্ধ রূপ দিয়ে নৃত্যকলার পর্যায়ভুক্ত করেছে। কোন কথা না বলে, শুধু অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাই হ'ল নৃত্য। কথা, সুর ও তালের সাহায্যে গান গেয়ে মানুষ যেমন মনের নানা ভাবকে প্রকাশ করে, তাল ও ছন্দোবদ্ধ নৃত্য দিয়েও তেমনি করা যায়।

নানা ধরনের নাচ

নাচের মধ্যে যাতে ভাব প্রকাশই প্রধান তার নাম নৃত্য, আর যাতে তাল-লয় প্রধান তার নাম নৃত্ত। আমাদের দেশে কথাকলি ভাবপ্রধান, আর কথক নাচ তালপ্রধান। ভরতনাট্যম্ ও মণিপুরী—এ দু'টিতে ভাব ও তাল উভয়ের প্রাধান্য। এগুলি হ'ল শাস্ত্রানুসারী নাচ। তা ছাড়া সাঁওতালী নাচ, রায়বেঁশে নাচ, কাঠি নাচ প্রভৃতি বহু রকমের লোক-নৃত্য এদেশের অঞ্চলে অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আজকাল নৃত্যনাট্য বলে আর একরকম নাচের প্রবর্তন হয়েছে। ইয়োরোপে লিরিক, গথিক, ট্র্যাভিশিয়ান এবং বল নাচের নাম শোনা যায়।



নৃত্য সরস্বতী (হালেবিড্, মহীশূর)

জীবনী বৈচিত্র্য

মহাপ্রভুর কথা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, ঘুরতে ঘুরতে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গম্ ক্ষেত্রে হাজির হলেন তিনি।

তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে কাবেরী নদী। সেই নদীর মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ, তারই মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দির। তার স্বর্ণচূড়া ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়।

মহাপ্রভু কাবেরীতে স্নান করে নিলেন, তার পর ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন মন্দিরের ভিতর। সম্মুখেই শ্রীরঙ্গনাথের নয়নলোভন মূর্তি। দেখতে দেখতে মহাপ্রভুর ভাবাবেগ এল, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দের অশ্রু। নিজেকে ভুলে, আশপাশের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তিনি হাত তুলে বিগ্রহের সামনে নৃত্য শুরু করে দিলেন।

নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোক সেই অপরূপ দৃশ্য দেখছিলেন। এমনটি তিনি আর কখনও দেখেন নি। তিনিও পরম ভক্ত, তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে কোন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে আজ এই মন্দিরে।

লোকটির নাম বেঙ্কট ভট্ট। ওখানকারই এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক। মহাপ্রভু উঠে দাঁড়াতেই তিনি গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, বললেন, "আপনি যদি দয়া করে একবার আমার বাড়িতে পদধূলি দেন, আমার জীবন ধন্য হবে।"

ভক্তের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না চৈতন্যদেব, বেঙ্কট ভট্টের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে কয়েক মাস সেখানেই কাটিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা আর কৃষ্ণনাম শুনবার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগল বেঙ্কট ভট্টের বাড়িতে। গানে, সংকীর্তনে মুখর হয়ে উঠল বাড়ি। মনে হ'ল এটিও যেন একটি তীর্থক্ষেত্র।

রোজ সকালে মহাপ্রভু কাবেরীতে স্নান করে নিতেন, তার পর বেঙ্কট ভট্টকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকতেন গিয়ে মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথের সামনে। বহুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে তার পর ফিরে আসতেন। এইভাবে চলতে লাগল দিনের পর দিন।

একদিন মন্দিরে গিয়ে দেখেন, নাটমন্দিরের এক কোণে বসে এক ব্রাহ্মণ একমনে গীতা পাঠ করে চলেছেন—গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়। ব্রাহ্মণ তেমন লেখাপড়া জানেন বলে মনে হয় না। পুঁথিখানি ঠিক মত খুলে ধরতেও পারেন নি, উচ্চারণও অত্যন্ত অশুদ্ধ। কিন্তু তাতে তাঁর কিছু এসে যাচ্ছে না—পড়তে পড়তে তিনি যেন ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গেছেন, তাঁর দেহে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক প্রভৃতি আট রকম সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

মহাপ্রভু থমকে দাঁড়ালেন, কাছে গিয়ে বললেন, "কি পড়ছ তুমি? এত আনন্দ—এত পুলক—এত সুখ পাচ্ছ মনে হচ্ছে? কি থেকে এ রকমটা হ'ল?"

ব্রাহ্মণ প্রথমটা যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। তার পর লজ্জিতকণ্ঠেই বললেন, "প্রভু, সত্যিই আমি খুব মূর্খ। সংস্কৃত ভালো জানি না, পড়তে পারি না, উচ্চারণ করতেও পারি না। সবাই ঠাট্টা করে ; কিন্তু তবু আমি ঐই গীতা না পড়ে থাকতে পারি না—রোজ এইখানে এই নাটমন্দিরে এসে পড়ি। আমার গুরু আমাকে আদেশ দিয়েছেন, রোজ আমাকে খানিকটা করে গীতা পড়তে হবে। গীতার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এই অষ্টাদশ অধ্যায়।"

মহাপ্রভু তাঁর দিকে সপ্রশ্ন ও সকৌতূহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে ব্রাহ্মণ বললেন, "কেন ভালো লাগে বলব ? যখনই আমি এই অধ্যায় পড়তে শুরু করি তখনই আমার মনে হয়—

'অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
ধরিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥'

"আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অপরূপ দৃশ্য। স্বয়ং নারায়ণ, হাতে তোত্র (চাবুক) আর লাগাম, রথের ওপরে বসে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, অর্জুন মাথা নীচু করে শুনছেন। যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণ এই দৃশ্যই শুধু প্রত্যক্ষ করি, চোখের সামনে আর কিছু দেখতে পাই না। তখন আর আমি আমাতে থাকি না, আমার মনের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত আনন্দের আবির্ভাব হয় যার বর্ণনা মুখে দেওয়া অসম্ভব।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে চৈতন্যদেব থর থর করে কাঁপতে লাগলেন ; তার পর ব্রাহ্মণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বহু পুণ্যের ফলে আজ তোমার মত ভক্তের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তুমিই একমাত্র গীতার সারতত্ত্ব জানতে পেরেছ। তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আজ আমার জীবন ধন্য হ'ল। তুমি যেমন পড়ছ পড়ে যাও। উচ্চারণ ভুল হ'ল কিনা, পাঠ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।"

মহাপ্রভুর চোখ দিয়ে তখন অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। ব্রাহ্মণও বুঝতে পারলেন তিনি কোন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছেন। তিনি বললেন, "তুমিই কি তা হলে সেই নারায়ণ, আমার সামনে ধরা দিতে এসেছ ? সত্যি, আমার তাই মনে হচ্ছে—আমি আজ



ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সাক্ষাৎ নারায়ণের দর্শন পেয়েছি। নইলে তোমাকে দেখে গীতাপাঠের চেয়েও দ্বিগুণ সুখ কেন হচ্ছে আমার মনে ?—

'তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।

সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয়' ॥"

বলে ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে হাতে ধরে তুললেন, বললেন, "চুপ, এ কথা আর কাউকে ব'লো না। তুমি তোমার নিত্যকর্ম যে-ভাবে করছ করে যাও, শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই পাবে তুমি। তোমার মত ভক্ত তাঁকে পাবে না—এ কি হতে পারে ?"

ব্রাহ্মণ সেইদিন থেকে মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে গেল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সুন্দর ঘটনাটির উল্লেখ আছে। কবিতার ছত্রগুলিও তাই থেকেই তুলে দেওয়া হ'ল।

ঢেঁকির বিক্রম

শক্তিমান্ পুরুষদের আমরা বলি পালোয়ান, এবং পালোয়ান বললেই আমাদের কুস্তিগির বা ব্যায়ামবীরদের কথা আগে মনে আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও মাঝে মাঝে অসম্ভব শক্তিমান্ দু'-একটি মানুষের দেখা পাওয়া যায়। আশানন্দ ঢেঁকি ছিলেন এই রকম একটি মানুষ।

'ঢেঁকি' নাম শুনে তোমরা হয়তো একটু অবাক্ হয়ে যাচ্ছ। ও রকম পদবীও হয় নাকি ? আসলে ওটা কিন্তু কোন নাম বা পদবী নয়—লোকের দেওয়া উপাধি। ওঁর সত্যিকার নাম ছিল আশানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অনেক দিন আগেকার কথা। শান্তিপুরের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আশানন্দের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গায়ে হ'ল অসম্ভব জোর। লম্বা-চওড়া চেহারা, কিন্তু স্বভাবটি বড় ভালো। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। নিজের অল্প কিছু জমিজমা, বাগান ছিল, তাতেই কোন রকমে চলে যায়।

একবার আশানন্দকে কোন কার্যোপলক্ষে দূরদেশে যেতে হ'ল। তখনকার দিনে রেলগাড়ি ছিল না, যাতায়াতের এত সুবিধেও ছিল না। দীর্ঘ পথ পার হ'তে গেলেও পায়ে হেঁটেই যেতে হ'ত। আশানন্দ কাজ শেষ করে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলেন। পথের মধ্যে এক গ্রামে এসে সন্ধ্যে হয়ে গেল। অগত্যা সেদিনের মত আর অগ্রসর না হয়ে তিনি গ্রামের এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলেন রাত কাটাবার জন্য। ব্রাহ্মণ অতিথি দেখে গৃহকর্তা তাঁকে পরম সমাদরে আশ্রয় দিলেন। আহারাদির পর আশানন্দকে বাড়ির বাইরের ঘরে শুতে দেওয়া হ'ল। গরমের জন্য তিনি ঘরে না শুয়ে ঘরের বারান্দায় বিছানা পেতে নিলেন।

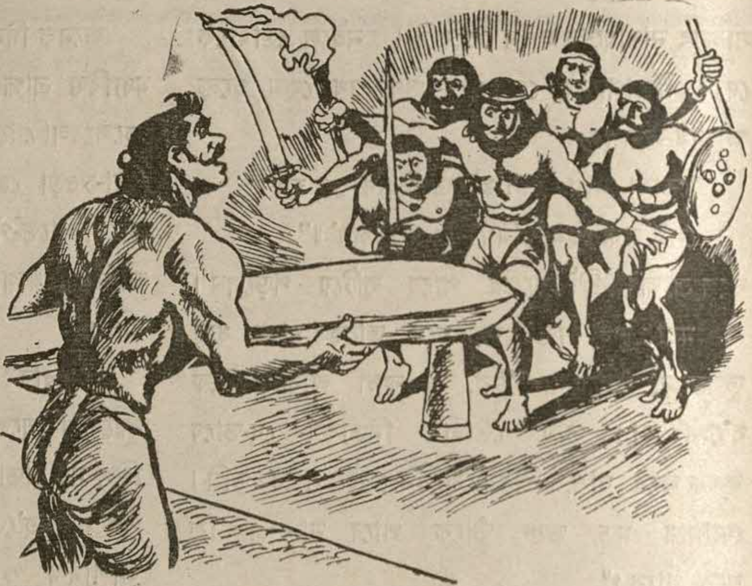
সে আমলে চোর-ডাকাতের উপদ্রব একটু বেশি ছিল—বিশেষ করে ডাকাতের। প্রায়ই নানা গ্রামে বড়লোকদের বাড়িতে ডাকাতি হ'ত। আশানন্দের আশ্রয়দাতাও ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। সে রাত্রে তাঁরই বাড়িতে ডাকাত পড়ল।

নামকরা ডাকাতের দল। দলের নাম শুনেই বাড়ির লোকদের থরহরি কম্প শুরু হ'ল। ডাকাতদের বাধা দেবার চেষ্টা না করে বাড়ির সবাই খিড়কি দরজা দিয়ে পালাতে আরম্ভ করল। বাড়ির কর্তা ছিলেন ধর্মভীরু লোক।

তাঁর হঠাৎ খেয়াল হ'ল, তাই তো, বাড়িতে ব্রাহ্মণ অতিথি রয়েছেন, তিনি হয়তো কিছুই জানেন না। ডাকাতরা আর কাউকে না পেয়ে তাঁকেই হয়তো খুন করে রেখে যাবে। ব্রহ্ম-হত্যার পাতক হবে তাঁর। তিনি দৌড়ে গিয়ে বাইরে ঘুমন্ত আশানন্দকে ঠেলে তুললেন, বললেন, "বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, শীগ্‌গির পালান।"

আশানন্দ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলেন। ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল। তার পর বললেন, "বলেন কি! আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আর আপনাদের এই বিপদের সময় আমি আপনাদের সাহায্য না করে ফেলে পালাব? আসুক না ডাকাত, তাকে রুখতে হবে।"

এদিকে ডাকাতরা তখন সদর দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে। মশাল জ্বালিয়ে হারে-রে-রে করতে করতে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভিতর। বাড়ির কর্তা, আর যাঁরা পালাতে পারেন নি,—ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। আশানন্দ মালকোঁচা মেরে নিলেন, তার পর একটা লাঠি বা হাতিয়ারের খোঁজে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ঢেঁকিশালের দিকে। তিনি বিদ্যুৎগতিতে ঢেঁকিশালে ঢুকে ঢেঁকিটা উপড়ে নিলেন, তার পর সেটাই কাঁধে নিয়ে ছুটে এলেন ডাকাতদের সামনে।



ঢেঁকিটা নিয়েই ছুটে এলেন ডাকাতদের সামনে।

তোমরা, যারা পাড়াগাঁয়ে থাক বা গেছ, নিশ্চয়ই ঢেঁকি দেখেছ। এক-একটা ঢেঁকি কি বিরাট হয় আর কী ভীষণ তার ওজন তা হয়তো জান।

আশানন্দকে ঢেঁকি উপড়ে আনতে দেখে ডাকাতরা হকচকিয়ে গেল, কেউ আর কাছে এগোতে সাহস করে না। দূর থেকেই তারা সড়কি, বল্লম, ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। তখন আশানন্দ সেই ঢেঁকি ঘুরিয়ে প্রবল বেগে ডাকাতদের ওপর আঘাত হানলেন। ঢেঁকির ঘায়ে দু'-তিনটে ডাকাত জখম হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, বাকি সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। ডাকাত-দলের সর্দার দেখল আশানন্দের হাত এখন খালি, সে আর তার একজন সঙ্গী তখন লাঠি ঘুরিয়ে এগিয়ে এল। সামনেই ছিল চণ্ডীমণ্ডপ, আশানন্দ বেগতিক দেখে তার দাওয়ায় উঠে পড়লেন, তার পর এক টানে একটা শালের খুঁটি উপড়ে নিয়ে ডাকাতদের

সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন কোথায় গেল ডাকাতের লাঠি! শালের খুঁটির তীব্র আঘাতে লাঠি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সঙ্গী পালাল কিন্তু সর্দার পালাতে পারল না, আশানন্দ বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরে ফেললেন।

এর পর আর কি? নাকে খৎ দিয়ে, জীবনে আর কোনদিন ডাকাতি করব না প্রতিজ্ঞা করে সে যাত্রা সে ছাড়া পেল।

ডাকাত চলে গেছে জানতে পেরে বাড়ির লোকেরা ফিরে এল, এল পাড়ার লোকেরাও। আশানন্দের অদ্ভুত শক্তি আর বীরত্ব দেখে সবাই মুগ্ধ। দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল সে কাহিনী। ঢেঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই সবাই তাঁর উপাধি দিল 'ঢেঁকি'। সেই থেকে আশানন্দ মুখুজ্যে হলেন আশানন্দ ঢেঁকি।

এমন যাঁর গায়ের জোর তাঁর খোরাকও তেমনি হবে এটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। আশানন্দও প্রচুর খেতে পারতেন, খেতেনও। একবার তাঁর শরীর একটু খারাপ হওয়ায় সকালে কবিরাজ এসে বিধান দিলেন, "এবেলা একটু লঘু পথ্য করুন। একটু খই বেগুনপোড়া দিয়ে খেতে পারেন; ব্যস্, আর কিচ্ছু না।"

বিকেল বেলা কবিরাজ আবার এলেন রোগী কেমন আছেন দেখতে। দরজার কাছে এক ঝুড়ি ধানের খোসা আর স্তূপীকৃত বেগুনের খোসা দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল—লঘু পথ্যটা কেমন হয়েছে। আশানন্দ বললেন, "আপনার কথামতই খেয়েছি, শুধু খই আর বেগুনপোড়া। এ বেলা কি খাব?"

"কতটা খেয়েছেন?" কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলেন।

আশানন্দের মা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "তা, ও তো একটু বেশিই খায়। এক ধামা ধান দিয়ে খই বানিয়ে দিয়েছি, আর গোটা পঁচিশেক বেগুন পুড়িয়ে দিয়েছি, তাই খেয়েছে।"

কবিরাজ হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার অসুখ সেরে গেছে, এ বেলা যা খুশি খেতে পারেন।"

তোমরা যদি কখনও শান্তিপুরে যাও তা হলে আশানন্দের ভিটে দেখতে ভুলো না। বেশ কিছুদিন আগে সেখানে তাঁর নামে একটি শ্বেতপাথরের স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে:

"দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে
সুমহান্ ব্রত যাঁর ছিল এ জীবনে,
মুখো-বংশ-অবতীর্ণ আশানন্দ বীর
ঢেঁকি নামে খ্যাত যিনি বক্ষে পৃথিবীর,
প্রবাদ হয়েছে এবে গরিমা যাঁহার
তাঁহারি এ স্মৃতিস্তম্ভে কর নমস্কার।"

শ্রুতিধর

শ্রুতিধর বলে একটা কথা আছে, তার মানে যে লোক একবার যা শোনে সে কথা কখনও ভোলে না। আমাদের দেশেও ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এই রকম একজন শ্রুতিধর লোক ছিলেন, তাঁর নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

মহাপণ্ডিত ছিলেন জগন্নাথ আর তেমনি ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। সে যুগের দেশী-বিদেশী সকলেই তাঁকে বিশেষ খাতির করে চলতেন। —খোদ ওয়ারেন হেস্টিংস্, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মহারাজ নন্দকুমার—সকলেই

বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত স্যর উইলিয়াম্ জোন্স্ তো ছিলেন জগন্নাথের পরম ভক্ত। যখন তখন তিনি ত্রিবেণীতে জগন্নাথের বাড়ি এসে হাজির হতেন। সঙ্গে স্ত্রীকে শুদ্ধু নিয়ে আসতেন।

জগন্নাথ ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ত্রিবেণীতে ছিল তাঁর বাড়ি। রোজ সকালে তিনি ত্রিবেণীর গঙ্গার ঘাটে চলে আসতেন আর সেইখানে গঙ্গাতীরে বসে বসেই আহ্নিক সেরে নিতেন।

একদিন সকালে জগন্নাথ এই রকম ঘাটে এসে বসেছেন। আহ্নিক সারা হয়ে গেছে, উঠি উঠি করছেন, এমন সময় দেখেন দু'টি সাহেব ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষায় তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তার পর হাতাহাতি। জগন্নাথ ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু ভাষা না জানলেও কেউ ঝগড়া করলে তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর আহ্নিক হয়ে গিয়েছিল, তাই ঝগড়টা তাঁর চোখের সামনেই ঘটল।

কয়েক দিন পরেই সেই সাহেব দু'টি আদালতে পরস্পরের নামে নালিশ ঠুকে দিল। জজ্ জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনার কোন সাক্ষী আছে?" তারা বলল, "আর তো কেউ সেখানে ছিল না, তবে ঘাটে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বসে বসে পূজো করছিলেন, তিনি সবই দেখেছেন, তিনি সবই জানেন।"

কে এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ? খোঁজ্ খোঁজ্। অনুসন্ধানে জানা গেল লোকটি আর কেউ ন'ন— স্বয়ং পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তখন আদালতে তাঁর ডাক পড়ল সাক্ষী দেবার জন্য।

জেরায় জগন্নাথ বললেন, "হ্যাঁ, এরা যে পরস্পর ঝগড়া, মারামারি করেছে তা আমি



তারপর হাতাহাতি

দেখেছি, তবে আমি তো আর ইংরেজি জানি না, কাজেই আসল দোষটা কার তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তা হলে এখন কি করা যায়?

জগন্নাথ বললেন, "ভাষা না জানলেও ওরা কে কি বলেছে তা আমার মনে আছে, সেটা আমি আউড়ে দিতে পারি।" বলেই তিনি সাহেব দু'টির কে কি বলেছিল তা গড় গড় করে বলে গেলেন।

আদালত শুদ্ধু লোক তো অবাক্। একটা ভাষা না জেনে সেই ভাষায় কে কি বলেছে তা আউড়ে যাওয়া, তাও কয়েক দিন পরে, কম স্মরণশক্তির কথা নয়!

জজ্ বললেন, তিনি জীবনে এমন ঘটনার কথা কল্পনা করতে পারতেন না।

গল্পটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন থাকা বিচিত্র

নয়, তবে তুই সাহেবের কথা কাটাকাটির সময় তাদের মূল বক্তব্যটা জগন্নাথ পণ্ডিত ঠিকই বলে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এই স্মরণশক্তির কথা আজ প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারও স্মরণশক্তি ভালো হলে তাই আমরা বলি, "এঃ, লোকটি দেখছি একেবারে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন!"

সাগর-প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগর মশাই শুধু বিদ্যারই সাগর ছিলেন না, দয়ার সাগর বলেও তাঁর ছিল সমান খ্যাতি। কেউ বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি তার একটা বিহিত করে দিতেনই।

একবার। বিদ্যাসাগর মশাইএর আর্থিক অবস্থা তখন বেশ একটু খারাপ যাচ্ছে, এমন সময় তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক আর একজন অচেনা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

কুশল প্রশ্নের পর আগন্তুক পরিচিত ভদ্র-লোকটি তাঁর সঙ্গীকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি নাটোরে দারোগার চাকরি করেন। একটা মিথ্যে মামলায় এঁকে জড়িয়ে এঁর ওপর ছ' মাসের জেলের হুকুম হয়েছে। অথচ ইনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আজই মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হবে। এঁর পক্ষে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজই তাঁকে সাতশ' টাকা দিতে হবে। বাড়ি থেকে গত কালই টাকাটা এসে পৌঁছবার কথা, কিন্তু এখনও আসে নি। তাই ইনি বড় বিপদে পড়েছেন।"

বিদ্যাসাগর মশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তা আমায় কি করতে হবে বলুন?"

"আপনি যদি অনুগ্রহ করে ব্যারিস্টার সাহেবকে একটা চিঠি লিখে দেন যে তিনি আজ বিনা ফীতেই মামলা শুরু করে দেন, তা হ'লে আপনার কথা তিনি নিশ্চয়ই ফেলতে পারবেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে ফী-এর টাকা নিশ্চয়ই এসে পড়বে।"

বিদ্যাসাগর মশাই আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "সে কি হয়? ভদ্রলোকের ওপর জেলের হুকুম হয়ে গেছে— জেলের দোরগোড়ায়ই দাঁড়িয়ে আছেন বলা যায়। এ অবস্থায় টাকা বাকি রেখে মামলা করতে বলাটা বড়ই অশোভন। তা ছাড়া মনোমোহন বাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা পরিচয়ও নেই। ...না না, আমাকে এ অনুরোধ করবেন না, এ আমি পারব না।"

ভদ্রলোক অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ঐ এক কথা, "না না, এ কি করা যায়? অযথা আমাকে অনুরোধ করে লজ্জা দিচ্ছেন। এ চিঠি আমি লিখতে পারি না।"

অনেকক্ষণ বলে-কয়েও যখন বিদ্যাসাগর মশাইকে রাজী করা গেল না তখন দারোগা বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমারই কপাল! শুনেছিলাম যার আর কোথাও গতি হয় না সেও এখানে এলে আশ্রয় পায়। কিন্তু আমার বেলায় তাও হ'ল না।"

দারোগা বাবুর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর এবার বিচলিত হলেন। একটা কাগজ টেনে নিয়ে তিনি ব্যারিস্টার সাহেবকে



দারোগা বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন···

চিঠি লিখতে লাগলেন। কিন্তু এক লাইন লিখেই কলম বন্ধ হ'ল। হাত যেন আর সরতে চায় না। বিদ্যাসাগর আবার কলম ফেলে দিয়ে বললেন, "নাঃ, এ চিঠি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কি লিখব? কেনই বা এমন অন্যায় অনুরোধ করব? আমাকে মাপ করুন।"

দারোগা বাবুর চোখ দিয়ে এবার টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল।—"তা হলে কি আমায় শেষ পর্যন্ত জেলেই যেতে হবে? আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন সুযোগই আমি পাব না আর?"

বিদ্যাসাগর মশাই আপন মনে কি ভাবছিলেন। হঠাৎ দারোগা বাবুকে হাতের ইশারায় থামতে বলে বাক্স থেকে একটা চেক্‌বই বার করলেন। সাতশ' টাকার একখানি চেক্ লিখে সেটা দারোগা বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, "এই নিন আপনার ফীএর টাকা। ব্যারিস্টার সাহেবকে বলবেন, তিনি যেন দয়া করে কাল দুপুরের আগে এটা না ভাঙান। ব্যাঙ্কে এখন আমার এক পয়সাও জমা নেই, তবে কাল দুপুরের আগে যে ভাবে পারি সাতশ' টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেব।"

দারোগা বাবু নমস্কার করে চেক্ নিয়ে চলে গেলেন।

আপীলের রায় বেরোল। জজ্ মন্তব্য করলেন, এ সাজানো মামলা, দারোগা বাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করা হয়েছে। তিনি বে-কসুর খালাস পেলেন।

ইতিমধ্যে আগের ঘটনার ৩/৪ দিন পরেই দেশ থেকে দারোগা বাবুর টাকা এসে গেল। তিনি তাঁর বন্ধু বিদ্যাসাগরের পরিচিত সেই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে সেই টাকাটা ফেরৎ দেবার জন্য বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়িতে হাজির হলেন।

সমস্ত শুনে বিদ্যাসাগরের মুখ গম্ভীর হ'ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "সবই বুঝলুম। কিন্তু মশাই, ভদ্রলোক হয়ে আমার সঙ্গে এমন জুয়াচুরিটা কেন করলেন বলুন তো?"

দারোগা বাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন, "জুয়াচুরি করেছি!—আমি? কি ব্যাপার বুঝলাম না তো?"

"আপনি না বলেছিলেন আপনি পুলিশের দারোগা?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম বই কি! আমি নাটোরের এক থানায় এখনও দারোগার কাজ করছি। বিশ্বাস না হয় একটু খোঁজ নিলেই—"

বিদ্যাসাগর তেমনি গম্ভীর ভাবে বললেন, "বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত। এতটা বয়স হ'ল, কত লোকই তো টাকা নিয়ে যায়—কেউ সাহায্য, কেউ ধার। যারা ধার বলে নেয়—ফেরত তো কাউকে দিতে দেখি নি! গরীবদের কথা দূরে থাক, বড়লোকরাও তো কেউ টাকা নিলে আর ফেরত দিতে চায় না। সেই দেশেরই লোক হয়ে—তাও আবার পুলিশের লোক হয়ে আপনি সাত দিনের চুক্তিতে নেওয়া টাকা চার দিন পরেই ফেরত দিতে এসেছেন—এ আমি কি করে বিশ্বাস করি বলুন?"

দারোগা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তা হলে বিদ্যাসাগর মশাই রসিকতা করছেন! বিদ্যাসাগর এবার মৃদু হেসে বললেন, "শুনেছিলাম হাইকোর্টের কোন কোন জজ্ মোকদ্দমা বুঝতে না পেরে আসামীকে বেকসুর খালাস দেন। আপনার বেলাও তাই হয়েছে নিশ্চয়। জজ্ মামলা বুঝতে পারেন নি। নইলে আপনারই তো সকলের আগে জেল হওয়া উচিত। ধার নিয়ে আপনি ধার শোধ দিতে এসেছেন, সাত দিনের নাম করে টাকা নিয়ে চার দিন পরে শোধ দিচ্ছেন, আবার এর ওপর বলছেন আপনি পুলিশে চাকরি করেন—আপনাকেই সকলের আগে জেলে পুরতে না পারলে দেশে আইনের মর্যাদা থাকবে কি করে?'—বলেই অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুললেন বিদ্যাসাগর।

দারোগাবাবু আর তাঁর বন্ধু সেদিন অমনি ছাড়া পান নি, দস্তুরমত ভুরিভোজন করিয়ে তবেই বিদ্যাসাগর মশাই তাঁদের সেদিন যেতে দিয়েছিলেন।

এ যুগের আর এক মহাপণ্ডিত

'সর্ববিদ্যাবিশারদ্' বলে আমাদের দেশে একটা কথা আছে। সর্ববিষয়ে যাঁর অসাধারণ জ্ঞান তাঁকেই ঐ আখ্যা দেওয়া হয়। তোমরা জান কিনা জানি না—এই অল্প কয়েক বছর আগেও আমাদের এই বাংলাতেই এই রকম এক মহাপণ্ডিত ছিলেন--যাঁকে অনেকে বলত ভারতের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোক। তাঁর নাম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

অসম্ভব ছিল তাঁর পড়াশোনা আর তেমনি ছিল স্মরণশক্তি। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, নানারকমের বিজ্ঞান—কোনটিতেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক খুঁজে পাওয়া ছিল ভার। তাঁর সম্বন্ধে ২/১টি গল্প শোন।

একবার ব্রজেন্দ্রনাথ বিলেতে গেছেন। লণ্ডন শহরে এসে ইস্ট্ এণ্ড্টা দেখবার তাঁর ভারি শখ হ'ল। লণ্ডন শহরটা কলকাতার মত একেলে শহর নয়—বহুদিনকার পুরোনো। এর রাস্তাঘাট, পুরোনো বাড়ি প্রভৃতির সঙ্গে নানা ইতিহাস জড়িত। বই পড়ে পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথের সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা ছিল, তাই চাক্ষুষ দেখবার জন্য এত কৌতূহল। কিন্তু ভালো করে দেখতে গেলে একজন গাইড্ বা প্রদর্শক থাকা দরকার—যে সব খবর রাখে, দেখিয়ে দেখিয়ে বলে দিতে পারে কোন্টা কি। একজন নামকরা ইংরেজ পণ্ডিত, লণ্ডন শহর সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর যাঁর জানা,—এমন একজন পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথের গাইড্ হতে রাজী হলেন।

গাড়ি করে দু'জনে চলেছেন। পাড়াটা ভালো নয়, শহরের যত গুণ্ডা, সমাজবিরোধী লোকের আড্ডা এদিক্‌টায়। গাইড্ তাই

ব্রজেন্দ্রনাথকে সাবধান করে দিয়েছেন—তিনি যেন গাড়ি থেকে না নামেন। গাড়ি চলতে থাকবে, খোলা জানালা দিয়ে তিনি দু'পাশটা দেখবেন আর গাইড্ তাঁকে জায়গাগুলোর পরিচয় করিয়ে দেবেন।

যেতে যেতে গাইড্ যখনই আঙ্ল দিয়ে কোন একটা জায়গা দেখিয়ে তার নাম করেন অমনি ব্রজেন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, "ও, এই সেই জায়গা? এর কথা তো অমুক বইতেই পড়েছি!"

বারে বারে এই রকম হতে লাগল। গাইড্ সাহেবটি তখন অবাক্ হয়ে বললেন, "আপনি তো, মশাই, আচ্ছা লোক! আমি নিজে এতদিন লণ্ডনে থেকে এত খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি, আপনি ৩/৪ হাজার মাইল দূরের দেশে বসে কেবল বই পড়েই তার চেয়ে বেশি জেনে ফেলেছেন এবং দিব্যি তা মনেও রেখেছেন!"

একটু পরেই গাড়ি ইস্ট্ এণ্ড্ ছাড়িয়ে টাওয়ার অব্ লণ্ডনে এসে পৌঁছল। এটি লণ্ডনের একটি ঐতিহাসিক ভবন। সেকালের বিলিতী রাজাদের এটি ছিল একাধারে দুর্গ, প্রাসাদ এবং বন্দীশালা। ধরতে গেলে এর প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বারান্দার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ঐতিহাসিক কাহিনী। এখানে আসার পর হ'ল আরও মজা। গাইড্ সাহেব যেই সামান্য একটু ধরিয়ে দেন—"এটা অমুক ঘর—" অমনি ব্রজেন্দ্রনাথ সে জায়গাটি সম্বন্ধে অনর্গল ঝুড়ি ঝুড়ি তথ্য বলতে শুরু করে দেন, যার সিকির সিকিও গাইডের জানা নেই। ফলে একটু পরেই দেখা গেল দর্শক ব্রজেন্দ্রনাথই হয়ে দাঁড়িয়েছেন গাইড্, আর তাঁর সঙ্গী গাইড্ পণ্ডিতটি বনে গেছেন দর্শক। অথচ ব্রজেন্দ্রনাথ



ব্রজেন্দ্রনাথই হয়ে দাঁড়ালেন গাইড্

এর আগে কখনও ও-জায়গায় আসেন নি, তাঁর যা জ্ঞান সব বই থেকে পড়া।

দেখানো শেষ হ'ল। গাইড্ হাত যোড় করে বললেন, "এবার থেকে আপনিই দয়া করে গাইডের কাজ করুন। লণ্ডন শহরে আপনার মত ভালো গাইড্ আর একটিও পাওয়া যাবে না এ আমি **হলফ** করে বলতে পারি।"

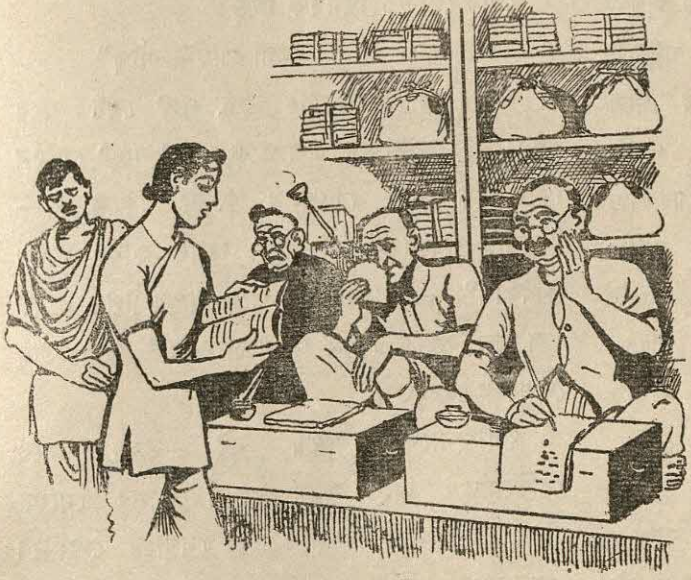
কবিগুরুর গল্প

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন। শুধু আমরা, বাঙ্গালীরাই নই, পৃথিবীর সব দেশেরই সাহিত্যরসিকরা তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়।

রবীন্দ্রনাথ কত বছর বয়সে কবিতা লেখা শুরু করেন জান? তখন তাঁর বয়স বড় জোর সাত কি আট। তাঁর ভাগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তিনিই একদিন তাঁকে ধরে কি করে কবিতা লিখতে

হয় শিখিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন কাজটা যত কঠিন ভেবেছিলেন আসলে তা নয়। তাঁর হাতে কবিতা বেশ সহজ ভাবেই বেরোতে লাগল।

একখানা নীল মলাটের খাতা যোগাড় করলেন তিনি, তারপর তাইতেই বড় বড় কাঁচা অক্ষরে ফুটে উঠতে লাগল শিশুকবির মনের যত ভাব। কিন্তু শুধু তো লিখলেই হয় না, তার সমঝদার পাঠকও চাই। কবিতা লিখেই তিনি বাড়ির যত কর্মচারী, কাছারি-বাড়ির যত আমলা সবাইকে ধরে ধরে তা শোনাতে শুরু করলেন।



সবাইকে ধরে ধরে কবিতা শোনাতে শুরু করলেন।

এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, "হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।...কাব্য গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই, কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। নিজেই তখন লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে এক একে তিন হইয়াছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা আমার সহযোগী ছিলেন।"

এর পর কবি চলে এলেন বোলপুরে। এবার জুটল একটা বড়সড় ডাইরী। তারই পাতায় একটা ছায়াচ্ছন্ন নারকেল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে চলল তাঁর অনর্গল কাব্যচর্চা।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই ঘটল একটা কাণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ তখন নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কি করে খবর পেলেন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে জানেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে ফরমাস এল—অমুক বিষয় নিয়ে একটা কবিতা লিখতে হবে এবং সেটা ক্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ে শোনাতে হবে। তাই করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সহ-পাঠীরা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না যে ওটা বালক কবির নিজের লেখা। একজন বলল যে লেখাটা ছাপার বই থেকে চুরি—বইটা সে এনে দেখাতে পারে। বই কেউ দেখতে চাইল না, এমনিতেই সবাই সে কথা বিশ্বাস করে নিল।

এই সহপাঠীরাই হয়তো পরবর্তী জীবনে একদিন কবির সতীর্থ ছিলেন বলে গর্ব অনুভব করেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনটা ছিল

ভারি কল্পনাপ্রবণ। খুব ছোটবেলার কথা বলি। তাঁদের বাড়িতে একটা পুরোনো সেকেলে আমলের ভাঙ্গা পাল্কি ছিল। তার রঙ গিয়েছিল চটে, গদির ছোবড়া গিয়েছিল বেরিয়ে। নানা অ-দরকারী জিনিসের সঙ্গে সেটাও বাড়ির এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথ নির্জন দুপুরে গিয়ে তার মধ্যে বসে থাকতেন আর খুলে দিতেন কল্পনার ঘোড়ার রাশ। কখনও তাঁর মনে হ'ত ওটা যেন গভীর সমুদ্রের মাঝখানে একটা অজানা দ্বীপ আর তিনি হচ্ছেন রবিন্‌সন্ ক্রুসো। কখনও মনে হ'ত ওটা বুঝি ময়ূরপঙ্খী নৌকো—ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় ফেলে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। আবার কখনও ভাবতেন ওটা সত্যিই একটা পাল্কি, তিনি ওতে চড়ে বনের পথ দিয়ে চলেছেন, বেহারারা হাঁই হুঁই করে সেই পাল্কি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পথে একদল ডাকাত হা-রে-রে-রে করে তেড়ে এল। তিনি পাল্কি থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। বহু ডাকাত মারা পড়ল, বাকিরা যে যার প্রাণ নিয়ে পালাল। আবার পাল্কি চলল জঙ্গলের পথে—হেঁইও হেঁই হেঁইও হেঁই—হুকুমদারি হুকুমদারি।

বাড়ির পেছন দিকে একটা জানালার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসে থাকতেন। ঐ জানালার নীচেই ছিল একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর আর তার পূবদিকে ছিল একটা ঝুরি-নামা বটগাছ। পুকুরে নানাধরনের লোক নাইতে আসত, শিশুকবি বসে বসে তাই দেখতেন। প্রত্যহ এই রকম দেখতে দেখতে তাদের চলাফেরা কবির মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলা লোকজন চলে গেলে কবির সারা মন অধিকার করে বসত ঐ প্রাচীন বট। তার ঝুরি-গুলি নীচে নেমে এসে একটা অন্ধকার জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। দেখে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হ'ত দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নলোকের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়িয়ে আজও দিনের আলোর মাঝখানে রয়ে গেছে।

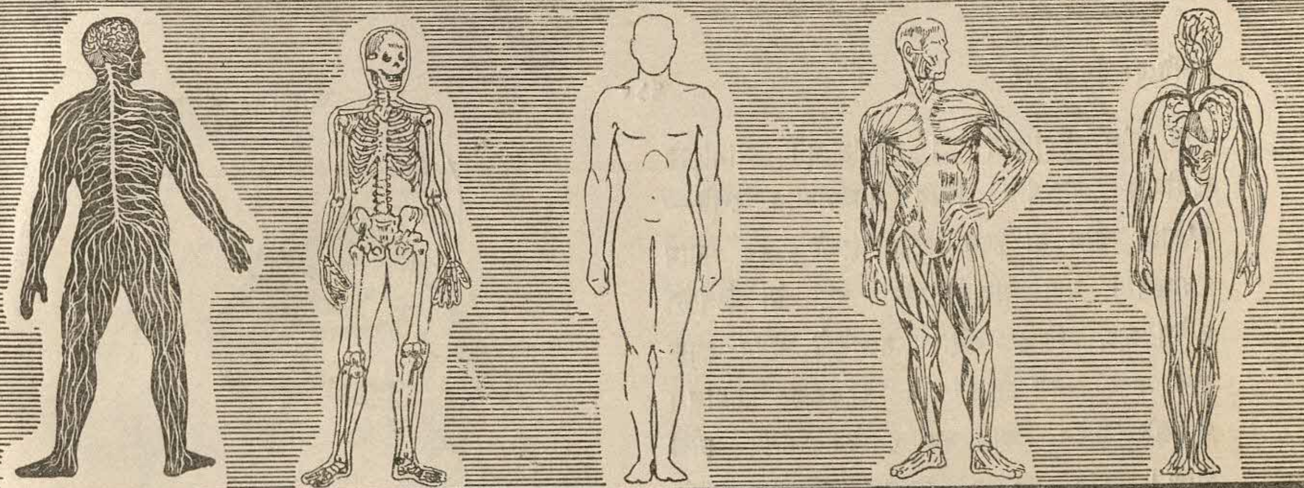
এই রহস্যময় বটগাছটার কথা কবি কোন দিন ভুলতে পারেন নি। এই বটগাছটা নিয়ে বড় হয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন:

"নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় নিয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট?"

অক্ষর পরিচয়ের পর 'কর, খল' শেষ করে যখন তিনি পড়লেন 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' সেদিন তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি লিখেছেন—"আমার জীবনে এইটেই ছিল আদি কবির প্রথম কবিতা।" এই রকম "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান" সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—এটি ছিল তাঁর শৈশবের মেঘদূত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই তখন সবে বেরিয়েছে। এই সময় রমেশ দত্তের মেয়ের বিয়ে, রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গেছেন। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্রও গিয়ে হাজির। রমেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি একগাছা ফুলের মালা নিয়ে বঙ্কিমের গলায় পরিয়ে দিতেই বঙ্কিম মালাটি খুলে নিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এ মালা এর প্রাপ্য। রমেশ, তুমি এর লেখা সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়েছ?"

প্রতিভা কখনও প্রতিভাবান্‌দের চোখ এড়ায় না।

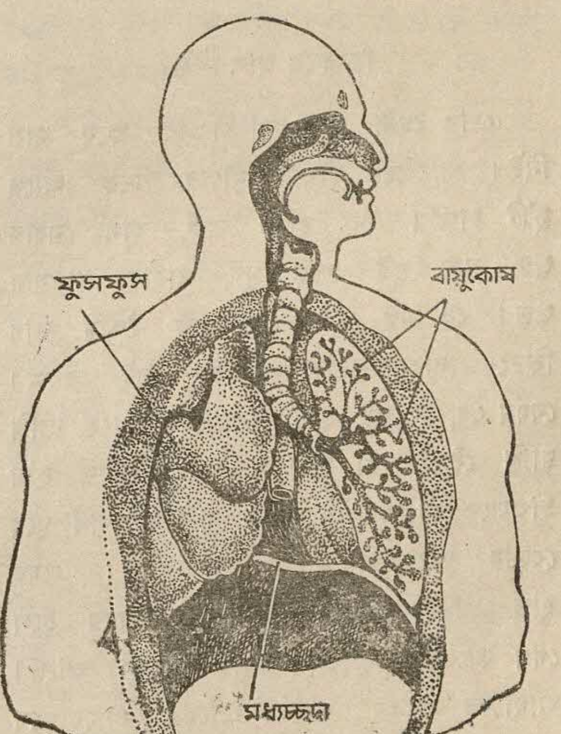


আমাদের শরীরের কথা

ফুসফুসের গল্প শোন

আমাদের খাদ্যের অনেক কাজের মধ্যে একটা বড় কাজ হ'ল শরীরের জন্য শক্তি সরবরাহ করা। কারণ কাজ করতে গেলেই কিছু-না-কিছু শক্তি খরচ হয়ে যায়, আর এই শক্তি আসে আমাদের খাবারের থেকে। এঞ্জিনে যেমন কয়লা পুড়িয়ে তাপের সৃষ্টি করতে হয়, তবেই জল গ্যাস (স্টিম্) হতে পারে, তেমনি আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষের কাজের জন্য আমাদের খাবার "পোড়ানো" দরকার—যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'জারণ' বা 'অক্সিডেশন্'। অহরহ আমাদের দেহের কোষে কোষে চলছে এই জারণের খেলা। এই জারণের জন্য দরকার হয় প্রচুর অক্সিজেন, আর রক্তের ভিতর দিয়ে এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তোমাদের আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৩) আমাদের ফুস্‌ফুসে রক্ত গেলে সেখানেই আদান-প্রদান হয়ে যায় অক্সিজেনের।

তোমরা জান যে আমাদের বুকের মাঝখানে আছে হৃৎপিণ্ড আর তার দু'দিকে দু'টো ফুস্‌ফুস্। এই হৃৎপিণ্ড আর ফুস্‌ফুসেরা বসে আছে একটা বিরাট মাংসপেশীর ওপরে—যার



ফুস্‌ফুসেরা বসে আছে এক বিরাট মাংসপেশীর ওপরে—যার নাম মধ্যচ্ছদা।

নাম হ'ল মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম্। আমাদের শরীরকে মাঝখান দিয়ে বুক আর পেট—দু'ভাগে ভাগ বা ছেদ করে বলেই এর নাম মধ্যচ্ছদা। মধ্যচ্ছদার চেহারা অনেকটা উল্‌টো ঘটের মত, কিন্তু এই মাংসপেশীটি যখন কাজ শুরু করে তখন হয়ে যায় একেবারে সমান। কাজেই তখন আমাদের পেটের ওপর চাপ পড়ে। আর যতবার আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিই ততবারই এই ঘটনা ঘটে।

ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে ফুস্‌ফুসের যে-দিক্‌টা মধ্যচ্ছদার ওপরে আছে সে-দিক্‌টাই বেশ বড়, তার পর যত ওপরের দিকে ওঠা যায় দেখা যাবে ততই তা সরু হয়ে গেছে। তাই তার নাম হচ্ছে চূড়া বা অগ্রভাগ।

কি করে শ্বাস নিই

এবার দেখা যাক আমরা কি করে শ্বাস নিই। আমাদের মাথার নীচের দিকে আছে দু'টি রাস্তা। এক হচ্ছে নাক,—শ্বাস নেবার জন্য, আর দুই হচ্ছে মুখ,—খাবার খাওয়ার জন্য। যে অঙ্গ যে কাজের জন্য তৈরি তার ভিতরে ব্যবস্থাও আছে ঠিক সেই রকম। যেমন ধর, নাকের কথা। প্রথমেই আছে রাশি রাশি রোঁয়া বা লোম; এদের কাজ হ'ল হাওয়াতে যে সব বীজাণু বা দূষিত পদার্থ ঘুরে বেড়ায় তাদের ধরে আটকে রাখা। এদের হাত এড়িয়ে যারা আর একটু ভিতরে চলে গেল তাদেরও ঘায়েল করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নাকের ভিতরের হাড়ের ওপরে যে শ্লেষ্মাঝিল্লী আছে তাতে তৈরি শ্লেষ্মা বা কফই তাদের আটকে দেয়, তারপর বাইরে বার করে

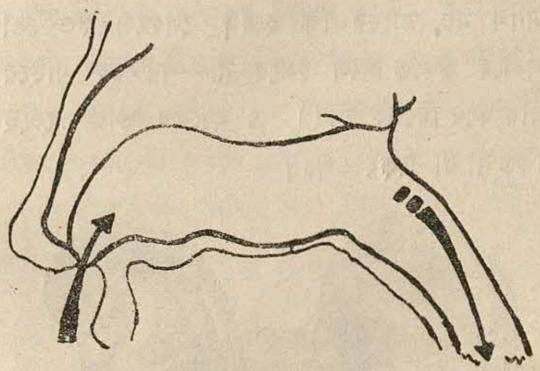


আমাদের মাথার নীচের দিকে আছে দু'টি রাস্তা—এক হচ্ছে নাক, আর এক হচ্ছে মুখ।

দেয় হাঁচির সঙ্গে। এ ছাড়াও হাওয়ার ফুস্‌ফুসে যাওয়ার সমস্ত রাস্তায়ই আছে খুব সরু সরু রোঁয়া। তারা যে শুধু বীজাণু প্রভৃতি জিনিসগুলিকে ধরেই রাখতে পারে তা নয়, উল্‌টো দিকে ঠেলে ঠেলে তাদেরকে বাইরে বার করেও দিতে পারে। হাঁচি, কাসি, নাক পরিষ্কার করার সময়ে এদের সব বাইরে বার করে দেওয়া হয়।

নাকের ভিতর কারিকুরি

আমাদের নাকের ভিতরটা ভালো করে দেখলে দেখবে যে সেটা শুধু একটা সাধারণ নলের মত গর্ত নয়, এর গায়ে গায়ে উঁচু উঁচু হাড় দিয়ে ভাগ করা আছে আর তার ওপরে বিছানো আছে শ্লেষ্মাঝিল্লী। শ্লেষ্মাঝিল্লীর ভিতর ভিতর খুব ছোট ছোট জালক বা কৈশিক রক্ত-নালী আছে, তাতে আমাদের শরীরের গরম রক্ত সব সময়েই চলাফেরা করছে। কাজেই এর ওপর দিয়ে যখন হাওয়া যায় তখন শীতকালে সে হাওয়া বেশ গরম হয়ে যায় আর শ্লেষ্মা থেকে হাওয়ার ভিতরে



ঢুকে যায় খানিকটা জলকণা। এজন্যই যারা মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় তাদের কাসি হয়—কারণ ঠাণ্ডা, জলহীন, ধুলো-বালিওয়ালা হাওয়া গলায় লাগলেই একটা বিশ্রী রকম শুকনো কাসি আসে।

শ্বাসনালী আর বায়ুকোষ

নাকের ভিতর দিয়ে এবং মুখের পেছন দিয়ে হাওয়া চলে আসে আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে। তার পর তার ভিতর দিয়ে শ্বাসনালী হয়ে ঢুকে যায় ফুস্‌ফুসে। এই শ্বাসনালীটা গলায় হাত দিলেই টের পাবে,—মনে হবে যেন একটা আংটির ওপরে আর একটা আংটি বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আসলে আমাদের শ্বাসনালী এমন ভাবে তৈরি যাতে সব সময়েই এটা খোলা থাকে, কখনই অন্ত্রের মত চুপ্‌সে না যায়।

শ্বাসনালী খানিক দূর যাওয়ার পরেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে একটা গিয়ে ঢোকে ডানদিকের ফুস্‌ফুসে, আর একট বাঁ-দিকের ফুস্‌ফুসে। এদের নাম হ'ল ক্লোমশাখা, ইংরেজিতে বলে 'ব্রংকাস্'। এরা ফুস্‌ফুসের ভিতরে ঢুকে ঠিক গাছের মত শাখা-প্রশাখায় ভাগ ভাগ হয়ে যায়। শেষ অবধি এরা গিয়ে শেষ হয় বায়ুকোষে।

এ বায়ুকোষগুলি কিন্তু সাধারণ কোষের মত নয়,—আসলে এরা হচ্ছে এক-একটা হাওয়ার বেলুনের মত, তাদের চারদিক্ ঘিরে আছে ছোট ছোট কোষ আর তার ভিতরে ভিতরে আছে খুব ছোট ছোট কৈশিক রক্ত-নালী। এই কৈশিক রক্তনালীর রক্তই আমাদের প্রশ্বাসের হাওয়ার সংস্পর্শে এসে নিয়ে নেয় অক্সিজেন, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস।

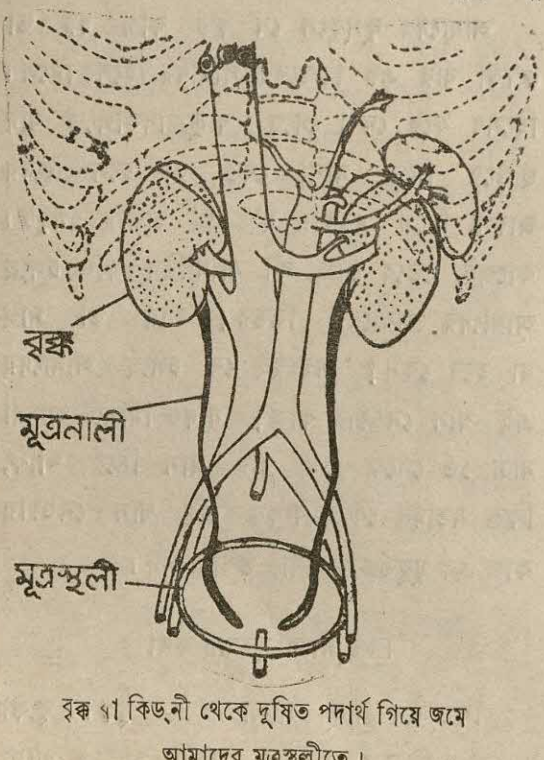
আমাদের ফুস্‌ফুসে যে কত কাজ হয় তা বোঝা যায় এর ভিতরের পরিধির হিসেব নিলে। হিসেব করে দেখা গেছে বায়ুকোষগুলিকে যদি ছড়িয়ে নিয়ে মাপা যেত তা হলে এদের জায়গা দিতে দরকার হ'ত দু' হাজার বর্গফুট। কাজেই, ভেবে দেখ, কী সাংঘাতিক কাজ চলছে আমাদের শরীরের ভিতর! আর তা নাই বা হবে কেন? অহরহই যে চলছে আমাদের এই শ্বাস নেওয়ার কাজ! যদিও মিনিটে আমরা মাত্র ১৬ থেকে ১৮ বার শ্বাস নিয়ে থাকি, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব এই শ্বাস নেওয়ার কাজ এক মুহূর্তও থামাবার উপায় নেই।

কিড্‌নী বা বৃক্কের কথা

কিড্‌নীর সাধু বাংলা হচ্ছে বৃক্ক। বৃক্কের চাইতে কিড্‌নী শব্দটিই বোধ হয় আমাদের

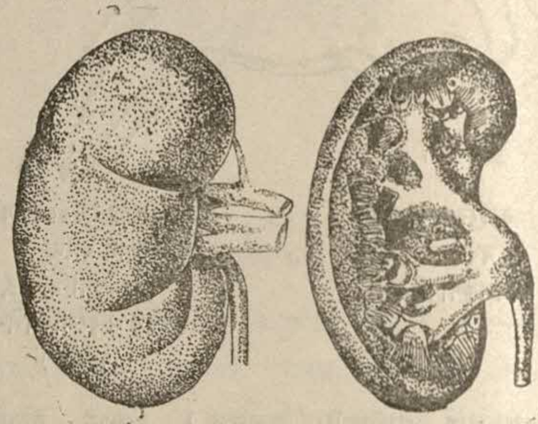
বেশি পরিচিত, তাই বৃক্ক না বলে কিড্‌নী বললেই হয়তো সহজে বুঝতে পারবে। এই কিড্‌নীর কাজ কি?

আগেই বলেছি যে আমাদের প্রত্যেকটা কোষই জীবন্ত, আর তাদের বাঁচবার, খাওয়ার, বাড়বার এবং নিজের কাজ করবার জন্য চাই খাদ্য ও অক্সিজেন। খাবার আত্মস্থ করতে গিয়ে প্রত্যেক কোষই যে কেবল মাত্র অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় তা নয়, ঐ কাজটা হয় বেশ একটু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। তার ফলে আমাদের রক্তে অনেকগুলি অপকারী জিনিসও জমে যায়। তার মধ্যে যেগুলি গ্যাসীয় তাদের যে শোধন করে নেওয়া হয় ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়ে তা তো আগেই পড়েছ। কিন্তু অন্য পদার্থগুলি, অর্থাৎ যা



বৃক্ক বা কিড্‌নী থেকে দূষিত পদার্থ গিয়ে জমে আমাদের মূত্রস্থলীতে।

গ্যাস নয়, তাদের কি হবে? সেগুলোকেও তো শরীরে জমতে দিলে চলবে না—শরীরের বাইরে বার করে দিতেই হবে। এ কাজের ভার রয়েছে কিড্‌নী বা বৃক্কের ওপর।



কিড্‌নীর বাইরেকার ও ভিতরকার চেহারা

কিড্‌নী সংখ্যায় দু'টি। এরা আমাদের পেটের একেবারে পেছনে রয়েছে—দু'দিকে দু'টো। এদের থেকেই রক্তের দূষিত পদার্থগুলি বেরিয়ে গিয়ে জমে আমাদের মূত্রস্থলীতে। মূত্রস্থলী যখন ভরে যায় তখনই আমাদের প্রস্রাবের বেগ আসে, আর আমরা এই দূষিত জিনিসগুলিকে বাইরে বার করে দিই। কিড্‌নী দিনে প্রায় ২০০ লিটার রক্ত শোধন করে, কিন্তু এর প্রায় সমস্ত জলটাই আবার টেনে নেয়—কাজেই সারাদিনে মাত্র ১½ লিটার মত প্রস্রাব আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে।

কীড্‌নীকে কাটতে থাকলে দেখা যাবে এর মৌলিক অংশটি একটি ফানেল বা ফাঁদলের মত। তার ভিতরে একগুচ্ছ কৈশিক রক্তনালী। এ রকম প্রায় ১০ লক্ষ অংশ নিয়ে একটি কিড্‌নী তৈরি। শুধু যে আমাদের শরীরের দূষিত পদার্থগুলিকে বার করে দেওয়া

কিড্‌নীর কাজ তাই নয়, এ ছাড়া আমাদের শরীরের জলীয় অংশের গুণাগুণ বিচার করা, আমাদের রক্তের দোষগুণ ঠিক করে সাম্য স্থাপন করা প্রভৃতি আরও অনেক কাজ একে করতে হয়। কিড্‌নী ঠিকমত কাজ না করলে লোকে বাঁচতে পারে না, তার শরীরে ময়লা জিনিস জমে গিয়ে সমস্ত শরীর দূষিত করে ফেলে।

দেহের আবরণ ঃ চামড়া

আমাদের দেহের যে সব অংশের কথা তোমাদের বলেছি তাদের বাইরের থেকে বাঁচবার জন্য একটা ঢাকনা থাকা দরকার। সেই ঢাকনা হচ্ছে আমাদের শরীরের চামড়া, ভালো বাংলায় ত্বক্‌। তোমরা হয়তো ভাবছ যে এই চামড়া সাধারণ যে-কোন ঢাকনার মত—যেমন কাগজ, কাপড় ইত্যাদি। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। আমাদের চামড়া একটি জীবন্ত জিনিস; দেহের অন্যান্য কোষের মত চামড়ার কোষেদের কাজও অনেক।

প্রথমে দেখ, আমাদের চামড়া বেশ স্থিতিস্থাপক —যাকে ইংরেজিতে বলে ইলাস্টিক্‌, অর্থাৎ টানলে বেড়ে যায়, আবার ছেড়ে দিলে কমে যায়। যেখানে যেমনটি ভাঁজ দরকার তেমনি ভাঁজ পড়ে—দিব্যি রোগা লোকটিরও যখন একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ি দেখা দেয় তখন চামড়াও সেইভাবে তাল রেখে বেড়ে যায়, —ফেটে চৌচির হয়ে যায় না। অবশ্য এ না হলে আমরা আমাদের হাত-পা নাড়তেই পারতাম না, প্রত্যেকটি জোড়ে অর্থাৎ সন্ধিতেই চামড়া ফেটে যেত।

তা ছাড়া আমাদের চামড়া দেখতেও কি চমৎকার বল তো? ঠিকমত যত্ন করে রাখতে পারলে কী সুন্দরই না জৌলুষ হয় তার! অনেকের মতে তো মানুষের সৌন্দর্য চামড়ার ওপরই নির্ভর করে।

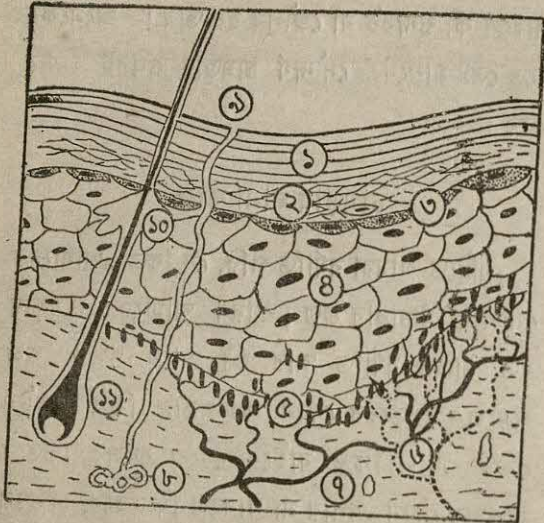
চামড়ার নানা কাজ

বৃষ্টিতে আমরা বর্ষাতি পরি, সে কিন্তু আমাদের পোশাক বাঁচাবার জন্য; কারণ আমাদের চামড়ার মত ভালো বর্ষাতি আর কী আছে বল? জল পড়লেও ভেতরের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিন্তু একটুও ভেজে না। কিন্তু বাইরে থেকে জলের ভিতরে যাওয়ার কোন উপায় না থাকলে কি হবে, ভিতর থেকে ময়লা জিনিস বার করে দিতে কিন্তু আমাদের চামড়া খুবই ওস্তাদ। আমাদের ঘামের ভিতর দিয়ে কত না ময়লা জিনিস বেরিয়ে যায়! এ বিষয়ে চামড়াকে কিড্‌নী আর ফুস্‌ফুসের দলে ফেলা যায়।

এই কি সব? তোমরা তো জান, আমাদের মস্তিষ্ক করোটির মাঝখানে বসে আমাদের শরীরের ভিতরের ও বাইরের কাজকর্ম চালায়; কিন্তু করোটির ভিতরে খবর পৌঁছে দেয় কে?—কেন, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌। কাজেই ত্বকের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে মস্তিষ্কের সব গোয়েন্দারা।

চামড়ার নানা ভাগ, নানা স্তর

এবারে, এস, চামড়া ভায়াকে বেশ ভালো করে পরীক্ষা করা যাক। প্রথমেই একে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা যায়—একটা ভিতরের ভাগ, আর একটা বাইরের। ভিতরের ভাগের নাম অন্তস্ত্বক্‌ (ডার্মিস্‌) আর বাইরের ভাগের নাম বহিস্ত্বক্‌ (এপিডার্মিস্‌)।



চামড়ার ভিতরের চেহারা :
(১) সবার বাইরের ভাগ, প্রতি মুহূর্তে খসে খসে যাচ্ছে ; (২) এই অংশটা দেখতে ঠিক কাচের মত ; (৩) চ্যাপ্টা কোষের স্তর ; এখান থেকেই এদের মরণ শুরু হয় ; (৪) ও (৫) এই কোষগুলি হচ্ছে জীবন্ত, এরাই বেড়ে বেড়ে বাইরের অংশগুলি তৈরি করছে ; (৬) অন্তস্ত্বক্‌, এর মধ্যে আছে—(৭) নার্ভ ও রক্তনালী ; (৮) স্বেদ-গ্রন্থি ; (৯) কি ভাবে ঘাম বাইরে আসে ; (১০) তৈল-গ্রন্থি, এরা লোমকে তেল সরবরাহ করে ; (১১) লোমকূপ, যার থেকে লোম বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে।

বহিস্ত্বক্‌কে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। সবার বাইরের ভাগ হচ্ছে মরা কোষ দিয়ে তৈরি,—প্রতি মুহূর্তে খসে খসে যাচ্ছে। এর পরের অংশ দেখতে একেবারে কাচের মত, এরা ক্রমাগত ভাগ হয়ে হয়ে বাইরের দিকে আসছে আর এদের চেহারা হয়ে যাচ্ছে চ্যাপ্টা। সঙ্গে সঙ্গে এদের গায়ের রস সব শুকিয়ে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে শক্ত। এর ভিতরের কোষগুলির কাজ হচ্ছে বেড়ে গিয়ে বাইরের অংশ তৈরি করা। এর ভিতর আছে আরো ছু'টি স্তর। এর মধ্যে সব চেয়ে ভিতরের স্তরটির নাম হ'ল ম্যালপিগির স্তর—ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ম্যালপিগির নামে। অন্তস্ত্বকের সঙ্গে এই স্তরটিই বেশ শক্ত ভাবে লাগানো থাকে কতকগুলি কাঁটার মত জিনিস দিয়ে।

কালো আর ফরসা

এই কোষগুলির ভিতর ভিতর থাকে আমাদের গায়ের রঙ—রঙের দানা। ফরসাদের থাকে কম, কালোদের থাকে বেশি। অবশ্য এ রঙ যে খামোখা আমাদের শরীরে থাকে তা নয়। এই রঙের স্তরটি শরীরকে সূর্যের আলো থেকে অনেকটা বাঁচায়। এ যেন আমাদের শরীরের ভিতরে একটা ছাতা আর কি! বেশি গরম লাগলে আমাদের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে। এই জন্যই দেখবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের গায়ের রঙ কালো, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের লোকদের রঙ ফরসা। এও আমাদের আসল ত্বক্‌ বা অন্তস্ত্বক্‌কে বাঁচাবার একটা ফন্দী। ম্যালপিগি স্তর আর বাইরের স্তরের মাঝখানে খানিকটা জল জমে গিয়ে ভিতরের অন্তস্ত্বক্‌কে গরম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। কাজেই ফোস্কারও কাজ আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বহিস্ত্বক্‌ হচ্ছে অনেকটা দরোয়ানের মত—সর্বদা পাহারা দিচ্ছে, শরীরে ময়লা বীজাণু ঢুকতে দিচ্ছে না, গরমকেও আটকাচ্ছে।

চামড়ার ভিতরের দিক্‌—অন্তস্ত্বক্‌

অন্তস্ত্বক্‌ বা সত্যিকারের ত্বক্‌ কিন্তু ছু'টি মাত্র স্তরে তৈরি, অথচ তার ভিতরে কত না দরকারী যন্ত্রপাতি আছে! ভালো করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় এই স্তরটি একভাবে ঢাকা নয়—উঁচু-নীচু, আর তার ভিতরে ভিতরে রয়েছে ঘাম

তৈরির গ্রন্থি, লোমকূপ ও লোম, আর তার গায়ে গায়ে তাদের জন্য মাংসপেশী আর তৈল-গ্রন্থি—যা থেকে তেল বেরিয়ে আমাদের চামড়াকে মসৃণ রাখে। এর ভিতরে ভিতরে আছে ছোট ছোট রক্তনালী—যারা জল, খাবার, অক্সিজেন এবং যে সব জিনিস বাইরে বার করে দিতে হবে—যেমন নুন, ইউরিয়া এবং ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড ইত্যাদি সব বয়ে নিয়ে আসে।

এ ছাড়া আছে ছোট ছোট নার্ভকেন্দ্র,—যারা ঠাণ্ডা, গরম, মসৃণ, এবড়োখেবড়ো, পাতলা, মোটা, ভারী, হাল্কা—এ সব বুঝতে পারে এবং মস্তিষ্ককে সে সব খবর পাঠিয়ে দেয়। এ জন্যই চামড়া আমাদের কাছে কেবল একটা বাইরেকার আবরণই নয়, এ হচ্ছে একটি ইন্দ্রিয়—স্পর্শ বলতে আমরা যা বুঝি তার সমস্ত কাজটাই করে এই চামড়া। শুধু কি তাই? আমাদের দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এই ত্বক্ বা চামড়া—প্রায় ১৮ বর্গ ফুট জায়গা যুড়ে রয়েছে সে।

চামড়া আর কি করে

ত্বকের আর একটা কাজ হ'ল বাইরের তাপের সঙ্গে শরীরের তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। শরীর যেই না গরম হয়ে উঠল অমনি খবর চলে গেল ভিতরে। সেখান থেকে ছোট ছোট রক্তনালীতে হুকুম এল,—তোমরা সব খুলে যাও। ব্যস্, সারা শরীরের চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ল রক্ত, আর চামড়া সেই রক্তের গরমকে বাইরে ছড়িয়ে দিল, শরীর আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই জন্যেই গরমের দিনে ফরসা লোকেরা হয়ে যায় লাল আর আমাদের মত কালো লোকেরা—বেগুনী।

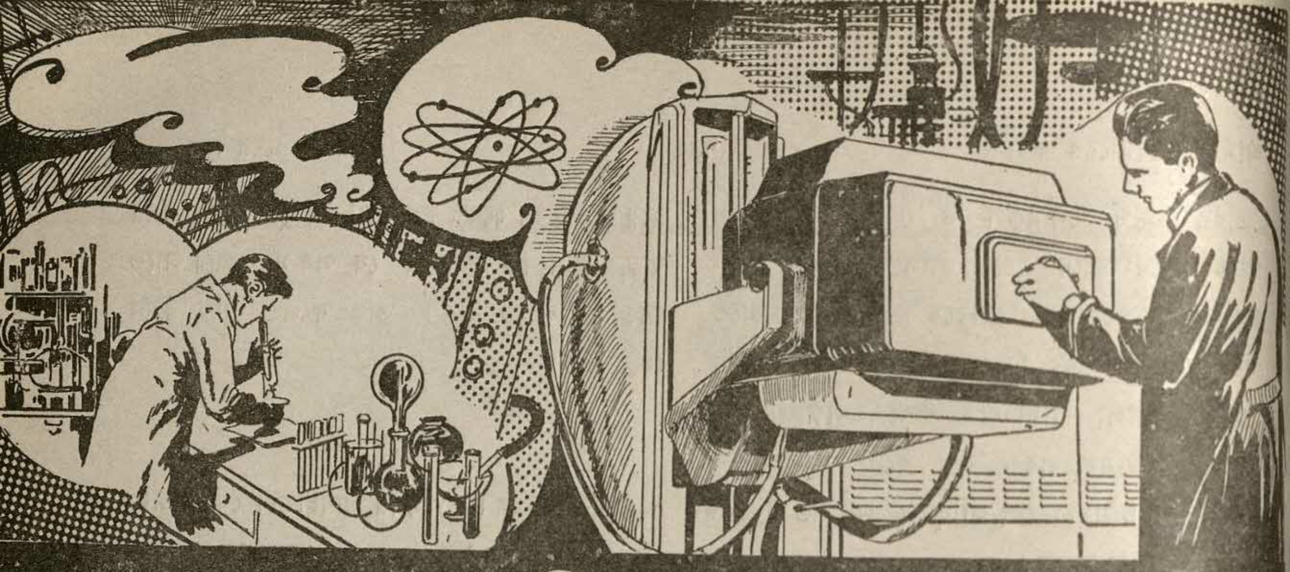
আবার উল্টোটাও হয়। যখন শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন ত্বকের রক্তনালী সব কুঁচকে বন্ধ হয়ে যায়, এমন কি লোমের যে সব মাংসপেশী আছে সেগুলিও কুঁচকে যায়। তার ফলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঘাম কেন হয়

শরীর যখন চারপাশের আবহাওয়া থেকে গরম হয়ে ওঠে তখন ওপরে যে ভাবে বললাম সেইভাবে তাপ আমরা শরীর থেকে বাইরে বার করে দি; কিন্তু যদি চারপাশের আবহাওয়া হয় গরম, তা হলেই আমাদের শরীরকে ঠাণ্ডা হতে হয় ঘাম বার করে দিয়ে। কিছু তাপ লেগে যায় ঘামকে বাষ্পে তৈরি করতে। আমাদের শরীরের ত্বকে দিনে প্রায় এক কিলোগ্রাম করে ঘাম তৈরি হয়, আর তার ভিতর দিয়ে আমাদের দেহের অনেক ময়লা জিনিস বেরিয়ে যায়। গরম কালে আমাদের স্বেদ-গ্রন্থি অনেক বেশি ঘাম তৈরি করে, কারণ নানান্ রকম দূষিত জিনিস বার করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কাজেই আমাদের লোমকূপগুলিকে পরিষ্কার রাখা দরকার। সেজন্যই ডাক্তারেরা পরামর্শ দেন যে রোজ আমাদের স্নান করতে হবে এবং চামড়ার ওপরকার ময়লা ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে হবে।

ত্বকের ঠিক নীচেই আছে একতাল চর্বি, সাধারণত ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বেশি। এই চর্বি শরীরের ভিতরে তাপ রক্ষা করে।

চামড়ার কোন ক্ষতি হলে তা তাড়াতাড়ি আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য অল্প কাটা 'সেরে' গেলে বুঝতেও পারা যায় না। অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়ে গেলে,—যেমন পুড়ে গেলে, ডাক্তারেরা অন্য জায়গার চামড়া এনে যুড়ে দিয়ে তাদের নতুন করে তুলতে পারেন।



সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : গ্যালিলিও

সাধারণ বিজ্ঞানের দু'টি মূল শাখা—পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য বিষয়ে আমার ১ম দু'টি খণ্ডে মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবারে কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর প্রধান প্রধান আবিষ্কার সম্বন্ধেও কিছু বলব। প্রথমে শুরু করা যাক গ্যালিলিওকে নিয়ে।

এখন থেকে প্রায় চারশ' বছর আগেকার কথা। ইটালী দেশের এক নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন গ্যালিলিও। সেকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে লোকের যে ধারণা ছিল তা ছিল ভুলে ভরা। বিজ্ঞানের সত্য পরীক্ষামূলক, অর্থাৎ হাতে-কলমে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানের যে-কোন বিষয় যাচাই করে নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এ সবের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেকালের বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরা যে মত প্রচার করতেন সাধারণ লোকেরা তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিত, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন প্রশ্ন তাদের মনে জাগত না।

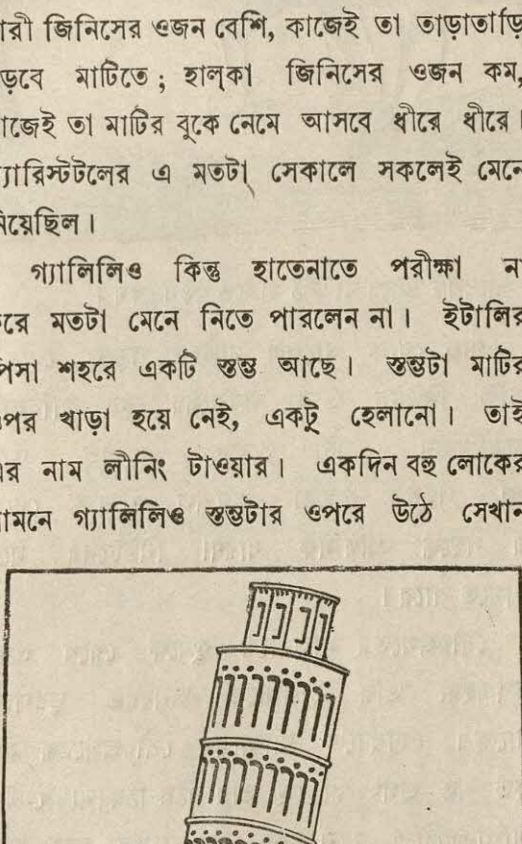
আমরা রোজ। সকালে দেখি, সূর্য পূর্বদিকে উঠছে, তারপর সমস্ত আকাশটা পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যেবেলা পশ্চিম আকাশে অস্ত যাচ্ছে। শুধু সূর্য কেন,—চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্র—সকলেই উদিত হয় পূবের আকাশে, অস্ত যায় পশ্চিম আকাশে। এ দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র—সকলেই আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আমাদের চারদিকে ঘুরছে। সেকালের দার্শনিকেরা এমনি ধরনের কথাই বলতেন, অথচ আজ আমরা জানি কথাটা কতই না ভুল।

আজ আমরা সবাই জানি আমাদের সৌর-জগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য, আর পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহেরা উপগ্রহ সমেত সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে অনবরত। এ সত্য সর্বপ্রথম প্রচার করেন গ্যালিলিও,—নিজ হাতে দূরবীন তৈরি করে, নিজের চোখে দেখে। শনির আংটির খবরও তিনিই প্রথম দেন। আর এ-হেন অধার্মিক (?) কথা বলবার জন্যে গ্যালিলিওকে কী অমানুষিক নির্যাতনই না সহ্য করতে হয়েছে।

নজরবন্দী অবস্থায় শেষ পর্যন্ত জীবন ত্যাগ করতে হয়েছে তাঁকে।

আমরা হামেশাই দেখছি যে ওপর থেকে কোন ভারী জিনিস ফেলে দিলে তা তাড়াতাড়ি মাটির বুকে নেমে আসে, আর কোন হাল্‌কা জিনিস নেমে আসে আস্তে আস্তে। এর কারণ সম্বন্ধে সেকালের নামকরা দার্শনিক অ্যারিস্টটল বললেন, ভারী জিনিসের ওজন বেশি, কাজেই তা তাড়াতাড়ি পড়বে মাটিতে; হাল্‌কা জিনিসের ওজন কম, কাজেই তা মাটির বুকে নেমে আসবে ধীরে ধীরে। অ্যারিস্টটলের এ মতটা সেকালে সকলেই মেনে নিয়েছিল।

গ্যালিলিও কিন্তু হাতেনাতে পরীক্ষা না করে মতটা মেনে নিতে পারলেন না। ইটালির পিসা শহরে একটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভটা মাটির ওপর খাড়া হয়ে নেই, একটু হেলানো। তাই এর নাম লীনিং টাওয়ার। একদিন বহু লোকের সামনে গ্যালিলিও স্তম্ভটার ওপরে উঠে সেখান



পিসার হেলানো স্তম্ভ—যার ওপরে উঠে গ্যালিলিও তাঁর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

থেকে এক পাউণ্ড আর দশ পাউণ্ড ওজনের দু'টো লোহার বল নিয়ে একই সময়ে নীচে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল, বল দু'টো ঠিক একই সময়ে মাটিতে এসে পড়েছে। গ্যালিলিও বললেন, সাধারণত হাল্‌কা জিনিস ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে যে একটু বেশি সময় নেয় তার কারণ হ'ল জিনিসটার ওপর বায়ুর বাধা। বায়ুর বাধা যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তবে যে-কোন ওজনের জিনিস কোন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে মাটিতে নেমে আসতে একই সময় নেবে।

এমনিধারা পেণ্ডুলাম বা দোলক নিয়েও পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। একটা দোলককে দুলিয়ে দিলে তার বাঁ দিক্ থেকে ডাইনে আসতে যতটা সময় লাগে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে আসতেও সেই একই সময় লাগবে। তাঁর এই সূত্র বিজ্ঞানের নানা কাজে লাগানো হয়েছে। তোমাদের দেয়ালে যে দেয়াল-ঘড়ি (পেণ্ডুলাম ঘড়ি) দেখ, তাও এই নিয়মেই তৈরি।

এমনি ধরনের আরও বহু বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে গেছেন গ্যালিলিও। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, গ্যালিলিও এবং আর একজন মহাবিজ্ঞানী নিউটনের বহু আবিষ্কারই পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করেছে, অন্ধবিশ্বাসের বাঁধন ছিঁড়ে বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : নিউটন

যে বছর গ্যালিলিও মারা যান সে বছরই জন্মগ্রহণ করে নিউটন। নিউটনের নানা আবিষ্কার সম্বন্ধে এ বইএর অন্যত্রও বলা হয়েছে।

আমরা এখানে তাঁর মহাকর্ষের সূত্র এবং গতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলছি।

কোন জিনিসের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু আছে বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন তার ভর বা মাস্। সোজা কথায় বস্তুর পরিমাণকেই আমরা ভর বলি।

কোন জিনিসের ওপর বল প্রয়োগ করলে তা গতিসম্পন্ন হতে পারে। ছাদের ওপর থেকে একখানা ইট ছেড়ে দিলে মাটিতেই পড়ে। আমরা বলতে পারি, ইটখানা গতিসম্পন্ন হয়েছে। গাছ থেকে যখন ফল পড়ে তখন তা মাটিতেই পড়ে, আকাশে উঠে যায় না। এ থেকে মনে আসা স্বাভাবিক, পৃথিবীও তা হলে প্রতিটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করছে। সোজা কথায় বলা যায়, পৃথিবী প্রতিটি জিনিসকে টানছে তার নিজের দিকে। এই যে টান, একে বলা হয় অভিকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। নিউটন বললেন, শুধু পৃথিবীই নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণিকা অন্য বস্তুকণিকাকে টানছে,—তা বস্তু-কণিকা দু'টি কাছেই থাক বা দূরেই থাক। এই যে আকর্ষণ বা টান এটা নির্ভর করে বস্তুর ভর ও দূরত্বের ওপর। ভর বেশি হলে এ টানটাও বেশি হবে, আর দূরত্বও বেশি হলে জোরটা হবে কম। দূরত্ব কমে আসলে টানের জোরটাও বেড়ে চলবে। বস্তুকণিকার পরস্পরের প্রতি এই যে আকর্ষণ বা টানের নিয়ম একেই বলা হয় নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র। ইংরেজিতে একেই বলে 'ইউনিভার্সাল ল অব্ গ্র্যাভিটেশন'।



আপেলটি ওপরে না উঠে মাটিতে পড়ল কেন ?

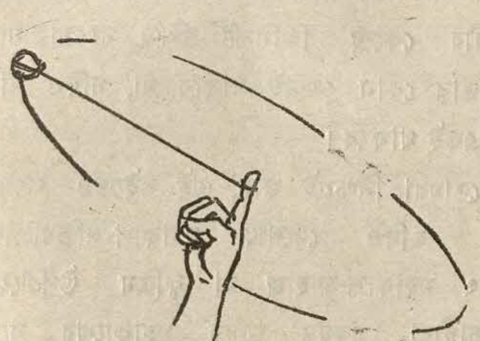
গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়তে দেখেই নাকি নিউটন তাঁর মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। গল্পটা শুনতে ভালোই, তবে গল্প গল্পই। হয়তো আপেল পড়তে দেখে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা নিউটনের মনে জাগতে পারে।

সৌরজগতের মাঝখানে সূর্যকে রেখে গ্রহ-উপগ্রহরা তার চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। মহাকাশে আমাদের সৌরজগতের মত কত শত জগৎ রয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আকাশের লক্ষ লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্র কোন শৃঙ্খলা মেনে চলছে না। কিন্তু নিউটনের সূত্র আমাদের বলে দিচ্ছে, বিশ্বপ্রকৃতি কত সুন্দর আইন-শৃঙ্খলে বাঁধা। পরস্পর পরস্পরের টানাটানিতে কোন-না-কোন নির্দিষ্ট পথে আইন বা নিয়ম মেনে ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র—সকলেই।

চাঁদ কেন পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে না

পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ ; সে অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ে পৃথিবীর টানে। তবে চাঁদ কেন পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে না ?

একটা সুতোর মাথায় একটা ঢিল বেঁধে তা অনায়াসেই আঙুলের চারদিকে ঘোরানো যায়। ঢিল ঘুরতে ঘুরতে আঙুলের ওপর এসে পড়ে



সুতোর মাথায় ঢিল বেঁধে অনায়াসেই আঙুলের চারদিকে ঘোরানো যায়।

না বা দূরে ছিটকে বেরিয়ে যায় না। অবশ্য সুতোটা ছিঁড়ে গেলে ঢিলটা একদিকে ছুটে বেরিয়ে যাবে। দেখা যাক ব্যাপারটা কি ঘটে।

ঢিলটা যতক্ষণ ঘুরছে ততক্ষণ ঢিলটার ওপর দু'টি শক্তি কাজ করছে। সুতোটা ঢিলটাকে সব সময়ই আঙুলের দিকে টেনে রাখছে, আর ঢিলটার চেষ্টা হ'ল চক্রাকার পথ ছেড়ে একদিকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া। প্রথম টানটাকে বলা হয় কেন্দ্রাভিমুখী টান বা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, আর দ্বিতীয় টানটাকে বলা হয় বহির্মুখী টান বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। কেন্দ্রাভিমুখী টানটা যদি বেশি হয় তবে ঢিলটা আঙুলের ওপর এসে পড়বে ; আর বহির্মুখী টানটা বেশি হলে ঢিলটা বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ ঢিলটা ঘুরছে ততক্ষণ এই দু'টো টান সমান। সুতোটা ছিঁড়ে গেলে কেন্দ্রাভিমুখী টানটা থাকে না। ফলে ঢিলটা বাইরে ছিটকে চলে যায়।

চাঁদের বেলায়ও অনেকটা এমনি ধরনের ব্যাপার ঘটছে। চাঁদের নিজস্ব গতির জন্যে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার মত বল বা ফোর্স তার রয়েছে, আবার পৃথিবীর টানটাও কাজ করছে তার ওপর। এ দু'টো বলের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে ব'লে চাঁদ পৃথিবীর বুকে এসেও পড়ছে না বা মহাকাশে মিলিয়েও যেতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, চাঁদের গতি যদি কখনও এখনকার চেয়ে বেশি হয় তখন আর পৃথিবী তাকে আটকে রাখতে পারবে না। আবার যদি তা একদম কমে যায় তবে সে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়বে পৃথিবীর বুকে। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহদের বেলাও এই একই নিয়ম।

মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ

চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের গতির রহস্য যখন জানা হয়ে গেল তখন কৃত্রিম উপায়ে তা সৃষ্টির কাজটাও অনেকটা সহজ হয়ে পড়ল। রাশিয়া ও আমেরিকা এ ব্যাপারে অসাধ্যসাধন করল। আমেরিকা চাঁদ জয় করল ; চাঁদের বুকে নেমে, হেঁটে ঘুরেফিরে দেখে এল মানুষ, এমন কি গাড়িও চালাল চাঁদের বুকে। একবার নয়, কয়েকবার। কৃত্রিম উপগ্রহ তো হামেশাই ছাড়া হচ্ছে মহাকাশে ! এদিক্ দিয়ে ভারতও পিছিয়ে নেই। তারাও মহাশূন্যে পাঠিয়েছে একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ।

প্রথমে আর্যভট, রাশিয়ার সহযোগিতায় কিন্তু পুরোপুরি ভারতীয়দের হাতেই তৈরি। তারপর একে একে আরও কয়েকটা, 'রোহিণী' ইত্যাদি। এখন ভারত নিজেই সেগুলি মহাকাশে পাঠাচ্ছে।

ভর ও ওজন

ভর বা মাস্‌-এর কথা আগেই বলেছি। কোন জিনিসের মধ্যে বস্তুর পরিমাণই হ'ল ভর। নিউটন বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণিকা একে অন্যকে টানছে। পৃথিবীও সমস্ত বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। পৃথিবীর এই টান বা ফোর্সকেই বলা যেতে পারে ওজন।

কোন বস্তুর ওজন দু'টি ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে। এক—পদার্থের ভর, দুই—পৃথিবীর টানের জন্যে যে ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন সৃষ্টি হয় সেই ত্বরণ। একে বলা হয় অভিকর্ষ-ত্বরণ (অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি)। কোন বস্তুর ভর বেশি হলে তার ওজন হবে বেশি, ভর কম হলে ওজন হবে কম। অঙ্কের ভাষায় বলা যায়—ভর আর ওজন সমানুপাতিক।

কোন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি গতিসম্পন্ন হতে পারে। জিনিসটির ওপর ক্রমাগত বল প্রয়োগ করলে জিনিসটির গতি-বেগও একটু একটু করে বাড়তে থাকে। এই যে বাড়তি গতিবেগ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে যতটুকু করে গতি বেড়ে যাচ্ছে তাকেই বলে ত্বরণ। পৃথিবী যখন কোন জিনিসকে টানে তখন জিনিসটির ওপর একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয় অভিকর্ষ-ত্বরণ। পৃথিবীর পিঠের ওপরে এই ত্বরণ সব জায়গায় এক নয়—কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। আবার পৃথিবীর পিঠ থেকে যদি ওপরে ওঠা যায় বা কোন খনির তলায় নামা যায় তবেও অভিকর্ষ-ত্বরণ হয় কম। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এক কিলোগ্রাম ওজনের জিনিস যদি কলকাতা থেকে দার্জিলিং নিয়ে যাওয়া যায় তবে ওজন হবে একটু কম। আরও ওপরে উঠলে ওজন আরও কম হবে। তেমনি ভাবে কোন খনির তলায় ঐ এক কে.জি. জিনিস নিয়ে গেলে তার ওজনও কমই হবে। এমনি ভাবে যদি কোনক্রমে পৃথিবীর কেন্দ্রে জিনিসটি নিয়ে যাওয়া যায় তবে তার কোন ওজনই থাকবে না, যদিও তার ভর একই থাকবে।

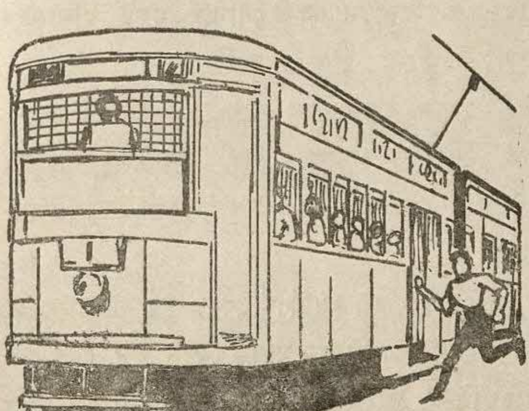
তোমরা নিশ্চয়ই জান, এই বইতেও পড়েছ এবং ছবিও দেখেছ, মহাকাশ-অভিযাত্রীরা অর্থাৎ মহাকাশ-জাহাজ বা কৃত্রিম উপগ্রহের আরোহীরা কেমন সুন্দর মহাকাশের বুকে সাঁতার কেটে বেড়িয়েছেন! এর কারণ, মহাকাশে পৃথিবীর আকর্ষণ এক রকম ছিলই না; ফলে আরোহীদের কোন ওজন ছিল না, তাঁরা ছিলেন ভারশূন্য।

নিউটনের গতির নিয়ম

মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ ছাড়া নিউটন গতির যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন তাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চলন্ত ট্রাম্‌-বাস্‌ থেকে নামতে গেলে অনেক সময় বিপদ্‌ ঘটার সম্ভাবনা। তা ছাড়া চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে পড়লে অসাবধানে দাঁড়ানো যাত্রীরা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আবার হঠাৎ গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে যাত্রীরা। এর কারণ কি?

গাড়ি যখন চলছে তখন তুমিও গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলছ। হঠাৎ গাড়ি থেমে পড়লে তোমার শরীরের নীচের অংশটা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল, কিন্তু তোমার দেহের ওপরের অংশ তো তখনও চলছেই! কাজেই এ সময় তোমার শরীরের ওপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে। আবার গাড়ি যখন থেমে আছে তখন যাত্রীরাও সবাই স্থির হয়ে রয়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করলেই যাত্রীদের দেহের পায়ের দিক্‌টা গোড়ায় চলতে আরম্ভ করল, কিন্তু মাথার দিক্‌টা তো তখনও স্থির হয়েই রয়েছে। ফলে পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়বে গাড়ির যাত্রীরা। এই জন্যই চলতি ট্রাম থেকে নামতে বা চলতি ট্রামে উঠতে হলে সামনের দিকে মুখ করে একটু ছুটে যেতে হয়।



চলতি ট্রাম থেকে নামতে বা চলতি ট্রামে উঠতে হ'লে সামনের দিকে মুখ করে একটু ছুটে যেতে হয়।

নিউটন এ ব্যাপার সম্বন্ধে যে নিয়মটির কথা বলেছেন তা এই রকম: যদি কোন পদার্থ এক জায়গায় স্থির থাকে তবে তা চিরদিনই স্থির থাকবে, আর জিনিসটা যদি চলতে থাকে তবে সে চিরদিনই চলতে থাকবে,—অবশ্য বাইরে থেকে কোন বল বা ফোর্স এসে যদি ব্যাঘাত না ঘটায়।

একটা বল্ নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে দিলে বল্‌টি কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থেমে যায়। কারণ হ'ল মাটি ও বাতাসের বাধা। যদি ও-সব বাধা না থাকত তবে বল্‌টি চিরটা কালই চলতে থাকত। টেবিলের ওপর যে বইখানি রয়েছে তা চিরদিনই ওখানে থাকবে যদি না কেউ সেখানা টেবিলের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। নিউটনের এই প্রথম নিয়মটিকে বলা হয় জাড্যের নিয়ম বা 'ল অব্ ইনার্‌শিয়া'।

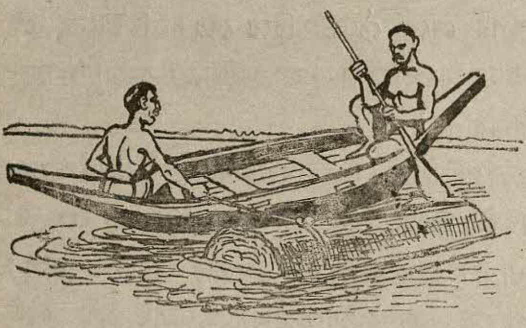
গতি সম্বন্ধে নিউটনের আরও দু'টি নিয়ম আছে। দ্বিতীয় নিয়মটি থেকে বল বা ফোর্স কাকে বলে তা আমরা জানতে পারি। তৃতীয় নিয়মটি হ'ল: প্রতিটি ক্রিয়ারই আছে সমান ও বিপরীতমুখী একটি প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীত।

তোমাদের মধ্যে কারো যদি বন্দুক ছোঁড়ার অভিজ্ঞতা থাকে তবে তারা নিশ্চয়ই জান যে বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরিয়ে যায় তখন বন্দুকটা কেমন পেছন দিকে ধাক্কা দেয়। এও নিউটনের তৃতীয় নিয়মের জন্যেই।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী: আর্কিমিডিসের আবিষ্কার

গ্যালিলিও-নিউটনের মত আর্কিমিডিসের আবিষ্কারও নানাদিক্ দিয়ে উল্লেখ করবার মত। আর্কিমিডিস তরল পদার্থের যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন তা নিউটন-গ্যালিলিওর বহু আগের কথা। সুতরাং ওগুলি আগেই বলে নিলে ভালো হ'ত। যাই হোক, এখানেই বলছি।

কোন ভারী জিনিস মাটির ওপর দিয়ে টেনে বা বয়ে নেওয়া কতই না কষ্টকর! কিন্তু জিনিসটি যদি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তবে তা খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে দেখছি বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়ি নদীর জলে কতক ডুবিয়ে কতক ভাসিয়ে সামান্য একগাছা দড়ি বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছোট্ট একখানা ডিঙ্গি নৌকো ও একটি মাত্র লোকই



বিরাট কাঠের গুঁড়ি নদীর জলে ফেলে সামান্য একগাছা দড়ি বেঁধে অনায়াসে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।

এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ অত বড় কাঠের গুঁড়ি মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিতে হলে অন্তত দশ-বারো জন জোয়ান লোকের দরকার।

এ অসাধ্যসাধন করার পিছনে বিজ্ঞানের যে নিয়মটি রয়েছে তা আবিষ্কার করেছেন আর্কিমিডিস। নিয়মটি এই রকম: যখন কোন কঠিন পদার্থ কোন তরল পদার্থে ডোবানো হয় তখন কঠিন পদার্থটির ওজনের কিছু অংশ কমে গিয়েছে বলে মনে হয়। কঠিন পদার্থটির যে আয়তন সে ঠিক ততটা পরিমাণ তরল পদার্থ সরিয়ে দেবে। এই পরিমাণ তরল পদার্থের যে ওজন, মনে হবে পদার্থটি যেন সেই পরিমাণ ওজন হারিয়ে হাল্‌কা হয়ে গেছে। এখানে তোমাদের জেনে রাখা ভালো যে পদার্থ কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ওজন হারায় না। তরল পদার্থে ডোবানোর ফলে ওটিকে হাল্‌কা মনে হওয়ার কারণ হ'ল তরল পদার্থের ওপরের দিকের চাপ—যাকে বলা হয় ঊর্ধ্বচাপ। যে কোন তরল পদার্থই ওপরে, নীচে এবং পাশাপাশি চাপ দিয়ে থাকে এবং এই চাপের জন্যে ভারী জিনিস জলে বা অন্য কোন তরল পদার্থে ডোবালে তা হাল্‌কা মনে হয়।

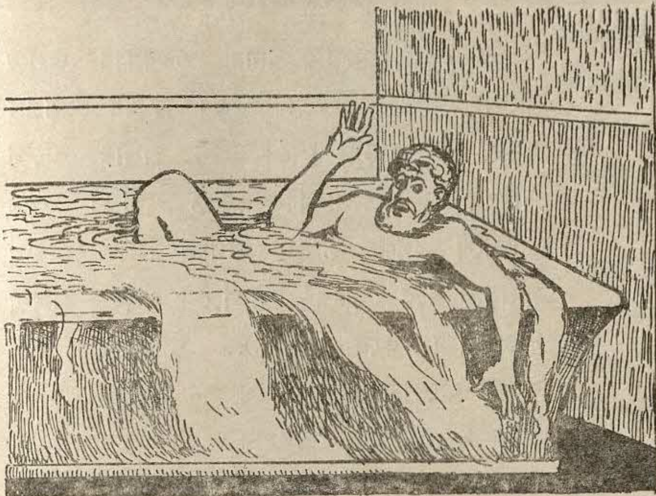
আর্কিমিডিসের সেই বিখ্যাত গল্প

এ সূত্রটি আবিষ্কারের পেছনে একটি সুন্দর গল্প আছে। যারা জান না শোন সে গল্পটি।

এখন থেকে দু'হাজার বছরেরও আগেকার কথা। ইটালীর সাইরাকিউজের রাজা হিরো স্যাকরাকে দিয়েছেন একটি সোনার মুকুট বানাতে। মুকুটটি বানানো হ'ল। ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু রাজার কেন যেন সন্দেহ হ'ল, খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছে তো মুকুটটি? সোনা চুরি করে খানিকটা খাদটাদ মিশিয়ে দেয় নি তো স্যাকরা?

পণ্ডিত হিসেবে আর্কিমিডিসের খুব নাম। রাজা তাঁরই ওপর ভার দিলেন মুকুটে কোন খাদ মেশানো আছে কিনা তা বার করবার। তবে মুকুটটি কিন্তু ভাঙ্গা চলবে না।

কি করে সমস্যার সমাধান করবেন আর্কিমিডিসের শুধু এই ভাবনা। ভাবতে ভাবতে একদিন স্নানঘরে ঢুকেছেন। চৌবাচ্চা ভর্তি জল। স্নান করবার জন্যে চৌবাচ্চায় নেমেছেন আর্কিমিডিস, অমনি বেশ খানিকটা জল উপচে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হ'ল, তাঁর



চৌবাচ্চায় নামতেই খানিকটা জল উপচে পড়ল।

নিজের শরীরের ওজনও যেন খানিকটা কমে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে মুকুট-সমস্যার একটা সমাধান মনে এসে গেল আর্কিমিডিসের। খাঁটি সোনার মুকুট যতটা জল সরাবে সোনায় খাদ মেশানো মুকুট সে পরিমাণ জল সরাতে পারবে না ; অর্থাৎ জলের মধ্যে ডোবালে খাঁটি সোনার যে ওজন হবে খাদ মেশালে তা হবে না। সুতরাং সহজ একটা পরীক্ষা করেই মুকুট খাঁটি সোনার কিনা বোঝা যেতে পারে। এক লাফে চৌবাচ্চা ছেড়ে তিনি সোজা ছুটলেন রাজার কাছে। চেঁচিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা!' (আমি পেয়ে গেছি! আমি পেয়ে গেছি!) এরই নাম "প্লাবিতা সূত্র"। প্লাবিতা সূত্র আবিষ্কারের এই-ই হ'ল ইতিহাস।

বাতাসে কেন অক্সিজেন কমে যায় না

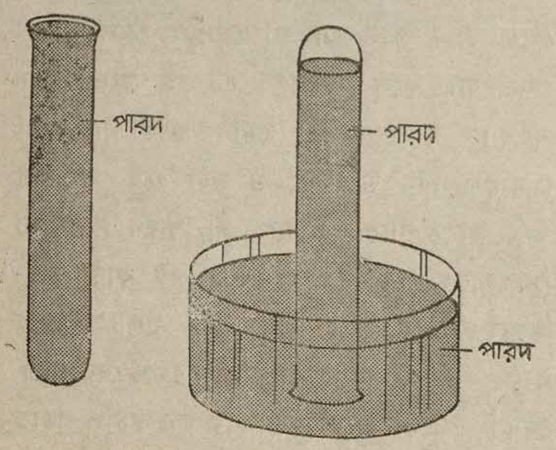
আমাদের চারদিকে যে বায়ুর আবরণ রয়েছে তাকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। বায়ুর আবরণটি আছে বলে পৃথিবীতে প্রাণিজগৎ টিকে আছে। বায়ু আসলে কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ। এর মধ্যে প্রধান হ'ল দু'টি গ্যাস—একটি নাইট্রোজেন, অন্যটি অক্সিজেন। মোটামুটি হিসেবে দেখা যায় যে বায়ুর আয়তনের পাঁচ ভাগের চার ভাগ নাইট্রোজেন, আর এক ভাগ অক্সিজেন। শ্বাস গ্রহণ করবার সময় আমরা এই অক্সিজেন কাজে লাগাই ; অক্সিজেন টেনে নিয়ে আমরা বায়ুর ভিতর ছেড়ে দিই কার্বন ডাইঅক্সাইড নামে একটি গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের চেয়ে ভারী, তাই সে অক্সিজেনকে ঠেলে সরিয়ে দেয়—যার ফলে আমাদের দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তা হ'লে তো এমনি ভাবে বায়ুর মধ্যে ক্রমাগত কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হয়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারে? উত্তর—না, কারণ গাছপালা সূর্যালোকে বায়ুর ভিতর থেকে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে তার কার্বন অংশটুকু নিজের কাজে লাগায়, আর বায়ুর মধ্যে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন। কাজেই বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা নেই।

বায়ুরও চাপ আছে

এই যে বায়ুমণ্ডল এরও কিন্তু চাপ আছে, এবং সে চাপ নিতান্ত কম নয়। জন্ম থেকেই আমরা সে চাপের মধ্যে বেড়ে উঠি বলে সে চাপের প্রবলতা আমরা টের পাই না। হিসেবে দেখা যায় যে প্রতি বর্গ ইঞ্চি

জায়গার ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় সাড়ে সাত কিলোগ্রামের কাছাকাছি। আবহাওয়া-বিজ্ঞানে বায়ুমণ্ডলের সঠিক খবর জানা দরকার। বায়ুমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার দিয়ে বায়ুমণ্ডলের এই চাপ মাপা হয়। সহজ উপায়ে এটি এইভাবে তৈরি করা যেতে পারে :

একটি একমুখ-খোলা কাচের নল নিয়ে তা পারা বা পারদ দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। তারপর খোলা মুখটা আঙুল দিয়ে বন্ধ করে অন্য একটি পারদভরা বড় পাত্রের মধ্যে নলটি উলটে বসাতে হবে। এবারে খোলা মুখ থেকে আঙুলটি সরিয়ে নিলে দেখা যাবে, নলের ভিতরকার পারদ আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে আসছে, তারপর তা এক জায়গায় স্থির



নলের ভিতরকার পারদ আস্তে আস্তে নেমে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে যাবে।

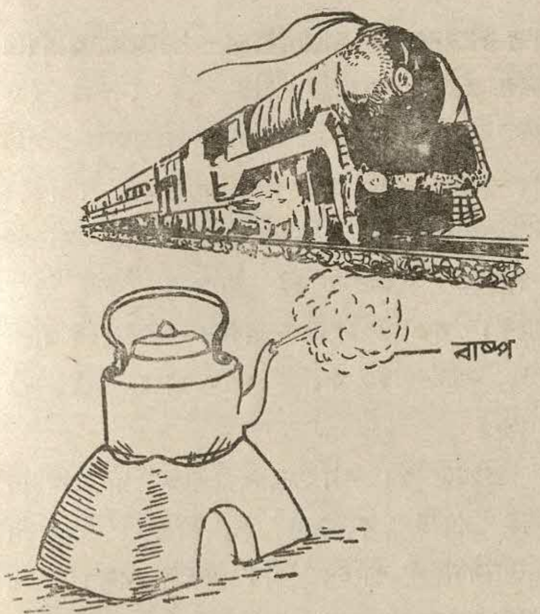
হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাত্রের ভিতর যে পারদ আছে সেখান থেকে মেপে দেখা যাবে যে নলের ভিতরে পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ৭৬ সেন্টিমিটার। ঝড়ের সময় কিন্তু সেটা আর তা থাকে না, আর তাই দেখেই বোঝা যায় ঝড় আসছে।

বাতাসে জলের বাষ্প

বায়ুমণ্ডলের কথায় বায়ুর ভিতরকার জলীয় বাষ্পের কথাও এসে পড়ে। সূর্যের উত্তাপে সমুদ্র, নদী প্রভৃতি থেকে জল জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে আকাশে উঠে যায়। ওপর আকাশে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগলে তা আবার ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে, শস্যশ্যামলা করে আমাদের পৃথিবীকে। এই জলীয় বাষ্পের একটা অংশ সব সময়েই থাকে বায়ুর মধ্যে। এর পরিমাণ কখনও বেশি হয়, কখনও হয় কম। বর্ষার দিনে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি থাকে, ফলে ভিজে কাপড়চোপড় শুকোতেই চায় না। আবার শীতের দিনের আবহাওয়া থাকে শুকনো, অর্থাৎ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে কম। ফলে আমাদের শরীরে ঘাম হয় না, ভিজে কাপড়চোপড়ও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পই মেঘ, শিশির, কুয়াশা প্রভৃতির জন্যে দায়ী।

তাপশক্তি

আগেই বলা হয়েছে—তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা ধরনের শক্তি নিয়েই পদার্থবিদের কারবার। ফলে পদার্থবিদ্যার আবার আলাদা আলাদা শাখা গড়ে উঠেছে। পদার্থের সাধারণ ধর্ম এবং সে সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাখায় তার নাম সাধারণ পদার্থবিজ্ঞান বা জেনারেল ফিজিক্স। তা ছাড়া রয়েছে তাপ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, তড়িৎ-বিজ্ঞান প্রভৃতি।



কেটলির ভিতর থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে। ভাবতে অবাক্ লাগে, এই বাষ্পের শক্তিতেই রেলগাড়ি চলে।

কয়লা পোড়ালে আমরা তাপ পাই। ঐ তাপ দিলে জল বাষ্পে পরিণত হয় আর সেই বাষ্পের শক্তিতে রেলগাড়ি চলে। কাজেই আমরা বলতে পারি, তাপ এক রকম শক্তি ; এ শক্তি দিয়ে আমরা নানা কাজ করতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি, শক্তি প্রধানত দু'রকম—কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি আর পোটেনশিয়াল এনার্জি বা স্থিতিশক্তি। দেখা যাক তাপশক্তি এর কোন্ দলে পড়ে।

দুনিয়ার সব রকম পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশের নাম অণু বা মলিক্যুল। কোন পদার্থের ধর্ম মানেই হ'ল পদার্থটির অণুদের ধর্ম। অণুরা পদার্থের মধ্যে চুপচাপ কেউ বসে নেই, অনবরত ছুটোছুটি করেই চলেছে। অণুদের এই ছুটোছুটির জন্যই তাপশক্তির প্রকাশ। কাজেই আমরা বলতে পারি তাপশক্তি আসলে গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি। কোন জিনিস যখন বেশি গরম হয় তখন তার ভিতরকার অণুগুলির গতিবেগও বেড়ে যায়। ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, অণুদের গতিবেগ বাড়লে পদার্থের তাপশক্তিও বেড়ে যায়।

তাপ প্রয়োগের ফল

কোন পদার্থের ওপর তাপ প্রয়োগ করলে তার উষ্ণতা বাড়ে। তা ছাড়া কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে কোন পদার্থের ওপর তাপ প্রয়োগ করলে তার আয়তনও বাড়ে। অবশ্য এমন দু'-চারটে জিনিসও আছে যাকে উত্তপ্ত করলে আয়তন সমান থাকে, সময় সময় কমেও যায়।

দু'খানা রেল লাইনের জোড়ের মুখে সামান্য একটুখানি ফাঁক রাখা হয় তা তোমরা লক্ষ করে থাকবে। এর কারণ আর কিছুই নয়, চাকার ঘষা লেগে, তাপ পেয়ে লাইন যাতে আয়তনে বেড়ে বেঁকে না যায় তারই জন্যে এ ব্যবস্থা। কাচের বোতলে ছিপি শক্ত করে আটকে গেলে বোতলের গলাটা একটু গরম করে নিলে ছিপি খোলা সহজ হয়। এরও কারণ এই তাপ দিয়ে কাচের আয়তন বাড়ানো।

তাপ ও উষ্ণতা বা তাপমাত্রা

কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের ভিতরে যে তাপের পরিবর্তন ঘটে তারই মাপ হ'ল উষ্ণতা। কেউ কেউ বলেন তাপমাত্রা। উষ্ণতার নিয়ম হচ্ছে পদার্থটি অন্য কোন উষ্ণতর পদার্থের সংস্পর্শে রাখলে পদার্থটি থেকে তাপ সেই পদার্থে যাবে না, সেই পদার্থ থেকেই তাপ এই পদার্থে চলে আসবে।

কোন পদার্থের উষ্ণতা মাপবার জন্যে আমরা যে ছোট্ট যন্ত্রটি ব্যবহার করি তার নাম



কত জ্বর? থার্মোমিটার দিয়ে দেখা হ'ল।

হ'ল তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার। অবশ্য উষ্ণতা মাপা হচ্ছে বললে ভুল বলা হয়। আসলে থার্মোমিটার দিয়ে আমরা পদার্থের উষ্ণতা তুলনা করি। এ কাজ করবার জন্যে কোন বিশেষ অবস্থায় কোন জিনিসের উষ্ণতাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিতে হয়। তারপর অন্যান্য জিনিসের উষ্ণতা একটি তুলনামূলক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপ যখন থাকে ৭৬ সেন্টিমিটার তখন বরফ এবং ফুটন্ত বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতাকে স্থির উষ্ণতা হিসেবে ধরা হয়। প্রধানত যে দু'ধরনের থার্মোমিটার আমরা ব্যবহার করি তার নাম হ'ল সেন্টিগ্রেড বা সেলশিয়াস এবং ফারেনহাইট। সেন্টিগ্রেড পদ্ধতিতে বরফের উষ্ণতাকে ধরা হয় ০ (শূন্য) ডিগ্রী আর ফুটন্ত জলের উষ্ণতাকে ধরা হয় ১০০ ডিগ্রী। ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে বরফের উষ্ণতাকে ধরা হয় ৩২ ডিগ্রী এবং ফুটন্ত জলের উষ্ণতাকে ধরা হয় ২১২ ডিগ্রী। আমাদের জ্বরটর হ'লে এতদিন যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হ'ত তা হ'ল ফারেনহাইট থার্মোমিটার,—কাজের সুবিধার জন্যে ওটিকে আকারে ছোট করে নেওয়া হ'ত এই যা। আবহাওয়ার উষ্ণতা আজকাল প্রায় সব দেশেই সেন্টিগ্রেড বা সেলশিয়াস পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারেও সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি এদেশে জ্বরটরও ঐভাবেই মাপা হচ্ছে, ফারেনহাইট পদ্ধতি এখানে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে।

অন্যান্য বহু আবিষ্কারের সঙ্গে থার্মোমিটার যন্ত্রও তৈরি করেছেন গ্যালিলিও। সাধারণ থার্মোমিটারও কাচের তৈরি একটা নল। তার মধ্যে থাকে খুব সরু একটা ছিদ্র আর ছিদ্রটির মধ্যে ভরা থাকে পারদ বা পারা। উষ্ণতা বাড়লে বা কমলে এই পারাও আয়তনে বাড়ে-কমে। কতটা বাড়ল বা কমল দেখেই কত ডিগ্রী উষ্ণতা বলে দেওয়া যায়।

তাপ চলে কি করে

সূর্য থেকে আমরা অনবরত তাপ পাই। একটি সরু তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালেও তারটি গরম হয়ে ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শক্তি কখনও ধ্বংস হয় না, তার রূপান্তর ঘটে মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, বিদ্যুৎ-শক্তি তাপ শক্তিতে বদলে গেছে। কয়লা পোড়ালেও আমরা তাপ পাই। এখানে কয়লার ভিতরকার কার্বন খুব তাড়াতাড়ি বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিশে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়, তা ছাড়া অন্য রাসায়নিক ক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। কাজেই এই সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেও তাপের সৃষ্টি হয়।

যে-কোন ভাবেই এই তাপ সৃষ্টি হোক না কেন, তাপের একটা ধর্ম হ'ল এই, যে, তাপ কখনও এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে তিন রকম ভাবে। এদের বলা হয় পরিবহন (কণ্ডাক্‌শন্), পরিচলন (কনভেক্‌শন্) এবং বিকিরণ (রেডিয়েশন)। পরিবহন এবং পরিচলনের বেলা কোন একটি মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে তাপ চলাচল করে। একটা লোহার দণ্ডের একমাথা গরম করলে অল্প সময়ের মধ্যেই অন্য মাথাও গরম হয়। এ কাজটি ঘটে পরিবহন ক্রিয়ার মাধ্যমে। একটা পাত্রে জল নিয়ে তা উনুনে বসালে পাত্রের সমস্ত জল গরম হয় যে ভাবে তাকে বলা হয় পরিচলন। এখানেও পাত্রের তলা থেকে তাপটা জলের ওপরে আসছে একটি মাধ্যমের সাহায্যে। গরম জল তলা থেকে ওপরে উঠে সেই মাধ্যমের কাজ করছে। কাজেই দেখা গেল, পরিবহন এবং পরিচলন উভয় ক্রিয়ার জন্যেই একটি মাধ্যম দরকার।

সূর্য এবং আমাদের এই পৃথিবী—এদের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধান। তা ছাড়া এদের মাঝখানকার প্রায় সমস্তটাই একদম শূন্য, অর্থাৎ কোন মাধ্যম নেই। তাই যদি হয় তবে সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে তাপ আসে কি ভাবে? বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য থেকে যে পদ্ধতিতে তাপ আসে তাকে বলা হয় বিকিরণ। বিকিরণের জন্যে আমাদের পরিচিত কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। বিকীর্ণ তাপ বহন করে ইথার। বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ইথার নামে একটি অদ্ভুত ধরনের মাধ্যম আছে। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া না গেলেও, এটি যে আছে তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এই ইথারের মধ্যে ঢেউই হ'ল বিকীর্ণ তাপ। আবার এই ইথারই সূর্য থেকে ঐ তাপকে পৌঁছে দেয় আমাদের কাছে। ইথারের ঢেউ যে শুধু মাত্র বিকীর্ণ তাপ সৃষ্টি করে তা নয়, বিভিন্ন রঙের আলো, এক্স-রে, রেডিও-তরঙ্গ—এ সবই হ'ল ইথারের ঢেউ।

কোন উপায়ে যদি পরিবহন, পরিচলন এবং বিকিরণ-ক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া যায়—অন্তত পক্ষে যদি খুব করে কমিয়ে দেওয়া যায়, তবে গরম জিনিস গরমই থাকবে, আর ঠাণ্ডা জিনিস থাকবে ঠাণ্ডাই। তোমরা থার্মোফ্লাস্ক দেখেছ। এই থার্মোফ্লাস্কে গরম জিনিস গরম এবং ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা রাখা যায় দীর্ঘ সময় ধরে। বলা বাহুল্য, এটি তৈরি করা হয় এমন ভাবে যাতে তাপের যাযাবরবৃত্তি বেশ খানিকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। ওর ভিতরের কৌশলটা মোটামুটি এই রকম: ফ্লাস্কের মুখ খুললে দেখবে ভিতরে আর একটা কাচের বোতলের মত রয়েছে—খুব চক্‌চকে। এই বোতলের দু'টো দেয়াল, আর সেই দেয়াল দু'টির মাঝখানটা ফাঁকা অর্থাৎ সেখানকার বাতাসটুকুও যতটা সম্ভব পাম্প করে বার করে নেওয়া হয়েছে। একদম ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে পরিচলন বা পরিবহন কোনটাই সম্ভব নয়, কারণ সেখানে প্রয়োজনীয় মাধ্যমের অভাব। ফলে থার্মোফ্লাস্কের ভিতর থেকে তাপ তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে পারে না বা বাইরের তাপও তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকতে পারে না।



রঙ্গালয়ের কথা

নাটক কে না ভালোবাসে ?

নাটক দেখতে ভালোবাসে না এমন কে আছে ? যাত্রা-থিয়েটারের আসরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পালায় বিরাট গদা ঘুরিয়ে যখন ভীম কৌরব নিধন করতে থাকে তখন তোমরা সবাই উৎসাহে হাততালি দাও। আবার যখন অভিমন্যুকে সপ্তরথী ঘিরে ফেলে তখন অসহায় ছেলেটির জন্য সমবেদনায় তোমাদের সকলেরই প্রাণ ভরে যায়। আসল কথা, আমরা আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি দেখতে ভালোবাসি। তাই সুখ-দুঃখের কাহিনীগুলিকে জীবন্ত করে ছবির মত আমাদের সামনে তুলে ধরি অভিনয় দিয়ে।

মানুষ অভিনয় করতে শিখল কবে ?

অভিনয় আরম্ভ হয়েছে মানুষের সভ্যতার এক আদিম স্তরে। কোন্ স্তরে এ কথা বলা শক্ত। তবে এ কথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আদিম মানুষ যখন ঠিকমত কথা বলতেও পারত না বা গানও গাইতে পারত না তখনও তারা নানারকমের চীৎকার আর ধ্বনির সঙ্গে একক বা সমবেতভাবে নাটকের উৎসব করত।

সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে মানুষ তত প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা বিস্তারের জন্য নানা চেষ্টা করেছে। এক সময় মানুষ পশু শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করত। সে সময় সারাক্ষণই তারা চিন্তা করত শিকারের কথা—যে পশু তারা শিকার করত তার কথা। তাদের এই শিকার-যাত্রার আগে তারা পশুশিকারের অভিনয় করত যাতে শিকারে তারা সফল হতে পারে। কখনও একদল সাজত শিকারী, আর একদল শিকারের পশু। বলা বাহুল্য এই অভিনয়ে শিকারীদেরই হ'ত জয়।

নাচ থেকে অভিনয়

ক্রমে ক্রমে এই শিকারীরা শুধু অঙ্গভঙ্গী করে এই শিকারের কায়দাগুলি প্রকাশ করতে লাগল আর তাই শেষে রূপ নিল সুসংবদ্ধ নাচের। আমাদের দেশের আদিবাসীদের মধ্যে, এ ধরনের নাচ এখনও দেখা যায়। সাঁওতাল বা নাগাদের শিকার-নৃত্যের অভিনয় এখনও বড়

বড় নৃত্যবিদেরা দেখিয়ে থাকেন। শিকার-নৃত্যের মত ফসলের জন্য নাচ, ভূত-প্রেত তাড়ানোর জন্য নাচ, রণনৃত্য ইত্যাদি নাচের মধ্যে দিয়ে আদিম মানুষ একদিকে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেছে, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবার চেষ্টা করেছে—তা সে প্রতিপক্ষ প্রকৃতিই হোক বা অন্য মানুষই হোক, অন্যদিকে একালের বা সর্ব-কালের অভিনয়েরও জন্ম হয়েছে এই নাচের মধ্যে দিয়ে। ক্রমে নাচের সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে ফোটাবার জন্য মুখোসের ব্যবহারও শুরু হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে আদিম জাতিদের মধ্যে এই ধরনের নৃত্য বা অভিনয়ে যারা নেতৃত্ব করত সমাজে তাদের একটা বিশেষ স্থান হ'ত। এই নেতা ক্রমে ক্রমে বিশেষ শক্তির অধিকারী বলে গণ্য হ'ত এবং শেষে এরাই হ'ত পুরোহিত।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আদিম সমাজের রূপান্তর হতে লাগল। মানুষ দেবতাদের কল্পনা করে নিয়ে নিজেদের মতন করে তাদের গড়তে আরম্ভ করল। ইতিহাসে বা আরও আগে গাথা-পুরাণে এল একের পর এক বীর—একের পর এক জননায়ক। এই সময় তাদের গুণকীর্তন করারও রেওয়াজ হ'ল।

অভিনয় দিয়ে প্রকৃতিকে বশ করা ছাড়াও আনন্দ দেওয়া বা দেবতা বা বীরদের শৌর্যবীর্য প্রকাশ করাও হ'ল অভিনয়ের কাজ; আর সামাজিক জীবনেও জিনিসটা এক নতুন বৈচিত্র্য এনে দিল। নাট্যশালার জন্ম বলতে গেলে এই থেকেই।

নাট্যকলার জন্ম : গ্রীস

সভ্য মানুষের নাট্যকলার জন্মস্থান বলা হয় প্রাচীন গ্রীসকে। এই দেশেই বহু অতীতে এক জাতি বাস করত যারা জানত জীবনকে কি করে সুন্দর ভাবে উপভোগ করা যায়। তাই এই গ্রীস দেশে প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছিল বিভিন্ন শিল্পকলার প্রসার। সেই সঙ্গে খেলা-ধূলা ও শারীরিক সৌন্দর্যের অনুশীলন, নৃত্য, গীত—এ-সবও হয়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অঙ্গ।

গ্রীস দেশের লোকেদের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল অসীম। নাটকেরও জন্ম ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকেই। ওদেশের ধর্মানুষ্ঠানে আমাদের দেশের মতই জাঁকজমক ছিল প্রচুর আর তাদের প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা তাদের দেবতাদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করবার প্রয়াস পেত। গ্রীক ভাস্কর বা চিত্রশিল্পীর যেমন আগ্রহ ছিল দেবতাকে তার শিল্পকাজের মধ্যে দিয়ে নিজের কাছে আনতে অথবা নিজেকে দেবতার কাছাকাছি ভাবতে, তেমনি আগ্রহ ছিল নাটকে বা নাচেও দেবতাকে কাছে টেনে আনতে। গ্রীস দেশে নাটকের জন্ম থেকে পরবর্তী কালের 'কমেডি'র সময় পর্যন্ত ধর্মই ছিল গ্রীস নাটকের আর অভিনয়ের উৎস।

ডাইওনিসাসের সম্মানে

আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করা গ্রীসের এক প্রাচীন শিল্প। ওদেশের অর্থনৈতিক জীবনে এর বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই আঙ্গুরের ফসল যখন ঘরে আসত সে সময়টা ছিল ওদের এক মহা উৎসবের সময়—খানিকটা আমাদের দেশে



ডাইওনিসাসের উৎসব

নতুন ধান উঠবার সময় যেমন গ্রামে গ্রামে পৌষ-পার্বণ আর নবান্নের ধুম লেগে যায় সেই রকম আর কি! আঙ্গুরের ফসল ওঠার সময় প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা উৎসবে মেতে যেত। হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়ে দলে দলে তারা গ্রামের পথে পথে চলত। তার মধ্যে এক একটা দল হয়তো হাত ধরাধরি করে নাচ-গান শুরু করত। উৎসব হ'ত মদিরার দেবতা 'ডাইওনিসাসে'র সম্মানে—আঙ্গুরের ফসলের অধিষ্ঠাতা সুরা-দেবতাই কিনা ডাইওনিসাস! এই দেবতাকে তারা ভক্তি জানাত, তাঁর নামে পশুবলি দিত। কখনও কখনও ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে মনে করত।

এই গ্রীক দেবতা ডাইওনিসাসের উৎসবই গ্রীস দেশের নাটকের উৎস বলা যায়। মহা-মনীষী অ্যারিস্টটল গ্রীক নাটকের জন্মপ্রসঙ্গে বলেন, উৎসবের নাচের নেতাদের নিয়েই গ্রীক নাটকের জন্ম। এ কথা থেকে মনে হয় যে ডাইওনিসাসের উৎসবের নাচ ক্রমে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আর এই নাচ আর গানের দলের নেতারাই প্রথম অভিনেতা।

এথেন্সে প্রথম নাট্যশালা

এ পর্যন্ত যত নাট্যশালার ইতিহাস জানা গেছে তার মধ্যে এথেন্সের ডাইওনিসাসের নাট্যশালাই বোধ হয় প্রাচীনতম। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ছ'শ' বছর আগে এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসের উত্তর দিকে ডাইওনিসাসের উৎসব হ'ত। সেখানে একটা গোল নাচের জায়গার চারদিকে ছিল কতকগুলি বসবার আসন। পিসিস্ট্রেটাস এই নাট্যশালা সরিয়ে নিয়ে যে জায়গায় তৈরি করান তার ভগ্নাবশেষ আজ আড়াই হাজার বছর পরেও পথিকের মন মুগ্ধ করে। ডাইওনিসাসের মন্দিরের কাছেই একখণ্ড গোলাকৃতি জমি নাচের জন্য পিটিয়ে সমান করা হয়। আর তার চারদিকে পাহাড়ের ঢালুতে কাঠ দিয়ে বসবার জায়গা। স্টেজ বা মঞ্চ বলে কিছু নেই। পিসিস্ট্রেটাসের কালেই

গ্রীসে নাট্যাভিনয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে নাটক প্রতিযোগিতার শুরু। এই সময় থেকেই নাটক অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলা যেতে পারে।

খৃষ্টের জন্মের পাঁচশ' বছরেরও আগে বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম প্রতিযোগিতায় আইকেরার থেসপিস প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনিই প্রথম নাটকে কোরাস বা গানের দল ছাড়া একজন অভিনেতার প্রবর্তন করেন। থেসপিসের পর একে একে এলেন অ্যাসকাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস। থেসপিসের সময়ও গানের দলই ছিল আসল—অভিনেতার অভিনয় করা অংশগুলি গানের মাঝে মাঝে কাহিনীর সংযোজকের কাজ করত। অ্যাসকাইলাসের হাতে গানের দলের প্রাধান্য আরও কমে গেল, কিন্তু সফোক্লিসই প্রথম সেই নাটক আনেন যাতে অভিনেতারই স্থান হয় সর্বাগ্রে।

থেসপিসই তাঁর নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাদের মুখে রং মেখে রূপসজ্জার প্রথার প্রবর্তন করেন বলে কেউ কেউ বলেন। কারো কারো মতে অভিনয়ের সময়ে মুখোস পরার প্রচলনও তিনিই শুরু করেন। প্রথমে একজন অভিনেতাই অভিনয় করত। মুখোস পরে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় হ'ত। পরে আরো অভিনেতার আমদানি হয়।

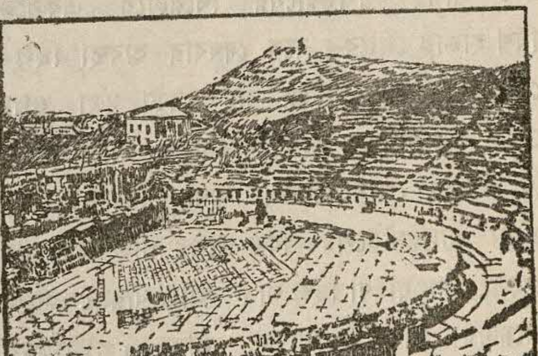
ডাইওনিসাসের উৎসব

ডাইওনিসাসের উৎসবের কথা একটু বিশদ করে বলতে হয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই উৎসবের অঙ্গ ছিল শোভাযাত্রা, ধর্মানুষ্ঠান, বাদ্য-সঙ্গীত, কবিতা, সমবেত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা আর বিয়োগান্তক, মিলনান্তক এবং কৌতুকময় নাটকের অভিনয়। পাঁচ-ছ' দিন এথেন্সের লোক কাজকর্ম থেকে ছুটি নিত আর ভোজ, হৈ-হল্লা, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিন কাটাত।

ডাইওনিসাসের উৎসবে নাট্যোৎসব তিনদিন ধরে চলত আর এক-একদিন চার-পাঁচটি নাটকের অভিনয় হ'ত। খেলাধূলার প্রতিযোগিতার মত নাটক প্রতিযোগিতাতেও যে বিজয়ী হ'ত তার ছিল খুব সম্মান। শুধু সে একা নয়, তার আত্মীয়স্বজন, এমন কি গ্রামবাসীরাও তা নিয়ে গর্ববোধ করত।

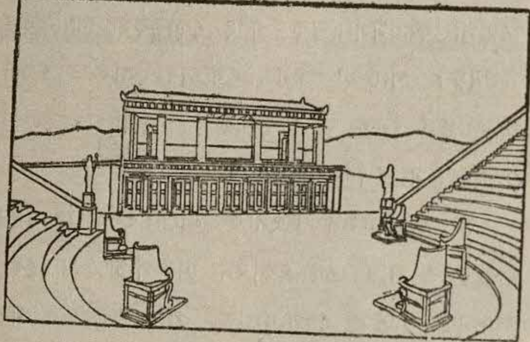
নাট্যশালার বিবর্তন

গ্রীক নাট্যশালার গঠন ক্রমে ক্রমে বদলে যায়। আগেই বলেছি, প্রথম থিয়েটারে কোন স্টেজ ছিল না—ছিল নাচের জন্য গোলাকার ভূমি, যার চারদিকে কাঠের আসন সাজানো থাকত দর্শকদের জন্য। ক্রমে গোলাকার এই নাচের জায়গা, যাকে বলা হ'ত অরকেষ্ট্রা,—



পাহাড়ের ধাপে ধাপে গাঁথা আসনের বেষ্টনী

তার চারদিকে উঠল পাহাড়ের ধাপে ধাপে গাঁথা আসনের বেষ্টনী। নাচের বৃত্তের ওধারে উঠল একটা নীচু স্টেজ-বাড়ি, যাকে বলা হ'ত



অ্যাক্রোপলিসের এই নাট্যশালায় পনেরো হাজার দর্শকের বসবার আসন ছিল।

'স্কীন'। এর সামনে সম্ভবত ছিল একটা ঝুল-বারান্দা—স্টেজ-বাড়ি থেকে দর্শকদের দিকে বার করা। দৃশ্যপটের চল তখনও হয় নি। অ্যাক্রো-পলিসের এই নাটাশালায় পনেরো হাজার দর্শকের বসবার আসন ছিল।

গ্রীক থিয়েটারের গঠনপ্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। থিয়েটারের বসবার আসন ধাপে ধাপে থাকার দরুণ স্টেজের ওপরে সামান্য শব্দও সমস্ত দর্শকদের কানে পৌঁছতে অসুবিধা হ'ত না। এপিডরাসের থিয়েটারে একসঙ্গে বিশ হাজার লোকের বসে দেখবার ব্যবস্থা ছিল। সেই থিয়েটারের স্টেজে যদি একটা মুদ্রা ওপর থেকে পড়ত তবে তার আওয়াজও নাকি সারা থিয়েটারেই শোনা যেত। অথচ সেকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী অ্যারিস্টটলের পর্যন্ত শব্দের গতি সম্বন্ধে খুব ভালো রকম ধারণা ছিল না। আর, যাঁরা সেকালে থিয়েটার নির্মাণ করতেন, তাঁরা প্রেক্ষাগৃহের জন্য আগে জমি কৃত্রিম উপায়ে উঁচু করেও নিতেন না।

গ্রীসের মেষপালকেরা লক্ষ করেছিল যে তারা যখন একে অন্যকে ডাকত তখন সমতল মাঠে যেমন শোনা যেত বাটির মত ঢালু জায়গায় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার শোনা যেত। রঙ্গালয় বানাবার সময় গ্রীক স্থপতিরা এই অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছিলেন। ছাদ না থাকায় শব্দের প্রতিধ্বনি হ'ত না। অথচ শব্দটা সারা রঙ্গশালার যে কোন জায়গা থেকেই বেশ ভালোভাবে শোনা যেত।

নাটকের অভিনয় ছড়িয়ে পড়ল

যত দিন যেতে লাগল গ্রীসের অন্যান্য জায়গাতেও ডাইওনিসাসের উৎসবের সময়ে এথেন্সের নাট্যসম্ভার থেকে নাট্যপ্রদর্শনী হতে লাগল। এথেন্সে নাটকের প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে রোমান রাজা হ্যাড্রিয়ানের সময় পর্যন্ত সমান ভাবে চলেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪৭২ সালে অ্যাসকাইলাস আগের বছর এথেন্সে তাঁর যে নাটকগুলি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল সেগুলি সাইরাকিউজ শহরে অভিনয় করান।

জনপ্রিয় নাটকগুলি অভিনয় করার জন্য এথেন্সের ডাইওনিসাসের অভিনেতাদের ডাক পড়ত দূরাঞ্চলে। এরাই বোধ হয় জগতের প্রথম অভিনেতৃসঙ্ঘ। রোমে থিয়েটার তৈরি হলে গ্রীক নাটকের অভিনয় সেখানে হয়—গ্রীক ভাষায় ও রোমান অনুবাদে। ক্রমে অভিনয় ছড়িয়ে পড়ে গ্রীক উপনিবেশ-নগরগুলিতে আর রোমান সাম্রাজ্যে। সেখানে গ্রীসের বড় নাট্য-কারদের নাটক অভিনীত হতে থাকে। এথেন্সে খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দীতেও এই সব নাটকের অভিনয় হয়েছে বলে জানা যায়।

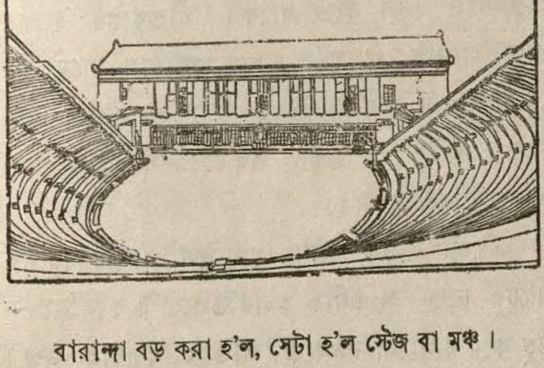
গ্রীক নাটকের প্রাধান্যের যুগ প্রায় আট-ন'শ' বছর। শেষ দিকে অবশ্য নাটকের অনেক

অবনতি হয়েছিল। অনেক সময় পুরোনো বড় নাটকের অভিনয় করেই নাট্যশালাগুলি চলত। এই সারা সময় ধরে নাট্যগৃহগুলির গঠনে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। অ্যাক্রোপলিসের সৌষ্ঠব-হীন পাহাড়ের ঢালুদেশে তক্তার আসন আর গোলাকার জমিতে নাচের জায়গা—এই ধরনের আদি নাট্যশালা থেকে পরিবর্তন হতে হতে শেষ পর্যন্ত গ্রীকো-রোমান ধরনের যে নাট্যশালার উদ্ভব হয় তার থেকেই 'রেনেশাঁস' যুগের নাট্যশালার জন্ম—আজকের থিয়েটারেরও।

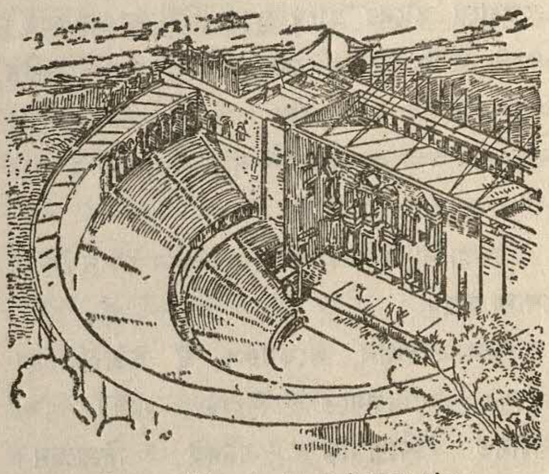
রঙ্গমঞ্চের ক্রমপরিবর্তন

আমরা দেখেছি প্রথম দিকে গোলাকার সমতল জায়গা ছিল অরকেষ্ট্রা নাচের জন্য আর তার চারদিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বসবার আসন। অন্য ধারে নীচু বারান্দাওয়ালা 'স্কীন' বা ঘরের সারি। স্কীন আর দর্শকদের আসনের মাঝখানে অনেকখানি প্রবেশপথ ছিল—সমস্তটাই ছিল খোলামেলা।

ক্রমে অরকেষ্ট্রা নাচের জায়গা ছোট হয়ে গেল—স্টেজবাড়িকে আরো এগিয়ে আনা হ'ল। বারান্দা বড় করা হ'ল—সেটা হ'ল স্টেজ বা



বারান্দা বড় করা হ'ল, সেটা হ'ল স্টেজ বা মঞ্চ।



কপিকল জাতীয় কায়দা ব্যবহার করা হ'ত।

মঞ্চ। তারই ওপরে হ'ত অভিনয়। তার পেছনে স্কীনের দোতলা দু'দিকে প্রসারিত হয়ে স্টেজের দোতলা পর্যন্ত এসে গেল। গ্রীকো-রোমান থিয়েটারের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মত। শেষ পর্যন্ত অরকেষ্ট্রা দর্শকদের আসনের সঙ্গেই যুড়ে গেল আর স্টেজ, যার শুরুতে কাজ ছিল অভিনেতাকে দর্শকদের চোখের সামনে ধরা,—হ'ল অভিনয়েরই জায়গা। তার পর 'স্কীন', যা ছিল নাচের চক্রের পেছনে একসারি ঘর,—হয়ে গেল স্টেজের পেছনের দেয়াল।

গ্রীক অরকেষ্ট্রা বা গ্রীক স্টেজে সীন-সীনারি বা দৃশ্যপটের বালাই ছিল না এ কথা আগেই বলেছি। গ্রীক থিয়েটারে যখন রোমান প্রভাব এসেছে তখন নানা রকমের কলকজার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, একটা মেশিনের নাম শোনা যায় যাতে দেবতাদের অবতরণ বা স্বর্গারোহণ দেখানো যেত। অর্থাৎ এমন এক কপিকল জাতীয় কায়দা ব্যবহার করা হ'ত যাতে অভিনেতাকে আরকেষ্ট্রা অথবা স্টেজ-মঞ্চ থেকে

একেবারে স্কীনের ছাদে তুলে নিয়ে যাওয়া যেত। একটা গ্রীক নাটকে দেখা যায় দার্শনিক সক্রেটিস একটা ঝুড়ির মধ্যে বসে পৃথিবীর আর স্বর্গের মাঝখানে আটকে আছেন—আর বসে বসে দর্শনের বই পড়ছেন।

ঘোরানো মঞ্চের ব্যবস্থাও কোন কোন ক্ষেত্রে শোনা যায়।

অ্যাসকাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস গ্রীসের নাট্যজগতে বিরাট নাম। এঁরা প্রধানত বিয়োগান্ত নাটকই দিয়েছেন। এ ছাড়াও আর এক ধরনের নাটক অভিনীত হ'ত। তাকে বলত কমেডি। কমেডিকে আমরা বলি মিলনান্তক নাটক। কিন্তু গ্রীক কমেডিগুলি ছিল সাধারণত প্রহসন। এই ধরনের নাটক সম্পর্কে অ্যারিষ্টোফিনিসের (খৃঃ পূঃ ৪৪৮-৩৮৫) নামই খুব বেশি শোনা যায়। এই নাটকে



অভিনেতা মুখোস প'রে ভাঁড়ের ধরনে অভিনয় করত।

অভিনেতা সাধারণত মুখোস প'রে ভাঁড়ের ধরনে অভিনয় করত আর গানের দলেরও মুখ থাকত নানা রকম মুখোসে ঢাকা। দেবতা বা বীরদের চরিত্র অবলম্বন করে খানিকটা মজা করাই ছিল এই ধরনের নাটকের উদ্দেশ্য।



অভিনেতারা রঙবেরঙের মজার পোশাক পরত।

এ ধরনের অভিনয় সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে ফুলদানি আর পানপাত্রে আঁকা ছবি থেকে জানা যায় অভিনেতারা রঙবেরঙের মজার পোশাক পরত।

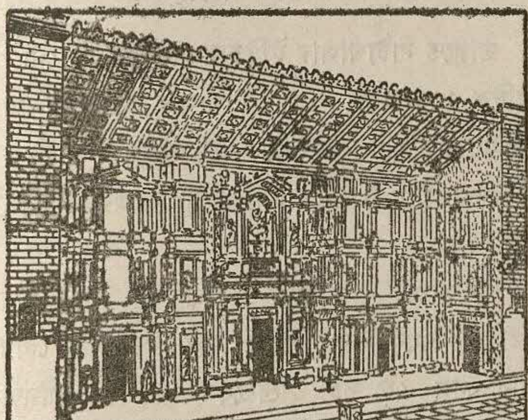
রোমের নাটক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ধর্মের যদিও বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না, তবু খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪ সালে প্রথম যখন রোম শহরে অভিনেতাদের আবির্ভাব হ'ল—সেটা হয়েছিল দেবতাদের খুশি করে তাঁদের অনুগ্রহ লাভ করে মড়ক থেকে বাঁচবার জন্য।

রোমান থিয়েটার

রোমের নাট্যশালা ও নাটকে গ্রীক প্রভাব ছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে রোমে গ্রীসীয় ধরনের নাট্যাভিনয়েরও অনেক বদল হয় আর তার ফলে রঙ্গমঞ্চ আর নাট্যশালার আকৃতি-প্রকৃতিরও বদল হতে থাকে। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই শ' বছর আগে প্লটিয়াস নামে এক রোমান নাট্যকার নাটক রচনায় অনেক নূতনত্ব এনে দেন। প্লটিয়াসের মৃত্যুর পর টেরেনস্ এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

এঁদের নাটক লেখা হয়েছিল গ্রীসীয় ধরনের নাচের চক্রে অভিনীত হবার উপযোগী করে নয়—উঁচু করে বানানো রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার জন্য।

রোমানদের একটা শখ ছিল বিরাট বিরাট প্রাসাদ বানানো। নাট্যশালাও তারা প্রাসাদের মতই বড় করে বানাত। টেরেনসের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দেড়শ' বছর আগে রোমে প্রথম পাথর দিয়ে গড়া নাট্যশালা তৈরি আরম্ভ হয়। রোমান সাম্রাজ্য যত বাড়তে লাগল ততই চলল রোমের জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের বাহুল্য। ঐ সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাগুলিও তৈরি হতে থাকে নানা কারুকার্য দিয়ে। সম্রাট্ অগাস্টাসের আমলে বিশাল পম্পির থিয়েটার পুনর্নির্মাণ করানো হয় আর তাঁর



রোমান নাট্যশালাগুলিও তৈরি হতে থাকে নানা কারুকার্য দিয়ে।

পালিত পুত্র ম্যাসেলার সম্মানের জন্য পাথর দিয়ে একটি থিয়েটার-গৃহ তৈরি করানো হয়।

রোমান নাট্যশালার সুদৃশ্য স্তম্ভরাজির পাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আসনের সারি কোন কোন নাট্যশালায় দেড় হাজার দর্শককে জায়গা দিতে পারত। একেবারে সামনে—অরকেষ্ট্রার ঠিক সামনের লাইনে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো আসনগুলি থাকত সেনেটের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত।

রঙ্গমঞ্চ হ'ত প্রায় তিনশ' ফুট লম্বা পাথরের তৈরি প্ল্যাটফর্ম। তার দু'পাশে আর পেছনে থামের সারি আর মূর্তি দিয়ে সাজানো থাকত। রোমের স্থাপত্যে মূর্তি খুব বেশি ব্যবহার করা হ'ত। এক কথায় রোমান থিয়েটার, রোমান মন্দির আর রোমান প্রাসাদ দেখতে প্রায় একই রকমের ছিল—সবই কারুকার্য আর ভাস্কর্যে ভরা—সবই জমকালো।

অথচ দর্শকের আসনের ওপরে এখানেও ছাদের ব্যবস্থা ছিল না। উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসতে হ'ত দর্শকদের।

নাট্যশালায় সকালের দিকে দেখানো হ'ত একটু ভারী অর্থাৎ গুরুগম্ভীর ধরনের নাটকের অভিনয়—কখনও পুরোনো গ্রীক নাটকের রোমান সংস্করণ। বিকেলে দেখানো হ'ত হাল্কা ধরনের জিনিস, মূক অভিনয় ইত্যাদি। কখনও কখনও কোন বিজয়োৎসবের পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ শত্রুসেনানী বা রাজাকে কিংবা সেনাপতিকে শোভাযাত্রা করে স্টেজের ওপর দিয়ে একধার থেকে আর একধারে হাঁটিয়ে নিয়ে দর্শকদের উল্লাসের খোরাক জোগানো হ'ত। এ ধরনের দৃশ্য দেখানো হ'ত নাটকের বিরতির সময়ে।

রোমান থিয়েটারে অনেক সময় এমন সব জিনিস দেখনো হ'ত যাতে দর্শকের তাক লেগে যায়। ভোজবাজীর মত অভিনেতাকে অদৃশ্য করে দেওয়া, উড়ন্ত দেবতার আবির্ভাব, স্টেজের ওপর বজ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদির খেলা রোমান

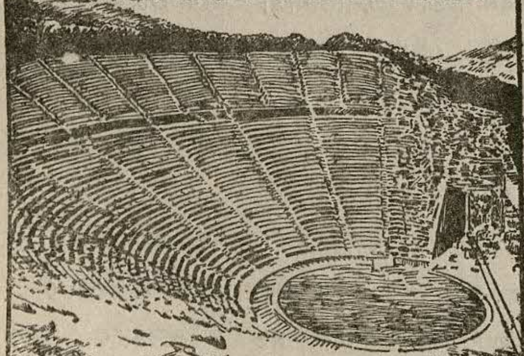
থিয়েটারে খুব প্রচলিত ছিল। রোমান রঙ্গমঞ্চের সামনে পর্দার ব্যবহার হ'ত। দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে পর্দা তুলে দেওয়া হ'ত—অভিনয় শেষ হলে আবার পর্দা ফেলে দেওয়া হ'ত।

গ্রীক ও রোমান অভিনয়ে তফাৎ

কিন্তু নাটকের মান হিসেবে গ্রীক থিয়েটারের তুলনায় রোমান থিয়েটার বরাবরই ছিল নীচু। গভীর আবেগের বিন্যাসের চেয়ে নানারকম চমক-জাগানো দৃশ্যই রোমানরা পছন্দ করত বেশি—গভীরতার চেয়ে জাঁকজমকেরই বেশি আদর ছিল দর্শকদের কাছে। তবে গ্রীসের নাট্যাভিনয়ে নাচগানের প্রাধান্য ছিল, রোমান থিয়েটারে ছিল অভিনয়ের।

রোমেই প্রথম রাত্রে অভিনয় আরম্ভ হয়। সে অভিনয় হ'ত মশাল জ্বেলে।

রোমের ইতিহাসে একটা সময় আসে যখন লোক নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। দাঙ্গা, খুন, রক্তপিপাসা সাধারণের মধ্যে বেড়ে ওঠে। নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যশালা তাই পরে গ্ল্যাডিয়েটারদের যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। অবশ্য ঐ সব রঙ্গমঞ্চের পরিসর এ ধরনের দৃশ্যের পক্ষে অত্যন্ত স্বল্প ছিল, তাই পরে কলোসিয়ামের সৃষ্টি। কলোসিয়ামের কথা তোমরা ইতিহাসের কথায় পড়েছ। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮৩-৫৮৪)।



কলোসিয়ামের ভিতরে দর্শকদের বসবার আসন।

রোমান নাটকের পরিণতি নিষ্ঠুর হত্যালীলায়, প্রহসনের সমাপ্তি অশ্লীল ভাঁড়ামিতে। অবশেষে খৃষ্টান ধর্মের জোয়ারে রোমের নাট্যাভিনয় কোথায় লুপ্ত হ'ল—বহুদিন পর্যন্ত আর তার কোন হদিশ মেলে নি।

প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়

ভারতে নাট্যশালার ইতিহাসও অতি পুরোনো। বৈদিক যুগে অবশ্য কোন নাট্যশালার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে নাটক অভিনয় সম্বন্ধে পুরাণ ইত্যাদিতে যা দেখা যায় তাতে নাট্যাভিনয়ের জন্মের ইতিহাস এই রকম:

দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন এমন এক শিল্পের সৃষ্টি করতে যা চোখ আর কান এই দুই ইন্দ্রিয়কেই একসঙ্গে আনন্দ দিতে পারে। এর ফলে ব্রহ্মা চারিটি বেদ থেকে আবৃত্তি, গান, অনুকরণ (মিমেটিক আর্ট) এবং আবেগ ইত্যাদি একত্র করে নতুন এক শিল্পাঙ্গ সৃষ্টি করলেন।

অন্যান্য দেবতারা অন্যান্য অংশ দিলেন—শিব দিলেন নাচ। ব্রহ্মা ভরত মুনিকে আদেশ করলেন নাট্যশালা তৈরি করতে।

এই নাট্যশালা তৈরি করতে দেওয়ার পেছনে আরও এক কাহিনী আছে। দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের গল্প তো জানই। দেবতারা অসুরদের ওপর জয়লাভ করে এক

উৎসব করছিলেন। অসুরবিজয়ের কাহিনী নিয়ে এক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। নাটক আরম্ভ হবে—এমন সময় অসুরেরা হৈ হৈ করে এসে দিল অভিনয় পণ্ড করে। রঙ্গমঞ্চে উঠে তারা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রহারের চোটে একেবারে অজ্ঞান করে দিল। এমন সময় এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি জর্জরদণ্ড দিয়ে বিঘ্নকারী অসুরদের হটিয়ে দিলেন। এই অবস্থায় ভরত ব্রহ্মার কাছে নাট্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আবেদন জানালে ব্রহ্মা নাট্যশালা বানাবার আদেশ দেন আর বিশ্বকর্মাকে নাট্যগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

নাট্যমণ্ডপ

এই পরিকল্পনা অনুসারে নাট্যমণ্ডপ তিন রকম হ'ত—বিকৃষ্ট, চতুরস্র আর ত্র্যস্র অথবা ভাষান্তরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও অবর।

জ্যেষ্ঠ হ'ত ১০৮ হাত দীর্ঘ, মধ্যম ৬৪ হাত আর অবর ৩২ হাত। এই বিবিধ নাট্যগৃহের মধ্যে দেবতাদের জন্য জ্যেষ্ঠ, রাজাদের জন্য মধ্যম আর সাধারণ লোকের জন্য অবরগৃহ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ত্র্যস্র শব্দের মানে ত্রিকোণাকৃতি। নাট্যগৃহের মধ্যে ত্রিকোণ একটি রঙ্গপীঠ নির্মাণ করা হ'ত। এতে দরজা থাকত দু'টি। একটি প্রেক্ষাগৃহের কোণে, আর একটি থাকত রঙ্গপীঠের পেছনে।

তবে চতুরস্র তথা মধ্যমটিই মর্ত্যের মানুষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হ'ত। কারণ তার যথোপযুক্ত গঠন সংস্থানের জন্য অভিনয়ের গান আরো বেশি সুশ্রাব্য হ'ত। অতিরিক্ত বড় নাট্যশালা হলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরকে অস্বাভাবিক উঁচু গলায় গান ও সংলাপ প্রয়োগ করতে হয়—যার ফলে বেসুরো শোনাবার আশঙ্কা থাকে, আর যা কিছু চেষ্টা সব যদি চেঁচানোতেই বেরিয়ে যায় তবে ভাবের অভিব্যক্তি চোখেমুখে সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে না। তাই চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহই প্রশস্ত বলে মহর্ষি ভরত তার পরিমাপ ও কারণ নির্দেশ করেছেন।

রঙ্গালয়ের একাংশে ছিল অভিনয়ের জায়গা আর একাংশ দর্শকদের জন্য থাকত। দর্শকদের বসবার জায়গাগুলি জাতি হিসেবে ভাগ করে থাম দিয়ে নিশানা দেবার নির্দেশ ছিল। দর্শকদের সামনে ৬৪ বর্গ হাত অভিনয়ের জায়গা—তার নাম রঙ্গ। এই রঙ্গ নানা ছবি আর মূর্তি দিয়ে সাজানো থাকত। রঙ্গের শেষাংশকে বলত রঙ্গশীর্ষ। রঙ্গের পেছনে থাকত যবনিকা—একে বলা হ'ত 'পাটি' অথবা 'অপাটি'। একে তিরস্করণী বা প্রতিশিরাও বলত। যবনিকার অন্তরালে ছিল নেপথ্যগৃহ। মোটামুটি পাঁচটি অংশ থাকত রঙ্গমঞ্চে—রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, নেপথ্য, মঞ্চধারণী ও প্রজামণ্ডপ।

দোতলা স্টেজ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দোতলা স্টেজের কথা আছে। এর দৃশ্যপটগুলি নাড়াচাড়া করা যেত না। সিনের চারপাশ আঁকা থাকত। ভিতর দিক্ থেকে দু'পাশে দু'টি দরজা থাকত, তাতে পর্দা দেওয়া থাকত। সেই পর্দা সরিয়ে অভিনেতা স্টেজে ঢুকত। অভিনয় আরম্ভ হবার আগে জর্জরের পূজো হ'ত। জর্জর নাট্যের দেবতা। সূত্রধার তাঁর পূজো করত। তারপর জর্জরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া

হ'ত আর সূত্রধার নান্দীপাঠ করত। নান্দীপাঠ দেবতা ইত্যাদির স্তুতি। নান্দীপাঠের পর নাটকের অভিনয় আরম্ভ হ'ত। পাত্রপাত্রীরা স্টেজে ঢুকত।

ভরতেরও আগে

ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে যদিও ভারতের নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তবু এ কথা ঠিক যে ভরতের বহু আগেই ভারতবর্ষে নাট্যকলার প্রসার হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়—যখন বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর দুই শিষ্য মোগ্‌গলায়ন ও উপতিষ্য সকলের সম্মুখে অভিনয় করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের নাট্যকার

প্রাচীন নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে ভাসের নামই সবচেয়ে প্রথম মনে আসে। এ ছাড়া কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক এখনও সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করা হয়—কোন কোনটা অভিনীতও হয়। নাটকের সংলাপে কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করা হ'ত। যেমন, রাজা বা মুনিঋষিরা সংস্কৃতে কথা বলতেন আর স্ত্রীচরিত্রেরা অথবা বিদূষক এবং গ্রাম্য লোকেরা কথা বলতেন প্রাকৃতে।

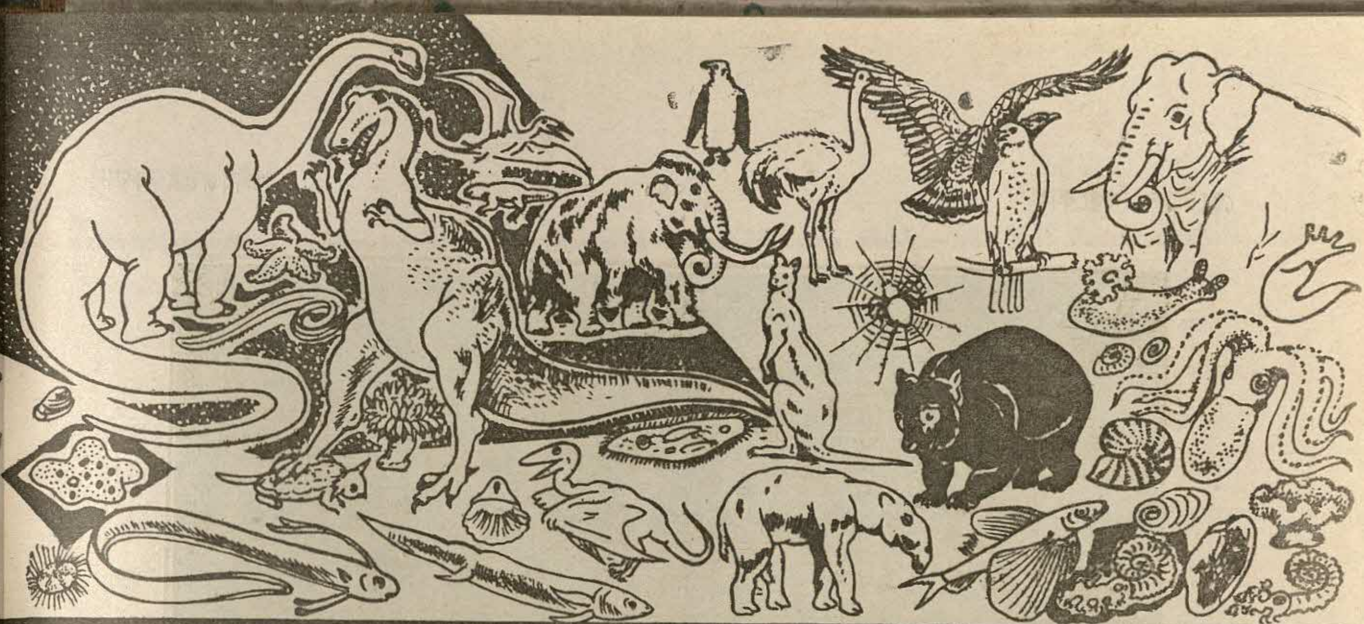
কালিদাসের শকুন্তলা (আসল বইটার নাম অভিজ্ঞানশকুন্তলম্) পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে মহাভারত থেকে। মহাকবি ভাস কালিদাসেরও আগেকার নাট্যকার। তাঁর লেখা বারোখানা নাটক পাওয়া গেছে। তার মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তাই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। বাসবদত্তার আখ্যান বৌদ্ধ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। ইতিহাস ও সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসম্ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৪৮৬)। আর একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক হচ্ছে রাজা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্—অর্থাৎ মাটির খেলনা গাড়ি।

বিদেশী প্রভাব

প্রাচীন ভারতের রঙ্গমঞ্চের ওপর গ্রীক ও রোমান প্রভাবের কথা অনেক ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন যে অংশে তিনি অধিকার বিস্তার করেছিলেন সে অংশে গ্রীক নাটকের অভিনয় হয় বলে কথিত আছে। এ ছাড়া গ্রীক মিনাণ্ডারের শাসনকালে গ্রীক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তবে এর ফলে ভারতীয় নাট্যশিল্পে গ্রীক প্রভাব কতখানি এসেছিল তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখনও পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের কোন রঙ্গালয়ের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করে আমাদের সামনে ধরে দেন নি।

সেকালের নটনটীর সামাজিক সম্মান বিশেষ ছিল না। মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করত। অভিনয় শেখার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষার্থীরা সেখানে আচার্যের কাছে অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করত।

মুসলমান আমলে উত্তর ভারতে নাট্যশালা লুপ্ত হ'ল—লুপ্ত হ'ল অভিনয়ও। ফলে মন্দিরে দেবদাসীদের নাচ, কীর্তনাদির মধ্যেই আত্মগোপন করে রইল প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার মহিমা।

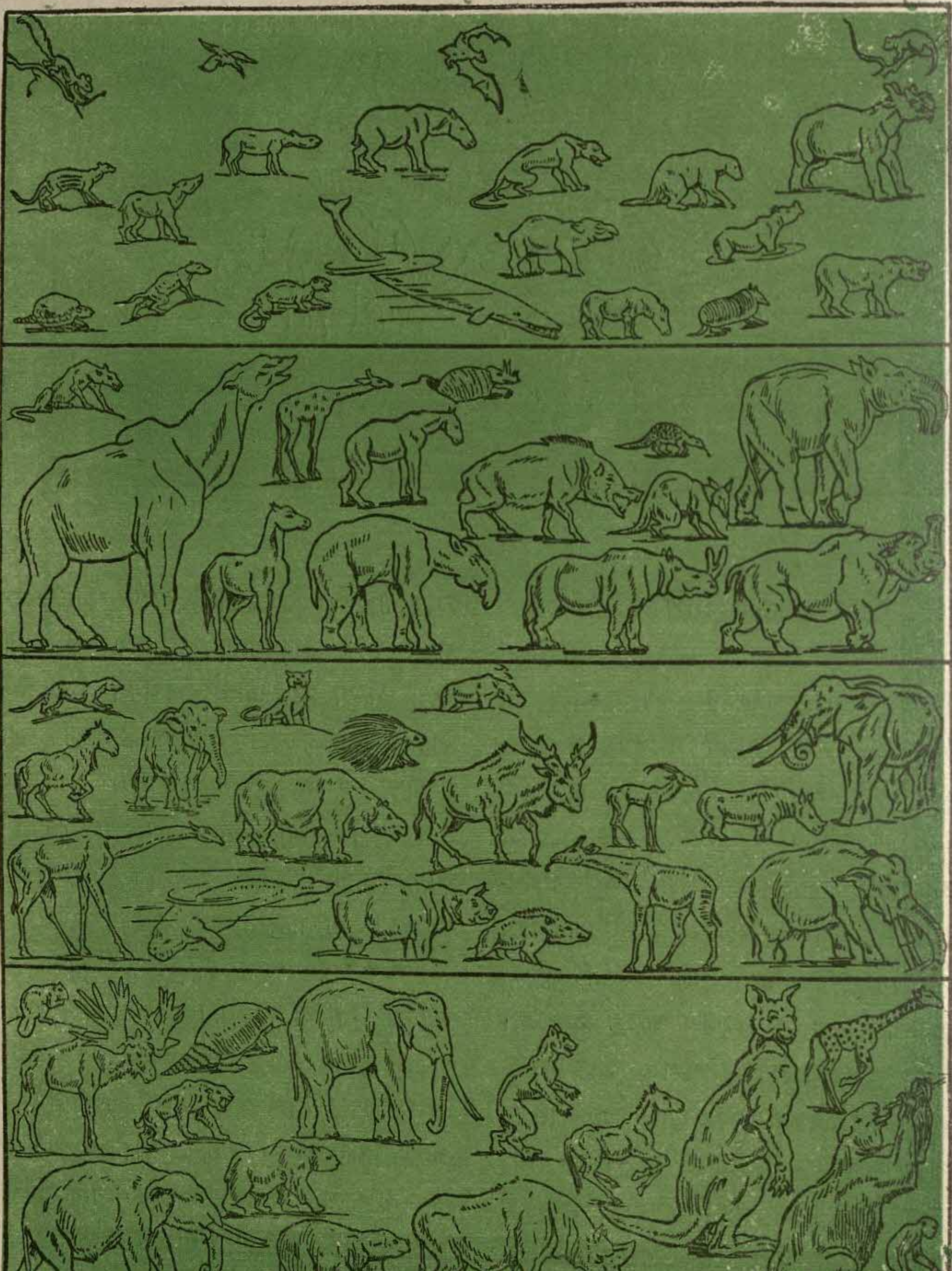


জীবজন্তুর কথা

হাড়ওয়ালা প্রাণী

এর আগে আমরা নানা রকমের নিরস্থিক অর্থাৎ হাড়-ছাড়া প্রাণীদের কথা আলোচনা করেছি, এবারে চলে আসব অস্থিক বা হাড়-ওয়ালা প্রাণীদের কথায়। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় 'ভার্টিব্রেট' অর্থাৎ মেরুদণ্ডী বা শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী। আধুনিক প্রাণি-বিজ্ঞানীরা জীবজন্তুদের যে ২২টি পর্ব বা ফাইলামে ভাগ করেছেন তার মধ্যে ২১টিই ইনভার্টিব্রেট—হাড়-ছাড়া প্রাণী, সে কথা তো আগেই বলেছি। কেবল ২২ নম্বরেরটি আলাদা। এই পর্বের প্রাণীদের শরীরে একটা করে শিরদাঁড়া কিংবা অন্তত পক্ষে একটি নরম কিন্তু মজবুত দণ্ড থাকে—যাকে বলা হয় নোটো কর্ড। সেজন্য আজকাল এই পর্বটির বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে কর্ডাটা। এই কর্ডাটাদের নিয়েই এবার আমাদের গল্প শুরু।

কর্ডাটারাও কিন্তু সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়—কম করে ৪০,০০০ রকমের। ছোট্ট ছোট্ট ক্ষুদে ক্ষুদে জীব থেকে শুরু করে অতিকায় বহু প্রাণী এর মধ্যে পড়ে, মায় মানুষ অবধি। এদের বেশির ভাগেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাকি ২১টি পর্বের প্রাণীদের তুলনায় অনেক উন্নত। অবশ্য এদের মধ্যেও উঁচু জাত, নীচু জাত আছে। যেমন ধর, অ্যাক্রোনিয়া জাতের কর্ডাটা। এরা বেশ নীচু জাতের। ব্যালানোগ্লাস হচ্ছে এদের একটি নমুনা—দেখতে অনেকটা কেঁচোর মত, থাকে সমুদ্রের বালির তলায়। এদের মাথায় কোনও করোটি নেই, কাজেই মগজও নেই। এই রকম অ্যাসিডিয়াও বেশ নীচু জাতের কর্ডাটা। এদের নোটো কর্ড জন্মের আগে ভ্রূণ অবস্থায় দেখা গেলেও জন্মের পর আর দেখাই যায় না। কিন্তু উঁচু জাতের কর্ডাটা, যাদের বৈজ্ঞানিক নাম ক্রেনিয়াটা, অনেক উন্নত স্তরের জীব। এরাই আসল মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রেট। এদের মগজ, স্নায়ুমণ্ডলী এবং আরও নানা শারীরিক বৈশিষ্ট্যই



বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতের প্রাণীরা কেমন করে,তাদের চেহারা বদলাল

তার প্রমাণ। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের দেখতে পাওয়া যায়—জলে, স্থলে, আকাশে। সকলের সম্বন্ধে তো বলা সম্ভব নয়, তাই বেছে বেছে এই দলের কতকগুলির কথা বলব, এবং প্রধানত স্থলচর প্রাণীদের কথাই বলব,—যদিও মাছই হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মাছ জলচর প্রাণী, আর জলচর প্রাণীদের কাহিনী বলা হবে পরবর্তী খণ্ডে, যদিও কথা প্রসঙ্গে ওদের অনেকের কথা ইতিপূর্বেও কিছু কিছু বলা হয়েছে।

উভচর প্রাণী—অ্যাম্‌ফিবিয়ান্‌স্‌

সৃষ্টির গোড়ায় প্রথম প্রাণীর উদ্ভব হয় জলে। তারপর এক সময়ে, সেও আন্দাজ ৩০ কোটি বছর আগে, এদের কতক ডাঙ্গায় উঠে আসতে আরম্ভ করে। কেন এসেছিল সে সম্বন্ধে কতকগুলি কারণ অনুমান করা যায়। হয়তো খরায় অনেক জায়গার জল শুকিয়ে যাওয়ায় বাঁচতে হলে কাদায় বা ডাঙ্গায় উঠে না এসে উপায় ছিল না। তা ছাড়া জলে ছিল বড় বড় জানোয়ার—যারা অনেকেই ওদের দিয়েই জলযোগ করত। তাই আত্মরক্ষার তাগিদেই হয়তো জল থেকে উঠে আসা সঙ্গত মনে হয়েছিল। ডাঙ্গায় তখন ওদের ওপর কর্তৃত্ব করে এমন বড় জানোয়ার একটিও ছিল না, কাজেই সেখানে এসে ওরাই হ'ল রাজা—যাকে বলে একচ্ছত্র সম্রাট্‌।



মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী

অবশ্য এই জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসা একদিনে হয় নি—একটু একটু করে লক্ষ লক্ষ বছর ধরেই হয়তো ঐ কাজ সমাধা হয়েছে। এদের কথা তোমরা এ বইএর প্রথম খণ্ডেই পড়েছ। প্রথম যারা এল তারা তখনও জলের মায়া পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাই কখনও জলে কখনও ডাঙ্গায় এদের দেখা যেত। কেউ কেউ জীবনের প্রথম দিক্‌টা জলে কাটিয়ে শেষে পুরোপুরি ডাঙ্গার জীব হয়ে যেতে লাগল। যখন জলে থাকত তখন জলের ভিতরে থেকে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ঝিল্লি বা কানকোর দরকার হ'ত, ডাঙ্গায় এসে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার জন্য তার বদলে দেখা দিল ফুস্‌ফুস্‌। এদেরকেই আমরা বলি উভচর প্রাণী (অ্যাম্‌ফিবিয়ান্‌স্‌)। ক্রমবিকাশের ফলে প্রাণিদেহে কি করে এই পরিবর্তন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে সে কথাও তোমাদের আগে বলেছি।

প্রথম প্রথম এই উভচর প্রাণীদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। পরে এদেরই আবার কতক সরীসৃপ হয়ে যায় এবং তাদেরও কতক পরে পাখি আর স্তন্যপায়ীতে পরিবর্তিত হয়। এখনও যারা পৃথিবীতে উভচর প্রাণী হয়ে বাস করছে তাদেরকে তিনটি প্রধান দলে ভাগ করা যেতে পারে— (১) ব্যাঙ, (২) স্যালামাণ্ডার, (৩) সিসিলিয়ান্‌। এদের মধ্যে ব্যাঙই আমাদের কাছে সব চাইতে পরিচিত।

ব্যাঙের গল্প

জন্মের সময় ব্যাঙ পুরোপুরি জলের প্রাণী। তখন তাকে আমরা ব্যাঙ বলি না, বলি ব্যাঙাচি। দেখতে তখন সে অনেকটা মাছেরই মত; পা-টা কিচ্ছু নেই, আছে একটা লম্বা লেজ। মাছেরই মতন সে তখন কানকো দিয়ে জলের তলায় নিঃশ্বাস নেয়, শ্যাওলাট্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে। অবশ্য মরা জলজীবের মাংসের টুকরো পেলেও খেতে আপত্তি নেই তার।

তার পরেই তার দেহে শুরু হয় পরিবর্তন। মুখটা চ্যাটাল হয়ে চওড়া হয়ে যায়, কানকো চামড়ায় ঢাকা পড়ে যায়; লেজের পাশ দিয়ে প্রথমে দেখা দেয় পেছনের দু'টি পা, তার পর সামনের দু'টি পা। লেজ আস্তে আস্তে খসে পড়ে। দেখা দেয় ফুস্‌ফুস্‌। কানকোর বদলে এই ফুস্‌ফুস্‌ দিয়েই তখন নিঃশ্বাস নিতে হয় সোজা বাতাস থেকে। তখন আর তাকে জলের তলায় সর্বক্ষণ পড়ে থাকলে চলবে না, কারণ



গেছো ব্যাঙ

তখন সে স্থলচর প্রাণী; আর ব্যাঙাচি নয়—পুরোদস্তুর ব্যাঙ। লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে সে ডাঙ্গার ওপর চলাফেরা করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের এই যে রূপান্তর এতে ওদের থাইরয়েড গ্রন্থির ভূমিকা খুব বেশি।

ব্যাঙ নানা জাতের আছে—কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ ইত্যাদি বহু জাতের ব্যাঙের খবর এ পর্যন্ত জানা গেছে। কুনো ব্যাঙের চেহারা বড় কদাকার—সারা গা ভর্তি আঁচিল। এরা দেয়ালের কোণে, ভাঙ্গা ফাটলে, গর্তে বা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। স্যাঁৎসেঁতে জায়গাই এদের বেশি পছন্দ। প্রচণ্ড রকম লাফাতে পারে এরা, আর শিকারে বেরোয় রাত্রে। শিকার মানে নানা রকম পোকামাকড়, কেঁচো, ফড়িং ইত্যাদি। শিকার করার ধরনটা কিন্তু ভারি মজার। এদের জিভ থাকে মুখের ভিতর সামনের দিকে আটকানো, কিন্তু পেছন দিক্‌টা খোলা। শিকারের সন্ধান পেলেই এরা একটু দূরে বসে অপেক্ষা করে, তারপর এক সময় সড়াৎ করে জিভটা ছুঁড়ে দেয় শিকারের দিকে। জিভটা ভীষণ আঠাল, কাজেই শিকার সহজেই আটকে যায় সেই জিভে। এবার জিভটা মুখের ভিতর টেনে নিলেই হ'ল।

সোনা ব্যাঙ দেখতে এদের চাইতে অনেক ভালো, আকারেও বড়। গায়ের রং একটু সোনালি গোছের, তাতে কালো কালো ডোরা। তবে আঁচিলটাচিল কিছু নেই। এরা অবশ্য পুকুর বা ডোবার জলেই থাকতে ভালোবাসে। হাঁসের মত এদের পায়ের পাতা চামড়া দিয়ে যোড়া থাকায় সাঁতার কাটতে ভারি সুবিধে। গেছো ব্যাঙ গাছে উঠতে পারে। এদের পায়ে এক রকম মাংসপিণ্ড বসানো, যা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরা বেশ সহজ।

ব্যাঙের ডাক নিশ্চয়ই শুনেছ। বিশেষ করে বর্ষাকালে। ডাকটা তেমন মধুর না হলেও কবিরা ও নিয়েও কবিত্ব করতে ছাড়েন নি। বৈষ্ণব কবি 'মত্ত দাদুরীর' ডাকে পুলকিত হয়ে উঠেছেন; রবীন্দ্রনাথের "দাদুরী ডাকিছে সঘনে" হয়তো তোমাদের মুখস্থ। "দাদুরী" ব্যাঙেরই আর একটা ভালো নাম। মেয়ে-ব্যাঙই বলা উচিত। তবে মেয়ে-ব্যাঙেরা একেবারেই চুপ্‌চাপ থাকে—চেঁচামিচি করে কিন্তু পুরুষ ব্যাঙেরা। অবশ্য ঐ ডাকের একটা উদ্দেশ্য আছে। ডিম পাড়ার আগে সঙ্গিনীদের আকৃষ্ট করবার জন্যই বিশেষ করে এই ডাক বা গান—যা খুশি বলতে পার। বিজ্ঞানীরা বলেন, এক এক জাতের ব্যাঙের ডাক এক এক রকম। আমরা না বুঝলেও ওরা নিজেরা ঠিকই বুঝে নেয়। ডাকবার সময় ব্যাঙের চেহারাটাও দেখবার মত। বেশির ভাগ ব্যাঙেরই গলার নীচে একটা থলি থাকে, ডাকবার সময় এই থলিতে বাতাস ঢুকে সেটা বেলুনের মত ফুলে ওঠে। অবশ্য শত্রু আক্রমণ করলে ওরা যখন চেঁচায়, সে ডাক একেবারেই আলাদা। তাকে যেন গান বলে ভুল ক'র না।

বর্ষাকালে মেয়ে-ব্যাঙেরা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা অর্থাৎ ব্যাঙাচি বেরোতে কোন কোন জাতের সময় লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আবার কারো কারো লাগে অনেক বেশি। ডিমের সংখ্যাও তাই। কোন কোন জাতের ব্যাঙ একসঙ্গে ২০/২৫ হাজার ডিম পাড়তে পারে,

কেউ পাড়ে কয়েকশ' মাত্র। আবার একসঙ্গে মাত্র একটি করে ডিম পাড়ছে এমন ব্যাঙেরও সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে।

স্যালামাণ্ডার আর সিসিলিয়ান্

ব্যাঙের মত স্যালামাণ্ডাররাও প্রথমে জলের প্রাণী, তার পর ডাঙ্গার। কিন্তু ব্যাঙের সঙ্গে চেহারার মিল নেই ওদের। মিল আছে বরং টিকটিকির সঙ্গে। ঐ রকম লম্বা লেজ—সামনে পেছনে চারটে পা। তবে কারো কারো পা খুবই ছোট, কারো হয়তো পেছনের পা নেই-ই।



এক জাতের স্যালামাণ্ডার—এগুলোর সঙ্গে অবশ্য টিকটিকির মিল সামান্যই

কিন্তু টিকটিকির মত ওদের শরীর শুকনোও নয়, আঁশও নেই গায়ে। এদের গা-ভর্তি অজস্র গ্রন্থি—যা থেকে রস বেরিয়ে চামড়া সর্বদাই ভিজে ভিজে থাকে। ব্যাঙদের তুলনায় সংখ্যায় এরা অনেক কম—পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই এদের দেখা পাবে না। তবু বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জাতের স্যালামাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন। সবচেয়ে বড়গুলো ৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। এই অতিকায় স্যালামাণ্ডারের দেখা পাওয়া যায় চীনে আর জাপানে। উত্তর আমেরিকায়ও ২ ফুট লম্বা স্যালামাণ্ডার পাওয়া গেছে। এরা অধিকাংশ সময়ে জলেই থাকে। তবে বেশির ভাগ স্যালামাণ্ডারই অনেক ছোট—বড় জোর ৫/৬ ইঞ্চি।

ব্যাঙের মত স্যালামাণ্ডার ডাকতে পারে না—কিন্তু ওদেরও ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। অবশ্য ডিমের সংখ্যা ব্যাঙের মত অত বেশি নয়। খুব বেশি হলে ৫/৬ শ',—সাধারণতঃ আরও অনেক কম,—২০/২৫টাও হয়। তবে ব্যাঙাচি যেমন ব্যাঙ থেকে দেখতে আলাদা, বাচ্চা স্যালামাণ্ডার সে রকম নয়। আল্প্স্ অঞ্চলে এক জাতের স্যালামাণ্ডার আছে যারা ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চা দেয়।

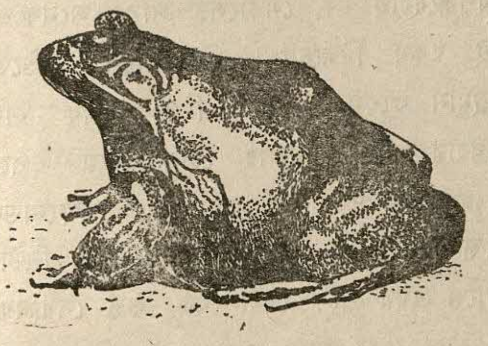
সিসিলিয়ান্ বর্গের উভচরেরা সংখ্যায় সবচেয়ে কম। সবশুদ্ধু গুটি ৭০ জাতের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ইথিওফিস্ এই জাতের একটি। এরা থাকে গরম দেশে। এদের পা নেই, সারা গায়ে আংটির মত দাগ—দেখতে অনেকটা সাপ বা কেঁচোর মত। মাটির তলায় গর্ত করে বাস করে বলে এদের চোখ প্রায় লোপ পেয়ে গেছে—অন্ধই বলা যায় এক রকম। মায়েরা ডিম পেড়ে সাধারণত সে ডিমগুলো ছাড়তে চায় না, শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই ফাঁকে রেখে দেয়—যত দিন না সেগুলো ফুটে বাচ্চা বেরুচ্ছে। কোন কোন জাতের সিসিলিয়ানকেও ডিমের বদলে সরাসরি বাচ্চা দিতে দেখা গেছে।

লম্বা ঘুম, খাওয়াদাওয়া ও আত্মরক্ষা

উভচর প্রাণীদের সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে, ওদের শীতকালের ঘুম। শুধু উভচর নয়, অনেক সরীসৃপ এবং কোন কোন জাতের স্তন্যপায়ীরও এ অভ্যাস আছে। শীত এলেই ওরা যতটা সম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে একটা নিরিবিলি গর্তটর্ত বেছে নিয়ে

লম্বা ঘুম লাগায়। জেগে ওঠে একেবারে সেই শীতের শেষে। এই সময় ওরা কিছু খায় না, সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া—যেমন শ্বাসকর্ম, রক্ত-সঞ্চালন ইত্যাদি অসম্ভব রকম ক্ষীণ হয়ে আসে, একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ে ওরা। এই সময়ে শরীরে সঞ্চিত খাদ্যই ওদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখে। শীতের পরে ওদের ঘুম ভাঙ্গে। তখন যেন আবার নতুন জীবন পেয়ে, প্রচণ্ড খিদে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরের পৃথিবীতে। খুব গরম দেশের উভচরেরা কেউ কেউ গ্রীষ্মকালেও এই রকম ঘুম লাগায়। তারা অবশ্য আর শীতকালে ঘুমোয় না।

উভচর প্রাণীরা সকলেই প্রায় আমিষ-ভোজী—বিশেষ করে পোকামাকড় ওদের প্রিয় খাদ্য। তবে কেউ কেউ নিরামিষও খায়। ব্যাঙেরা এ বিষয়ে অনেক উদার—যা পায় তা-ই খায়। বুল্ ফ্রগ্ নামে এক জাতের অতিকায় ব্যাঙ আছে,



বুল্ ফ্রগ্

—তারা সুবিধে পেলে পাখি, ইঁদুর, মাছ, এমন কি সাপ ধরেও খায়। একবার এই রকম একটা ব্যাঙকে বাদুড় ধরে খেতেও দেখা গিয়েছিল। তবে পোকামাকড়ই ওদের প্রধান খাদ্য। এমনও দেখা গেছে যে ফসল-নষ্ট-করা পোকামাকড়ের উৎপাত এড়াবার জন্য চাষের ক্ষেতে ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে উপকার পাওয়া গেছে; ব্যাঙেরাই ঐ সব পোকামাকড় খেয়ে নির্মূল করে দিয়েছে।

বেঁচে থাকতে হলে আত্মরক্ষাও একটা বড় সমস্যা। খাদ্যসংগ্রহের জন্য যেমন অপরকে আক্রমণ করতে হবে তেমনি শত্রু আক্রমণ করলে নিজেকে বাঁচাতেও হবে। বিশেষ করে ব্যাঙের তো শত্রুর অভাব নেই! অতিকায় ব্যাঙ সাপ ধরে খেলেও সাধারণ ব্যাঙেরা সাপেদেরই একটি প্রিয় খাদ্য। বড় বড় মাছেরাও ওদের খেতে ভালোবাসে, তা ছাড়া অনেক পাখি বা ছোটখাটো হিংস্র প্রাণীদেরও ওদের ওপর লোভ আছে। এমন কি মানুষও বাদ যায় না। পৃথিবীর নানা দেশের লোকেদের মধ্যে ব্যাঙ খাবার চলন আছে। সুকুমার রায়ের সেই কবিতাটা পড়েছ তো?—"ব্যাঙ খায় ফরাসীরা, খেতে নয় মন্দ।" চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি আরও অনেক দেশে ব্যাঙ মুখোরোচক খাদ্য। এখন আমেরিকায়ও শুরু হয়েছে ব্যাঙ খাওয়া।

ব্যাঙের আত্মরক্ষার প্রধান উপায় ওর প্রচণ্ড লাফাবার শক্তি। তা ছাড়া অনেক ব্যাঙের গায়ে থাকে বিষাক্ত গ্রন্থি। তা থেকে যে রস বেরোয় তার বিষই ওদের রক্ষা করে। সে বিষ সময় সময় এত তীব্র হয় যে ওদের আক্রমণ করলে ঐ বিষের জ্বালায় আক্রমণকারী মারা পর্যন্ত যেতে পারে। আমেরিকার আদিবাসীরা এই সব বিষাক্ত ব্যাঙের বিষ সংগ্রহ করে তীরের ফলায় লাগিয়ে নিত শত্রু নিপাতের জন্য। এখনও জংলী জাতের মধ্যে কারো কারো ঐ অভ্যাস আছে।

এ রকম বিষাক্ত গ্রন্থি শুধু যে অনেক ব্যাঙের গায়ে থাকে তা নয়—অনেক স্যালামাণ্ডারের গায়েও থাকে।

সরীসৃপের কথা

সরীসৃপ বলতে আমরা সেই সব প্রাণীকেই বুঝি যারা বুকে হেঁটে চলে, যাদের রক্ত ঠাণ্ডা, সারা গায়ে আঁশ বা কাঁটা বসানো আর যাদের বাচ্চা হয় ডিম থেকে। এদের কেউ কেউ জলে বাস করলেও এরা উভচর প্রাণীদের মত নয়—কানকো দিয়ে নিঃশ্বাসও নেয় না। টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর, কাছিম—এরাই হচ্ছে এ যুগের সরীসৃপ। সাপেরাও তাই।

এমন একদিন গেছে যেদিন পৃথিবীতে এই সরীসৃপদেরই ছিল রাজত্ব, ওদের চাইতে শক্তিশালী জীব ডাঙ্গায় একটিও ছিল না। জিরাফের চাইতেও উঁচু কিংবা তিমির চাইতেও লম্বা সেকালকার সেই অতিকায় সরীসৃপদের কথা তোমাদের আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১১৮)। আমাদের ভাগ্য ভালো যে এদের খপ্পরে আমাদের পড়তে হয় নি, পৃথিবীতে মানুষ আসার অনেক আগেই ওরা লোপ পেয়ে গেছে। এখন ওদের বংশে যারা আছে তারা ওদের তুলনায় নেহাৎই তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীব।

জ্যান্ত ফসিল—স্ফেনোডন

সেকাল আর একালের সরীসৃপদের চেহারায়ও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনোসরদের ছবির সঙ্গে এখনকার সরীসৃপদের চেহারা মিলিয়ে দেখলেই তা টের পাবে। কিন্তু এরই মধ্যে এক জাতের সরীসৃপ এখনও টিকে আছে যাদের চেহারা মোটেই বদলায় নি, লক্ষ লক্ষ বছর আগে যেমনটা ছিল তেমনি রয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা তাই এদের বলেন "জ্যান্ত ফসিল"। এদের আসল নাম স্ফেনোডন বা হাটেরিয়া।

স্ফেনোডন কোনও বিরাট জানোয়ার নয়—লম্বায় বড় জোর দু' ফুট কি আড়াই ফুট হবে। গিরগিটির সঙ্গে চেহারায় খানিকটা সাদৃশ্যও আছে। হাল্কা কালচে-সবুজ রংএর ওপর সাদা সাদা দাগ, পেটের তলাটা সাদা। পা, নখ টিকটিকির মত, আর সারা গা আঁশে ভর্তি। তবে পিঠের ওপর কাঁটা বসানো।

স্ফেনোডনের বিশেষত্ব হচ্ছে ওদের দাঁতের গড়ন আর কপালের ওপর একটি বাড়তি চোখ। অবশ্য এই 'তৃতীয় নয়ন' দিয়ে সে আর এখন দেখতে পায় না, সেটি এখন কপালের ওপর শোভা হয়েই রয়েছে। কিন্তু এক কালে ওর পূর্বপুরুষেরা এই তৃতীয় চোখ দিয়েও বেশ দেখতে পেত তা বোঝা যায়। অব্যবহারের ফলে সে ক্ষমতা ওরা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু ওদের পূর্বপুরুষেরাই নয়, সেকালের আরও অনেক জীব এই রকম তিনচোখো ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। দু'চোখ দিয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখবার সময়ে কপালের চোখ দিয়ে ওপরের দিকেও তাকাতে পারত তারা। এই স্ফেনোডনও কিন্তু এখন আর বেশি নেই। এক সময়ে নিউজিল্যাণ্ডে ওদের প্রচুর দেখা যেত কিন্তু সেখানকার মাওরীরা মেরে মেরে ওদের প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে। এখন ঐ নিউজিল্যাণ্ডেরই আশেপাশে ২।১টি নির্জন দ্বীপে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। দিনের বেলা গর্তে লুকিয়ে থাকে, রাত্রি হ'লে পোকামাকড় শিকার করতে বেরোয়। প্রাণিবিজ্ঞানের দিক্ থেকে স্ফেনোডনকে একটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য নমুনা বলতে হবে। তাই

এদের বংশ যাতে লোপ না পায় তার জন্য বিজ্ঞানীরা খুব সতর্ক।

টিকটিকি আর তার জাতভাই

তোমাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে ছোট মেয়েরা, টিকটিকি দেখলে খুব ভয় পাও। কিন্তু, সত্যি, ওদের ভয় পাবার কিছু নেই। ভারি নিরীহ জীব এরা—মানুষের কোন অপকার করে না, বরঞ্চ উপকারই করে; বিরক্তিকর এবং ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ঘরদুয়ার পরিষ্কার রাখে।

সাধারণত দেয়ালে বা ঘরের আনাচে-কানাচে আড্ডা গাড়ে এরা, তবে বাইরে জঙ্গলেও থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এদের দেখতে পাওয়া যায়—এক মেরুর দেশ ছাড়া। নানা জাতের টিকটিকি আছে—প্রায় আড়াই হাজার রকমের। চেহারায়ও রকমফের আছে। কেউ সাদাটে, কেউ পাটকিলে, কেউ কালচে বা ডোরাকাটা, কারো কারো গায়ে চিত্রবিচিত্র দাগ, কারো বা আবার গায়ে কাঁটা বসানো। অবশ্য চামড়ার ওপর আঁশ সকলেরই আছে। সাধারণত লম্বায় এরা ৫।৬ ইঞ্চি বা তারও কম, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এক জাতের টিকটিকি দেখা যায় যারা লম্বায় দু' ফুটের কম হবে না।

টিকটিকি খাড়া দেয়াল বেয়ে কি করে তর্‌তর্‌ করে উঠে যায়, এমন কি ছাদের নীচে কড়িবরগার ওপরে বা পাশে উল্টো হয়ে অর্থাৎ পা ওপরে, পিঠ নীচে রেখে কি করে চলাফেরা করে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আসে। টিকটিকির ঐ যে নখওয়ালা চারটে পা—তার তলায় আছে নরম চামড়ার ফাঁপা থলি। তার গা-টা আবার আঠাল। ঐ থলি দিয়ে বাতাস শুষে নিয়ে ওরা দিব্যি যেখানে সেখানে আটকে থাকতে পারে। সেই সঙ্গে থলির গা-টা আঠাল হওয়ায় সুবিধেটা হয় আরও বেশি। শরীরের তুলনায় টিকটিকির লেজও হয় বেশ লম্বা; আর মজা, এই লেজ তারা যখন তখন খসিয়ে ফেলতে পারে। লেজ-কাটা বা লেজ-খসা টিকটিকি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। কেউ হয়তো পেছন থেকে ওকে আক্রমণ করল। আক্রমণটা লেজের ওপরেই আগে হবে। অমনি লেজটি খসিয়ে ফেলে আক্রমণকারীকে বোকা বানিয়ে টিকটিকি পালিয়ে যাবে। খসে-পড়া লেজটি মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে স্থির হয়ে যাবে। শুধু একটি লেজ, সঙ্গে ধড় নেই—দাপাদাপি করছে দেখে শত্রুর পক্ষে ভড়কে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। লেজ হারিয়েও কিন্তু টিকটিকির ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ সে জানে দু'দিন বাদে আবার তার নতুন লেজ গজাবে, আবার সে আগের মত বাহারে লেজ নিয়ে ছুটে বেড়াবে। এ রকম লেজ খসিয়ে পালাবার ক্ষমতা আরও কোন কোন জাতের সরীসৃপের আছে। স্ফেনোডনেরও আছে।

অস্ট্রেলিয়ায় মোলোক্‌ নামে এক রকম জাতভাই আছে টিকটিকির। সারা গায়ে বর্ম আর কাঁটা লাগানো অতি বীভৎস তার চেহারা। কিন্তু প্রাণীটি নেহাৎ নিরীহ; উই আর পিঁপড়ে ছাড়া আর কিছু খায় না।

টিকটিকির আর এক জাতভাই গিরগিটি। আকারে একটু বড়, তবে টিকটিকির মত ঘরে বাস করে না—জঙ্গলই ওদের প্রিয় বাসস্থান।

আমার নাতনী টফি, যখন তার বয়স পাঁচ বছর, তখন হঠাৎ একদিন কোথা থেকে এক ছড়া শিখে এসে আমাকে শুনিয়ে গেল :

"টিকটিকি গিরগিটি, দু'জনেই বি.এ., বি.টি.
হাসে শুধু মিটিমিটি, ইংলিশে লেখে চিঠি।"

টিকটিকি বা গিরগিটির এ সব গুণের কথা অবশ্য আমি জানি না, তবে অন্য কয়েকটি গুণের কথা বলি শোন।

বহুরূপী

বহুরূপী নামে এক জাতের গিরগিটি আছে যারা কথায় কথায় গায়ের রং বদলাতে পারে। এদের চামড়ার ঠিক নীচের কোষগুলো হলদে। ঠিক তার নীচে আরও কতকগুলি কোষ আছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'মেলানো-ফোরস্'। এগুলি কালো, বাদামী, পাটকিলে ইত্যাদি নানা রকম রঙের দানায় ভর্তি। বহুরূপীরা মাংসপেশী কুঁচকে বা ছড়িয়ে এই দানাগুলোকে ওপরে নীচে ছিটিয়ে দিতে পারে আর তারই ফলে ওদের গায়ের রঙ দফায় দফায় বদলে যায়। এরা গাছে থাকে। অনেক সময় গাছের ডাল বা পাতার রঙের সঙ্গে নিজেদের গায়ের রঙ এমন ভাবে মিলিয়ে নেয় যে তখন ডালপালার মধ্যে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত। এদের চোখও বেশ ড্যাবডেবে; আবার মজা, এই দু'টি চোখ দিয়ে একসঙ্গে একদিকে না তাকিয়ে এরা দু'টি চোখ আলাদা আলাদা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একসঙ্গে দু'দিকে লক্ষ রাখতে পারে। হয়তো এক চোখ দিয়ে ওপরে তাকিয়ে আছে, অন্য চোখটির দৃষ্টি রয়েছে গাছের তলায়। এ যেন সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু!—"এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে।"

বহুরূপী আকারে লেজ-সমেত বড় জোর এক ফুট হয়। কিন্তু ঐটুকু শরীরে ছয় ইঞ্চি লম্বা জিভ। জিভটার আগায় একটা ছোট্ট বাটির মত বসানো, আর ভারি আঠাল সেটা। ঐ জিভই ওদের শিকার ধরবার অস্ত্র। লেজ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে অত্যন্ত নিরীহ প্রাণীর মত চুপ্‌চাপ বসে আছে—যেন কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সামনে হয়তো উড়ে এল একটা ফড়িং। অমনি সাঁৎ করে ৬ ইঞ্চি লম্বা জিভটি বেরিয়ে এল বিদ্যুৎ-বেগে, ঠিক ল্যাসোর মত ফড়িংটাকে ধরে ফেলল। আঠাল জিভের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় তখন আর তার নিষ্কৃতি নেই।

এ যুগের অতিকায় গিরগিটি

সেকালের অতিকায় সরীসৃপদের বংশধর হচ্ছে এই গিরগিটি তা আগেই বলেছি। কিন্তু এখনকার গিরগিটির সে চেহারা আর নেই। তবে ইন্দোনেশিয়ার কাছে কোমোডো দ্বীপে এক রকম অতিকায় গিরগিটি এখনও দেখা যায় যারা আকারে প্রায় ১০।১২ ফুট লম্বা। এদের তাই নাম দেওয়া হয়েছে কোমোডোর ড্রাগন। এরা মাংসাশী প্রাণী এবং বেশ হিংস্র। বুনো শূয়োর, বুনো ছাগল, জংলী পাখি ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য। বাগে পেলে বড় বড় হরিণকে শুদ্ধু ধরে খেতে ছাড়ে না। এ জাতের গিরগিটি প্রশান্ত মহাসাগরের এজোস দ্বীপেও দেখতে পাওয়া যায়। ওদের বলা হয় মনিটর। মনিটর আরও কয়েক রকম আছে


কোমোডোর ড্রাগন

—আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে এদের বাস। আকারে অনেকেই ৫।৬ ফুট হয়। যে সব মনিটর জলের কাছাকাছি থাকে তাদের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কুমীরের ডিম। অবশ্য ওরা নিজেরাও আবার কুমীরের প্রিয় খাদ্য। ডিম চুরি করতে গিয়ে একবার তাদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই।

ইগুয়ানা নামে আর এক জাতের গিরগিটিও আকারে ৫।৬ ফুট হয়। এদের পিঠে ঝুঁটির মত লম্বা আঁশ আর কাঁটা, কারো কারো আবার গলার নীচে থাকে গলকম্বলের মত চামড়ার থলি। প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে বিষুব রেখার কাছাকাছি কতকগুলি আগ্নেয়গিরির দ্বীপ আছে। জনমানবহীন দ্বীপ, শুধু জমাট লাভা আর পাথর ছাড়া বড় কিছু চোখে পড়ে না। এই দ্বীপগুলোকে বলে গ্যালাপেগোস দ্বীপপুঞ্জ। এখানেও এক জাতের অতিকায় সামুদ্রিক গিরগিটি বাস করে—যাদের দেখলে সেকালের সেই অতিকায় ডাইনোসরদের কথাই মনে পড়বে। আকারে এরা ৪।৫ ফুটের মত হয়। এরা কিন্তু মাংসাশী নয়, —সামুদ্রিক আগাছা, শ্যাওলা—এই সব খেয়ে নিতান্ত সাত্ত্বিক জীবন যাপন করে।

মজার চেহারাওয়ালা গিরগিটি

আর ২।১টি মজার গিরগিটির কথাও এই প্রসঙ্গে বলে নি। আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চলে এক রকম কুৎসিত চেহারার গিরগিটি দেখা যায়। এদের গলার চারপাশে যেন একটা "ফ্রিল্" বসানো আছে। এরা খাড়া হয়ে দু' পায়ে খুব জোরে ছুটতে পারে, আর ছুটবার সময়ে মুখটা হাঁ করে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার লেস্ওয়ালা গিরগিটিরও গলার চারধারে এই রকম ফ্রিল্ বা লেসের মত একটা পর্দা লাগানো আছে—আকারে অনেকটা বড়। সাধারণ অবস্থায় সেগুলো গলার চারদিকে ঝুলে থাকে কিন্তু রাগলে বা উত্তেজিত হ'লে এই লেস্ বা পর্দা খাড়া হয়ে ওঠে। দেখলে মনে হয় যেন গলার

চারদিকে কেউ একটা লেসের ঝালর লাগিয়ে দিয়েছে। রাণী ১ম এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যণ্ডের বড় বড় লোকেরা যেমন লেসের কলারওয়ালা জামা পরত অনেকটা সেই রকম আর কি! ঐ রকম চেহারা নিয়ে, হাঁ করে ভিতরের টুকটুকে লাল গলা দেখিয়ে, এরা যখন উচ্চস্বরে শিস দিতে থাকে তখন যে কোনও শক্তিমান্ জীব ভয় না পেয়ে পারে না। এই গিরগিটিগুলি আকারেও নেহাৎ ছোট নয়, দাঁড়ালে তিন ফুট হবে। ক্যাঙ্গারুর মত দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে এরা আর ঐ ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতেও পারে বেশ জোরে।

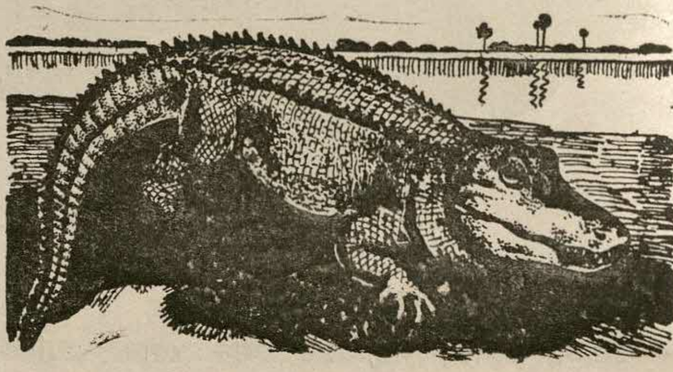
সেকালে একজাতের সরীসৃপ উড়তে পারত। এই উড়ুক্কু সরীসৃপদের বলা হ'ত টেরো-ড্যাক্টিল। এরা অবশ্য এখন লোপ পেয়ে গেছে, তবে এদেরই একটি ক্ষুদে সংস্করণ বলা যেতে পারে মালয় দেশে উড়ুক্কু গির-গিটিকে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও এদের দেখা যায়। এদের পাঁজরার কয়েকটি হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে দু'পাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো আবার পাৎলা চামড়ার পর্দা দিয়ে ঢাকা। এই পর্দা এরা সাধারণ অবস্থায় গুটিয়ে রাখে, কিন্তু দরকার হলেই পর্দাটা খুলে পাখার মত ছড়িয়ে স্বচ্ছন্দে এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে চলে যেতে পারে। কেউ কেউ বলেন, ওটা ঠিক ওড়া নয়—লাফানো। কিন্তু ঐটুকু কয়েক ইঞ্চি প্রাণী যদি এক লাফে তিরিশ ফুট রাস্তা ভেসে পার হয়ে যেতে পারে তবে তাকে ওড়া বলতে দোষ কি?

কুম্ভীর-কাহিনী

"কুম্ভীরটা বেজায় বেয়াড়া,
তার কাহিনী পড়ে সিংহ গুম্ফে দিয়ে চাড়া।"

কুম্ভীর অর্থাৎ কুমীর। সরীসৃপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সম্ভবত সবচেয়ে হিংস্র হচ্ছে এই কুমীর। বেয়াড়া তো বটেই! পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বড় বড় নদীতে, হ্রদে, জলায় কুমীর দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদী তো কুমীরে ভর্তি!

কুমীর অবশ্য নানা জাতের আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় আর ভয়ঙ্কর হচ্ছে সেগুলো যাদের ইংরেজিতে বলা হয় ক্রোকোডাইল।



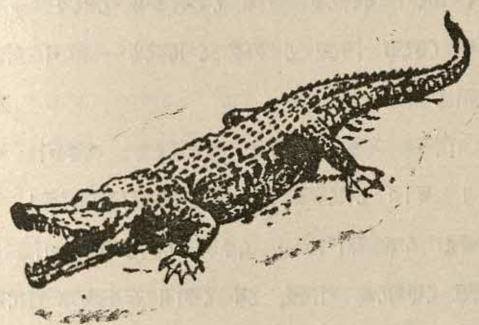
ক্রোকোডাইল

এদের কোন কোনটাকে ২৫।৩০ ফুট—এমন কি তার চেয়েও লম্বা হতে দেখা গেছে। বাগে পেলে কোন জীবজন্তুই এরা খেতে ছাড়ে না, এমন কি মানুষখেকো বলেও এদের যথেষ্ট সুনাম আছে। ক্রোকোডাইল এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সব মহাদেশেই আছে।

অ্যালিগেটর নামে আর এক জাতের কুমীর আছে। এগুলো কেবল চীন দেশে আর

আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের মুখটা ক্রোকোডাইলের তুলনায় চওড়া আর থ্যাবড়া। আকারেও এরা একটু ছোট,—সাধারণত ১০।১২ ফুট। তবে ১৯।২০ ফুট লম্বা অ্যালিগেটরও দেখা গেছে। এরা সাধারণত মানুষ খায় না, তবে অন্য বড় জন্তু সুবিধে পেলেই খায়। অ্যালিগেটর খুব চেঁচাতে পারে। যখন চেঁচায় তখন দূর থেকে ক্ষেপা ষাঁড়ের গর্জন বলে ভুল হয়।

তৃতীয় জাতের নাম হচ্ছে ঘড়িয়াল (ইংরেজিতে



মেছো কুমীর (গেভিয়াল)

গেভিয়াল)। আমাদের দেশে এদেরকে মেছো কুমীর বলে, কারণ মাছই এদের প্রধান খাদ্য। এদের মুখটা ভয়ানক ছুঁচলো—ক্রোকোডাইলের চাইতেও ছুঁচলো। আকারেও এগুলো অনেক ছোট।

কুমীর তোমরা সকলেই দেখেছ। টিকটিকির সঙ্গে এদের চেহারায় বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ৩০ ফুট লম্বা টিকটিকি তো সহজ কথা নয়! তা ছাড়া কুমীরের পিঠের চামড়া ভীষণ পুরু আর শক্ত। তাতে বড় বড় ভাঁজ আর হাড়ের মত কাঁটা। এজন্য কুমীরের চামড়ার চাহিদা বড় কম নয়। সবচেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে অ্যালিগেটরের চামড়া। এই চামড়ার লোভে মানুষ এক সময় এত আলিগেটর মেরেছে যে ওদের বংশই লোপ পাবার যোগাড় হয়েছিল। তাই আইন করে বছরের কতকটা সময় ওদের মারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুমীরের খিদে

কুমীরের চোয়ালে ভীষণ জোর, দাঁতে ভীষণ ধার। চোয়ালের এক চাপে সে যে-কোন বড় জন্তুর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে, এক কামড়ে সে মানুষের একটা পা উরুর নীচ থেকে কেটে নিয়ে যেতে পারে। তবে সে-দাঁত দিয়ে চিবুনো যায় না। এজন্য কুমীর ছোট ছোট শিকার এক রকম গিলেই খায়। বড় বড় জন্তু হলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নিতে হয়। এজন্য শিকার ধরে তাকে কাবু করবার জন্য অনেক সময় কুমীর তাকে জলের মধ্যে ক্রমাগত মোচড় দিতে থাকে। মোচড় খেয়ে খেয়ে অসাড় হয়ে গেলে তখন দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু সময় সময় তাতেও অসুবিধে। এজন্য কুমীর টাটকা মাংসের চাইতে একটু বাসি মাংস পছন্দ করে। কখনও কখনও তেমন খিদে না থাকলে শিকার ধরে তাকে তখনই না খেয়ে ফেলে নদীর ধারে কোন গর্তে লুকিয়ে রাখে। ২।১ দিন বাদে যখন সেটা একটু পচে নরম হয়ে যায় তখন গিয়ে তাকে খায়। নরম মাংস দাঁতে টুকরো টুকরো করা তার কাছে অনেক সহজ। শোনা যায় কুমীরের এই স্বভাবের জন্যই কুমীরের হাতে পড়েও অনেক মানুষ নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে। কুমীর মানুষ ধরে তাকে তখনই না খেয়ে মাটিচাপা

দিয়ে রেখে এল, তার পর কুমীর চলে গেলে মাটি সরিয়ে লোকটি বেরিয়ে পড়ল।

কুমীর প্রায় সর্বভুক্। সুবিধে পেলে কোন জন্তুই খেতে ছাড়ে না। এবং, আগেই বলেছি, যতটা পারে গিলে খায়। একবার আফ্রিকার টাঙ্গানিকায় এক ইংরেজ শিকারী একটা কুমীর শিকার করে তার পেট চিরে ১১টা পেতলের বালা, ৩টে আর্মলেট, মানুষের হাতের আর পায়ের ১৪টা আস্ত হাড় এবং কয়েক গজ শক্ত দড়ি পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ কুমীরটি বেশ কয়েকটি কাফ্রী মেয়ে আর পুরুষকে আস্ত খেয়েছিল—ওগুলো তাদেরই গায়ের গয়নাগাঁটি। দড়িটি দিয়ে সম্ভবত কোন মোট বাঁধা ছিল যা হয়তো আক্রান্ত লোকটি মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কুমীর সেটিও বাদ দেয় নি। পেতলের গয়না আর দড়িটা হজম না হওয়ায় ওর পাকস্থলীতেই রয়ে গিয়েছিল। অবশ্য খাবার হজম করার জন্য কুমীর ছোট ছোট গোল গোল নুড়িপাথর ইচ্ছে করেই গিলে ফেলে। নুড়ি-পাথরগুলি পেটে গিয়ে নড়াচড়ার ফলে খাবারকে পিষে নরম করে দেয়, তাতে হজমের সুবিধে হয়। পাথর একটু বড় হলে অবশ্য পেটেই থেকে যায়। পাথর হজম করা বা বার করে দেওয়া তো সহজ কথা নয়!

জলের কুমীর ডাঙ্গায়

জলে থাকলেও কুমীরকে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ওপরের বাতাসের ওপর নির্ভর করতে হয়। কুমীরের মুখটাও সেই ভাবে তৈরি। নাক ছ'টো মাথার ওপর দিকে এমন ভাবে বসানো যে সমস্ত শরীরটা জলের তলায় ডুবিয়ে রেখেও কুমীর শুধু নাক ছ'টো ওপরে রেখে সাঁতরে যেতে পারে। মুখে যদি খাবার ধরা থাকে তা হলেও অসুবিধে নেই। মুখের গড়ন এমনই যে তাতে জল ঢুকলেও সে জল শ্বাসনালীতে ঢুকতে পারে না, একটা চামড়ার পর্দা ভাল্‌ভের মত সে জলকে আটকে রাখে। তবে জলের তলায় চোখ বন্ধ করে দিতে পারলে কুমীর নাকি ভয়ানক ঘাবড়ে যায়। কুমীরের হাতে পড়ে মানুষ বুদ্ধি না হারিয়ে ছ'হাতে তার চোখ টিপে ধরেছে আর বেগতিক দেখে কুমীর তাকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেয়েছে—এমন গল্পও শোনা গেছে।

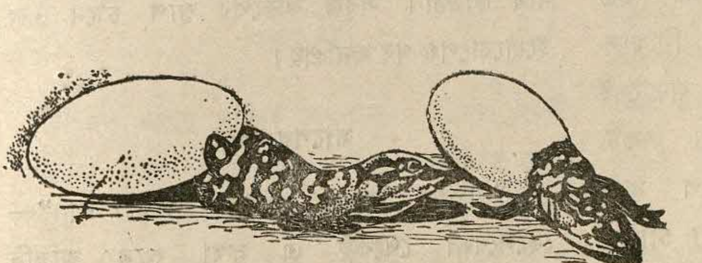
দাঁতের মত লেজও কুমীরের একটা বড় অস্ত্র। তার লেজের ঝাপটায় অসম্ভব জোর। ঐ লেজের এক ঝাপটায় একটা ছোটখাট গাছ সে উপড়ে ফেলতে পারে, যে কোন জবরদস্ত পালোয়ানকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে।

তবে জলচর হ'লেও রোদ পোহাবার জন্য কুমীর প্রায়ই ডাঙ্গায় উঠে আসে। অনেক সময় দেখা গেছে, কুমীর আরামে রোদ পোহাচ্ছে আর ছোট ছোট এক একম পাখি এসে তার দাঁত থেকে মাংসের টুকরো কুরে কুরে খাচ্ছে, কুমীর কিছু বলছে না। পাখির ঠোঁটটা যেন কুমীরের খড়কে কাঠি। এই পাখিগুলির ইংরেজি নাম জিক্‌জ্যাক্। ওরা কুমীরের বন্ধু। কুমীর যেমন দাঁতে-আটকে-থাকা মাংসের টুকরো ওদের খেতে দেয়, ওরাও তেমনি সজাগ দৃষ্টিতে কুমীরকে পাহারা দেয়, শত্রু আসছে দেখলেই সচেতন করে দেয়।

ডিম পাড়বার সময়েও কুমীর ডাঙ্গায় উঠে আসে। সাধারণত নদীর চরে নিরিবিলি

জায়গায় বালির নীচে গর্ত খুঁড়ে ওরা ডিম পাড়ে। মা-কুমীর অনেক সময় ডিম পাহারাও দেয়—যতদিন না তা ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চা একবার ডিম থেকে বেরিয়ে এলে সে নিজেই নিজেকে দেখতে পারে।

মা-অ্যালিগেটরের ডিম পাড়ার ধরনটা আরও মজার। ডিম পাড়বার আগে সে নদীর ধারে একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ঘাস-পাতা দিয়ে সেখানে একটা স্তূপ বানায়। তার পর স্তূপের ওপর কয়েকটা ডিম পেড়ে আবার তা ঘাসপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। তার পর আবার তার ওপর ডিম পাড়ে। এইভাবে ৩০।৪০টা ডিম পাড়লে স্তূপটা বেশ উঁচু হয়ে ওঠে। সে ডিম ফোটাবার জন্য যে তাপের দরকার তার খানিকটা আসে সূর্যের আলো থেকে আর খানিকটা আসে ঐ ঘাসপাতা পচে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাই থেকে। অবশ্য ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে প্রায় তু'মাস লাগে। ডিম থেকে বেরোবার আগে বাচ্চারা ডিমের ভিতর থেকেই একটা অদ্ভুত শব্দ করতে পারে। তাই শুনে মা-অ্যালিগেটর স্তূপের ঘাসপাতা সরিয়ে তাদের বেরোবার পথ পরিষ্কার করে দেয়।



কুমীরের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুচ্ছে।

কুমীর পোষা

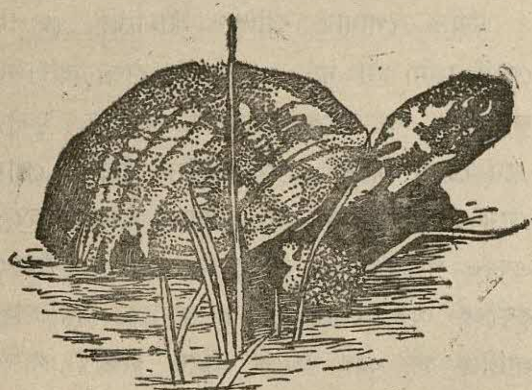
মিশর দেশে এক সময়ে কুমীরকে খুব পবিত্র জীব বলে মনে করা হ'ত। কুমীর পুষে, মন্দিরে তার জন্য আলাদা পুকুর করে যত্নে সেখানে তাকে রেখে দেওয়া হ'ত, পূজোও করা হ'ত। এমন কি মরে গেলেও তার মৃতদেহটা নষ্ট না করে ম্যমি করে রাখা হ'ত সমারোহের সঙ্গে। মিশরের নীল নদে খুব বড় বড় কুমীর দেখা যায়। জলে-ভাসা মরা জন্তু খেয়ে ওরা নদীর জল পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে বলেই হয়তো ওদের অত খাতির।

কুমীর পোষার বাতিক আমাদের দেশেও যে ছিল না তা নয়। বড় বড় রাজা-মহারাজা, জমিদাররা শখ করে নিজেদের দীঘিতে কুমীর এনে ছেড়ে দিতেন। সে কুমীর দিব্যি পোষ মেনে যেত, ডাকলে এসে খাবার নিয়ে যেত। এখনও পৃথিবীর কোন কোন দেশে কুমীরকে কুকুরের মত পোষা হয়। কুমীরের মুখ জাল লাগিয়ে বন্ধ করে তাকে দিয়ে রাস্তায় গাড়ি পর্যন্ত টানানো হয়েছে। কুমীরে-টানা গাড়ির ছবি আমরা সিনেমায় দেখেছি। গায়ে ভীষণ জোর তো!

কচ্ছপ-চরিত

সরীসৃপদের মধ্যে আর একটি জাত হচ্ছে কচ্ছপ—চলতি কথায় কাছিম। বিজ্ঞানীরা এদের চেলোনিয়া বর্গে ফেলেছেন। সমস্ত শরীরটা একটা বর্ম দিয়ে ঘেরা—যেন কতকগুলো হাড়ের পাত দিয়ে গড়া, তার তলায়

পাঁজরার মত হাড় সাজানো। আসল প্রাণীটি থাকে ঐ বর্ম—যাকে আমরা বলি কচ্ছপের খোল বা খোলা—তারই নীচে। এমনিতে মুখ আর চারটে পা বেরিয়ে থাকে, কিন্তু ভয় পেলে বা শত্রু আক্রমণ করলে সে সবশুদ্ধ কুঁকড়ে নিয়ে ঐ খোলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। তখন আর তাকে খুঁজে পাবার যো নেই। আর ঐ খোল এত শক্ত যে তা ভাঙ্গাও খুব সহজসাধ্য নয়। তবে হ্যাঁ, যদি কোন রকমে খোলটি উল্টে দেওয়া যায় তা হ'লে আর কচ্ছপের কিছু করার থাকে না। সে তখন সত্যি অসহায়।



কচ্ছপ

কচ্ছপের চেহারা দেখলেই মনে হয় সে খুব আদিম যুগের প্রাণী। সত্যিই তাই। চাল-চলনেও অত্যন্ত কুঁড়ে। এই কুঁড়েমির জন্য অন্যান্য সমান চেহারার প্রাণীর তুলনায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তার যেমন অল্প বাতাসেই কুলিয়ে যায়, তেমনি খোরাকও খুব কম। একটা দশ পাউণ্ড আন্দাজ ওজনের কচ্ছপ মাসে ৬ আউন্সটাক মাত্র খাবার খেয়েই দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে।

কচ্ছপ নানা জাতের দেখা গেলেও সাধারণত তিন রকম কচ্ছপই প্রধান। এক—টার্টল; এরা জলচর,—সমুদ্রেই বেশি থাকে। দুই—টর্টয়জ,—ডাঙ্গার কচ্ছপ; আর তিন—টেরিপিন,—মিষ্টি জলের কচ্ছপ।

এদের মধ্যে টার্টলরাই সংখ্যায় বেশি। বিজ্ঞানীরা প্রায় ২৫০ রকমের টার্টলের সন্ধান পেয়েছেন। কোনটা হয়তো খুব ছোট—ওজনে বড় জোর আধ কে. জি. আবার কোনটা, যেমন ধর প্রশান্ত মহাসাগরের অতিকায় কচ্ছপ,—কম করে ৭৫০।৮৫০ কে. জির. কম হবে না। এরা সাধারণত নরম জলজ গাছ আর ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে জীবনধারণ করে।

ডাঙ্গার কচ্ছপও সময় সময় বেশ বড় হয়। তা ছাড়া বেশ দীর্ঘায়ু জীব এরা। কলকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটি কচ্ছপ আছে যার বয়স এখন দেড়শ' বছরও ছাড়িয়ে গেছে। গ্যালাপেগোস দ্বীপেও অনেক অতিকায় কচ্ছপ বাস করে।

কচ্ছপের চেহারাও রকমারি হতে পারে। কারো গলাটা সাপের মত লম্বা, কারো পিঠে উটের মত কুঁজ, আবার কারো বা পিঠের খোলে বিচিত্র কারিকুরি। টাটকা জলের কচ্ছপ মানুষের প্রিয় খাদ্য। পূর্ববঙ্গে এর ভারী কদর। সেখানে ওর নাম কাউঠা। সবুজ কচ্ছপের স্যুপ্ চীনে এবং ইয়োরোপেও খুব জনপ্রিয়।

সাপের কথা

"সাপকে কখনও বিশ্বাস ক'র না।"—ছেলেবেলা থেকেই এ কথা শুনে আসছি আমরা। সাপের স্বভাব নাকি অত্যন্ত খল, কারণে অকারণে ছোবল মারবে, আর একটি

ছোবলেই—ব্যস্, চিরকালের জন্য সব খতম্! কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানীরা সাপ সম্বন্ধে অমন কঠোর মন্তব্য করেন না। পৃথিবীতে প্রায় ৩০০০ জাতের সাপ আছে, তার মধ্যে তিন ভাগের দু'ভাগই হচ্ছে নিরীহ অর্থাৎ বিষহীন। বাকি এক ভাগেরও সকলকার বিষ তত তীব্র নয়—অন্তত মানুষের পক্ষে। এজন্য দেখা গেছে, অনেক সময় সাপের কামড় খেয়েও মানুষের তেমন কিছুই হয় নি, কিংবা হ'লেও একটু চিকিৎসার পর তা সেরে গেছে। তবে কতকগুলি সাপ আছে—যেমন এদেশের গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, করেত, আমেরিকার র‍্যাট্ল্ বা বিলেতের ভাইপার—



র‍্যাট্ল্ সাপ

যারা এক কথায় সত্যিই শয়তান। এদের একটি ছোবল খেলে আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। কিন্তু কোন্ সাপ নির্বিষ আর কোন্ সাপ বিষধর সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয় তো! কাজেই সাপ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো নয় কি? তবে, মোটামুটি দেখা গেছে, বিষধরের গায়ের রং খুব উজ্জ্বল হয় আর প্রায়ই সারা গায়ে চক্র আঁকা থাকে; নির্বিষ সাপের রং অধিকাংশ সময়েই কালচে, ছাই-ছাই বা মেটে-মেটে হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

সাপও কিন্তু সরীসৃপ জাতের প্রাণী। অর্থাৎ টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক বেশ নিকট। একই পূর্বপুরুষ থেকে ওদের সকলকার জন্ম। কোন কোন গিরগিটি দেখতে অনেকটা সাপের মত। বিজ্ঞানীর ভাষায় সাপেরা হচ্ছে স্কোয়ামাটা বর্গের জীব।

সবচেয়ে পুরোনো সাপের ফসিল যা পাওয়া গেছে তার বয়স ১০ কোটি বছর হবে। কিন্তু তারও চেহারা ছিল এখনকার সাপের মতই। কাজেই তা দেখে ওদের সম্বন্ধে নতুন কিছু জানা যায় নি।

সাপেরা কি করে পা হারাল

যাই হোক, সরীসৃপ থেকে একদল কি করে পা হারিয়ে সর্প জাতির সৃষ্টি করল সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের দু'টি মত আছে। একদল বলেন, এক সময়ে একদল সরীসৃপ বসবাসের জন্য ঘাসবন বেছে নেয়। খুব বড় বড় ঘাসের বন—যেখানে পা ফেলে ফেলে হাঁটার কোন সুবিধে ছিল না। কাজেই পায়ের ব্যবহার ওরা ছেড়ে দেয়। পুরুষানুক্রমে ব্যবহার না করে করে সে পা ক্রমবিকাশের নিয়মে ক্রমে ছোট হতে হতে শেষে একদম লোপ পেয়ে গেছে। আর একদল বলেন,—ঘাসবন নয়, একদল সরীসৃপ

ডাঙ্গার উপদ্রব এড়াবার জন্য মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বাস করতে থাকে। (আমাদের পুরাণেও তো সাপেদের মাটির নীচে পাতালপুরীর বাসিন্দা বলা হয়েছে!) সেখানেও পায়ের কোন দরকার হ'ত না, তাই ক্রমে ক্রমে ওদের পা লোপ পেয়ে গেছে। নইলে সাপের যে এক সময়ে পা ছিল তার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। কোন কোন জাতের সাপের দেহে এই পায়ের চিহ্ন—বিশেষ করে পেছনের দু'টি পা আজও দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য পরে ওদের বংশধরেরা আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে বাইরের পৃথিবীতে।

মাটির নীচে থাকলে চোখেরও কোন দরকার হয় না। দ্বিতীয় মতের বিজ্ঞানীদের ধারণা, সাপেরা যখন পুরোপুরি মাটির তলায় গিয়ে বাস করতে থাকে তখন তাদের চোখের দৃষ্টি-শক্তিও নিশ্চয়ই খুব কমে গিয়েছিল। কে জানে, হয়তো লোপ পেয়েও থাকবে! পরে যখন আবার তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে এল তখন ধীরে ধীরে আবার তা ফিরে এল। এই মতের স্বপক্ষে বিজ্ঞানীদের যুক্তি হচ্ছে, সাপের চোখ অন্যান্য সরীসৃপদের চাইতে একদম আলাদা। সে চোখে কোন পাতা নেই। অর্থাৎ ওরা আমাদের মত চোখ বুঁজতে পারে না। তবে দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখরই বলা যায়।

সাপ মাঝে মাঝে খোলস বদলায়। ওপরের চামড়াটা একেবারে খুলে বেরিয়ে যায়, আর ভিতর থেকে নতুন চক্চকে চেহারা নিয়ে ওরা বেরিয়ে আসে। সাপের এই পরিত্যক্ত খোলসকে চলতি ভাষায় ছোলম বলে। ভালো বাংলায় এরই নাম নির্মোক।

সাপ কি শুনতে পায়?

সাপর ঘ্রাণশক্তিও বেশ তীব্র। গন্ধ শুঁকেই ওরা শিকার খুঁজে বার করতে পারে, অন্য সাপ চিনতে পারে। সাপের জিভ চেরা। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই চেরা জিভের সাহায্যেও ওরা গন্ধ টের পায়। দৃষ্টি এবং ঘ্রাণশক্তি প্রখর হলেও সাপ নাকি মোটেই শুনতে পায় না। বিজ্ঞানীরা ওদেরকে কেটেকুটে পরীক্ষা করে দেখেছেন শুনবার উপযোগী কোন ইন্দ্রিয়ই ওদের নেই। না বাইরের কান, না ভিতরের কান। অথচ আমাদের অনেকেরই ধারণা, সাপুড়েরা যখন বাঁশী বাজায় তখন সেই বাঁশীর স্বরে আকৃষ্ট হয়ে সাপ তালে তালে মাথা দোলায়। শুনতে না পেলে এটা কি করে সম্ভব? বিজ্ঞানীরা জবাবে বলেন, সাপুড়ে বাঁশী বাজাবার সময়ে মাথা দোলায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীও দোলায়; সাপও সেই দুলুনি দেখেই তালে তালে মাথা নাড়ে। তবে শব্দে বা অন্য কারণে মাটি কাঁপলে সাপ তা ঠিক বুঝতে পারে।

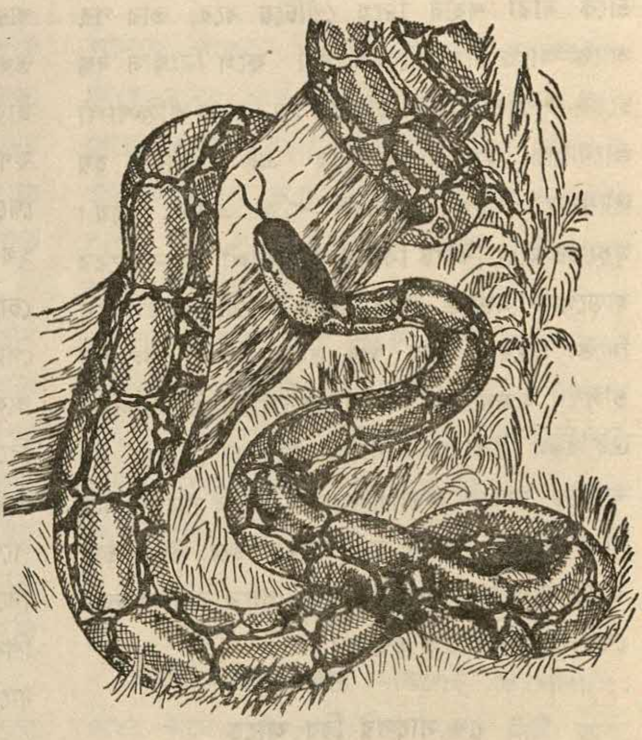
সাপের খাওয়া

সাপ মাংসাশী প্রাণী, কিন্তু মাংস সে চিবিয়ে খায় না। কামড় দিয়ে শিকার ধরতে পারে বটে, কিন্তু দাঁত দিয়ে ছিঁড়বার ক্ষমতা তার নেই। তাই তাকে খেতে হয় গিলে। সাপের মুখ তেমন বড় না হলেও তার গড়নটা এমনই যে দরকার হলেই মাথাটা সে রবারের মত ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে ফেলতে পারে। ফলে নিজের মাথার চেয়ে ৮।১০ গুণ মোটা জানোয়ারও তার হাঁ-এর তলায় দিব্যি গলে যায়। পেটের গড়নও তেমনি। তার মধ্যে খাবার পড়লেই চিমসে

পেট ফুটবলের ব্লাডারের মত ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে গুরুভোজনের পর অনেক সময় বাইরে থেকেই বোঝা যায় পেটের ভিতর কি একটা রয়েছে। একবার গিলে খাবার পর সে খাবার হজম হতেও বেশ কিছুদিন সময় লাগে। এজন্য সাপ অনেক সময় বেশ কিছুদিন না খেয়েই কাটিয়ে দেয়। এ কারণে সাপের আর এক নাম বায়ু-ভুক্, অর্থাৎ যে বাতাস খেয়ে টিকে থাকে। আসলে কিন্তু বাতাস-তাটাস কিছু খায় না সে, উপোস করার কারণটা তো বলেইছি। অনেক বিষধর সাপ আছে যারা আবার জাতভাইদের ছাড়া আর কাউকে খায় না। এই সব সাপ-খেকো সাপ প্রায়ই নিজেদের চাইতে অনেক বড় সাপ মেরে খায়।

অজগর

সবচেয়ে বড় জাতের সাপকে আমরা বলি অজগর। অজ অর্থাৎ ছাগলকে সে গিলতে পারে—তাই আজগর। অজগরও আবার তিন জাতের আছে। ময়াল বা পাইথন, বোড়া জাতের বোয়া কন্‌স্ট্রিক্‌টর আর এনাকোণ্ডা। কন্‌স্ট্রিক্‌টর মানে যারা কাউকে জড়িয়ে প্যাঁচের পর প্যাঁচ কষে চেপে মারতে পারে। ২০।২৫ ফুট লম্বা অজগর হামেশাই দেখা যায়। আরও লম্বা—৩৩ ফুট লম্বা অজগরও দেখা গেছে। এনাকোণ্ডাগুলো আবার মোটাও হয় তেমনি—ময়ালের চেয়েও অনেক মোটা। ওরা অবশ্য এদেশের সাপ নয়, ওদের নিবাস আমেরিকা—



এনাকোণ্ডা

বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা। আমাজন নদীর ধরে যে বিশাল অরণ্য সেখানে ওদের প্রচণ্ড প্রতাপ। রেড ইণ্ডিয়ান্‌রা ওদেরকে যমের মত ভয় করে। ময়াল বা পাইথন তো তোমরা আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেই দেখেছ। সুন্দরবনেও এদের প্রচুর দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এরা আছে।

অজগর কিন্তু বিষধর সাপ নয়। কিন্তু বিষ না থাকলে কি হবে, অতি ভয়ঙ্কর এই সাপ। বড় বড় ছাগল, হরিণ, শূয়োর কিছুই এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। বাগে পেলে বাঘ ধরে খেতেও ছাড়ে না। আস্ত মানুষ গিলে খাওয়াও ওদের কাছে কিছু না—সুবিধে পেলে খায়ও।

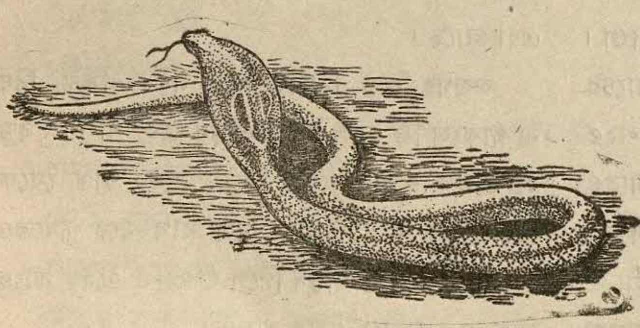
শিকার সামনে পেলে বিদ্যুৎবেগে এরা

তাকে সারা শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে, তার পর আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকে। ফলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েই শিকারকে প্রাণ হারাতে হয়। বড় শক্তিশালী জানোয়ার হ'লে অজগরের এই পেষাইও হয় তদনুযায়ী প্রচণ্ড। অসম্ভব শক্তি এদের গায়ে। মুহূর্তের মধ্যে বিরাট বিরাট শক্তিশালী জানোয়ারের হাড়গোড় মড়মড় করে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। তার পর তাকে গিলে ফেললেই হ'ল। অজগরের মত অনেক ছোটখাটো সাপেরও এই রকম শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিয়ে দম আটকে মারার অভ্যাস আছে। তবে সাপের শত্রু হচ্ছে বেজী। বেজীর ঘন লোমের জন্য সাপ তার কাছে নাকাল। কামড় বসাতে পারে না ঠিক মত। বেজীও সাপ মারতে ওস্তাদ।

যে সাপের বিষ আছে

অজগর ভীষণ হলেও মানুষ বেশি ভয় করে বিষধর সাপকে। এদেশের গোখরো সাপের কথা আগেই বলেছি। ভালো বাংলায় একে বলা হয় গোখুরা বা গোক্ষুর (ইংরেজি নাম কোব্‌রা)। এদের মাথার একটু নীচে গরুর ক্ষুরের মত একটা দাগ থাকার জন্যই এই নাম। এমনি অবস্থায় এরা অন্য সাপের মতই দেখতে, কিন্তু যখন উত্তেজিত হয় তখন ঐ জায়গাটা ছড়িয়ে গিয়ে দেখতে হয় অনেকটা ছাতার মত। আমরা বলি সাপ ফণা ধরেছে। ফণা ধরার সময় প্রায়ই গোখরোর ওপরের চোয়াল থেকে দু'টি বড় বড় লম্বা দাঁত বেরিয়ে পড়ে, আর মুখ বন্ধ করলেই গুটিয়ে গিয়ে চ্যাটাল ভাবে চোয়ালের সঙ্গে মিশে যায়। ছোবল মারার সময়ে গোখরো এই দাঁত দু'টিই ব্যবহার করে। একে বলে বিষদাঁত। গোখরোর মুখের ভিতরে থাকে বিষের থলি। মুখ খুলতেই এই দাঁত খাড়া হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিষের থলির ওপর চাপ পড়ে আর দাঁতের ভিতরকার নল দিয়ে সে বিষের ধারা গড়িয়ে আসে। তার পর যখন শিকারের গায়ে ছোবল মারল তখন ঐ দু'টি দাঁতের জন্য সেখানে দু'টো ছেঁদা হয়ে যায় (দেখতে অনেকটা : চিহ্নের মত), আর সেই ছেঁদার ভিতর গড়িয়ে পড়ে বিষ। অতি তীব্র সেই বিষ। ক্ষতস্থানে পড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে রক্তে মিশে রক্তের লাল কণিকাগুলিকে ধ্বংস করে দেবে, রক্তের শিরাগুলিকে আক্রমণ করবে। দেখতে দেখতে আক্রান্ত প্রাণী নীল হয়ে ঢলে পড়বে, হাত-পা অসাড় হয়ে যাবে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, বন্ধ হবে হৃৎপিণ্ডের কাজও। এর পর তাকে বাঁচানো শিবেরও অসাধ্য।

অথচ আশ্চর্য, এই বিষ যদি কোন ক্ষতস্থানে না লাগে তা হলে কোনই ক্ষতি হয় না। মানুষ মুখ দিয়ে ক্ষতস্থান থেকে সাপের এই বিষ চুষে নিয়ে ফেলে দিয়েছে অথচ তার কোনও ক্ষতি হয় নি—এমনও



গোক্ষুর সাপ ফণা তুলেছে।

দেখা গেছে। তবে চুষবার সময় মুখে যদি কোথাও ঘা বা ক্ষত থাকে তা হলে যে চুষবে তারও আর রক্ষা নেই। সাপে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের ওপরে নীচে খুব শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয় —যাতে বিষটা এক জায়গা থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

সাপুড়েরা বিষধর সাপ ধরে প্রথমেই তার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়—যাতে তা দিয়ে সে আর কাউকে আক্রমণ করতে না পারে। সাপের এই দাঁত শুধু আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য, কামড়ে খাবার জন্য নয়। উপর্যুপরি কয়েক বার ছোবল মারলে বিষের থলি খালি হয়ে যায়, তখন সে সাপ কামড়ালেও আর তেমন ক্ষতি হয় না।

কিন্তু বিষধর সাপ মাত্রেই যে খুব হিংস্র তা মনে করবার কারণ নেই। যাঁরা সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁরা বলেন, না চটালে গায়ে পড়ে ওরা বড় একটা মানুষকে কামড়াতে আসে না। তবে কেউটের স্বভাব নাকি বড় খল, বিনা প্ররোচনায়ও কামড়াতে ছাড়ে না।

বিষধর সাপের কথা বলতে গেলে র‍্যাট্‌ল্ সাপের কথা বলতে হয়। এই সাপের লেজের ডগাটা ভারি অদ্ভুত,—মাংস নেই, কেবল কতকগুলি খোলা হাড়, আংটির মত পাকানো পাকানো। চলবার সময় মাটি বা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে হাড়গুলিতে একটা অদ্ভুত শব্দ হয়। ঐ শব্দকে ইংরেজিতে বলে র‍্যাট্‌ল্। তাই থেকে সাপের নামও র‍্যাট্‌ল্। লেজের আংটিগুলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যায়ও বাড়তে থাকে। অনেকে বলেন ঐ শব্দের উদ্দেশ্য শিকারকে ভড়কে দেওয়া; আবার অনেকে বলেন, ঐ ভাবেই ওরা জাতভাইদের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে। এমনও দেখা গেছে, একটা র‍্যাট্‌ল্ সাপ যদি লেজ আছড়াতে শুরু করল তা হলে আশপাশের অন্যান্য র‍্যাট্‌ল সাপও লেজ আছড়াতে শুরু করবে। শেয়ালের ডাকের মত আর কি!

সাপ সম্বন্ধে আর একটা বড় কথা—ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটির মত সাপও সারা শীতকাল অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে কাটায়—কোনও নিরিবিলি ফাটল বেছে নিয়ে। সে ঘুম ভাঙ্গে একেবারে বসন্ত কালে।

পাখির রাজ্য

পাখি আমরা প্রায় সকলেই ভালোবাসি। ওদের অনেকেরই বাহারী রং এবং মিষ্টি ডাক, যাকে আমরা বলি গান,—আমাদের মুগ্ধ করে। এমন কথাও কেউ কেউ বলেন যে প্রাণিজগতে পাখি না থাকলে পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যেত।

পাখিরাও (বৈজ্ঞানিক নাম 'এভিস') কিন্তু জন্মেছে সরীসৃপ থেকেই। আদিকালের উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোড্যাক্‌টিলের কথা তোমরা এই বইএর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১১৯-১২০) পড়েছ। এদের কোন কোনটা আকারে যেমন বিরাট হ'ত স্বভাবও ছিল তেমনি হিংস্র। কিন্তু ওরাই যে পাখির পূর্বপুরুষ সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন একমত। অথচ, আশ্চর্য, সরীসৃপরা হচ্ছে ঠাণ্ডা রক্তওয়ালা প্রাণী, আর পাখিদের রক্ত সব সময়েই গরম।

সবচেয়ে পুরোনো পাখির যে দু'টি ফসিল পাওয়া গেছে তার বয়স আন্দাজ করা হয়েছে

প্রায় ১৪ কোটি বছর। ওদের একটির নাম দেওয়া হয়েছে আর্কিওপ্‌টেরিক্স, অপরটির আর্কিঅর্নিস। আকারে এক-একটা পায়রার মত, কিন্তু চেহারার মধ্যে পাখি ছাড়াও সরীসৃপদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। যেমন, গায়ে পালক থাকলেও গলা আর মাথা সরীসৃপদের মতই আঁশ দিয়ে ঢাকা। পা-টাও তাই। (পায়ে এই আঁশ অবশ্য এখনকার পাখিদের মধ্যেও দেখা যায়।) সরীসৃপদের মতই মুখের চোয়ালে ছু' সারি দাঁত বসানো—যা এ যুগের



আর্কিওপ্‌টেরিক্স

পাখিদের কারো দেখা যায় না। মাথার গড়নেও পাখির চাইতে সরীসৃপদের সঙ্গে মিলটা যেন বেশি। যাই হোক, এই ১৪ কোটি বছরের ক্রমবিকাশের ফলে পাখির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নানা জাতের, নানা চেহারার, নানা ধরনের, নানা স্বভাবের ছোটবড় অসংখ্য পাখির আবির্ভাব ঘটেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন অন্তত ৯ হাজার প্রজাতি আছে পাখির। শাখা-প্রজাতি ধরলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারেরও ওপর।

পাখি কি করে উড়তে শিখল

সরীসৃপরা একদল পাখি হয়ে কি করে উড়তে শিখল সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ছু'টি মত আছে। একদল বলেন, কতকগুলি সরীসৃপ এক সময়ে মাটিতেই থাকত, কিন্তু খুব জোরে ছুটতে পারত। ছোটার সুবিধের জন্য এদের সামনের পা ছু'টো হয়ে যায় পেছনের পা ছু'টোর চাইতে ছোট। ঐ রকম পায়ের সুযোগ নিয়ে জোরে দৌড়বার সময়ে অনেক সময় ওরা মাটি থেকে, প্রথম দিকে খানিকটা এবং শেষের দিকে অনেকখানি, ওপরে উঠে যেত—অনেকটা অল্পস্বল্প ওড়ার মত। এ থেকেই ক্রমে সামনের পা ছু'টো বদলাতে বদলাতে ডানায় রূপান্তরিত হয় আর ওরা পুরোপুরি উড়ুক্কু জীবে পরিণত হয়।

অপর দলের মত হচ্ছে, সরীসৃপদের কতকগুলি ঘন জঙ্গলে বাস করত এবং বেশির ভাগ সময় তাদের গাছের ডালেই কাটত। ঐ সময় এক ডাল থেকে আর এক ডালে যাবার সময় ওরা শরীরটাকে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে নামত। এই অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে ওরা অনেকক্ষণ শূন্যে কাটাতে শিখল এবং ক্রমে সামনের পা ছু'টো ডানা বা পাখায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।



পাখা নেই তবু যারা ওড়ে

পাখির শরীর ওড়ার মত করেই তৈরি

পাখির শরীরের গড়নই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে মনে হবে বিশেষ করে ওড়ার জন্যই ঐ শরীর তৈরি। অন্যান্য হাড়ওয়ালা প্রাণীদের তুলনায় ওদের হাড়ের সংখ্যা কম—অনেক হাড় আবার একত্র হয়ে মিশে গেছে। কতকগুলি হাড়ের ভিতরটা আবার ফাঁপা—বাতাসে ভর্তি। কাজেই সেগুলো খুব হাল্কা। শরীরের গড়ন অনেকটা জাহাজের খোলের মত বাঁকানো। কাঁধের হাড় খুব শক্ত—যাতে উড়বার সময় ডানায় জোর পাওয়া যায়। সারা শরীর হাল্কা পালক দিয়ে ঢাকা, সে পালকগুলোও আবার একটা অপরটার ওপর এমন ভাবে বিছানো যে তাতেও উড়বার সুবিধে হয়। পাখি অবশ্য এই পালককে খুব যত্ন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ডানার গড়নও উল্লেখযোগ্য। ওর ওপরের দিক্‌টা সামান্য একটু ধনুকের মত বাঁকানো, কিন্তু তলার দিক্‌টা ঠিক উল্টো কিংবা প্রায় সমতল; ডানার কোণটা ধীরে ধীরে সরু হতে হতে ছুঁচলো হয়ে গেছে। পাখির লেজও অন্য জানোয়ারদের মত নয় মোটেই, ওটিও উড়তে যাতে সুবিধে হয় সেই ভাবেই তৈরি।

এরোপ্লেন যে ভাবে ওড়ে পাখির ওড়ার কায়দাও ঠিক তাই। পাখির দেহের অনুকরণ করেই যে এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। আকাশে উড়তে গেলে যে ক'টি গুণ থাকা দরকার তা সবই পাখিদের আছে। ঐ সময়ে তার ওজন বাতাসের ঊর্ধ্বচাপের সমান হয়। বাতাস ঠেলে এগিয়ে চলার শক্তিও আছে তার। ডানার ঐ রকম গড়নের দরুণ তার ওপরের বাতাস তার তলার বাতাসের চাইতে বেশি জোরে বইতে থাকে, ফলে ওপরের বাতাসের চাপ নীচের চেয়ে কম হয়ে যায়, আর পাখিও ওপরে ঠেলে উঠতে পারে। বাতাসের গতির ফলেই ওর দেহের সামনের দিক্‌টা সহজ ভাবে এগিয়ে যায় আর পিছনের দিক্‌টা

ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলে। অবশ্য এই সময়ে ডানা ঝাপ্‌টাও দিতে হয়—অনেকটা নৌকো বাওয়ার মত করে। লেজটা করে হালের কাজ, অর্থাৎ এরই সাহায্যে পাখি ইচ্ছেমত দিক্ পরিবর্তন করতে পারে। ডানা ঝাপ্‌টাবার অভ্যাস এক এক পাখির এক এক রকম। সেকেণ্ডে ১০।১২ বার থেকে ৫০।৬০, ১০০।১৫০—এমন কি সময় সময় ২০০ বার ডানা ঝাপ্‌টায় এমন পাখিও আছে। কোন কোন পাখি আবার দীর্ঘ সময় ডানা না ঝাপ্‌টিয়ে একটানা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে।

পাখিদের ওড়ার গতিবেগও নেহাৎ কম নয়। ছোট ছোট পাখিরা অনেকেই ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। এমন কি কাকও। বুনো হাঁসের গতিবেগ আরও বেশি। পায়রা ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে ছুটতে পারে এবং একটানা। কোন কোন শিকারী পাখি ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশি যেতে পারে। সোনালি ঈগলের গতিবেগ শিকারে ছোঁ মারার সময়ে ঘণ্টায় ১৮০ মাইলও হতে দেখা গেছে। সুইফ্‌ট্ পাখি, নাম শুনেই বোঝা যায়, খুব দ্রুতগামী। এরা নাকি ঘণ্টায় ২০০ মাইলও যেতে পারে।



সোনালি ঈগল উড়ছে।

পাখির রঙ, পাখির ডাক : হরেক রকম পাখি

পাখির বিচিত্র রঙ আর বিচিত্র কণ্ঠস্বর আমাদের মুগ্ধ করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এগুলিরও একটা করে কারণ আছে। সাধারণত দেখা যায় পুরুষ পাখিরা দেখতে সুন্দর এবং গান করতেও ওস্তাদ। দেহের ঐ সৌন্দর্য আর মিষ্টি গানের উদ্দেশ্য অনেক সময়েই সঙ্গিনীদের আকৃষ্ট করা এবং এ বিষয়ে মানুষের ঠিক উল্টো এরা। মেয়েদের চাইতে পুরুষরাই এ গুণটা বেশি পেয়েছে।

ডিম পাড়ার সময় হলে পাখি বাসা বাঁধতে শুরু করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এ কাজে অংশ নেয় এবং ডিমে তা দেবার কাজও অনেক সময় ভাগাভাগি ক'রে করে। বাচ্চা হবার পরেও সরীসৃপদের মত ওরা তাকে নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে যায় না। যতদিন বাচ্চার চোখ না ফোটে, উড়তে না শেখে, নিজে খাবার সংগ্রহ করতে না পারে তত দিন ধরে বাচ্চার সমস্ত ভার মা-বাবার ওপর। পাখি মুখে করে খাবার

এনে বাচ্চাদের খাইয়ে দিচ্ছে এ দৃশ্য তো হামেশাই দেখা যায়।

পৃথিবীর সব দেশেই নানা জাতের পাখি আছে। বাংলা দেশে কাক, চিল থেকে শুরু করে চড়াই, শালিখ, দোয়েল, ফিঙ্গে, টিয়া, ঘুঘু, শ্যামা, হাঁস, চাতক, বক, সারস ইত্যাদি হরেক রকম পাখি আমরা দেখতে পাই। টুনটুনি (খুব ছোট্ট পাখি), কোকিল, বুলবুলি, বউ কথা কও খুব বেশি চোখে না পড়লেও আমাদের দেশেরই পাখি। ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখি,—আশ্চর্য সুন্দর দেখতে এই পাখি। বাজ, চিল—এরা হ'ল মাংসাশী পাখি, তেমনি মাছরাঙ্গা, বক—এরা হ'ল মাছখেকো পাখি। মাংসাশী পাখিদের অনেকেরই ঠোঁট বাঁকানো এবং ধারাল, নখও তাই;—শিকারের গায়ে নখ বিঁধিয়ে তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে। কোন পাখিরই দাঁত নেই, কিন্তু ঠোঁট এত শক্ত যে তাই দিয়েই তারা ঠুকরে ঠুকরে শক্ত জিনিস ভেঙ্গে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারে। বেশির ভাগ পাখিই পোকামাকড়, ফড়িং, ক্ষেতের ফসল আর বনের ফলফলারি খেয়ে থাকে। শহুরে পাখি এঁটোকাঁটা যা পায় তাই খায়। তবে একেবারে নিরামিষাশী পাখির কথা শোনা যায় নি।

সুন্দর সুন্দর পাখি অন্যান্য দেশেও অনেক আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় বার্ড অব্ প্যারাডাইস্। কিন্তু এখানে নামের ফর্দ দিয়ে লাভ নেই। গাইয়ে পাখির মধ্যে চন্দনা, ময়না, কাকাতুয়া মানুষের স্বরের অনুকরণ করতে পারে। কাকাতুয়া কিন্তু আমাদের দেশের পাখি নয়।

পাখির রাজা ঈগল

'খোকার দপ্তর' বইটিতে মনোমোহন সেন মশাই আমাদের শিখিয়ে গেছেন, ঈগল পাখি পাখির রাজা। আমাদের পুরাণে অবশ্য পাখিদের রাজা হচ্ছেন বিষ্ণুর বাহন গরুড়। কিন্তু গরুড় তো পুরোপুরি পাখি ন'ন, ওঁর মধ্যে মানুষ-মানুষ ভাবও রয়েছে বেশ খানিকটা। তা ছাড়া গরুড় পৌরাণিক পাখিদেরই রাজা, এ যুগের পাখিদের ওপর তাঁর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। তাই রাজত্ব না থাকলেও সবচেয়ে শক্তিমান্ পাখি হিসেবে ঈগলকেই বলা হয় পাখির রাজা।

চিড়িয়াখানার বাইরে ঈগল তোমরা নিশ্চয়ই দেখ নি। সাধারণ লোকালয়ে ওরা থাকে না—থাকে উত্তরে সেই সমুদ্রের ধারে বা গভীর জঙ্গলে—জনমানবহীন পাহাড়ের চূড়ায়। ঈগল নানা রকমের হয়, তার মধ্যে সামুদ্রিক ঈগলই বোধ হয় সবচেয়ে বড়। এদের এক-একটার পাখাই হয় ১০।১২ ফুট লম্বা। সামুদ্রিক বলতে কিন্তু মনে ক'র না এরা জলে বাস করে। এরা বাস করে সমুদ্রের ধারে। এদের প্রধান খাদ্য



পাহাড়ের চূড়ায় ঈগল

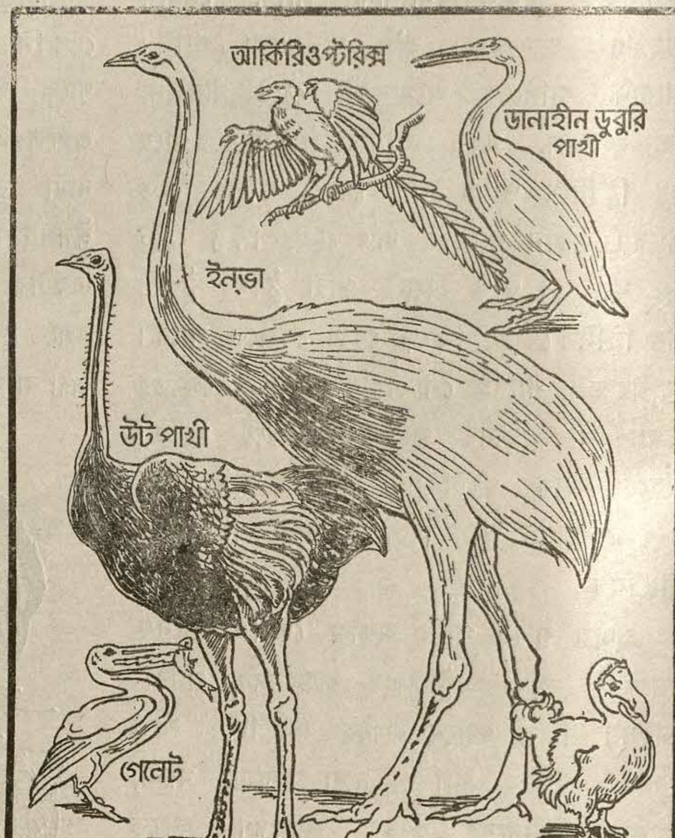
মাছ। জলের ওপর থেকেই ছোঁ মেরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ তুলে নিতে পারে।

আর এক রকম আছে সোনালি ঈগল। দেখতে ভারি সুন্দর। কিন্তু হলে কি হবে, ভীষণ হিংস্র এরা। থাকে পাহাড়ের চূড়ায়। শিকার ধরবার সময়ে নীচে নেমে আসে।

যোগীন সরকার মশায় লিখেছেন—"ইঁদুর-ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে।" কিন্তু ইঁদুর তো ছাড়,—বড় বড় ছাগল, ভেড়া, হরিণ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে রেহাই পায় না। বিদ্যুৎবেগে নেমে আসে 'ডাইভ্' দিয়ে, তার পর পিঠে ধারাল নখ বিঁধিয়ে দিয়ে ঐ ভারী জানোয়ারগুলিকে অনায়াসে ওপরে তুলে নিয়ে যায়। শেষে ঠোঁট দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। অনেক সময় বনে হরিণের পালের ওপর নেমে আসে ঈগল, পাখার ঝাপ্টা মেরে মেরে ভয়ার্ত একটিকে তাড়িয়ে দলছাড়া করে নেয়, তার পর এক ফাঁকে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। কী অসম্ভব জোর গায়ে!

অত্যন্ত পেটুক পাখি এই ঈগল, আর, কোন প্রাণীকেই খেতে ছাড়ে না। বাচ্চা ঈগল, যাদের উড়বার ক্ষমতাটুকুও হয় নি,—তাদের পর্যন্ত ছোট ইঁদুর, খরগোস বা পাখির ছানা না হলে চলে না। এজন্য মা-পাখি বাসার সঙ্গে একটা ভাঁড়ারে ঐ সব খাবার এনে জড় করে রেখে দেয়। বাচ্চারা মায়ের অনুপস্থিতিতেও গুঁড়ি মেরে সেখানে গিয়ে যখন তখন খেয়ে আসে।

লণ্ডনের এক সাহেবের নানা রকম জীবজন্তু পোষার বাতিক ছিল। একটা ঈগল পাখিও পুষেছিলেন তিনি। সুযোগ পেলেই সেটা অন্যান্য পোষা জানোয়ারগুলিকে ধরে ধরে খেত। তার জ্বালায় বাড়িতে বেড়াল-কুকুর রাখবারও উপায় ছিল না—সব সে খেয়ে শেষ করে দিয়েছিল। শেষে সে যখন একদিন সাহেবের পোষা বাঁদরটাকেও ধরে খেয়ে ফেলল তখন বেগতিক দেখে সাহেব তাকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

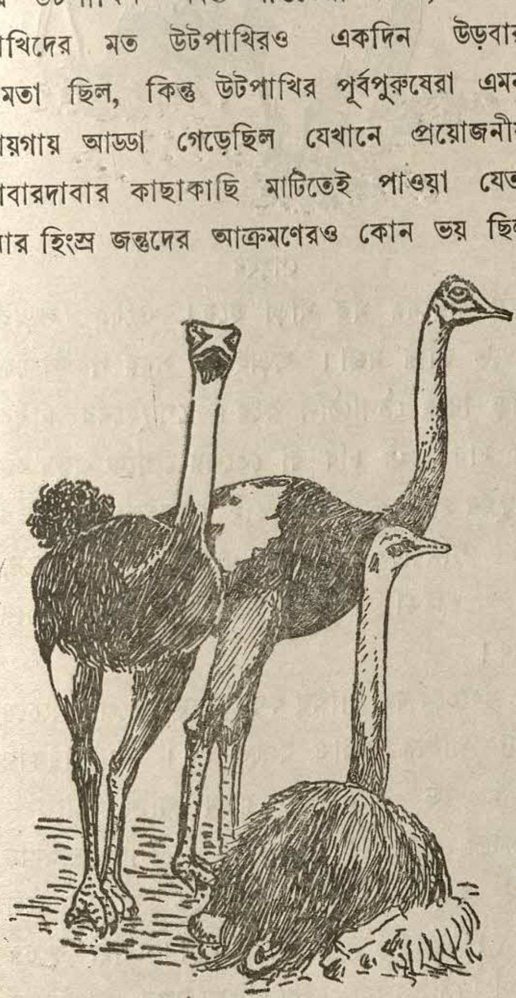


এই পাখিরা উড়তে পারে না। এদের কোন কোনটা এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

সব পাখি উড়তে পারে না

কোন কোন পাখি জলে বা জলের ধারে থাকতে ভালবাসে। হাঁস, বক, সারস এই ধরনের পাখি। জলচর পাখিদের পায়ের পাতা সচরাচর চামড়ার পর্দা দিয়ে যোড়া থাকে, সেজন্য এরা খুব দক্ষ সাঁতারু হয়।

সব পাখি কিন্তু উড়তে পারে না। যেমন ধর উটপাখি। অবশ্য পণ্ডিতেরা বলেন, অন্যান্য পাখিদের মত উটপাখিরও একদিন উড়বার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু উটপাখির পূর্বপুরুষেরা এমন জায়গায় আড্ডা গেড়েছিল যেখানে প্রয়োজনীয় খাবারদাবার কাছাকাছি মাটিতেই পাওয়া যেত, আর হিংস্র জন্তুদের আক্রমণেরও কোন ভয় ছিল



উটপাখি

না। মাটিতেই এ রকম নিশ্চিন্ত জীবন পাওয়ায় আকাশে ওড়ার দরকার হ'ত না ওদের। ডানার এই অব্যবহারের ফলেই অবশেষে একদিন ওদের বংশধরদের উড়বার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল। সেই থেকে উটপাখি আর উড়তে পারে না।

তবে উড়তে না পারলেও উটপাখি ছুটতে পারে খুব। ঘণ্টায় ৫০।৬০ মাইল ছোটা তার কাছে কিছুই না। গায়েও তার ভীষণ জোর। পিঠের ওপর দু'-তিন জন সওয়ারকে বসিয়ে সে ঘোড়ার মত ছুটতে পারে—প্রচণ্ড বেগে। এজন্য কোন কোন সৌখীন লোককে উটপাখি গাড়িতে যুতে ঘোড়ার মত গাড়ি টানাতেও দেখা গেছে। আকারেও বর্তমান পাখিদের মধ্যে উটপাখিই সবচেয়ে বড়। ৭।৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় এরা। এক-একটা উটপাখির ডিমও ওজনে ২।৩ কে. জি.র কম হবে না। ঐ একটা ডিমের ওমলেট ভেজে ২৫।৩০ জন লোককে নিমন্ত্রণ খাইয়ে দেওয়া যায়।

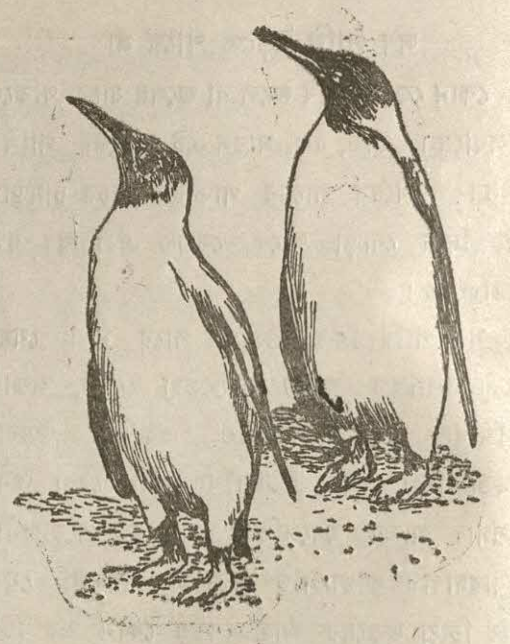
কথায় বলে উটপাখি সর্বভুক্। সত্যি, যা পায় তাই সে গিলে ফেলে। একবার একটি উটপাখির পেটে ৭টি পেরেক, ১৩টি তামার পয়সা, একটি রূপোর টাকা, ২টি চাবি এবং অসংখ্য গোল গোল পাথর পাওয়া গিয়েছিল। বলা বাহুল্য খিদের চোটে এগুলি সবই সে গিলে ফেলেছিল।

উটপাখি নাকি এক সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যেত, আমাদের দেশেও। কিন্তু এখন শুধু আফ্রিকাতেই ওদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে আরব দেশেও কিছু কিছু আছে। পোষা উটপাখি অবশ্য সব দেশেই আছে। উটপাখির পালকের ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা। খুব চড়া দামে ওগুলো বিক্রি হয়। এক-একটা পাখি

থেকে ফি বছরই পালক কেটে নেওয়া যায়, আর এই উটপাখি বেঁচে থাকে গড়পরতা প্রায় ৫০।৬০ বছর।

উটপাখির মত আর একটি বড় জাতের পাখি হ'ল অস্ট্রেলিয়ার এমু। এরাও উড়তে পারে না। তবে এরা উটপাখির চাইতে আকারে কিছু ছোট। কিন্তু দু'-তিনশ' বছর আগেও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে এমন এক জাতের পাখি দেখতে পাওয়া যেত যাদের তুলনায় উটপাখিকেও নিতান্ত শিশু বলা যায়। এদের বলা হ'ত মোয়া। উঁচুতে এক-একটা মোয়া ১৪।১৫ ফুট ছাড়িয়ে যেত। ওদের ঠ্যাংগুলো ছিল এক-একটা হাতির পায়ের মত, আর তেমনি অসাধারণ ছিল সেই ঠ্যাংএর জোর। কিন্তু, হলে কি হবে, উটপাখির মত এদেরও উড়বার ক্ষমতা ছিল না আর এদের মাংস ছিল নাকি খুব সুস্বাদু। তাই হ'ল ওদের কাল। মাংসের লোভে ওখানকার মানুষেরা শিকার করে করেই ওদের নির্বংশ করে দিয়েছে। দু'-তিনশ' বছর আগেও ওদের দেখা গেছে, কিন্তু এখন আর একটি মোয়াও নেই পৃথিবীতে। মোয়ার মত আর দু'টি বড় জাতের পাখিও এই অল্প দিন—১৫০।২০০ বছর আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এর একটির নাম ছিল ইপিয়র্নিস, আর একটির নাম অক্। ইপিয়র্নিসের এক-একটা ডিম প্রায় তিন ফুট লম্বা হ'ত, তার খোলার মধ্যে অন্তত দু'গ্যালন (প্রায় দশ লিটার) জল ভরে রাখা যেত।

পাখা থাকতেও উড়তে পারে না এমন আর একটি পাখি হচ্ছে পেঙ্গুইন। এরা শীতের দেশের বাসিন্দা। ডানাটা কালো, পেটটা সাদা;



পেঙ্গুইন

হাঁটে মানুষের মত খাড়া হয়ে। এদের লড়াই দেখতে ভারি মজা। লড়াইয়ের সময় পরস্পরকে ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলাঠেলি করে। পেঙ্গুইনের চর্বির খুব দাম। ঐ চর্বি বা তেলের লোভে মানুষ বহু পেঙ্গুইন হত্যা করেছে। তাই পেঙ্গুইনের সংখ্যাও এখন পৃথিবীতে খুব কমে এসেছে। কে জানে, এরাও হয়তো শীগ্গিরই একদিন লোপ পেয়ে যাবে!

সবচেয়ে বড় পাখির কথা বলতে গেলে সবচেয়ে ছোট্ট পাখির কথাও বলতে হয়। আমেরিকায় হামিং বার্ড্ নামে এক রকম পাখি আছে— আকারে এক-একটা ভোমরার মত। ভোমরার মতই গুন্‌গুন্ শব্দ (ইংরেজিতে যাকে বলে হামিং) করে বলেই এই নাম। লম্বা সূচের মত সরু ঠোঁট ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এরা ফুলের মধু খায়, ঐ ঠোঁট দিয়েই আবার ছোট্ট ছোট্ট পোকামাকড়ও ধরে।



সবচেয়ে ছোট্ট পাখি হামিং বার্ড

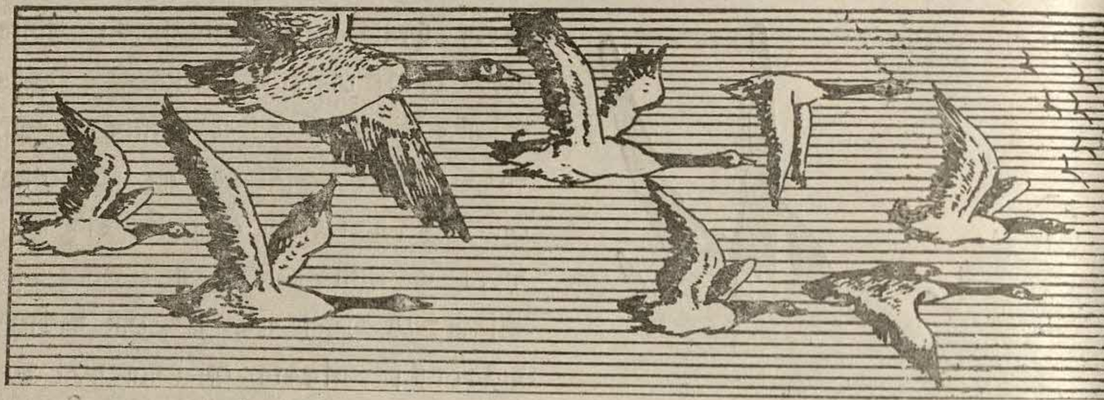
পাখির বাসা

ডিম পাড়ার আগে পাখিরা বাসা বাঁধে। এক এক জাতের পাখির বাসা বাঁধবার কায়দা এক এক রকম, আর জলে-স্থলে, পাতালে কোথায় যে ওরা বাসা বাঁধে না সেটাই হ'ল সমস্যা। সে বাসাও কি এক রকম? কোনটা ঝুড়ির মত, কোনটা পুঁটলির মত, কোনটা মৌচাকের মত; কোনটা বলের মত গোল, কোনটা চোঙ্গার মত লম্বা। বাসা তৈরির মশলা হচ্ছে গাছের শুকনো ডালপালা, খড়কুটো, ঘাস, কাদামাটি, পালক, ইটের টুকরো, ভাঙ্গা কাচ, পাথর, হাড়গোড় ইত্যাদি কত কি! মুখের লালাও ব্যবহার করা হয় সমানে—যুড়বার আঠা হিসেবে। অবশ্য বাসা বাঁধে না এমন পাখিও কিছু কিছু আছে। অনেক পায়রা ছাদের আলসে বা কার্নিসের নীচে বাস করে—সেই কালিদাসের যুগ থেকেই। কাঠঠোকরা ঠোঁট দিয়ে গাছের গায়ে গর্ত করে পোকামকড় ধরে, আবার সময় সময় তার মধ্যে থাকেও।

কাকের বাসা তো তোমরা হামেশাই দেখ, বাবুইএর বাসা দেখেছ কখনও? ঘাস দিয়ে বোনা, কতকটা চোঙ্গার মত লম্বা—নিখুঁত পরিপাটি বাসা। ভিতরে ঢুকবার দরজা তলার দিকে। আবার শত্রুকে ধোঁকা দেবার জন্য ওপরে নকল দরজাও বসানো থাকে সময় সময়। গ্রেব্ পাখি খড়কুটো, আগাছা দিয়ে জলে-ভাসা এমন এক 'ওয়াটারপ্রুফ' নৌকোর মত বাসা বানায় যে দেখলে তাক্ লেগে যাবে। এ বাসা নৌকোর মতই এদিক্-ওদিক্ ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়,—ঠিক যেন কাশ্মীরের হাউস-বোট! আফ্রিকার ফ্লেমিংগোর বাসা হচ্ছে কাদার ঢিবি। ওপরটা সমতল, মাঝে একটু গর্তমত। হাজার হাজার ঢিবি তৈরি করে হাজার হাজার ফ্লেমিংগো একসঙ্গে ডিম পাড়ে সেই সব বাসায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বাসা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বাওয়ার বার্ড্ বা কুঞ্জপাখির। বাসা তো নয়, যেন কুঞ্জবন! লতাপাতা, শামুক-ঝিনুক, ভাঙ্গা কাচ-পাথর জড় করে সে বাসা সাজায় তারা। যা তাদের চোখে দেখতে ভালো লাগে তাই এনে জড় করে। এমন কি মানুষের পাড়ায় গিয়ে রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো, রঙচঙে কাগজের বাক্স কুড়িয়ে আনে। একবার এই রকম একটা পাখির বাসায় কয়েকশ' খালি দেশলাই-বাক্স পাওয়া গিয়েছিল। এই পাখি আর তার বাসার নমুনা কলকাতার যাদুঘরে গেলে দেখতে পাবে।

পাখিদের যাযাবর বৃত্তি

পাখিদের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলে শেষ করব। সেটা হচ্ছে পাখিদের যাযাবর বৃত্তি। কোন কোন পাখি বিভিন্ন ঋতুতে দল বেঁধে অন্য দেশে চলে যায়, আবার ঋতু বদলালেই ঠিক সেইখানে ফিরে আসে। এইভাবে সময় সময় হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয় ওরা। পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র ডিঙ্গিয়ে দিনের পর



যাযাবর পাখির দল ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে।

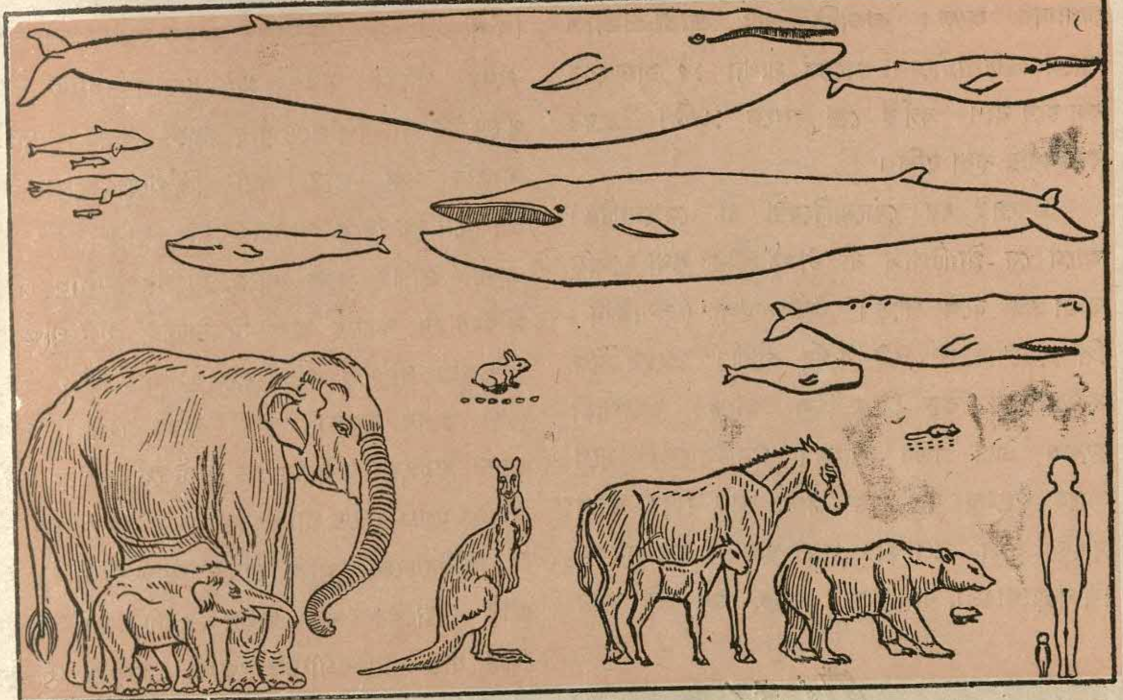
দিন ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে। এদেশের কোন কোন হাঁস গ্রীষ্মকালে যায় উত্তরে—তিব্বতের মানস সরোবরের দিকে, আবার শীত পড়লেই ঠিক ফিরে আসে নিজের দেশে। এ রকম অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার পাখিরা চারটি পথে এই রকম যাতায়াত করে—এক-একটা পথ ১৮ হাজার থেকে ২২ হাজার মাইলের কম হবে না। কি করে ওরা পথ চিনে যায়, আবার কি করে পথ চিনে এতটা দূরে ফিরে আসে এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় রহস্য হয়ে রয়েছে।

যে সব প্রাণী মায়ের দুধ খায়

এবারে আমরা ডাঙ্গার সবচেয়ে আধুনিক প্রাণীর প্রসঙ্গে চলে আসব। অন্যান্য সমস্ত জাতের প্রাণীর সঙ্গে এদের বড় তফাৎ, এই শ্রেণীর প্রাণীরা সবাই বাচ্চা অবস্থায় মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। দুধকে সাধু ভাষায় বলা হয় স্তন্য, তাই বাংলায় এদের নাম স্তন্যপায়ী। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন ম্যামেলিয়া শ্রেণীর (ক্লাস) প্রাণী। ল্যাটিন 'ম্যামা' শব্দটির অর্থ মাতৃস্তন—তাই থেকে ম্যামেলিয়া। ঘোড়া, গরু, কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, খরগোস থেকে শুরু করে বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি, জিরাফ, বানর, গরিলা, বাদুড়, ক্যাঙ্গারু, তিমি—সবই এই দলে পড়ে। আমরা, মানুষেরাও এই দলের অর্থাৎ এই শ্রেণীর প্রাণী।

স্তন্যপায়ীদের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের সবারই শিরদাঁড়া, হাড় ইত্যাদি বেশ সুগঠিত,—মগজও তাই অন্য শ্রেণীর প্রাণীর তুলনায় অনেকটা পরিপুষ্ট। এদের প্রত্যেকেরই গায়ে অল্পবিস্তর লোম আছে, গায়ের চামড়ার ভিতর দিয়ে জল ঢোকে না, সকলেরই রক্ত গরম আর এরা সকলেই সরাসরি মায়ের পেট থেকে পড়ে মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়। শুধু প্ল্যাটিপাস জাতের দু'-একটি স্তন্যপায়ী এখনও ডিম পাড়ে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বছর আগে কটিলোসরস্ নামে এক জাতের প্রাণী পৃথিবীতে বাস করত। এই কটিলোসরস্রাই সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী দু'য়েরই পূর্বপুরুষ। আজ থেকে অনুমান ১৫ কোটি বছর আগে কতকগুলি



আদুরে ছেলের দল : বিভিন্ন স্তন্যপায়ী ও তাদের বাচ্চারা
ওপরে নানা জাতের তিমি, মাঝখানে খরগোস, নীচে বাঁ দিক্‌ থেকে হাতি, ক্যাঙ্গারু, গাধা, ভালুক আর মানুষ

সরীসৃপ চেহারা বদলাতে থাকে। সামনের আর পেছনের পাগুলো দু'পাশে ছড়িয়ে না থেকে সরাসরি চলে আসে শরীরের নীচে, ফলে শরীরটা মাটি থেকে বেশ একটু উঁচু হয়ে ওঠে। পায়ের হাড় আরও শক্ত হয়ে তাতে জোর বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বদলাতে শুরু করে—দাঁত বদলায়, মুখ বদলায়, মগজ বদলায়। বুক, পেট—সর্ব অঙ্গেই বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। মায়েরা ডিম পাড়া ছেড়ে সরাসরি তাদেরই প্রায় অনুরূপ চেহারার বাচ্চা দিতে থাকে এবং সে বাচ্চা বেরিয়ে এসে কি খাবে সে ব্যবস্থাও মায়ের দেহের মধ্যেই তৈরি থাকে। এর ফলে জন্মের পর প্রথম দিক্‌টায় মা ও সন্তানের মধ্যে একটা পারিবারিক জীবনও গড়ে ওঠে, সরীসৃপদের মত ডিম পেড়েই কিংবা ডিম থেকে ছানা বেরোলেই মা-বাবার কর্তব্য শেষ হয় না। মাকে কিছুদিন সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়; সময় সময় বাপকেও তার অংশ নিতে হয়। পাখিদের মধ্যেও এ ব্যাপারটা দেখা যায়, তবে স্তন্যপায়ীদের বেলায় সন্তানপালনের সময়টা যেন আরও দীর্ঘস্থায়ী।

বিভিন্ন জাতের স্তন্যপায়ী

অন্যান্য প্রাণীদের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেও বহু জাত আছে—যাদের বিজ্ঞানীরা বর্গ (ফ্যামিলি), গণ (জেনাস্), প্রজাতি (স্পিসিস্) ইত্যাদিতে ভাগ করেছেন। আমরা অবশ্য অত সূক্ষ্ম ভাগাভাগি না করে অনেক জায়গায় জাত কথাটাই ব্যবহার করেছি—মোটামুটি তফাৎটা

দেখাবার জন্যে। প্রজাতি এবং শাখা-প্রজাতি ধরলে স্তন্যপায়ীদের জাতের সংখ্যা ১৫ হাজারের কম হবে না। বর্গই তো আছে ১৮টি। এদের কয়েকটির কথা বলি।

প্রথমেই ধর মোনোট্রিমেটা বা মোনোট্রিম। আগে যে প্ল্যাটিপাস বা হাঁসঠুঁটোর কথা বলেছি তারা এই দলে পড়ে। কাঁটাওয়ালা (স্পাইনি) পিঁপড়েখোররাও এই বর্গের প্রাণী। এদের সঙ্গে সরীসৃপদের কিছু কিছু মিল আছে। স্তন্যপায়ী হলেও এরা ডিম পাড়ে। প্ল্যাটিপাসের মুখে আছে হাঁসের মত শক্ত ঠোঁট, তাই দিয়ে কাদা খুঁটে এরা পোকা ধরে খায়। এই দলের পিঁপড়েখোররা, নাম শুনেই বুঝছ, শুধু উই আর

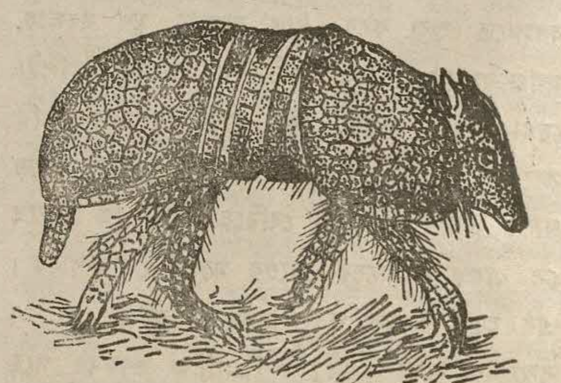


পিঁপড়েখোর

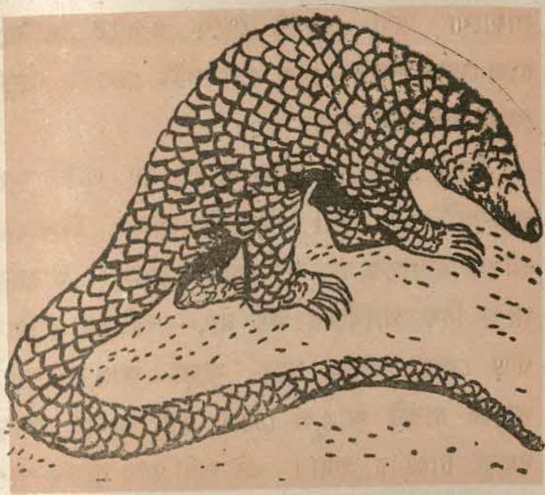
পিঁপড়ে খেয়ে থাকে। উইএর ইংরেজি হচ্ছে হোয়াইট অ্যান্ট, তাই এদের নাম অ্যান্ট-ইটার।

এই পিঁপড়েখোরদের সঙ্গে বড় জাতের পিঁপড়েখোরদের (যাদের সাধু বাংলায় অতিকায় পিপীলিকাভুক্ এবং ইংরেজিতে জায়ান্ট অ্যান্ট-ইটার বলা হয়) চালচলনে কিছুটা মিল থাকলেও তারা কিন্তু অন্য বর্গের প্রাণী—যাকে বলে এডেন্টাটা। অতিকায় নাম শুনেই বুঝছ এই পিঁপড়েখোরগুলো আকারে অনেক বড়। তা ছাড়া এদের পায়ের নখও খুব ধারাল—যাতে মাটি খুঁড়ে উই আর পিঁপড়ে বার করতে পারে। মুখটা অসম্ভব সরু আর লম্বা—পিঁপড়ে ছাড়া অন্য প্রাণী সে মুখ দিয়ে খাওয়াও যায় না। অত বড় একটা প্রাণীর পক্ষে ঐটুকু মাপের খাবার খেয়ে জীবনধারণ করতে হলে দিবারাত্রই যে খাওয়ার দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে তাতে সন্দেহ কি? তবে চিন্তা করার ক্ষমতা সম্ভবত ওদের নেই। মাথা এদের শরীরের তুলনায় এত ছোট যে সেখানে আর কতটুকু মগজ ধরতে পারে?

আর্মিডেলো আর স্লথও এডেন্টাটা বর্গের প্রাণী। স্লথের মত অলস প্রাণী বড় একটা দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে এক রকম ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই এরা প্রায় সারা জীবনটা কাটিয়ে দেয়। খায় গাছের পাতা। নেহাৎ পেটে তাত না পড়লে এ-ডাল থেকে ও-ডালে নড়তে চায় না। আবার যেতে যেতেই হয়তো মাঝপথে একটু ঘুমিয়ে নেয়। স্লথ দিনের পর দিন এক জায়গায় একভাবে ঝুলছে আর তার সারা গায়ে সবুজ ছাৎলা গজিয়ে



আর্মিডেলো



প্যাঙ্গোলিন

যাচ্ছে—এমনও দেখা গেছে। আর্মিডেলোর সারা গা বর্মে আঁটা। একটু ছুঁয়েছ কি হাত-পা গুটিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে যাবে—তখন আর তাকে বর্মের ভিতর থেকে টেনে বার করা যাবে না। এই ধরনের আর এক রকম বর্মধারী জীব হচ্ছে প্যাঙ্গোলিন। এরাও পিঁপড়েখোর, তবে অন্য বর্গের জীব—ফলিডোটা বর্গ।

যাদের বাচ্চা থলির ভিতর থাকে

মার্সুপিয়ালিয়া হচ্ছে আর এক বর্গের স্তন্যপায়ী। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে—মায়ের পেটে একটা চামড়ার থলি থাকে আর বাচ্চারা



মা ক্যাঙ্গারু—পেটের নীচে থলির ভিতর বাচ্চা

জন্মের পর এই থলির মধ্যেই কিছুদিন বাস করে—কারণ তখনও তারা সম্পূর্ণ পুষ্ট হয় না। থলির মধ্যেই থাকে মাতৃস্তন, বাচ্চারা সব সময়েই তার বোঁটায় মুখ দিয়ে থাকে আর থলির মধ্যেই পুষ্ট হয়। তার পর আর একটু বড় হলে তারা থলি থেকে বেরিয়ে আসে বটে, কিন্তু একেবারেই ছেড়ে যায় না। একটু ভয় পেলেই ছুটে এসে মায়ের পেটের থলির নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ঢোকে। ক্যাঙ্গারু এই রকম একটি প্রাণী। চিড়িয়াখানায় তোমরা ওদের দেখেছ, যদিও আসল নিবাস হচ্ছে ওদের অস্ট্রেলিয়া। কোন কোন ক্যাঙ্গারুও আকারে খুব বড় হয়। সাত ফুট উঁচু আর



ওপোসাম

একশ' কে. জি. ওজনের ক্যাঙ্গারুও দেখা গেছে। এদের লেজটা যেমন বড় আর ভারী, পেছনের ঠ্যাং দু'টোও তেমনি। সামনের পা-জোড়া ছোট, অনেকটা হাতের মত। লেজে এবং পেছনের ঠ্যাংএ কিন্তু ভীষণ জোর। ঐতেই ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে পারে ওরা। সময় সময় এক এক লাফে ২০।২৫ ফুট পথও টপ্‌কে পার হয়ে যায়।



কোয়ালা

ওপোসাম, কোয়ালা, ছোট্ট ইঁদুর-ক্যাঙ্গারু—এরাও এই জাতের প্রাণী।

এইসঙ্গে আর এক জাতের স্তন্যপায়ীর কথাও বলে নি। এরা শুধু পোকা খেয়ে থাকে, তাই এদের নাম কীটভুক্ বা ইন্‌সেক্‌টিভোরাস্। ছুঁচো এই দলের জীব।

পাখি নয় তবু ওড়ে

ডর্মোপ্‌টেরা নামে আর এক বর্গের স্তন্যপায়ী আছে—কীটভুক্‌দের সঙ্গে যাদের কিছুটা মিল থাকলেও যাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খানিকটা উড়বার ক্ষমতা। এদের পিঠের চামড়ার সঙ্গে এমন একটা পর্দা লাগানো থাকে যার সাহায্যে এরা এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে চলে যেতে পারে—বেশ খানিকটা ভেসে। উড়ুক্কু লেমুর এই দলে পড়ে।

উড়ুক্কু প্রাণীদের মধ্যে বাদুড় যে পাখি নয়, স্তন্যপায়ী—এ কথা নিশ্চয়ই জান। বিজ্ঞানের ভাষায় এদেরকে বলা হয় চিরোপ্‌টেরা। বাদুড়ের পাখা ঠিক পাখিদের মত নয়,—শরীরের দু'দিকে ঘাড় থেকে আরম্ভ হয়ে, বুড়ো আঙুল বাদে পায়ের চারটি আঙুল ঢেকে, হাঁটু অবধি যোড়া মজবুৎ চামড়ার পর্দা। এই পর্দা তার বুকের পাশ দিয়েও গেছে এবং সে চামড়া হাঁটু থেকে আরম্ভ হয়ে তার নীচের দিক্ দিয়ে অপর হাঁটুর সঙ্গে যুড়ে গেছে। পাখির ডানার মতই এই চামড়ার পর্দা বাদুড় উড়বার জন্য ব্যবহার করে। বাদুড় নিশাচর প্রাণী। পোকামাকড় ওর প্রধান খাদ্য হলেও ফলফলারির ওপরেও ওর লোভ বড় কম নয়। আম-লিচুর সময়ে বাদুড়ের অত্যাচারের কথা কে না জানে?

বাদুড় পুরোপুরি উড়ুক্কু প্রাণী, থাকে গাছের ডালে। মাটির ওপর ভালো করে হাঁটতেও পারে না, কোন রকমে টলতে টলতে চলে।

বাদুড়ের ঘুম দেখেছ কখনও? ঘুমোবার সময়ে এরা ডানা দু'টো ছাতার মত ফট্‌ফট্ করে বন্ধ করে ফেলে, তার পর ওপর দিকে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে ঘুমোয়। দেখলে মনে হবে যেন কতকগুলো কাপড়ের পুঁটলি কেউ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাদুড়ের আর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা হচ্ছে শব্দ অনুভব করার শক্তি। বাতাস কাঁপলে শব্দ হয়, কিন্তু সব শব্দ আমরা শুনতে পাই না, একটা নির্দিষ্ট মাত্রার কাঁপুনির শব্দই শুধু আমরা

টের পাই। কিন্তু অতি দ্রুতবেগে কাঁপা শব্দের ঢেউ—যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন আলট্রাসোনিক বা সুপারসোনিক শব্দরাজ্য (যা দিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল অনেক অসাধ্যসাধন করছেন)—তা আমাদের ধরবার ক্ষমতা নেই। বাদুড় কিন্তু তা ঠিক ধরতে পারে। দ্রুত পাখা নেড়ে তৈরিও করতে পারে তা। আধুনিক যে রাডার যন্ত্র—তাও বাদুড়ের অনুকরণেই তৈরি হয়েছে বলা চলে।



বাদুড়

কোন কোন বাদুড় ঘুমন্ত পশুপাখি, এমন কি মানুষেরও রক্ত নিঃশব্দে চুষে খায়। এই রক্ত-চোষা বাদুড়কে বলা হয় ভ্যাম্পায়ার।

আর কয়েকটি বর্গের স্তন্যপায়ী

রোডেন্সিয়া বর্গে পড়ে কাঠবেড়ালী, বীভার প্রভৃতি জানোয়ার। বীভারকে জানোয়ারের



বীভার

এঞ্জিনীয়ার বলা হয়। নদীর মধ্যে কাঠকুটো, গাছের ডাল আর মাটি ফেলে এরা যে ভাবে বাঁধ তৈরি করে তা বিস্ময়কর। ল্যাগোমর্ফা বর্গে পড়ে খরগোস জাতীয় জীব। তিমিও স্তন্যপায়ী তা আগেই বলেছি। এদের বর্গ হচ্ছে সিটোসিয়া। এরা জলচর প্রাণী, তাই এদের কথা যখন সামুদ্রিক প্রাণীদের গল্প বলব তখন ভালো করে বলা যাবে।

হিংস্র স্তন্যপায়ীদের কথা

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একটা দল হচ্ছে কার্নিভোরা বর্গের প্রাণী। কার্নিভোরাস্ মানে মাংসাশী, সুতরাং এরা স্বভাবতই হিংস্র। হিংসা না করে মাংস খাবার উপায় নেই যে! বাঘ, সিংহ, ভালুক, নেকড়ে, হায়না, কুকুর, বেড়াল থেকে শুরু করে সমুদ্রের সীল, ওয়াল্‌রাস্ (সিন্ধুঘোটক) প্রভৃতি বহু হিংস্র প্রাণী আছে এই দলে। নেকড়ে, ভালুক—এরা হচ্ছে কুকুর বংশের প্রাণী, আর বাঘ-সিংহেরা হচ্ছে বেড়াল বংশের।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এদের অল্পবিস্তর দেখা যায়। তবে সিংহ এখন আর আফ্রিকা ছাড়া অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। এক সময়ে অবশ্য ভারতবর্ষেও প্রচুর সিংহ ছিল, —এই একশ'-দেড়শ' বছর আগেও ছিল, কিন্তু এখন একমাত্র গুজরাতের জুনাগড়ে গির জঙ্গল ছাড়া ভারতের আর কোথাও সিংহ দেখা যায় না। জুনাগড়েও ওদের নানারকম চেষ্টা করে বংশ-লুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো হয়েছে। ভারতীয় সিংহ আফ্রিকার সিংহের চেয়ে আকারে কিছু ছোট, কেশরও ওদের অনেক কম। শোনা



স্তন্যপায়ীদের পায়ের তালু বা থাবা। বৈচিত্র্য লক্ষ করবার মত।

যায় এক সময়ে আমাদের সুন্দরবনেও প্রচুর সিংহ দেখা যেত, কিন্তু ওখানকার বাঘেদের হাতেই নাকি তারা নির্বংশ হয়ে গেছে। এ থেকেই বুঝছ সুন্দরবনের বাঘেরা কি ভীষণ চীজ্! অবশ্য বাঘেদের তুলনায় সিংহের সংখ্যা হয়তো অনেক কম হওয়াতেই এই বিপত্তি ঘটেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ কাব্যে হিমালয়ে বড় বড় সিংহের বর্ণনা আছে। এখন কিন্তু ওখানেও কোন সিংহ নেই।

সিংহকে বলা হয় পশুরাজ। আসলে তার নিজস্ব কোনও রাজত্ব নেই, শরীরের তুলনায় তার বিপুল পরাক্রম আর ঐ কেশর-ফোলানো গ্রামভারী চেহারা দেখেই ওর ঐ নামকরণ।



পশুরাজ-পরিবার: সিংহ, সিংহী ও বাচ্চা

প্রচণ্ড শক্তি ওর দাঁতে, আর বোধ হয় তার চেয়েও বেশি শক্তি ওর থাবায়। ঐ থাবার এক ঘায়ে সে একজন মানুষের ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে দিতে পারে। গায়ের জোর



বাঘ

সম্বন্ধে এইটুকু বললেই চলবে যে একটা বুনো মোষ মেরে সে অক্লেশে সেটা মুখে তুলে নিয়ে ছুটতে পারে।

পরাক্রমে অবশ্য বাঘও কম যায় না তা তো একটু আগেই বলেছি; এবং, হিংস্রতায়, বোধ হয় আরও ওপরে যায়। কিন্তু যাই বল, বাঘের চেহারাও বেশ সুন্দর, নয় কি? মখমলের মত হলদে চামড়া যুড়ে কালো কালো ডোরা। ঘাসবনে লুকিয়ে থাকতে সুবিধে

হয় বলেই নাকি ঐ রকম হয়েছে। সুন্দরবনে প্রচুর বিরাটকায় বাঘ আছে—তাদের বলা হয় রয়াল বেঙ্গল টাইগার। এ ছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত জঙ্গলেই ছোট-বড় বাঘ দেখা যায়। বাঘের খাবার জোরও বড় কম নয়। বাঘেদের মধ্যে চিতা হচ্ছে সবচেয়ে দুরন্ত। এদের মত দ্রুতগামী জানোয়ার ডাঙ্গায় কমই দেখা গেছে। ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বেগে ছুটতে পারে এরা।

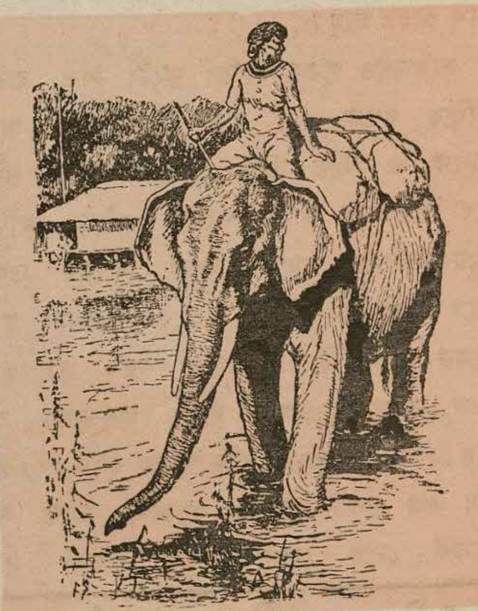
হাতির গল্প

ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে হাতি। এরা যে বর্গে পড়ে তার নাম প্রোবো-সিডিয়া। সবচেয়ে বড় হাতি দেখা যায় আফ্রিকার জঙ্গলে। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশও



আফ্রিকার হাতি

হাতির জন্য বিখ্যাত। এরা আফ্রিকার হাতির চেয়ে আকারে একটু ছোট আর এদের কানও অত বড় হয় না। নিরামিষাশী হলেও হাতি অত্যন্ত বলবান্ জীব। ওর ঐ লম্বা নাক,—যাকে আমরা বলি শুঁড়,—অসংখ্য পেশী দিয়ে গড়া। ঐ শুঁড় দিয়ে ও 'কর' অর্থাৎ হাতের মত কাজ করতে পারে বলে ওর আর এক নাম 'করী'। শুঁড়ে শুধু অসম্ভব শক্তিই নেই, ঐ শুঁড় দিয়ে হাতি অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারে।



ভারতীয় হাতি

হাতিরা দল বেঁধে থাকে। এক এক দলে ৭০—৮০—১০০ বা তারও বেশি হাতি থাকে। প্রতি দলে থাকে একটি করে দলপতি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির কাছে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী জীবকেও হার মানতে হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ হাতিকে পোষ মানাতে শিখেছে। পোষা হাতি মানুষের নানা কাজ করে দেয়। আগে এদেশে হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধও করা হ'ত। এখনও বড়দরের শিকারটিকার করতে গেলে হাতি ছাড়া চলে না। তা ছাড়া বাহন হিসেবে ও মোট বইবার কাজে হাতি মানুষের বিশেষ অনুরক্ত ভৃত্য। ব্রহ্মদেশে হাতিকে কাঠ টানার কাজে লাগানো হয়। শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) এক সময়ে সাদা হাতি (শ্বেতহস্তী) পাওয়া যেত,

পাওয়া যেত ব্রহ্মদেশেও। এখন ঐ জাতের হাতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। তবে হাতি খুব দীর্ঘায়ু জানোয়ার। ৭০/৮০ থেকে ১০০ বছর বা তারও বেশি ওদের আয়ু।

সাধারণত পুরুষ হাতির তু'টো দাঁত বাইরে বেরিয়ে থাকে। এ তু'টি ওদের বড় অস্ত্র। শত্রুকে ও দিয়ে চিরে ফেলতে পারে ওরা। তবে সাধারণত হাতি শত্রুকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে আছাড় মেরে কিংবা পায়ের তলায় পিষে মারবার চেষ্টা করে। বুনো হাতি অনেক সময় হিংস্র স্বভাবের হয়। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তু'-একটা হাতি দল-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমরা বলি পাগলা হাতি। এগুলি যেন এক একটা তুর্দান্ত শয়তান, যাকে পায় তাকেই মেরে ফেলে। তবে পোষা হাতি বেশ শান্ত এবং মানুষের উপকারী বন্ধুও। কিন্তু পোষা হাতিও, ক্ষেপে গেলে, কখনও কখনও তুর্দান্ত প্রকৃতির হয়ে পড়ে।

হাতির যে তু'টি দাঁতের কথা বলেছি ও তু'টি কিন্তু খুব দামী জিনিস। মানুষ নানা শিল্প-দ্রব্য তৈরি করে ঐ দাঁত দিয়ে। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্পের খুব নাম। আফ্রিকার হাতির দাঁত খুব বড় হয়। এই দাঁতের লোভে সেখানে যে কত হাতিকে মানুষ মেরেছে তার হিসেব নেই।

বিজোড় ক্ষুরওয়ালা জানোয়ার

ঘোড়া, গাধা, জেব্রা, টেপির প্রভৃতি বিজোড়-সংখ্যক শক্ত ক্ষুরওয়ালা জানোয়ারেরা হচ্ছে পেরিসোডাক্‌টাইলা বর্গের প্রাণী। গণ্ডারও



হাতের, পায়ের ও নখের গড়নে বৈচিত্র্য

এই দলে পড়ে। ঘোড়া এক সময়ে বুনো জানোয়ার ছিল, ঘোড়ার পূর্বপুরুষেরা ছিল শেয়ালের মত ছোট। তার পরে কি করে ওদের চেহারা বড় হ'ল, পায়ের আঙুল বদলে গিয়ে ক্ষুরের মত হয়ে গেল সে এক বিচিত্র কাহিনী। ঘোড়াকে পোষ মানানো সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। শোনা যায় এরই জোরে আর্যরা এদেশে এসে অনার্যদের হারাবার সুযোগ পায়। অনার্যদের মধ্যে ঘোড়ার চল ছিল না।



গণ্ডার

গণ্ডার নিরামিষাশী হলেও ভীষণ বদ্‌রাগী জানোয়ার। গায়েও প্রচণ্ড জোর। নাকের ওপর ঐ যে খাঁড়া ঐ দিয়ে ও প্রবলতম শত্রুকেও ঘায়েল করে দিতে পারে। কোন কোন গণ্ডারের দু'টো করে শিং (খড়্গ) থাকে —একটার পেছনে আর একটা। আফ্রিকায় এখনও অনেক গণ্ডার দেখা যায়। আমাদের দেশের আসাম রাজ্যও গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। ইন্দোনেশিয়াতেও গণ্ডার যথেষ্ট। গণ্ডারের চামড়া ভীষণ পুরু, সাধারণ বন্দুকের গুলিতেও তা সহজে ফুটো করা যায় না। তলোয়ারের কোপে তার কিছুই হয় না।

জোড় ক্ষুরওয়ালা জানোয়ার

আর্টিওডাক্‌টাইলাও ক্ষুরওয়ালা প্রাণী, তবে এদের ক্ষুরের সংখ্যা বিজোড় নয়—জোড়। শূয়োর, হরিণ, গরু, ছাগল, উট, জিরাফ, এমন কি হিপোপটেমাস্‌ও এই দলে পড়ে। এরা সকলেই প্রায় নিরামিষাশী, তবে কেউ কেউ সুবিধে পেলে মাংসও খায়। আত্মরক্ষার জন্য অনেকেরই শিং আছে। তা ছাড়া এরা অনেকেই প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে পারে। হরিণের তো এই দৌড়বার ক্ষমতাই আত্মরক্ষার একটি প্রধান উপায়। তবে দরকার হলে ওরা শিংও ব্যবহার করে। হরিণেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রত্যেক দলে একজন দলপতি, তার দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশি। বিপদে-আপদে দলকে বাঁচাবার ভারও তারই ওপর। তবে এই দলপতিত্ব নিয়ে হরিণে হরিণে লড়াইও যে হয় না এমন নয়। কস্তুরী হরিণের নাভিতে এক রকম গন্ধদ্রব্য আছে যার জন্য ওদের খুব কদর। শীতপ্রধান দেশে বল্গা হরিণ মানুষের পরম বন্ধু। স্লেজ টানা, মাল টানা প্রভৃতি হরেক রকম কাজ



মহাশৃঙ্গী হরিণ



বল্গা হরিণ

করে দেয় ওরা। মানুষ ওর দুধ খায়, প্রয়োজনে মাংসও খায়।

এই বর্গের জিরাফই বোধ হয় ডাঙ্গার সব চেয়ে লম্বা প্রাণী। হাতির চেয়েও উঁচু। বিশেষত ওর লম্বা গলা একটা দেখবার জিনিস। পণ্ডিতেরা বলেন, জিরাফের পূর্বপুরুষ যেখানে বাস করত সেখানে উঁচু ডালের পাতা ছাড়া ওদের খাবার কিছু ছিল না। ঘাড় উঁচিয়ে



জিরাফ

খাওয়ার অভ্যাসের ফলেই নাকি ওরা ঐ লম্বা ঘাড় পেয়েছে।

উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। মরুর ধূধূ-করা বালির মধ্যে ওরাই কেবল নিঃসঙ্কোচে চলতে পারে। হিপোপটেমাসের নিবাস আফ্রিকা।

এই বর্গের অনেকেরই পাকস্থলী এমন ভাবে তৈরি যে প্রথমটা ওরা খাবার গোঁৎ গোঁৎ করে গিলে ফেলে। পাকস্থলীতে গিয়ে কিছুক্ষণ দলাই-মলাইয়ের পর যখন জিনিসটা কাদাটে হয়ে আসে তখন সেটা আবার উগরে মুখে এনে ধীরেসুস্থে



উট

চিবিয়ে খাওয়া চলে। তার পর আবার সেটা পাকস্থলীতে চলে যায়। একে বলে রোমন্থন করা বা, চলতি কথায়, জাবর কাটা।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ছোটখাট বর্গ আরও অনেক আছে। যেমন ধর, টিউবিউলিডেন্টাটা, হায়রাকয়ডিয়া, সিরেনিয়া। কিন্তু সবচেয়ে প্রধান যেটি সেটির কথা এখনও বলা হয় নি। এইবার সেইটের কথা বলি। প্রাইমেটিস—যার মধ্যে আমরা, মানুষেরাও আছি।

মানুষের জাতভাই : প্রাইমেটিস

প্রাইমেটিস—সংক্ষেপে প্রাইমেট্‌স্‌। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে উন্নত ধরনের প্রাণী। মানুষ বাদে এদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) লেমুর, (২) বানর, (৩) বনমানুষ বা এপ্‌।



লেমুর

পৃথিবীতে, যতদূর জানা যায়, প্রথম প্রাইমেট জাতীয় প্রাণী দেখা দিয়েছিল ৭ কোটি বছর আগে। সেগুলি অবশ্য কীটভুক্‌ নীচু জাতের প্রাণী বলেই মনে হয়। তারপর সম্ভবত দেখা দেয় লেমুর জাতের প্রাণী ; এবং, তারও পরে, আন্দাজ ৪ কোটি বছর আগে সত্যিকার বানর জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল।

প্রাইমেটদের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন পর্যন্ত মোটামুটি গেছো প্রাণী—একমাত্র মানুষ আর বেবুন ছাড়া। এদের দেহের গড়নেও অন্য স্তন্যপায়ীদের চেয়ে নানা দিক্‌ দিয়ে তফাৎ চোখে পড়ে। গাছে থাকতে হলে ঘ্রাণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তিরই প্রয়োজন বেশি, তাই এদের মুখের গড়নও সেই রকম। মুখের ছুঁচলো ভাব কমে গিয়ে মুখটা থ্যাবড়া হয়ে গেছে, চোখ দু'টো এপাশে ওপাশে নয়—সোজা সামনের দিকে বসানো,—যাতে একসঙ্গে দূরের জিনিস স্থিরদৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়। মুখের কাজ হাত দিয়ে করার ফলে মুখের গড়নও বদলে গেছে, সামনের পা দু'টি পরিণত হয়েছে হাতে। বেশির ভাগ কাজই তাই দিয়ে করা যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত অন্য কোন জানোয়ারই ওদের মত হাতের ব্যবহার শেখে নি। সকলের ওপর হচ্ছে ওদের মগজ। আকারে অনেক বড়—অনেক পুষ্ট, এবং ওরই ফলে বুদ্ধিবৃত্তিও ওদের অনেক বেশি।

লেমুর

লেমুরকে প্রাইমেটদের মধ্যে ফেলা হলেও ওদের চালচলন একটু অন্য রকম। চেহারাও তাই। আকারে ছোট, লোমে ভরা গা ; অনেকেরই লম্বা লেজ আছে। যাদের নেই তাদের তার জায়গায় আছে একটা ঢিবি মত। পোকামাকড়, পাখির ডিম বা ছানা আর ফলমূলই এদের খাদ্য। মাদাগাস্কার অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে এদের প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও এরা কিছু কিছু বাস করে। আয় আয় নামে

এক রকম লেমুর আছে যারা স্লথের মতই ভীষণ আলসে প্রাণী।

বাঁদরের সংখ্যাই বেশি

প্রাইমেটদের মধ্যে সংখ্যায় বাঁদররাই বেশি। কথাটা বানর (বা-নর), কিন্তু চলতি কথায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁদর। কত জাতের বাঁদরই না আছে পৃথিবীতে! রূপী বাঁদর, হনুমান ইত্যাদি কত নাম দিয়েছি আমরা তাদের! এদের কতক জঙ্গলে থাকে, কতক জংলী হলেও আমাদের প্রতিবেশী, নানা রকম উৎপাতও করে। কিন্তু ভারি চালাক জানোয়ার, আর মানুষের অনুকরণ করতে ওদের যুড়ি নেই। বাঁদর-খেলা—বাঁদর-নাচ দেখলেই তা বোঝা যায়। রামায়ণে রামানুচর হনুমান ছিলেন পরম রামভক্ত, তাই এখনও এদেশে অনেকে হনুমানকে মহাবীর নাম দিয়েছে এবং কেউ কেউ ওকে খুব পবিত্র জীব বলে মনে করে।

বানর সাধারণত নিরামিষভোজী, তবে পোকামাকড় খেতে আপত্তি নেই। পাখির ডিম পেলে তাও খায়। এরা অনেকেই দল বেঁধে থাকে, পরস্পরকে সাহায্য করে, একে অপরের পিঠ চুলকে দেয়, উকুন বেছে দেয়। মাতৃস্নেহ এদের অপরিসীম। বাঁদরের বাচ্চা জন্মের পরে বহুদিন মা'র কাছ-ছাড়া হয় না। বুকের মধ্যে বাচ্চা আঁকড়ে ধরে বানরী গাছের ডালে বসে আছে কিংবা বাচ্চা বুকে নিয়েই এ-ডালে ও-ডালে লাফাচ্ছে এ দৃশ্য তো অহরহই দেখা যায়। এমন কি এমনও দেখা গেছে, বাচ্চা মরে গেছে, তবু তার শরীরটা পচে না যাওয়া পর্যন্ত মা তাকে বুক থেকে নামায় নি।

আমেরিকায়ও নানা জাতের বাঁদর আছে। নেসালি নামে এক জাতের বাঁদর আছে যাদের নাকটা মোটেই থ্যাবড়া নয়—পাখির ঠোঁটের মত বেরিয়ে থাকে। ক্যাপুচিন খুব ছোট্ট বাঁদর। এরা রোদ সহ্য করতে পারে না, রোদ দেখলেই হাত দিয়ে চোখ ঢাকে। ওদেশে খুব ছোট্ট ছোট্ট এক জাতের বাঁদর দেখতে পাওয়া যায় যাদের শরীরটা ইঞ্চি ছয়েকের বেশি হয় না। অবশ্য তার সঙ্গে ঐ মাপেরই একটা লেজ আছে। এদের বলে মারমোসেট। ওদেশের স্পাইডার-মাংকি বা মাকড়সা-বাঁদরেরও নাম করতে হয়। এদের লেজটা বিরাট আর ঠিক হাতের মতই ওরা তা ব্যবহার করে। প্রচণ্ড লম্ফবীর এরা। এক ডাল থেকে ২৫।৩০ ফুট নীচে সোজা লাফিয়ে পড়তে একটুও ভয় পায় না। হাউলিং মাংকি আকারে বিরাট, আর এমন চেঁচাতে পারে যে শুনলে কানে তালা লেগে যাবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছোটবড় নানান্ জাতের বাঁদর দেখা যায়। ব্রহ্ম, মালয়, ফিলিপাইন্‌স্ প্রভৃতি অঞ্চলে এক জাতের সামুদ্রিক বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। তবে এরা জলচর নয়, সমুদ্রের ধারে বাস করে। কাঁকড়া এদের প্রিয় খাদ্য। জলা বা অল্প জলে নেমে কাঁকড়া ধরে খেতে এরা ওস্তাদ। দক্ষিণ এশিয়া ও জাপানে ম্যাকাকা নামে এক জাতের বাঁদর আছে যারা অসম্ভব পরিশ্রমী। বরফ-ঘেরা পাহাড়ের ওপরেও এদের সাক্ষাৎ মেলে। আর আফ্রিকার জঙ্গলগুলি তো রকমারি বাঁদরে ভর্তি! ওখানকার বেবুনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, হয়তো চিড়িয়াখানায় দেখেছও। মুখটা

অনেকটা কুকুরের মত, সময় সময় দুই গালের ওপর রঙের বাহারও দেখা যায়। ম্যান্ড্রিল বেবুন এই রকম। এরা চার পায়ে হাঁটে এবং থাকে পাহাড়ী অঞ্চলে ; মাটিতেই ঘোরাফেরা করে। বেবুনরা দল বেঁধে থাকে এবং আকারেও যেমন বড় গায়েও তেমনি জোর। স্বভাবটিও মোটেই মোলায়েম নয়— হিংস্রই বলা চলে।

বানরের পায়ের পাতাও ঠিক হাতের মতন, তা দিয়ে হাতের মতই ডালপালা আঁকড়ে ধরা যায়। এজন্য কেউ কেউ বলেন, বানরের পা নেই, চারটেই হাত।

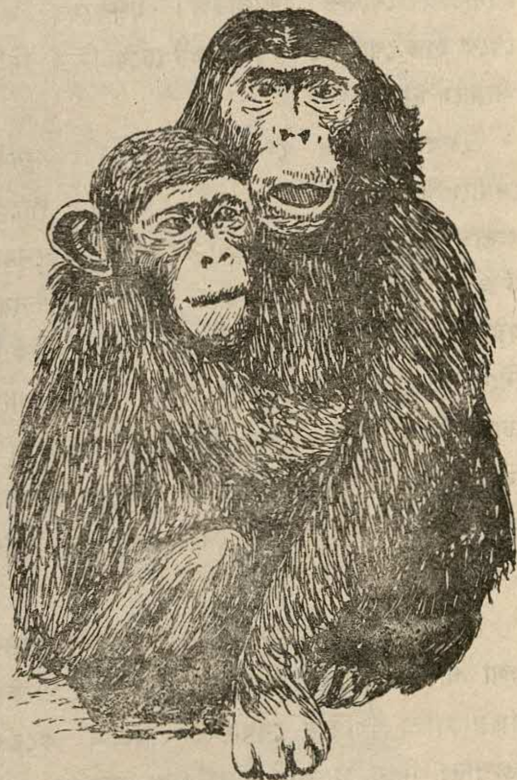
উল্লুক আর বনমানুষ

যে সব বাঁদরের লেজ থাকে না তাদের আর এক দলে ফেলা হয়। এদের একদল হচ্ছে উল্লুক বা গিবন। আকারে ২।৩ ফুট হবে, কিন্তু ভারি চটপটে। গাছের ডালে ঝুলে কসরৎ দেখাতে ওদের যুড়ি নেই। কেউ কেউ ডাকতেও পারে খুব, আওয়াজটা শঙ্খনাদের মত। যখন ডাকে তখন গলার কাছে একটা থলি বাতাসে বেলুনের মত ফুলে ওঠে।

লেজ-ছাড়া অন্য যে বাঁদর তারা অনেক বড় জাতের এবং তারাই বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে নিকট-আত্মীয়। তাই তাদের আর আমরা বাঁদর বা বানর বলি না, বলি বনমানুষ। বনমানুষও আবার তিন জাতের—শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটান আর গরিলা।

শিম্পাঞ্জী

শিম্পাঞ্জী দেখেছ তো? থ্যাবড়া নাকের নীচে মুখের ওপর ঠোঁটের ওপরের অংশটা খুব চওড়া। ফিকে বা ঘন কালো লোমের ভিতর থেকে কান দু'টো খুব সহজেই চোখে পড়ে। তিন জাতের বনমানুষের মধ্যে আকারে এরাই সব চেয়ে ছোট, দাঁড়ালে ৩।৪ ফুট হবে। হাত দু'টো খুব লম্বা। চলবার সময় কুঁজো হয়ে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে। তবে হাতে কিছু ধরা থাকলে খাড়া হয়েও খানিকটা চলতে পারে।



শিম্পাঞ্জী

শিম্পাঞ্জীর বাড়ি আফ্রিকা। সেখানে ঘন জঙ্গলে এরা গাছের ডালে থাকতেই ভালোবাসে, তবে খাবারের খোঁজে মাটিতেও নেমে আসে। ছোট ছোট পরিবার, সবাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। ফুলের বা পাতার কুঁড়ি, নরম ডালপালা, কচি পাতা, ফলমূল, পোকামাকড়

আর পাখির ডিম এদের প্রিয় খাদ্য। তবে এরা সহজেই পোষ মানে আর পোষা শিম্পাঞ্জী মানুষের দেখাদেখি সব কিছুই খেতে শেখে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লুলু নামে একটা মেয়ে-শিম্পাঞ্জী ছিল। তাকে কি খেতে দেওয়া হ'ত শুনবে? চা, পাঁউরুটি, ডিমসিদ্ধ আর রকমারি ফলমূল। তার ওপর সে আবার সিগারেট খেতেও শিখেছিল। দর্শকদের কাছ থেকে হাত পেতে জ্বলন্ত সিগারেট চেয়ে নিয়ে দিব্যি আরামে টানত।

শেখালে পরে পোষা শিম্পাঞ্জী মানুষের দেখাদেখি অনেক কাজই করতে পারে। অত্যন্ত তুখোড় বুদ্ধি তার। তোমরা সিনেমায় টার্জনের ছবিতে শিম্পাঞ্জীর অদ্ভুত অভিনয়ও হয়তো দেখেছ। চেয়ার-টেবিলে বসে ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া, বোতল থেকে সরবৎ বা মদ পাত্রে ঢেলে নিয়ে চুমুক দেওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, চাবি দিয়ে তালা খোলা—এ ধরনের হরেক রকম কাজ শিম্পাঞ্জীকে শিখিয়ে দেখা গেছে—সব সে নিখুঁত ভাবে করতে পারে।

শিম্পাঞ্জীরা যখন জঙ্গলে থাকে তখন দিনের বেলা গাছের ডালেই কাটায়, সময় সময় গাছের ছায়ায় পাতা বিছিয়ে সেখানেও বিশ্রাম করে। লতাপাতা দিয়ে গাছের ডালে শক্ত জালের মত বুনে রাত্রে সেই ঝুলন্ত জালের বিছানায় শুয়ে ঘুমোয়।

ওরাং ওটান

আর এক জাতের বনমানুষ ওরাং ওটান। এরা আকারে অনেক বড়, নিবাসও আফ্রিকায় নয়,—সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে। এদের মুখের রং ঈষৎ বেগুনী, মাথা আর মুখের চেহারা এমনই যে একটা ছোকরা ওরাং ওটানকে দেখলেও মনে হবে বুঝি এক প্রবীণ বৃদ্ধ বসে আছে। ওরাং ওটানও বেশ চালাক-চতুর, শেখালে শিম্পাঞ্জীর মতই অনেক কিছু শিখে নেয়। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটা ওরাং ওটান আমাদের ছেলেবেলায় কত যে আনন্দ দিয়েছে তার ঠিক নেই!



ওরাং ওটান

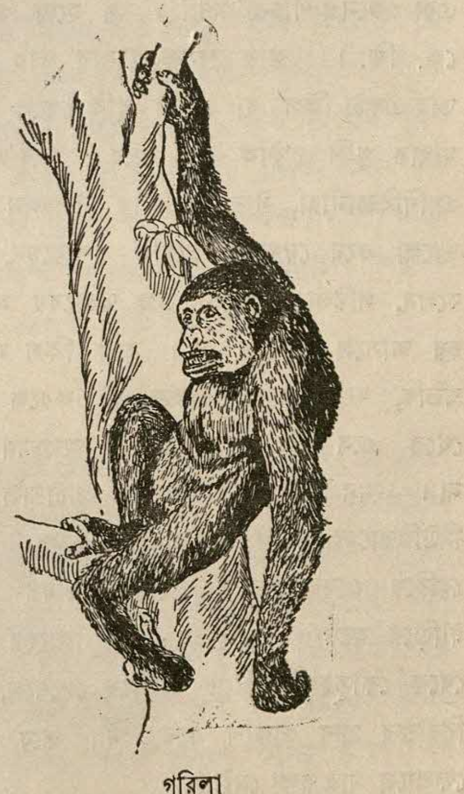
ওরাং ওটানকে পুরোপুরি গেছো প্রাণী বলতে পারা যায়। বিরাট লম্বা হাত। হাত আর পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে আঁকড়ে এরা তীব্র বেগে চলাফেরা করতে পারে—এ-ডাল থেকে ও-ডালে, এ-গাছ থেকে ও-গাছে। কিন্তু মাটি দিয়ে হাঁটতে হলেই মুশ্‌কিল। কোন রকমে হাত দু'টো উঁচু করে ভারসাম্য রক্ষা করে টলতে

টলতে চলতে হয় তখন। এদের পায়ের আঙুল দোমড়ানো, তাই ঠিকমত মাটিতে পায়ের পাতা ফেলতে পারে না। যখন হাত নামিয়ে দেয়, তখন তা প্রায় মাটিতে গিয়ে ঠেকে। ওরাংও খুব ছোট ছোট পরিবার বেঁধে একসঙ্গে থাকে। ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে জলাজঙ্গল এদের প্রিয় স্থান।

মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি—গরিলা

বনমানুষদের মধ্যে চেহারায় মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্য হচ্ছে গরিলার। অবশ্য লম্বায় সে প্রায়ই মানুষের চাইতে উঁচু হয়, চওড়ায় তো বটেই! দু'-তিনটি মোটা মানুষের বুকের ছাতি একত্র করলে হয়তো একটা গরিলার সমান হবে। মুখটা ভীষণ কালো, সারা গায়ে ইয়া বড় বড় লোম। একবার এক ইংরেজ শিকারী গরিলা দেখে বলেছিলেন,—একজন কুচকুচে কালো বুনো কাফ্রীর শরীরটাকে যদি দু'-তিন গুণ ফুলিয়ে সারা গায়ে কালো কালো লোম বসিয়ে আর মুখটা আরও থ্যাবড়া করে দেওয়া হয় তা হলে সে হয়তো অনেকটা গরিলার মত দেখতে হবে। তাড়াতাড়ি চলবার সময়ে, বিশেষ করে গাছের ওপর দিয়ে চলবার সময়ে গরিলা হাত-পা নামিয়ে দিয়ে চার পায়ে চলে, কিন্তু অন্য সময় খাড়া হয়েই থাকে। ঠিক খাড়া নয়, হাত দু'টো লম্বা বলে ঈষৎ কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। তবে দরকার পড়লে সে সটান খাড়া হয়েও দাঁড়াতে বা চলতে পারে।

গরিলা গহন অরণ্যের অধিবাসী। যে ঘন জঙ্গলে তার বাড়ি সেখানে সাধারণ লোকে বড় একটা যেতে সাহস পায় না। তাই বহুদিন পর্যন্ত লোকে গরিলাকে একটা কাল্পনিক জীব বলেই মনে করত। গরিলার অস্তিত্ব প্রথম টের পান পল ডুশেলু নামে এক শিকারী। ছেলেবেলা থেকেই তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন মিশনারী খৃষ্টান। গহন অরণ্যে খুব বড় জাতের একরকম বানর বাস করে শুনে তাঁর ও-সম্বন্ধে খুব কৌতূহল হয়। তার পর এক কাফ্রী সর্দারের কাছে ঐ রকম একটা বানরের চামড়া দেখে তাঁর জেদ চাপে—ঐ বানরকে খুঁজে বার করতেই হবে। তার পর প্রাণ তুচ্ছ করে তিনি খুঁজে খুঁজে একদিন গরিলার আড্ডায় গিয়ে হাজির হন এবং একটার সাক্ষাৎও পান। হঠাৎ গাছপালার আড়ালে দুম্‌দাম্ ঢাক পেটার শব্দ শুনে জংলীদের দল আসছে ভেবে যেই তিনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছেন অমনি এক বিরাট



গরিলা

গরিলা নিজের বুকে দমাদ্দম্ কিল মারতে মারতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাক নয়, শব্দটা ঐ বুকে কিল মারার। ডুশেলু সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে ওর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, তার পর ওর চামড়াখানা খুলে নিয়ে চলে এলেন। তাই দেখে সভ্য জগতের লোকেরা জানল যে গরিলা মোটেই কাল্পনিক জীব নয়।

গরিলা নিরামিষাশী হলেও সেকালের শিকারীরা ওর যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাতে ওকে ভীষণ হিংস্র প্রাণী বলেই মনে হ'ত। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে আর বুকে কিল মারতে মারতে ঐ রকম বীভৎস চেহারার কোন জীব যদি ছুটে আসে তবে ভয় হবার কথাই তো! একটা পূর্ণবয়স্ক গরিলা উঁচুতে প্রায় পাঁচ-ছ' ফুট এবং ওজনেও পাঁচ-ছ' মণ (১ মণ হচ্ছে প্রায় ৩৭ কে. জি.)। আর অসম্ভব জোর তার গায়ে। তার একটা কিল বা একটা ঘুষি খেলে মানুষের মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে যাবে। তবে এখনকার প্রাণিবিজ্ঞানীরা, যাঁরা গরিলার চালচলন আরও ভালো করে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা বলেন, গরিলাকে যতটা উগ্র স্বভাবের মনে করা হয় আসলে সে তা নয়। বুকে কিল মারা ওর স্বভাব, আর ওদের বিরক্ত না করলে নিজে থেকে এসে ওরা বড় একটা আক্রমণ করে না। এমন কি আমেরিকার ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়ামের এক বিজ্ঞানী ওদের সন্ধানে বেরিয়ে ওদের ডেরায় পৌঁছে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ফটোও তুলেছেন; ওরা গাছের ওপর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে, কিছু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে নি। তবে ওদের ক্ষেপালে আর রক্ষা নেই।

গরিলা সাধারণত দু' জাতের দেখা যায়। এক—যারা নীচু জায়গায় থাকে, আর দুই—যারা পাহাড়ী অঞ্চলে থাকে। কঙ্গো দেশে কিভু হ্রদের কাছে একদল পাহাড়ী গরিলার বাস। এদের চালচলন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। এরা সাধারণত ভবঘুরে জীব, এক জায়গায় স্থায়ী ভাবে থাকে না। অসম্ভব খিদে এদের। যেখানে কয়েক দিন থাকে সেখানকার গাছপালার একটি পাতাও রাখে না। অনেকটা পঙ্গপালের মত। ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এরা। মাটিতে গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে বাসা বাঁধে কিংবা গাছের ডালে বুনো আঙুরলতা দিয়ে মাচার মত তৈরি করে নেয়। মা-গরিলারা বাচ্চা নিয়ে সেখানেই রাত কাটায়, পুরুষ গরিলারা কাছাকাছি থেকে দরকার হলে পাহারা দেয়। চিতা ওদের পরম শত্রু।

ধাড়ি গরিলাকে ধরে এনে দেখা গেছে ওরা বেশি দিন বাঁচে না। হয়তো বনের স্বাধীন আবহাওয়া থেকে বন্দী-জীবনে এসে ওরা এত মনমরা হয়ে পড়ে যে সেই দুঃখই ওদের কাল হয়। তবে খুব বাচ্চা গরিলা ধরে এনে চিড়িয়াখানায় যত্নে 'মানুষ করে' দেখা গেছে সে দিব্যি পোষ মেনেছে এবং অনেক দিন বেঁচে আছে।

পৃথিবীতে গরিলার সংখ্যা এখন খুবই কমে গেছে। এক আফ্রিকার জঙ্গলেই ওদের যা কয়েকটা দেখা যায়। তাও সংখ্যায় বোধ হয় সামান্য কয়েক হাজারের বেশি হবে না। মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি এই প্রাণীটি যাতে অকালে পৃথিবী থেকে লোপ না পায় সেজন্য প্রাণিবিজ্ঞানীরা সবাইকে সজাগ হতে বলেছেন।



দেশবিদেশের রূপকথা

রূপকথা

রূপকথা বা উপকথা সারা পৃথিবীর সম্পদ্। মানুষ যখন ছিল বুনো, অসভ্য, তখনও সারা দিনের শেষে গুহায় বসে মশালের আলোয় দলপতি শুনিয়েছে গল্প। তার কৌতূহলী শ্রোতাদের চোখের জিজ্ঞাসা কখনও ফুরোয় না। তাই আরও কত যুগ বাদে সন্ধ্যেবেলা মা-ঠাকু'মা-দিদিমার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনেছে ছেলে-মেয়েরা। এর আগে রূপকথার গল্প তোমরা শুনেছ। সাধারণত দেখা যায় এই সব রূপ-কথার কোনও নির্দিষ্ট লেখক নেই। মুখে মুখেই ছড়িয়ে গেছে এই সব গল্প-কথা। আর দেখা যায় আমাদের সুপরিচিত এক একটি রূপকথার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রূপকথার আশ্চর্য মিল।

ডেনমার্ক

রূপকথা মুখে মুখে তৈরি হলেও, কখনও কখনও একজন বিশেষ রচয়িতা তাকে সারা দেশের সম্পদ্ করে তুলতে পারেন। এই রকমই হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেন আর ডেনমার্ক এক হয়ে গেছে। ডেনমার্কের ওডেন্স্ নগরে ১৮০৫ সালে জন্মেছিলেন হ্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসেন। উপন্যাস, নাটক অনেক লিখেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁকে অমর করে রাখল তাঁর রূপকথাগুলি। রাজারাণী, পশুপাখি, গাছপালা, পুতুল—এমন কি সামান্য সূচ নিয়েও তাঁর গল্প। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'তুষাররাণী' পড়ে ডিউক আর ওল্ডেনবার্গ তাঁকে নিজের হাতের হীরের আংটি খুলে দিয়েছিলেন। জার্মেনির রাজা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন যার ইংরেজি হ'ল 'অর্ডার অব দি রেড ঈগল্'। পৃথিবীর নানা ভাষায় অ্যাণ্ডারসেনের গল্পগুলির অনুবাদ হয়েছে। তারই একটি গল্প শোন।

টিনের সেপাই

একজন মিস্ত্রি একটা টিনের পাত কেটে তৈরি করল পঁচিশটি টিনের সেপাই। তাদের গায়ে লাল-নীল পোশাক হ'ল। কাঁধে বন্দুক। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেপাইরা। কিন্তু একটু মুশকিল হ'ল। সব শেষে টিন কম পড়ে গেল, তাই মিস্ত্রির শেষ পুতুলটিকে করতে হ'ল খোঁড়া। বাকি চব্বিশ জনের পাশে এক



হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান্ অ্যাণ্ডারসেন্

পায়েই সে রইল দাঁড়িয়ে। সবগুলো পুতুল একটা বাক্সয় ভরে মিস্ত্রি দিল বাজারে পাঠিয়ে বিক্রির জন্য।

সেই বাক্স শুদ্ধ কিনে নিলেন একজন লোক একটি ছোট ছেলের জন্মদিনে উপহার দেবেন বলে।

ছেলেটি তো ভারি খুশি। তার ছিল এক মস্ত টেবিল। সেখানে সে সেপাইগুলোকে সাজিয়ে রাখল। আরো অনেক খেলনা তার। একটা পিচবোর্ডের সাজানো-গোছানো বাড়ি, বাড়ির সামনে গাছ, পুকুর, হাঁস। আর বাড়ির ফটকের সামনে রেশমি পোশাক-পরা একটি মেয়ে এক পা তুলে নাচছে। হঠাৎ মনে হয় তারও এক পা বুঝি খোঁড়া। খোঁড়া সেপাই তাকে দেখে ভাবল, বেশ তো! মেয়েটিও খোঁড়া, আমিও খোঁড়া। ওকেই আমি বিয়ে করব। খোঁড়ার বউও খোঁড়াই হবে। কিন্তু মেয়েটি বড়-লোক। কি করে ওর সঙ্গে আলাপ করি?

অনেক রাত্রে যখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন পুতুলদের জাগার সময়। ওরা তখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে, নাচ-গান করে। আবার ঠিক ভোর হবার আগেই চলে যায় যে যার জায়গায়।

একপা-ওয়ালা সেপাই ভাবছে মেয়েটি যখন নাচবে তখনই ওর সঙ্গে আলাপ করবে। এই ভেবে যেই সে এগিয়েছে অমনি পেতলের বামন পুতুলটা তাকে তেড়ে এল।

খবরদার! ওর সঙ্গে ভাব করবে না।

খোঁড়া সেপাই চুপ করে গেল।

বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার আর আলাপ করা হ'ল না। অন্য পুতুলরা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সেপাই জেগে জেগে পাহারা দিল সমস্ত রাত।

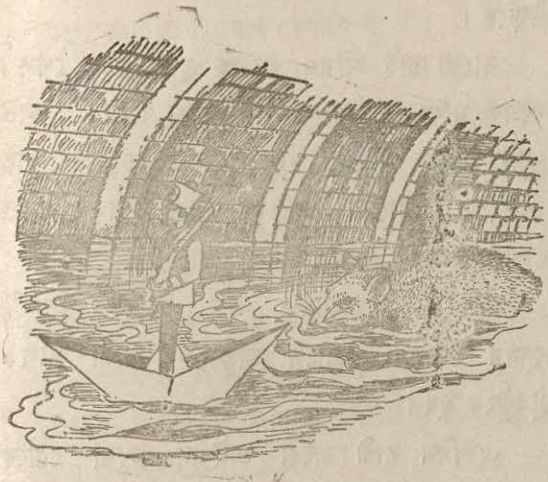
সকাল বেলা খেলতে খেলতে একটি ছেলে সেপাইটিকে বসিয়ে দিল জানালার ধারে। একটু বাদেই কোথা থেকে এক ঝলক হাওয়া এসে ওকে এক ধাক্কায় ফেলে দিল একেবারে রাস্তায়। বাড়ির সবাই তাকে কত খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, কিন্তু পেল না।

নিজে সেপাই হয়ে কি করেই বা চিৎকার করে ডাকে? তাই খোঁড়া পায়ে কাঁধে বন্দুক নিয়ে সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে রইল সে। ফুটপাথের পাথরের ফাঁকে এই ভাবেই সে আটকে রইল।

তার পর নামল তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টি থামতেই পথের দু'ধারে জল দাঁড়িয়ে গেল। পথ দিয়ে যেতে যেতে দু'টি ছেলে তাকে দেখতে পেল। কী আশ্চর্য! একটা টিনের সেপাই!

তারা একটা কাগজের নৌকো তৈরি করে তাতে সেপাইকে বসিয়ে তাকে জলে ভাসিয়ে দিল। জলের টানে ভেসে চলল নৌকো। একটু পরে

সে এসে ঢুকল নালার ওপর এক খিলানের নীচে। সেখানে দারুণ অন্ধকার। কিন্তু সেপাই বন্দুক তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ইঁদুর এসে তার পথ আটকাতে চাইল। সেপাইএর কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে ইঁদুরটা কটাস্ করে কামড়ে দিল তাকে।



সেপাইএর কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে ইঁদুরটা···

জলের টানে নৌকো আবার এগিয়ে চলল। ড্রেনের কাছে ঘুরে ঘুরে জল চলেছে। এবার নৌকো গেল ডুবে। নৌকোর কাগজ খুলে কোথায় তলিয়ে গেল। খোঁড়া সেপাই সটান গিয়ে পড়ল নদীর জলে। সেখানে আর এক কাণ্ড! একটা প্রকাণ্ড মাছ তাকে গপ্ করে গিলে ফেলল। মাছের পেটে ভয়ানক অন্ধকার। কিন্তু টিনের সেপাই সেখানেও বন্দুক উঁচিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন জেলেরা মাছটি ধরে নিয়ে এল বাজারে। সেই মাছ কিনে নিয়ে গেল একটি ছোট ছেলের বাবা। বাড়ির ঝি যেই মাছটা কেটেছে অমনি তার পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা খোঁড়া টিনের সেপাই পুতুল।

ছেলেটি দৌড়ে এল—'ও মা, আমার সেই খোঁড়া টিনের সেপাইটা!—সেই যে জানলা দিয়ে পড়ে গিয়েছিল!'

খোঁড়া সেপাই আবার গিয়ে বসল টেবিলের ওপর চব্বিশ জন সৈনিকের পাশে।

একদিন শীতকালে ঘরে আগুন জ্বলছিল। একটি ছোট ছেলে হঠাৎ কি খেয়ালে সেপাইকে ফেলে দিল আগুনে। নষ্ট হয়ে গেল তার নীল-লাল পোশাক। তবুও সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় সেই রেশমি পোশাক-পরা কাগজের মেয়েটিও এসে পড়ল আগুনে—ঠিক খোঁড়া সেপাইএর পাশে। কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। টিনও গেল গলে।

বাড়ির ঝি পরদিন এসে সেই কাগজের ছাই আর টিনের টুকরো ফেলে দিল আবর্জনার মধ্যে।

জার্মেনি

ডেনমার্কের মতই জার্মেনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রীম্ ভাইদের নাম। আমাদের অনেকগুলো পরিচিত রূপকথার সঙ্গে গ্রীমের গল্পের মিল পাওয়া যায়। হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেনের মত গ্রীক্ ভাইরাও রূপকথার যাদুকর।

গ্রীম্রা দু'ভাই। বড় ভাই জেকব গ্রীমের জন্ম হয়েছিল ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে, ছোট ভাই ভিইল্হেল্ম্ গ্রীম্ জন্মেছিলেন এক বছর পরে—১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে। দু'জনই ছিলেন মস্ত বড় পণ্ডিত—নানা ভাষায় অগাধ জ্ঞান। পরবর্তী জীবনে দু'জনেই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

করতেন। অত বড় পণ্ডিত লোক যে ছোটদের রূপকথা নিয়ে মেতে উঠবেন এ কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু তাই করলেন তাঁরা। জার্মেনির গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার প্রচলিত লোক-সাহিত্যগুলো সংগ্রহ করলেন আর তাই নিয়ে শেষে অনবদ্য ভাষায় রচনা করলেন তাঁদের রূপকথাগুলো—যা বিশ্বসাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে।

অনেক গল্প লিখেছিলেন গ্রীম্‌রা। তার মধ্যে ব্যাঙ রাজা, টম্ থাম্ব্, রাম্‌পেল্‌স্টিল্‌ট্‌স্কিন্, মৌমাছির রাণী, বেড়াল রাণী, কাঁপুনি শিখতে হবে প্রভৃতি গল্প প্রায় সকলেরই জানা। এখানে আমরা তাঁদের লেখা আর একটি গল্প তুলে দিচ্ছি।

বারো ভাই

এক রাজা আর এক রাণী। তাঁদের বারোটি ছেলে। রাজা বলেছেন রাণীকে, যদি এবার মেয়ে হয় তবে ঐ বারো ছেলেকেই মেরে ফেলব। মেয়েই আমার রাজ্য পাবে।

এই কথা শোনার পর থেকেই দিনরাত রাণী কাঁদেন। মা'র কান্না শুনে ছোট ছেলে বলল, "মা, তুমি এত কাঁদ কেন?"

রাণী সব কথা বললেন ছেলেকে। ছেলে বলল, "ভয় কি মা, আমরা বনে গিয়ে থাকব। বাবা আমাদের কিছুই করতে পারবেন না।"

রাণী বললেন, সেই ভালো। তারা যেন পালা করে বনের সবচেয়ে উঁচু গাছে চড়ে রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি তাদের ভাই হয় তবে রাজবাড়িতে সাদা নিশান উড়বে। তখন তারা আবার ফিরে আসবে।

আর যদি বোন হয়?

তা হলে লাল নিশান উড়বে। তারা যেন তখন আরও দূরে চলে যায়।

বারো ভাই চলে গেল বনে।

এক-এক করে এগারো ভাইএর পালা কেটে গেল। সবচেয়ে ছোট ভাইএর যেদিন পালা, সেদিন সে দেখল রাজবাড়িতে লাল নিশান উড়ছে।

বারো ভাই আরও অনেক দূরে চলে গেল। বনের মধ্যে একটা বাড়িতে তারা থাকে। ছোট ভাই বাড়ি পাহারা দেয়। অন্য ভাইরা যায় শিকারে। তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল কোনও মেয়ে দেখলেই তাকে মেরে ফেলবে তারা।

এদিকে রাজকন্যাও বড় হয়েছে। ভারি সুন্দর মেয়ে। কপালে আকাশের তারা জ্বলে। টুকটুকে মুখ।

একদিন রাণী বারো ভাইএর জামা রোদে দিয়েছেন। রাজকন্যা বলল, "মা, এ কাদের জামা?"

মা কেঁদে ফেললেন। মেয়েকে খুলে বললেন সব কথা।

সব কথা শুনে মেয়ে বলল, "তুমি কেঁদ না, আমি আমার ভাইদের ঠিক খুঁজে নিয়ে আসব।"

সেই বারোটা জামা নিয়ে রাজকন্যা চলল ভাইদের সন্ধানে। তারপর এসে পৌঁছুলো বনের ধারের সেই বাড়িতে।

ছোট ভাই তাকে দেখেই জানতে চাইল সে কে, কেন এখানে এসেছে। তার পর যখন শুনল সে তাদেরই বোন, ভাইদের খুঁজতে এসেছে, তখন বড় মায়া লাগল তার। সে বোনকে বলল: "আমি তোমার ছোট দাদা। দাদারা শিকারে গেছে, এস, এই ফাঁকে তোমায়

লুকিয়ে রাখি। নইলে ওরা হয়তো তোমায় মেরেই ফেলবে।"

ছোট ভাই তাদের বোনকে একটা কাঠের পিপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

শিকার থেকে ভাইরা ফিরে এল। ছোট ভাই ভাইদের বলল, "একটা মজার জিনিস দেখাব, কিন্তু আগে কথা দাও, মেরে ফেলবে না।"

ভাইরা কথা দিল।

ছোট ভাই তখন বোনকে বার করে দিল। ভাইদের তখন সে কী আনন্দ! তারা বোনকে নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন বাড়ির বাগানে বারোটা সুন্দর ফুল ফুটেছে। বোনের ইচ্ছে হ'ল দাদাদের বোতাম-ঘরে সে ফুলগুলো লাগাবে। কিন্তু যেই সে ফুলগুলি তুলেছে অমনি বারো ভাই বারোটা দাঁড়কাক হয়ে উড়ে চলে গেল।

রাজকন্যা বনের মধ্যে একা একা কাঁদতে লাগল। এমন সময় তার সামনে দেখা দিল এক ডাইনী বুড়ী। বুড়ী বলল, "ফুলগুলোর মধ্যেই ছিল তোমার ভাইদের জীবন।"

রাজকন্যা বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল, তার ভাইরা কি আর মানুষ হতে পারে না?

"পারে বটে, তবে সে খুব কঠিন কাজ। সাতটি বছর তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে। কথা বলতে পারবে না, হাসতে পারবে না। হাসলেই মৃত্যু হবে তোমার ভাইদের।"

রাজকুমারী বলল, "তাই করব আমি।"

সেই থেকে শুরু হ'ল তার ব্রত। কথা বলে না, হাসে না, শুধু বসে বসে সুতো কাটে।

এক দেশের এক রাজপুত্র একদিন দেখতে পেল রাজকন্যাকে। দেখে খুব পছন্দ হ'ল তার,



পারে বটে, তবে সে খুব কঠিন কাজ—

ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করল রাজপুত্র।

কিন্তু রাজপুত্রের মা বুড়ো রাণী তাকে দেখতে পারে না। এ নিশ্চয় ডাইনী। কথা বলে না, হাসে না! ঠিক হ'ল এই ডাইনী বউকে পুড়িয়ে মারা হবে।

রাজকন্যাকে যখন আগুনে পুড়িয়ে মারার যোগাড় হচ্ছে ঠিক সেই সময় কোথা থেকে বারোটা দাঁড়কাক উড়ে এসে মাটিতে নামল, আর মাটিতে পা দিয়েই তারা হয়ে গেল বারোজন রাজপুত্র।

আসলে সেই দিনই রাজকন্যার ব্রতের সাত

বছর পূর্ণ হ'ল। বারো ভাই আগুন নিভিয়ে ফেলল। কতদিন পরে হাসল তাদের আদরের বোনটি। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল বোনের স্বামী।

তারপর?

তারপর রাজসভার বিচারকেরা মিলে রায় দিলেন—বুড়ো রাণীকেই আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক।

রাশিয়া

রাশিয়া ইয়োরোপের একটি বিরাট দেশ। এখানকার সাহিত্যও যে খুব সমৃদ্ধ তা নিশ্চয় তোমাদের অজানা নয়। শুধু বড়দের সাহিত্য নয়, ছোটদের সাহিত্যও। বিশেষ করে রূপকথা। এবার রাশিয়ান্ রূপকথা একটি শোন।

নেকড়ে ও রাজপুত্র

এক ছিল রাজা। রাজার তিন ছেলে। ছোট ছেলেটির নাম ইভান। তার স্বভাবটি ছিল মিষ্টি। বড় হু'ভাই ছিল ভীষণ হিংসুটে।

রাজার ছিল একটি সাধের আঙুরবাগান। কিন্তু রোজই সেই বাগান থেকে আঙুর চুরি যায়। রাজা লোকজন, পাহারাদার—কত কি পাঠালেন, তবু চোরের সন্ধান মেলে না। রাজা তখন ছেলেদের ডেকে বললেন, "চোর ধরে আন।"

রাজার হুকুমে প্রথমে বড় ছেলে গেল চোর ধরতে। সে সারা বাগান ঘুরে বেড়াল, কাউকে দেখতে পেল না। শেষে অনেক রাত। বড় ছেলে আর জাগতে পারে না। সে পড়ল ঘুমিয়ে।

পরদিন সে তার বাবাকে জানাল, সে চোর ধরতে পারে নি।

এবার মেজ ছেলের পালা। সেও বড় ভাইয়ের মত করল। চোর ধরা পড়ল না এবারও।

তারপর গেল ছোট ছেলে ইভান চোর ধরতে। সারা রাত ধরে বাগান পাহারা দিল সে। একটুও বিশ্রাম নিল না, দু' চোখের ঘুম জোর করে আটকে রাখল।

গভীর রাতে ইভান দেখতে পেল একটা আলো বাগানের মধ্যে এসে ঢুকছে, তারপর গাছের ডালে আটকে গেল সেই আলো। ইভান দেখল একটা সোনালি আলোর পাখি। সে তীর ছুঁড়ল। পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল, কিন্তু পড়ে রইল তার একটা সোনালি পালক।

পরদিন ছোট ছেলে রাজাকে সেই সোনালি পালক দেখিয়ে বলল, সে চোর ধরতে পারে নি বটে, তবে তার সন্ধান পেয়েছে।

রাজা তখন তিন ছেলেকে ডেকে ভার দিলেন পাখিটাকে ধরে আনবার।

তিন ভাই তিন দিকের পথ ধরল। ইভান পথ চলতে চলতে এক জায়গায় তার ঘোড়াটি বেঁধে রেখে বসে পড়ল। সে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ বাদে ঘুম থেকে উঠে ইভান দেখে তার ঘোড়াটি তো আর সে জায়গায় নেই! সে কত খুঁজল, কোত্থাও নেই। তারপর এক জায়গায় গিয়ে দেখল সেখানে কতগুলো ঘোড়ার হাড় পড়ে আছে। তা হলে নিশ্চয় কোনও জন্তু তার ঘোড়াটিকে খেয়ে ফেলেছে।

মনের দুঃখে ইভান বসে রইল ঘাসের ওপর। এমনি সময় সেখানে একটি নেকড়ে এসে দেখা দিল। নেকড়েটা তাকে বলল: "তুমি এমন মন খারাপ করে বসে আছ কেন বল তো?"

ইভান জানাল তার ঘোড়া হারানোর কথা।

নেকড়ে বলল: "তোমার ঘোড়াটি আমিই খেয়ে ফেলেছি। সেজন্য দুঃখ ক'র না। আমি তোমার অনেক উপকার করব। এখন বল তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

ইভান জানাল তাদের বাগান থেকে রোজ একটা সোনালি পাখি আঙুর খেয়ে যায়, সে তাকেই ধরে আনতে যাচ্ছে।

নেকড়ে বলল: "ও বুঝেছি। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে তিন বছরেও তো তুমি সেখানে পৌঁছুতে পারবে না। সে জায়গার খবর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তুমি আমার পিঠে চড়ে বস এক্ষুনি।"

ইভানকে পিঠে নিয়ে নেকড়ে এসে পৌঁছুল এক মস্ত প্রাসাদের সামনে। নেকড়ে বলল, "এখন সবাই ঘুমুচ্ছে, এখনই স্থবিধে। তুমি প্রাসাদের চূড়ায় উঠে যাও। সামনে যে জানলা দেখবে, সেখানেই একটি সোনার খাঁচায় আছে সেই পাখি। খুব সাবধান, খাঁচাটা না ধরে পাখিটাকে তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবে। খাঁচা ধরলেই কিন্তু সবাই জেগে উঠে তোমায় ধরে ফেলবে।"

ইভান নেকড়ের কথামত পাখির কাছে এল, পাখিটাকে বুকের মধ্যে লুকিয়েও ফেলল, কিন্তু সে খাঁচাটার লোভ সামলাতে পারল না। নেকড়ের নিষেধ ভুলে গিয়ে সে যেই না খাঁচায় হাত দিয়েছে অমনি প্রাসাদের সবাই জেগে উঠল। প্রহরীরা ইভানকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

ইভান গিয়ে রাজসভায় দাঁড়াল। তার পরিচয় দিয়ে রাজাকে জানাল কেন সে পাখিটা চুরি করেছে।

রাজা বললেন, "তুমি যদি পাখিটা আমার কাছে চাইতে তবে অমনি পেতে, কিন্তু তুমি তা কর নি। এখন তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি কুস্‌মন দেশের রাজার সেই সোনার কেশরওয়ালা ঘোড়াটা এনে দিতে পার; নইলে এখানে বন্দী থাকতে হবে।"

ইভান সম্মত হ'ল। নেকড়ের কাছে সে সব খুলে বলল। নেকড়ে এবার ইভানকে নিয়ে চলল কুস্‌মন রাজার দেশে, কিন্তু এবারেও সে সাবধান করে দিয়ে বলল: "ঘোড়াটা নিয়ে এস, কিন্তু খবরদার, লাগামে যেন হাত দিও না।"

ইভান আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে আসার সময় এবারেও লোভ সামলাতে পারল না। মণিমুক্তো-দেওয়া কী স্থন্দর লাগাম! নেকড়ের কথা ভুলে যেই সে লাগামে হাত দিয়েছে অমনি গোটা প্রাসাদ জেগে উঠল, ইভানকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হ'ল রাজার কাছে।

রাজা বললেন, "তুমি আমার ঘোড়া চুরি করেছ এজন্য তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব। কিন্তু তুমি যদি রাজা ডালমেটের মেয়ে ইলিনাকে আমায় এনে দাও তা হলে ঘোড়াটা তোমাকেই দিয়ে দেব।"

ইভান আবার গেল নেকড়ের কাছে, নেকড়ে ইভানকে রাজা ডালমেটের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাজকন্যা তখন সখীদের নিয়ে বাগানে গল্প করছে। নেকড়ে এক লাফে বাগানে ঢুকে রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে ইভানের কাছে ফিরে এল, তারপর তারা সেই রাজ্য থেকে পালিয়ে গেল।

কুস্‌মনের রাজ্যের কাছে এসে ইভান বলল, "দেখ, সামান্য একটা ঘোড়ার জন্যে ইলিনার



রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে ইভানের কাছে ফিরে এল।

তারপর রাজা যখন ইলিনার ঘরে এসেছেন তার সঙ্গে কথা বলতে, দেখলেন, কোথায় সুন্দরী রাজকন্যা ইলিনা! সেখানে একটা নেকড়ে বসে আছে। রাজা তো ভয়েই অজ্ঞান।

নেকড়ের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল ইভান ও ইলিনার। ইভান বলল, "দেখ, একটা পাখির জন্য এই সুন্দর ঘোড়াটা হারাতে হবে।"

নেকড়ে এবার ঘোড়ার রূপ ধরল। ইভান সেই নকল ঘোড়া নিয়ে রাজাকে দিল, আর তার বদলে পেল সেই সোনালি পাখি।

নেকড়েকে বিদায় জানিয়ে ইভান দেশে ফেরার জন্য তৈরি

মত মেয়েকে হারাতে হচ্ছে! এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি থাকতে পারে?"

নেকড়ে বলল, "কোনও ভয় নেই। রাজকন্যাকে আমি বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। তারপর আমিই ইলিনার রূপ ধরে রাজার কাছে যাব। রাজামশাই খুশি হয়ে যখন ঘোড়াটা তোমায় দেবেন, তুমি সেই ঘোড়ায় চড়ে ইলিনাকে নিয়ে দেশে ফিরে যেও।"

তারা রাজকন্যাকে বনের ধারের কুঁড়েঘরে লুকিয়ে রেখে দিল। নেকড়ে তিনটে লাফ দিতেই ইলিনার মত সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেল। নকল ইলিনাকে পেয়ে রাজা তো খুব খুশি। ইভানকে তিনি ঘোড়া ও লাগাম ফিরিয়ে দিলেন।

হ'ল। পথে একটা ঝর্ণার জল খেয়ে সে বিশ্রাম করতে লাগল; তারপর কখন পড়ল ঘুমিয়ে।

এদিকে ইভানের বড় দু'ভাইও সেই পাখির খোঁজে চলেছে। যেতে যেতে তারা এসে পড়ল ছোট ভাইএর কাছে। ইভান ঘুমে অচেতন। তার সামনে ঘোড়ায়-চড়া কী সুন্দর একটি মেয়ে! দু'ভাই মিলে পরামর্শ করে ইভানকে সেখানেই মেরে ফেলল। তারপর রাজকন্যা ইলিনাকে নিয়ে তারা চলল তাদের রাজ্যে।

এদিকে দু'ভাই চলে যেতেই নেকড়েও সেই-খানে এসে দাঁড়িয়েছে। ইভানকে মৃত দেখেই সে কোথায় যেন ছুটে গেল। তার পর ফিরে এসে ইভানের সারা গায়ে মন্ত্র-পড়া জল দিল ছিটিয়ে।

দেখতে দেখতে বেঁচে উঠল ইভান। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? নেকড়ে তখন তাকে তার দুষ্টু দু'ভাইয়ের সব কাণ্ড জানাল। তারপর পিঠে নিয়ে চলল তার দেশের পথে।

যেতে যেতে ইভান পথের মাঝখানেই দেখতে পেল তার বড় দুই দাদাকে। দুই ভাই তো অবাক্! নেকড়ে তাদের দু'জনকেই দাঁত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। পরের অনিষ্ট করতে গেলে এই রকমই হয়।

ইভানকে বিপদ্-মুক্ত করে নেকড়ে বলল: "বন্ধু, এবার আসি?"

ইভান বলল: "তোমার কথা কোনদিন ভুলব না।"

ইলিনাকে সঙ্গে নিয়ে, সোনালি পাখি আর ঘোড়া নিয়ে ইভান তার রাজ্যে ফিরে এল। রাজা মশাইএর খুশি আর ধরে না।

মহা ধুমধাম করে ইভানের সঙ্গে ইলিনার বিয়ে হয়ে গেল।

আফ্রিকা

আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যেও নানা রূপকথা প্রচলিত। এই সব আদিবাসীরা, সে যুগে তেমন সুসভ্য না হলেও, কাহিনীগুলো বেশ মজাদার। এখানে লাইবেরিয়ার একটি রূপকথা বলছি শোন।

শেয়াল আর বেজি বদ্যি

এক ছিল শেয়াল আর এক শেয়ালনী। একদিন শেয়ালনীর খুব শক্ত অসুখ হ'ল। সেখানকার বদ্যি হ'ল বেজি। তার ভারি নাম-ডাক।

শেয়াল গেল তার কাছে। বলল, "বদ্যি-মশাই, আমার বউএর ভারি অসুখ। ওষুধ চাই।"

কি অসুখ, কি রকম লক্ষণ সব জেনেশুনে বেজি বলল, "তোমার বউএর শরীরে ভূত ঢুকেছে। তাকে তাড়াতে হবে। ডাইনী বুড়ীর সাদা গুঁড়ো চাই। যদি আনতে পার তবে অসুখ ভালো হয়ে যাবে।"



পূর্ণিমার রাত্তিরে যে বাঁদর মারা গেছে তার কলজে যদি আনতে পার তবে সাদা গুঁড়ো তৈরি করে দিতে পারি।

শেয়াল ডাইনীর বাড়ি গিয়ে সাদা গুঁড়ো চাইল। ডাইনী বলল, "পূর্ণিমার রাত্তিরে যে বাঁদর মারা গেছে তার কলজে যদি আনতে পার তবে সাদা গুঁড়ো তৈরি করে দিতে পারি।"

শেয়াল তক্ষুনি ছুটল শিকারীর কাছে। সব শুনে শিকারী বলল, "পূর্ণিমার রাতে বাঁদর মারা শক্ত। তবে কলা পাকলে সব বাঁদর এক জায়গায় আসে। তুমি এখন একটা কলাগাছ খুঁজে দাও দেখি যার সব ফল পেকেছে।"

শেয়াল গেল কলাগাছের কাছে। বলল, "কলাগাছ ভাই, তোমার সব ফলগুলো পাকিয়ে দাও। তা হ'লে বাঁদর আসবে। তখন শিকারী তাকে মারবে। সেই বাঁদরের কলজে দিয়ে ডাইনী বুড়ী সাদা গুঁড়ো তৈরি করবে। বেজি তাই দিয়ে আমার বউএর অসুখ সারিয়ে দেবে।"

কলাগাছ বলল: "তা হ'লে চাই সূর্যের আলো। নইলে আমার কলা পাকবে কি করে?"

শেয়াল তখন সূর্যের কাছে গিয়ে বলল: "সূর্য, তুমি আলো দাও; নইলে কলা পাকবে না। কলা না পাকলে শিকারী বাঁদর মারতে পারবে না, ডাইনী বুড়ী সাদা গুঁড়ো দেবে না। আমার বউএর অসুখও সারবে না।"

সূর্য বলল: "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ভাই, ভগবান্ না দিলে আমি তো আলো দিতে পারব না! তুমি তাঁকেই ডাক।"

শেয়াল বলল: "হে ভগবান্, সূর্যকে আলো দাও, কলা পাকুক, বাঁদর আসুক, শিকারী সেই বাঁদর মেরে তার কলজে দিক। তা দিয়ে ডাইনী বুড়ীর ওষুধ হোক। আমার শেয়ালনী ভালো হয়ে উঠুক।"

তখন সূর্য আলো দিয়ে কলা পাকাল। বাঁদর এল দল বেঁধে। সেই বাঁদরের কলজে দিয়ে ডাইনীর সাদা গুঁড়ো তৈরি হ'ল। বেজি ওষুধ তৈরি করে শেয়ালকে দিল।

কিন্তু ঘরে ফিরে এসে শেয়াল দেখল শেয়ালনী ভালো হয়ে গেছে। দিব্যি ঘরের কাজকর্ম করছে। শেয়াল ভাবল, অত সব কাণ্ড কেন করতে গেলাম! সোজাসুজি ভগবান্‌কে ডাকলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যেত!

সাঁওতালী রূপকথা: বাঘের বিয়ে

একজন ঘটক বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে ছিল একটা বড় মুড়ির থলি। যেতে যেতে দেখা হ'ল এক বাঘের সঙ্গে। বাঘ তো ঘটক মশাইকে খাবে বলে কাছে এগিয়েছে। ঘটক বললে, "আমায় মেরো না। তা হ'লে আর আমার ঘটকালি করা হবে না।"

বাঘ বলল, "ঘটকালি কি জিনিস?"

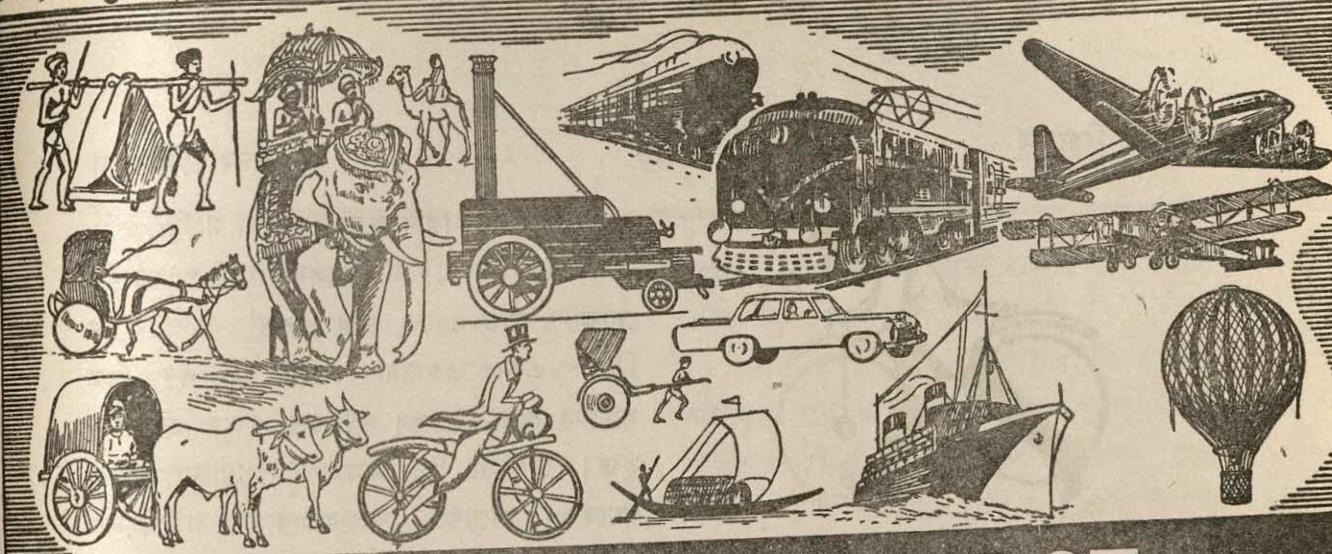
"সে এক মজার জিনিস। আমি একজনকে দু'জন করে দিতে পারি।"

বাঘ ভাবল, বেশ তো, আমিও দেখে নিই না কি জিনিস! বাঘ সে কথা ঘটককে বলল।

ঘটক বলল, "তা হ'লে এই থলের মধ্যে ঢোক।"

বাঘ যেই থলের মধ্যে ঢুকেছে, অমনি ঘটক তাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে দিল। তার পর যখন বাঘটা আধমরা হয়ে গেল—ঘটক তাকে নিয়ে থলেশুদ্ধু নদীর জলে ফেলে দিল।

এদিকে থলে ভাসতে ভাসতে ওপারে গিয়ে উঠল। এক বাঘিনী এসেছিল জল খেতে, সে থলেটা দেখে দাঁতে টেনে ছিঁড়তেই বাঘ বেরিয়ে এল। বাঘিনীকে দেখে বাঘ তো খুব খুশি। ঘটক তো তা হ'লে ঠিক কথাই বলেছে! সে একজন ছিল, এখন বাঘিনীকে নিয়ে দু'জনই হ'ল। বাঘ বাঘিনীকে সব খুলে বলল। ঘটক মশায়ের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। তার পর তারা বিয়ে করে মনের সুখে ঘর করতে লাগল।



যানবাহনের কথা

মানুষও গাড়ি টানে

চাকার আবিষ্কারের পরে যানবাহনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ রকম অগ্রগতি হয়েছিল এবং নানা ধরনের গাড়ি টানতে যে নানা ধরনের পশুদের লাগানো হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৯)।

আজ বিজ্ঞানের যুগে বেশির ভাগ দেশেই যান্ত্রিক উপায়ে যানবাহনের কাজ চলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশে মানুষেও গাড়ি টানে। আমাদের পরিচিত রিক্‌শই এই রকম একটি গাড়ি। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও রিক্‌শ চলছে। অবশ্য মানুষে টানা রিক্‌শর বদলে যান্ত্রিক উপায়ে চালানো রিক্‌শ অর্থাৎ সাইকেল-রিক্‌শরই চলন বেশি। তবে রাস্তায় ভিড় থাকলে বা রাস্তা খারাপ হ'লে মানুষে টানা রিক্‌শই সম্বল। শুধু আমাদের দেশেই নয়,—চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এশিয়ার অনেক দেশেই।

ঠিক যাত্রীবহনের জন্য না হ'লেও মাল টানার জন্য মানুষে-টানা গাড়ি এখনও উঠে যায় নি। রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়িতে করে সব দেশেই মাল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। বাজারে দোকানদার তার মাল নিয়ে আসে ঠেলাওয়ালার ঠেলাগাড়িতে। আর আইসক্রীমওয়ালার ঠেলাগাড়ি তো তোমাদের অতি প্রিয় জিনিস।

যান্ত্রিক উপায়ে চালানো সহজ গাড়ি

মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যতই এগোতে লাগল ততই তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রয়োগের কথা ভাবতে লাগল। যানবাহনও বাদ গেল না। যান্ত্রিক গাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সহজ যে গাড়ি আমরা ব্যবহার করে থাকি তা হ'ল সাইকেল।

যতদূর জানা যায়, ১৬৯০ সালে দ্য সিভরাক নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক সর্বপ্রথম দুই-চাকা-ওয়ালা একটি গাড়ি তৈরি করেন। এর একটি চাকা ছিল সামনে, অন্যটি পেছনে। একখানা কাঠ দিয়ে দু'টি চাকা যুক্ত ছিল। আরোহী কাঠ-খানার ওপর বসে পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিলেই গাড়িটি এগিয়ে চলত। এর অনেকদিন পর এমনি ধরনের অন্য একটি গাড়ি তৈরি হয়েছিল



ভেলোসাইপিড বা হবি হর্স্

১৭৭৯ সালে। এ গাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ভেলোসাইপিড'।

ইংল্যাণ্ডের হবি হর্স্

এর পর ১৮১৭ সালে কার্ল ড্রেইজিন নামে ইংল্যাণ্ডের জনৈক ভদ্রলোক নিজেরই নাম দিয়ে একখানা গাড়ি তৈরি করলেন। এ গাড়িটির দু'টি চাকা গাড়ির সঙ্গে এমন ভাবে আটকানো ছিল যে একটি হাতলের সাহায্যে সেটি ইচ্ছেমত ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যেত। আজকালকার দিনের স্টিয়ারিংএর আবিষ্কার এমনি ভাবেই হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে তখনকার দিনে এ গাড়ি 'ড্যাণ্ডি-হর্স্', 'হবি-হর্স্', 'বাইসাইপিড' বা 'ভেলোসাইপিড' নামেও পরিচিত ছিল।

পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ত বলে আবিষ্কারকেরা ভাবতে লাগলেন কি করে এ অসুবিধে দূর করা যায়। প্যাডেলের আবিষ্কার তখনও হয় নি। মিলন্ নামে স্কটল্যাণ্ডের এক কর্মকারই সর্বপ্রথম ১৮৩৫ সালে একটি তিন-চাকাওয়ালা গাড়িতে প্যাডেল লাগান। এর দশ বছর পরে ওদেরই গভিন্ ডল্জেল্ একটি ড্রেইজিন গাড়িতে প্যাডেল ব্যবহার করতে সমর্থ হন।

বোন্ শেকার বা হাড়-নাড়ানো গাড়ি

পিয়ারে লা লিমেঁ ছিলেন প্যারিস শহরের লোক। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে তিনি এমন একখানা গাড়ি বানালেন যার সামনের চাকাটিই শুধু প্যাডেল দিয়ে চালানো হ'ত। চাকাটির ঠিক মাঝখানে লাগানো থাকত প্যাডেল। অনেকটা আজকালকার সাইকেলের মতই দেখতে ছিল সেই গাড়িখানা। ভদ্রলোকের ছেলে কাজ করত একটি গাড়ি মেরামত করার কারখানায়। সম্ভবত তিনি তাঁর ছেলের কাছ থেকেই গাড়ি তৈরির ধারণাটা পেয়ে থাকবেন। সে যাই হোক, কিছুদিন পর তিনি তাঁর গাড়িটি নিয়ে আমেরিকা গেলেন এবং সেখানে তাঁর গাড়ির পেটেন্ট নিলেন। এর নাম দেওয়া হ'ল 'বাই-সাইকেল'। অনেকে ঠাট্টা করে বলত 'বোন্ শেকার' অর্থাৎ 'হাড়-নাড়ানো গাড়ি'। তখনও টায়ার-টিউবের



বোন্ শেকার বা হাড়-নাড়ানো গাড়ি

আবিষ্কার হয় নি, ফলে এ গাড়িতে চড়লে অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগত বলেই এই নাম।

ক্রমে লোহার চাকার বদলে এল রবারের টায়ার, আর সামনের চাকাটির আকার বড় হ'ল, পেছনের চাকাটি হ'ল খুবই ছোট। উভয় চাকার ভিতরে লাগানো হ'ল 'স্পোক্'।

এখন থেকে প্রায় একশ' বছরের কিছু আগে, ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে কভেন্ট্রি সিউইং মেশিন কোম্পানী সাধারণের জন্মে সাইকেল তৈরি করতে লাগল। এ সময়কার সবচেয়ে নামকরা সাইকেলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পেনি-ফার্দিং সাইকেল', কারণ এ জাতীয় সাইকেলে আবার সামনের চাকাটির চেয়ে পেছনেরটিই ছিল অনেক-গুণ বড়। খুব দ্রুতগতিতে চলত এই সাইকেল। তবে এতে বিপদের সম্ভাবনাও বেশ ছিল। হঠাৎ ধাকা লাগলে আরোহী অনেক সময় ছিটকে পড়ে যেত সাইকেল থেকে।

তখনকার দিনে সাইকেল-আরোহীকে বলত স্বার্থপর; কারণ সাইকেলে একজন মাত্র লোক চড়তে পারত, দ্বিতীয় কোন লোকের স্থান ছিল না এ গাড়িতে। আজকের দিনের মত সাইকেলের পেছনে কেরিয়ারের কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন। সেটা হয় আরও পরে। এখন তো রডে বসেও আর একজন লোক যেতে পারে—অর্থাৎ সবশুদ্ধ তিনজন। আবার আগে পিছে হু'টো সীটে বসে হু'জনেও সাইকেলে প্যাডেল করতে পারে এমন সাইকেলও বেরিয়েছে।

এর পর ইংল্যাণ্ডের কভেন্ট্রি কোম্পানীর জে. কে. স্টারলি 'রোভার' নামে এক রকম সাইকেল তৈরি করেছিলেন যার হু'টি চাকাই ছিল প্রায় সমান সমান আকারের। এটা ১৮৮৫ সালের কথা। এর তিন বছর পর বেলফাস্টের ডানলপ্ সাহেব ফাঁপা রবার-টায়ার ব্যবহার করেন সাইকেলের চাকায়।

এমনি ভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সাইকেল তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আজকাল সাইকেলকে সার্বজনীন যান বলা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে এখন বছরে প্রায় আড়াই কোটি সাইকেল তৈরি হয়।

কোন বড় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও নানা রকম ছোটখাট আবিষ্কার হয়ে থাকে। সাইকেলে ফাঁপা রবারের টায়ার-টিউব ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দরকার হ'ল এমন একটি যন্ত্রের যার সাহায্যে টিউবের ভিতরে বাতাস ভর্তি করার কাজ চলতে পারে। এমনি ভাবেই সাইকেল পাম্পেরও আবিষ্কার হ'ল।

বাষ্পের শক্তি

একটা কেটলিতে জল নিয়ে তা ফোটালে কেটলীর নল দিয়ে ভস্ ভস্ করে জলীয় বাষ্প বেরোতে থাকে আর কেটলির মুখটি লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে। এ থেকেই জলীয় বাষ্পের শক্তির কথা মানুষের মনে আসে। এই বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে যন্ত্র তৈরি হয় তাকেই আমরা বলি বাষ্পচালিত যন্ত্র বা স্টীম্ এঞ্জিন।

বাষ্পে বা স্টীম্কে মানুষের সেবায় লাগাবার জন্মে অনেকেই ভাবছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে টমাস্ নিউকমেন্ নামে এক ভদ্রলোক খনির ভেতর থেকে জল তুলে ফেলার জন্মে একটি স্টীম্ এঞ্জিন তৈরি করলেন। বলা বাহুল্য প্রাথমিক পর্যায়ে এ যন্ত্রটি দেখতে ছিল নিতান্তই বিদ্ঘুটে। কাজও হ'ত খুবই আস্তে

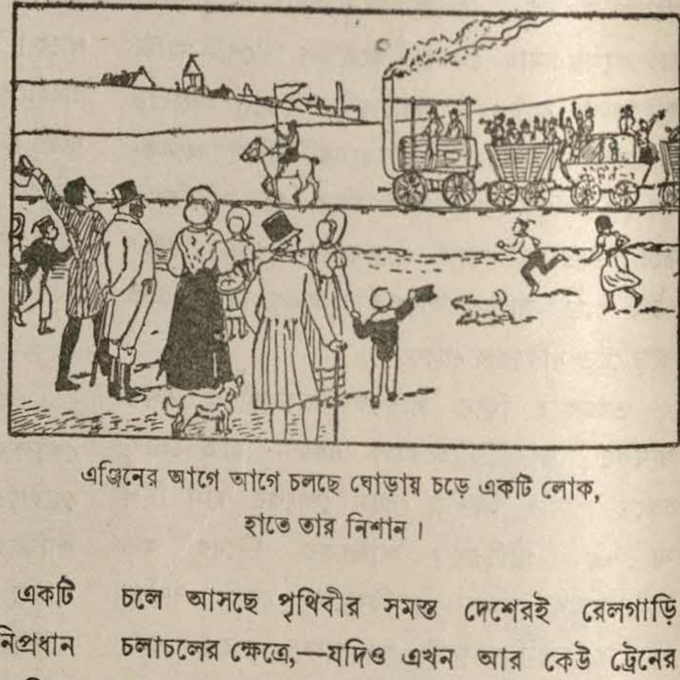
আস্তে। এর পর ১৭৬৯ সালে জেম্স্ ওয়াট্ যে ষ্টীম্ এঞ্জিন বানালেন তা নানা দিক্ দিয়েই ছিল উল্লেখ করবার মত। বলে রাখা ভালো, জেম্স্ ওয়াটের এ এঞ্জিন কিন্তু গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করা হয় নি।

প্রথম তৈরি বাষ্পীয় যান

রাস্তায় চলাফেরা করার জন্যে প্রথম বাষ্পীয় যান তৈরি করা হয় ১৭৮৪ সালে। এজন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন উইলিয়াম্ মারডক্। তিনি একটি ষ্টীম্ এঞ্জিন তৈরি করে তাতে চাকা লাগিয়ে নিলেন। সাধারণ রাস্তা দিয়ে দিব্যি চলতে লাগল এঞ্জিনটা। এর পর রিচার্ড ট্রিভেথিক্ নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক দেখলেন যে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার বদলে যদি রেল লাইন পেতে দেওয়া যায় তা হলে গাড়ি আরও সহজে চলতে পারে। তিনি ১৮০৪ সালে রেল লাইনের ওপর চলার উপযোগী এমন একটি বাষ্পীয় যান তৈরি করলেন যা ইংল্যাণ্ডের খনিপ্রধান ওয়েল্স্ অঞ্চলে কুড়ি টনের মত মাল টেনে নিতে সমর্থ হয়েছিল।

জর্জ্ স্টিফেনসনের রেলগাড়ি

১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। ইংল্যাণ্ডের স্টক্টন এবং ডারলিংটন শহরের মধ্যে রেল লাইন পাতা হয়েছে, সেখানে সেদিন চলবে প্রথম ষ্টীম এঞ্জিনে টানা রেলগাড়ি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে হাজার হাজার লোক। কখন চলবে গাড়ি—সকলের মুখে একই প্রশ্ন। অবশেষে সকল অপেক্ষার অবসান ঘটল। ট্রেন আসছে। ঘোড়ায় চড়ে গাড়ির আগে আগে আসছে একটি লোক, হাতে তার একটি নিশান। নিশান নাড়িয়ে লোকজনকে সাবধান করছে সে—গাড়ি আসছে, সাবধান! সেই প্রথম দিন থেকে শুরু করে নিশান দেখিয়ে লোকজন সাবধান করার সেই যে রীতি তা আজও

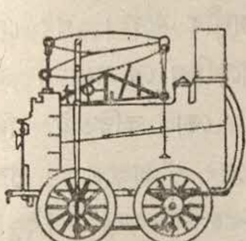


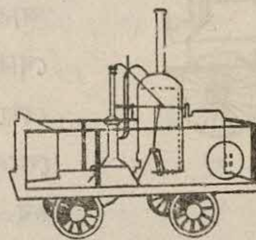
এঞ্জিনের আগে আগে চলছে ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক, হাতে তার নিশান।

চলে আসছে পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই রেলগাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে,—যদিও এখন আর কেউ ট্রেনের আগে আগে ঘোড়ায় চেপে নিশান হাতে চলার কথা ভাবতে পারে না। প্রথম দিনের ট্রেনযাত্রার সফলতার জন্যে যিনি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন তিনি হলেন জর্জ্ স্টিফেনসন,—ইংল্যাণ্ডেরই এক এঞ্জিনীয়ার।

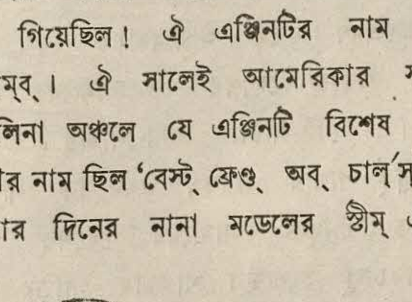
এদিকে আমেরিকার বোস্টন শহরে তিন মাইল লম্বা একটি রেল লাইন বসানো হ'ল ১৮২৬ সালে। এ লাইনে যে গাড়ি চলত তা

টানার কাজে অবশ্য লাগানো হ'ত ঘোড়া। সবচেয়ে প্রথম রেলগাড়ি চলে ওদেশে পেনসিলভানিয়া রাজ্যে,—কারবনডেল ও হোনেসডেল শহরের মধ্যে। এ রেল লাইনের ওপরে সর্বপ্রথম যে স্টীম্ এঞ্জিনটি চলেছিল তার নাম ছিল স্টুরব্রিজ। সেটা হ'ল ১৮২৯ সালের কথা।


স্টুরব্রিজ

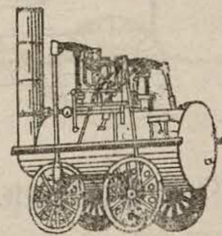

টম্ থাম্ব্

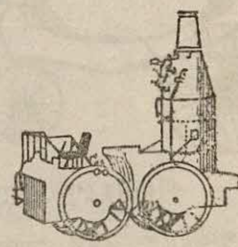
তখন অবশ্য রেলগাড়িও চলত খুব ধীরে ধীরে। বালটিমোর অঞ্চলে ঘোড়ায় টানা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একটি রেল এঞ্জিন তো হেরেই গিয়েছিল! ঐ এঞ্জিনটির নাম ছিল টম্ থাম্ব্। ঐ সালেই আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনা অঞ্চলে যে এঞ্জিনটি বিশেষ নাম করে তার নাম ছিল 'বেস্ট্ ফ্রেণ্ড্ অব্ চার্ল্‌স্টন্'। আগেকার দিনের নানা মডেলের স্টীম্ এঞ্জিন


সেকালের আর একটি স্টীম্ এঞ্জিন

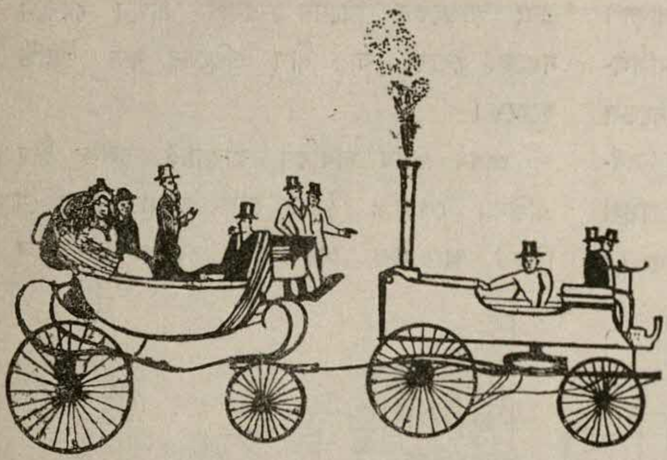
এবং আজকের দিনের একটি এঞ্জিন দেখলে সহজেই বোঝা যায় স্টীম্ এঞ্জিনের কত উন্নতি হয়েছে।

প্রথম প্রথম সাধারণ রাস্তায়ই চলত স্টীম্ এঞ্জিন। লোহার তৈরি চাকা ঘুরবার সময় যে বিকট আওয়াজ হ'ত তা সহজেই অনুমান


প্রথম যুগের স্টীম্ এঞ্জিন

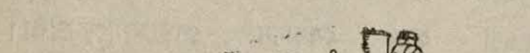

বেস্ট্ ফ্রেণ্ড্ অব্ চার্ল্‌স্টন্

করা যায়। তা ছাড়া সে সময়ে ঘণ্টায় তিন-চার মাইল বা বড় জোর দশ-বারো মাইলের বেশি চলতে পারত না সেই স্টীম্ এঞ্জিন। এ সব অসুবিধে দূর করবার জন্যেই রেল লাইন পাতা হ'ল। এর পর ক্রমে শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরি করাও সম্ভব হ'ল। ফলে আগে যেখানে এঞ্জিনের সঙ্গে একখানা মাত্র 'স্টেজ-কোচ্' যুড়ে দেওয়া হ'ত সেখানে পেছনে-যুড়ে-দেওয়া গাড়ির সংখ্যা বাড়তে লাগল। গাড়ির গতিবেগ বেড়ে বেড়ে আজ ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশি বেগে যেতে পারে রেলগাড়ি। এখানে একটা কথা বলা দরকার। স্টীম্ এঞ্জিন যে গাড়ি টানে তাকে আমরা বলি রেলগাড়ি। লোহার তৈরি রেলের ওপর দিয়ে চলে বলেই তাকে আমরা রেলগাড়ি নাম দিয়েছি—তা স্টীম্ এঞ্জিন সে গাড়ি টানুক আর নাই টানুক। আজকাল বিদ্যুৎশক্তি, কখনও বা ডিজেল তেল দিয়ে যে সব গাড়ি চলে তাদের নামও রেলগাড়ি।



এঞ্জিনের পেছনে যুড়ে দেওয়া হ'ত স্টেজ-কোচ্

পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য দেশ নেই যেখানে আজ রেলগাড়ির প্রচলন নেই। যানবাহনের ক্ষেত্রে এখনও রেলগাড়িই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি কাজের। সাম্প্রতিক কালের একটি হিসেবে দেখা যায় যে একমাত্র উত্তর আমেরিকায়ই প্রায় ২৯ লক্ষ মাইল রেল লাইন পাতা রয়েছে। ইয়োরোপে রয়েছে ২৫ লক্ষ মাইলেরও বেশি। এশিয়া মহাদেশে অবশ্য এ সংখ্যা ১ লক্ষ মাইলের মত।



নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত ৯৯৯ নং ষ্টীম্ এঞ্জিন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৯০ সালে) এই এঞ্জিনটি ঘণ্টায় ১১২·৫ মাইল বেগে গাড়ি টেনে নিয়ে সে দিন পৃথিবীতে রেকর্ড স্থাপন করেছিল।

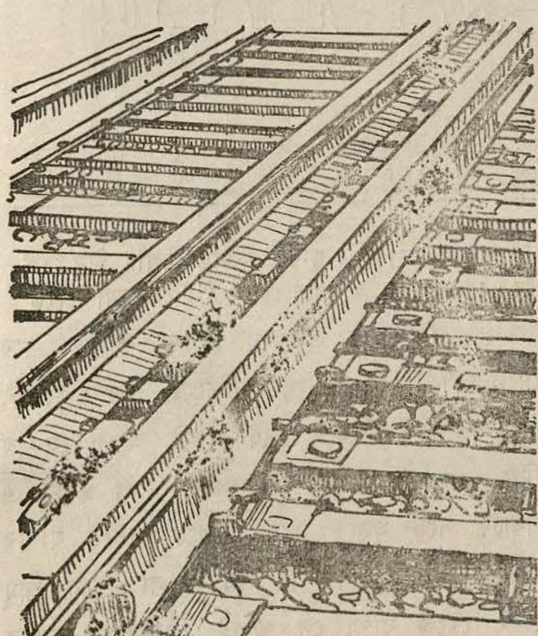
আমাদের দেশে

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও রেলগাড়ির চলন হয়েছে এখন থেকে ১০০ বছরেরও আগে। প্রথম যে রেলগাড়ি আমাদের দেশে চলেছে তা হ'ল হাওড়া আর হুগলীর মধ্যে। খুব সোরগোল পড়েছিল সে সময়ে। কবি হেমচন্দ্র তো কবিতাই লিখে ফেলেছিলেন—"ভারতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।" কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে ৩৫ হাজার মাইলের ওপর রেল লাইন বসানো ছিল, এখন তা আরও বেড়েছে। এ সব লাইনে যে রেলগাড়ি চলে তাতে লক্ষ লক্ষ লোক তো যাতায়াত করেই, উপরন্তু কোটি কোটি টন মাল আনা-নেওয়া হয়ে থাকে।

রেলভ্রমণ যাতে আরামদায়ক হয় তার চেষ্টাও অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও চলছে। গদি-আঁটা বসা-শোয়ার আসন, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার ব্যবস্থা, এমন কি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়িও আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালু হয়েছে। খাওয়ার গাড়ির ব্যবস্থা থাকে দূর দেশে পাড়ি দেওয়ার রেলগাড়িতে; স্নান করার চমৎকার ব্যবস্থা তো রয়েছেই। এক কথায়, চলতে চলতে স্নান, খাওয়াদাওয়া, ঘুমোনো—সবই চলে রেলের কামরায়, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মাইল দূরে যাওয়ার কাজটিও চলে একসঙ্গে। তবে আমাদের দেশে যাত্রীর তুলনায় পর্যাপ্ত গাড়ি দিতে না পারায় রেলভ্রমণের এ সব আরাম মুষ্টিমেয় কয়েকজনই পেয়ে থাকেন।

রেল লাইনের কথা

যে রেল লাইনের নাম থেকে রেলগাড়ি নামটি চালু হয়েছে সে সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলি। যে পথের ওপর রেল লাইন পাতা হয় তা চাওড়ায় ৬০ থেকে ৭৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রয়োজন মত কোন কোন জায়গায় এ পথ ২০০ ফুট চওড়াও হতে পারে। প্রথমে মাটির ওপর খোয়া বিছিয়ে রাস্তা শক্ত করা হয়, তার পর তার ওপর কাঠের স্লিপার বসিয়ে লোহার রেল লাইন বসানো হয়। এক-একখানা রেলের দৈর্ঘ্য হয় সাধারণত ৩৯ ফুট। কখনও কখনও রেলগুলোকে ঝালাই করে মুখে মুখে মিশিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দু'খানা রেলের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তার মাপ



কাঠের স্লিপার বসিয়ে তার ওপর লোহার রেল লাইন পাতা হয়।

অনুসারেই ব্রড গেজ (৫'৫ ফুট), মিটার গেজ (৩'৩৮ ফুট) এবং ন্যারো গেজ (২'৫ ফুট) নামের প্রচলন।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে রেল লাইন বসাতে কত যে পোল বানাতে হয়, পাহাড় কেটে কত যে সুড়ঙ্গ বানাতে হয় তা বলে শেষ করা যায় না। তা ছাড়া দুর্গম জায়গায় লাইন পাততে হলে আরও কত রকমের কসরৎ করতে হয়। এদিক্ দিয়ে দেখলে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রেল লাইনটি পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক রেলপথ।

স্টীম্ এঞ্জিনের ভিতরকার চেহারাটা কি রকম

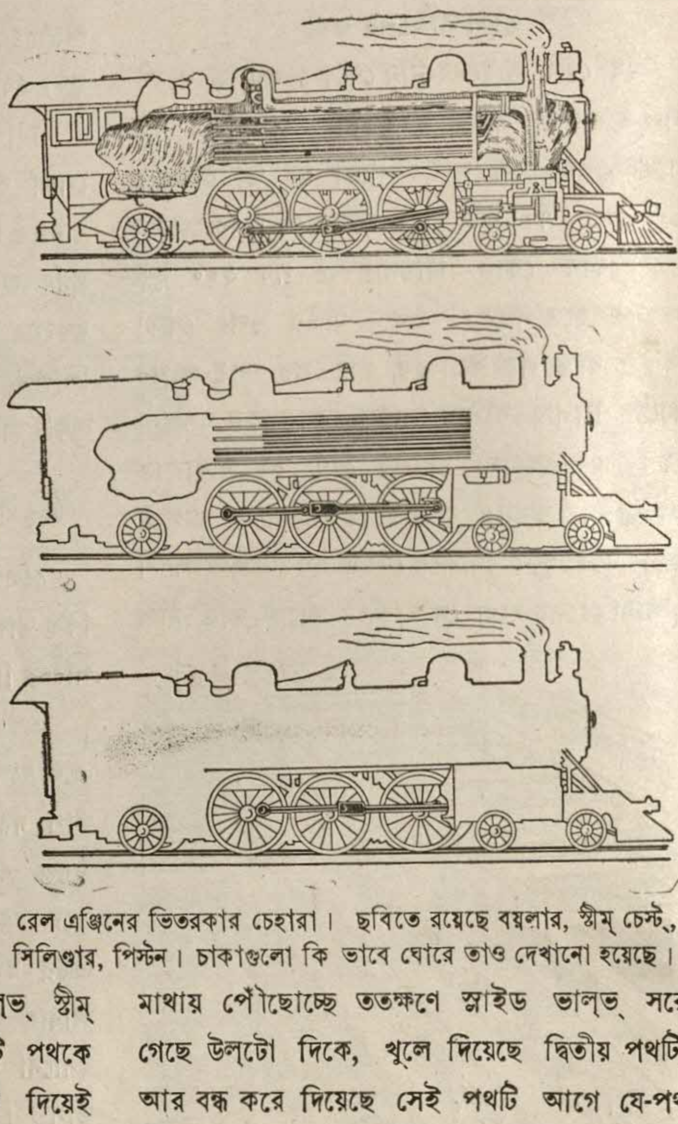
রেলগাড়ির এঞ্জিন বাইরে থেকে কে না দেখেছে, কিন্তু তার ভিতরের চেহারাটা কি রকম? একটু পরিচয় দিচ্ছি।

একটা বিরাট পাত্রে ফোটানো হয় জল। একে বলে বয়লার। এই জল ফোটাবার জন্য যে তাপ দরকার তা পাওয়া যায় কয়লা পুড়িয়ে। খুব উত্তপ্ত এবং ভীষণ চাপযুক্ত বাষ্প এবারে প্রবেশ করে একটি বাক্সের মত দেখতে যন্ত্রের মধ্যে। এটির ইংরেজি নাম 'স্টীম্ চেস্ট', বাংলায় বাষ্প-আধার বলা যেতে পারে। স্টীম্ চেস্টের মধ্যে বসানো রয়েছে একটি ভাল্‌ভ্—যার নাম স্লাইড ভাল্‌ভ্। ইংরেজি ডি অক্ষরটির মত চেহারা বলে এর আর এক নাম ডি-ভাল্‌ভ্। স্টীম্ চেস্টের সঙ্গেই রয়েছে একটি সিলিণ্ডার। স্টীম্ চেস্ট্ ও সিলিণ্ডারের মধ্যে রয়েছে দু'টি পথ। এর যে কোন একটি দিয়ে বাষ্প স্টীম্ চেস্ট্ থেকে সিলিণ্ডারে প্রবেশ করতে পারে। স্টীম্ চেস্টের সঙ্গে আরও একটি পথ আছে যেটি সিলিণ্ডারের বাইরে নেওয়া হয়েছে। ভাল্‌ভ্‌টির কাজ হ'ল এই যে এটি একই সঙ্গে বাইরে যাওয়ার পথটি

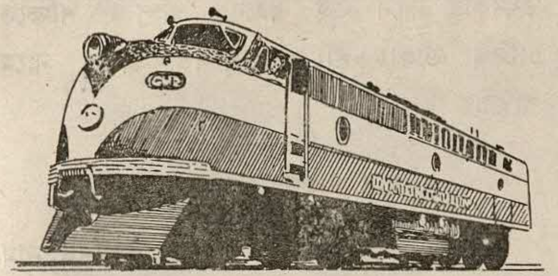
এবং অন্য দু'টি পথের একটির মধ্যে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ যে কোন সময় স্টীম্ চেস্ট্ থেকে বাষ্প সিলিণ্ডারে যাওয়ার একটি মাত্র পথ খোলা পেতে পারে।

সিলিণ্ডারের মধ্যে কাজ করছে একটি পিস্টন। পিস্টনটি সিলিণ্ডারের মধ্যে এ-মাথা ও-মাথা যাতায়াত করে স্টীমের চাপে। পিস্টন দণ্ডের মাথার দিকে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে—যার সাহায্যে পিস্টনের সরল রেখার গতিকে ঘূর্ণন গতিতে বদলে দেওয়া যায়। যে দণ্ডটির ওপর ঘূর্ণন গতি আরোপ করা হয় তার নাম ড্রাইভিং শ্যাফ্ট্। এর মাথায় লাগানো থাকে চাকা।

এবারে দেখা যাক স্টীম্ এঞ্জিন কি ভাবে কাজ করে।


রেল এঞ্জিনের ভিতরকার চেহারা। ছবিতে রয়েছে বয়লার, স্টীম্ চেস্ট্, সিলিণ্ডার, পিস্টন। চাকাগুলো কি ভাবে ঘোরে তাও দেখানো হয়েছে।

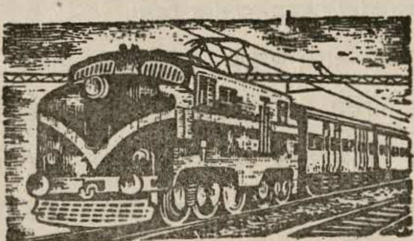
ধরা যাক, কোন সময় স্লাইড্ ভাল্ভ্ স্টীম্ চেস্ট্ আর সিলিণ্ডারের ভিতরকার একটি পথকে খুলে দিয়েছে। এ সময় শুধু এই পথটি দিয়েই বাষ্প সিলিণ্ডারে প্রবেশ করতে পারবে। অন্য পথটি এবং বাইরে যাবার পথকে স্লাইড ভাল্ভ্ যুক্ত করে রেখেছে। খোলা পথে বাষ্প প্রবেশ করল সিলিণ্ডারে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পিস্টনকে সিলিণ্ডারের অন্য মাথার দিকে। সিলিণ্ডারের অন্য দিক্‌কার বাষ্প খোলা পথে ঢুকে বাইরে বেরোবার পথ দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। পিস্টন যতক্ষণে সিলিণ্ডারের অন্য মাথায় পৌঁছোচ্ছে ততক্ষণে স্লাইড ভাল্ভ্ সরে গেছে উল্‌টো দিকে, খুলে দিয়েছে দ্বিতীয় পথটি, আর বন্ধ করে দিয়েছে সেই পথটি আগে যে-পথ দিয়ে বাষ্প ঢুকেছিল সিলিণ্ডারে। তা ছাড়া এ পথটির সঙ্গে যুক্তও করে দিয়েছে বাইরে যাবার পথকে। এদিকে দ্বিতীয় পথ খোলা পেয়ে স্টীম্ চেস্ট্ থেকে বাষ্প সে পথেই সিলিণ্ডারে ঢুকবে এবং ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে পিস্টনকে অন্য দিকে। পিস্টন অন্য মাথায় পৌঁছোবার আগেই আবার সর্বপ্রথমকার অবস্থা আসবে। এমনি ভাবেই পিস্টন সিলিণ্ডারের ভিতর এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত



আধুনিক একখানি ডিজেল এঞ্জিন

করতে থাকবে। পিস্টন যত এদিক্-ওদিক্ ঘুরবে, সঙ্গে সঙ্গে চাকাও তেমনি ঘুরতে থাকবে আর গাড়িও এগিয়ে চলবে।

রহস্যটা মোটামুটি এই, তবে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে ভিতরে।



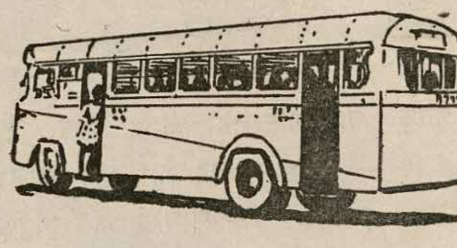
বিদ্যুৎ-চালিত ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিন

আজকাল অবশ্য রেলগাড়িরও অনেক উন্নতি হয়েছে। ডিজেল অয়েল-চালিত ডিজেল এঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ-চালিত ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিন স্টীম্ এঞ্জিনকে দ্রুত সরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের এঞ্জিনের চলন শুরু হয়েছে।

মোটর গাড়ির কথা

মাটির ওপরে চলাফেরা করবার জন্যে আমরা যে সব যানবাহন ব্যবহার করি তার মধ্যে মোটর গাড়ির স্থান এখন সকলের ওপরে। মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে মোটর বাস্, টেম্পো, লরী প্রভৃতির কথাই বলছি।

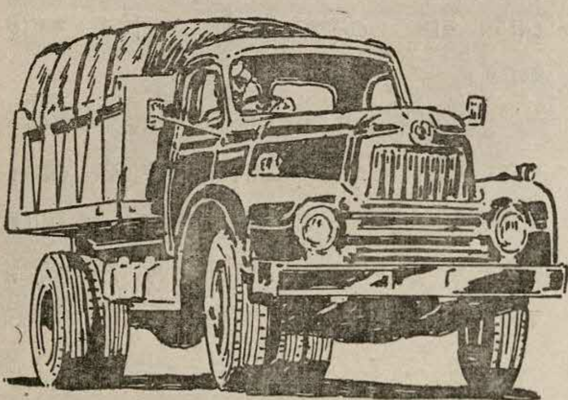
খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, শ'খানেক বছর আগে রাস্তায় আমাদের আধুনিক মোটর গাড়ির পূর্বপুরুষ একখানা গাড়ি বেরোলে লোকে গাড়ির মালিককে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবত না। কোন কোন জায়গায় মোটর গাড়ির



যাত্রীবহনের কাজে মোটর বাস্ যে কত উপকারী তা বলে বোঝানো যায় না।

আগে আগেও চলত একটি লোক, হাতে তার থাকত একটি লাল নিশান। রাস্তায় চলাচল-কারীদের সাবধান করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কোন কোন জায়গায় আবার কোন ঘোড়ার গাড়ি এলে মোটর গাড়িকে থেমে তাকে পথ করে দিতে হ'ত।

রাস্তায় ছিল তখন ঘোড়ার গাড়িরই একচ্ছত্র আধিপত্য। কারো কারো মাথায় চিন্তা এল, ঘোড়ার বদলে যন্ত্রের সাহায্যে কি গাড়ি চালানো যায় না? প্রথম দিকে হাতে চালানো কোন যন্ত্র বা স্প্রীং-এর সাহায্যে মোটর দিয়ে চালানো হ'ত এমনি ধরনের গাড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় যন্ত্র বা স্টীম্ এঞ্জিন আবিষ্কৃত হলে কাজটা অনেক পরিমাণে সহজ হ'ল। ১৭৭০ সালে ফরাসী দেশের এক এঞ্জিনীয়ার, নাম নিকোলাস জোসেফ কনট, বাষ্পের শক্তি দিয়ে মোটর গাড়ি টানার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি



মালবাহী লরী

যে গাড়ি বানিয়েছিলেন তাতে ছিল তিনটি চাকা, এঞ্জিনটি ছিল গাড়ির সামনে। অনেকটা আজকের দিনের তিন-চাকাওয়ালা গাড়িরই মত।

ক্রমে এই ধরনের বাষ্পীয় যানের উন্নতি হতে লাগল। ১৮৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে লণ্ডন শহর এবং তার আশপাশের অঞ্চলে এই ধরনের বহু বাষ্পীয় গাড়ির প্রচলন ছিল। এই ধরনের গাড়ি তৈরি করবার জন্যে বহু কোম্পানী গড়ে উঠল ইংল্যাণ্ডে। ফলে স্টেজ কোচ্ অর্থাৎ ঘোড়ায় টানা গাড়ির কোম্পানীগুলো থেকে নানা আপত্তি উঠল। ১৮৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে 'রোড লোকোমোটিভ আইন' পাশ করা হ'ল—যার ফলে বাষ্পীয় যান তৈরির কোম্পানীগুলোর ওপর প্রচুর কর ধার্য করা হ'ল। তখনকার দিনে এই ধরনের বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত ডাঙ্গায়-চলা গাড়িগুলিও ষ্টীমার নামে পরিচিত ছিল।

বর্তমান কালের মোটর এঞ্জিন

বর্তমান কালের মোটর গাড়ির এঞ্জিনের নাম ইণ্টারনাল্ কম্বাস্‌শন্ এঞ্জিন। এ গাড়ি চলে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন দিয়ে, আগেকার দিনের মত বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে নয়। এ ধরনের এঞ্জিনের প্রাথমিক ধারণা করেছিলেন পোর্তুগীজ বিজ্ঞানী ক্রীশ্চিয়ান হাইজেন্স। তিনি বারুদের বিস্ফোরণের শক্তির সাহায্যে এঞ্জিন চালাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এর পর দীর্ঘদিন এদিকে কাজ তেমন এগোয় নি।

১৮৫১ সালে ডব্লিউ. এম. স্টর্ম্ এমন ধরনের একটি এঞ্জিন তৈরি করলেন যার এঞ্জিন চলবে রাস্তার গ্যাস-বাতি জ্বালাবার গ্যাস দিয়ে। এর ন'বছর পরে এটিনি লিনয়ে নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক উন্নত ধরনের যে ইণ্টারনাল্ কম্বাস্‌শন্ এঞ্জিনটি তৈরি করেছিলেন তাও চালানো হয়েছিল ঐ রকম গ্যাস দিয়ে; এঞ্জিনের মধ্যে গ্যাস জ্বালাবার ব্যবস্থা হয়েছিল বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দিয়ে। ১৮৬২ সালে তিনি তাঁর একটি এঞ্জিন গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করেন।



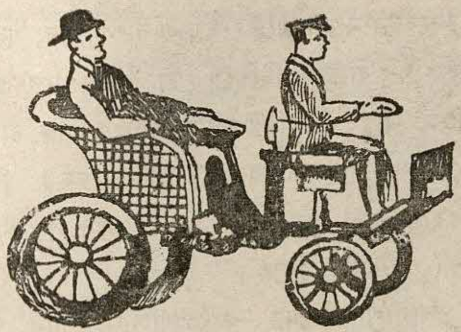
বাষ্পীয় শক্তি দিয়ে টানা মোটর গাড়ি



গ্যাস বা কোল গ্যাস দিয়ে টানা মোটর গাড়ি



চাকা ঘোরানো বা ষ্টিয়ারিংএর সেকেলে ব্যবস্থা



আধুনিক মোটর গাড়ির পূর্বপুরুষ ;
এ গাড়িতে চালক ছাড়া একজন যাত্রীই চড়তে পারত।

বর্তমানে যে উপায়ে এঞ্জিন কাজ করে তাকে বলা হয় ফোর স্ট্রোক্ সাইকেল। ব্যাপারটা সম্বন্ধে প্রথম কাজ করেছেন এক ফরাসী ভদ্রলোক, নাম ব্যো. ছ. রোচাস। ১৮৭৬ সালে ছু'টি জার্মান ভদ্রলোক,—নাম এন. এইচ. অটো এবং ই. ল্যাঞ্জার এ ধরনের এঞ্জিন তৈরি করতে সমর্থ হন। এঁরাও এঁদের এঞ্জিনে প্রথমে ব্যবহার করেন গ্যাস, পরে গ্যাসোলিন। 'অটো'র নাম থেকে 'ফোর স্ট্রোক সাইকেল'কে অনেক সময় 'অটো সাইকেল' বলা হয়। ক্রমে অটো এবং ল্যাঞ্জারের যন্ত্রের অনেক উন্নতি হ'তে থাকে। ১৮৮১-৮৬ সালে কার্ল বেনজ নামে এক জার্মান ভদ্রলোক তিন-চাকাওয়ালা একটি মোটর গাড়ি তৈরি করেন যার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকায় অনেকেই মোটর গাড়ির ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

আমেরিকায় প্রথম পেট্রোল-চালিত এঞ্জিন তৈরি হয় ১৮৯১ সালে। তৈরি করেন চার্ল্‌স্ ই. ফ্রাঙ্ক ডুরিয়ে এবং তাঁর ভাই চার্ল্‌স্ জে. ডুরিয়ে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে মোটর গাড়ির ব্যবসা আমেরিকায় ভীষণ ভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। মোটর গাড়ি তৈরির বড় বড় সব কোম্পানী গড়ে ওঠে আমেরিকার নানা অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে হেনরী ফোর্ড, আলেকজাণ্ডার উইনটন প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত।

ক্রমে মোটর গাড়িরও নানা উন্নতি হতে থাকে। দিনে দিনে মোটর গাড়ির আকার-আকৃতি এবং এঞ্জিনটির কত রকমই না পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে! পুরোনো মডেলের গাড়ির জায়গায় আজকাল কত অভিনব এবং আরামদায়ক



এ মোটরে দু'জন লোকের ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে।
এ ভ্রমণ যে আজকের তুলনায় মোটেই আরামদায়ক
ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

গাড়িরই না প্রচলন হয়েছে! আমাদের দেশও এ ব্যাপারে একেবারে পিছিয়ে নেই। কলকাতার কাছে উত্তরপাড়াতেই তো হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীতে হাজার হাজার গাড়ি তৈরি হচ্ছে আজকাল।

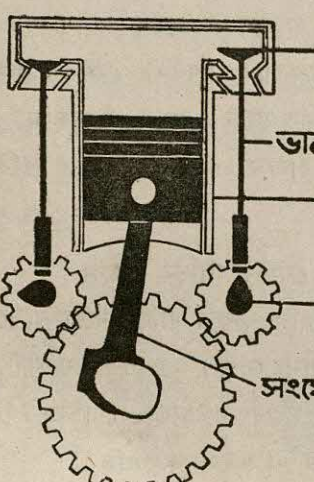
মোটর গাড়ির এঞ্জিন

আজকালকার একটি গাড়ির মধ্যে রয়েছে শত শত ছোটবড় নানা অংশ। এ সবের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব না হলেও মোটামুটি কি ভাবে এর এঞ্জিন চলে তা সংক্ষেপে বলছি।

গাড়ি শক্তি আহরণ করে যে এঞ্জিন থেকে তা বসানো হয় গাড়ির সামনে। অবশ্য

ইয়োরোপে কোন কোন গাড়ির এঞ্জিন পেছন দিকেও বসানো হয়। এঞ্জিন চালানো হয় পেট্রোল পুড়িয়ে। এইজন্যেই এ ধরনের এঞ্জিনকে বলা হয় ইন্টারনাল্ কম্বাস্শন্ এঞ্জিন।

ইস্পাতের তৈরি একটি চোঙ বা সিলিণ্ডারের ভিতরে একটি পিস্টন ওঠা-নামা করে। পিস্টনটি লোহার তৈরি। এটি একটি সংযোগকারী দণ্ড বা কানেক্টিং রড্ দিয়ে ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফ্ট্ নামে একটি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। পিস্টনের রৈখিক গতি বা লিনিয়ার মোশনকে ক্র্যাঙ্ক-শ্যাফ্টের সাহায্যে আবর্ত-গতি বা সারকুলার মোশনে পরিণত করা হয় আর তারই ফলে গাড়ির চাকা ঘোরে। সিলিণ্ডারের ওপরে থাকে তু'টি ভাল্ভ্। এর একটি আগম নল (প্রবেশপথ) বা ইন্‌লেট্ পাইপের সঙ্গে যুক্ত থাকে, অন্যটি থাকে নির্গম নল বা আউট্‌লেট পাইপের সঙ্গে যুক্ত। ভাল্ভ্ তু'টি খোলা বা বন্ধ করার জন্যে তু'টি বিশেষ ধরনের চাকা থাকে—যাদের বলা হয় ক্যাম্।



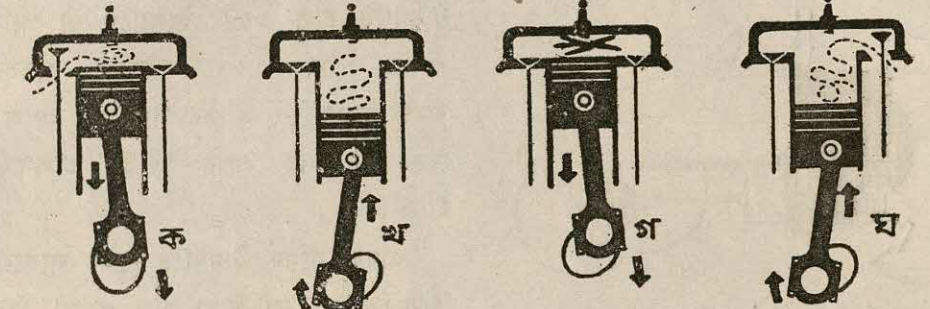
এ ছবিতে মোটর গাড়ির একটি এঞ্জিনের সিলিণ্ডার এবং অন্যান্য প্রধান অংশ দেখানো হয়েছে।

কারবুরেটর নামক যন্ত্রে পেট্রোল বাষ্প এবং উপযুক্ত পরিমাণে বাতাস মিশিয়ে তা সিলিণ্ডারে প্রবেশ করানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ চালিয়ে ঐ মেশানো গ্যাসকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় একটি বিদ্যুৎ-কোষ বা স্টোরেজ সেল (ব্যাটারী) থেকে।

পেট্রোল-এঞ্জিনের কার্যপ্রণালীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়—যার জন্যে এই কার্যপদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে ফোর স্ট্রোক্ সাইকেল।

প্রথম পর্যায়কে বলা হয় চার্জিং স্ট্রোক্। এ সময়ে পিস্টন থাকে বাইরের দিকে। ফলে সিলিণ্ডারের মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে অনেকটা। ইন্‌লেট-ভাল্ভ্ খুলে গিয়ে কারবুরেটর থেকে পেট্রোল-গ্যাস এবং বাতাসের মিশ্রণ সিলিণ্ডারে এসে হাজির হয়। অন্য ভাল্ভ্‌টি এ সময় বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয় এরপর। পিস্টন ভিতরের দিকে এগোতে থাকে বলে গ্যাস মিশ্রণটির আয়তন কমে, চাপ এবং উষ্ণতা বাড়ে। তু'টি ভাল্ভ্ই থাকে বন্ধ। এই পর্যায়ের শেষের দিকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়ে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক নাম কম্‌প্রেশন্ স্ট্রোক্। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিস্ফোরণের জন্য গ্যাসের তাপ ও চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে যায় এবং পিস্টনটি খুব জোরে বাইরের দিকে সরে যায়। একেই বলা হয় তৃতীয় পর্যায় বা ওয়ার্কিং স্ট্রোক্। এই স্ট্রোক্‌টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ সময়েই তাপ-শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই পর্যায়ের শেষের দিকে নির্গম ভাল্ভ্‌টি খুলে যায়।

চতুর্থ পর্যায়ের নাম একজস্ট্ স্ট্রোক্। এ



(ক) চার্জিং স্ট্রোক্, (খ) কম্প্রেশন্ স্ট্রোক্, (গ) ওয়ার্কিং স্ট্রোক্, (ঘ) একজস্ট্ স্ট্রোক্।

সময়ে পিস্টনটি আবার ভিতরের দিকে যেতে থাকে। নির্গম ভাল্ভ্ দিয়ে অকেজো গ্যাস বাইরে চলে যায়। এ পর্যায়ের শেষে আবার প্রথম থেকেই কাজ শুরু হয়। এমনি ভাবেই মোটরের এঞ্জিন চলে। চারটি পর্যায়ের কাজ কি ভাবে চলে তা চিত্র-সাহায্যে দেখানো হ'ল।

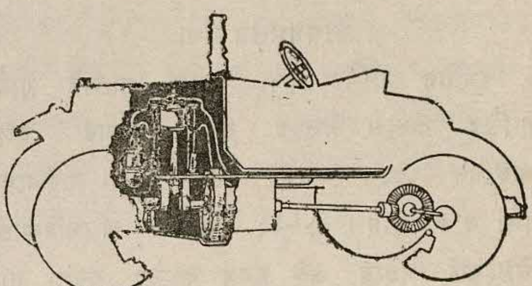
কোন মোটর গাড়িতেই একটি মাত্র সিলিণ্ডার কাজ করে না। প্রয়োজনবোধে এবং এঞ্জিনের শক্তি অনুসারে একের বেশি সিলিণ্ডার থাকে প্রতি মোটর গাড়িতে।

এঞ্জিনের মূল কথা সংক্ষেপে বলা হ'ল। কিন্তু আগেই বলেছি, একটি মোটর এঞ্জিনে রয়েছে শত শত অংশ। কতকগুলো অংশ মিলে এক এক ধরনের কাজ হয় এঞ্জিনে। যেমন



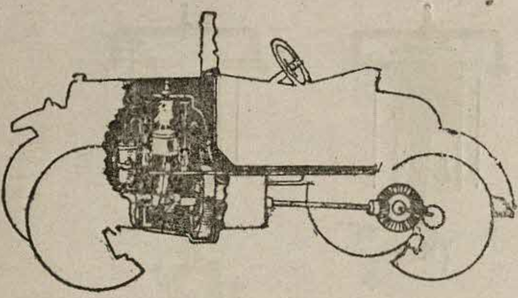
পিস্টন সিলিণ্ডারের ভিতর দিকে এগুচ্ছে। গ্যাসের আয়তন কমছে, চাপ এবং উষ্ণতা বাড়ছে।

কতগুলো অংশ মিলে কাজ করে জ্বালানীর—কোথায় এবং কি ভাবে পেট্রোল জমা করে রাখতে হবে, কি পরিমাণ পেট্রোল প্রতি বারে কাজে লাগানো হবে, কি ভাবে পেট্রোল বাতাসের



বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে গ্যাসের মধ্যে ঘটে বিস্ফোরণ। এর ফলে তাপ ও চাপ যায় খুব বেড়ে, পিস্টনটি অসম্ভব জোরে বাইরের দিকে সরে যায়।

সঙ্গে মেশানো হবে—এমনি ধরনের সব কাজ। একে বলা যেতে পারে জ্বালানী পদ্ধতি বা ফিউয়েল সিস্টেম্। ঠিক একই রকম ভাবে গাড়িতে রয়েছে এক্জস্ট্ সিস্টেম্, কুলিং সিস্টেম্, লুব্রিকেটিং সিস্টেম্, ইলেকট্রিকাল সিস্টেম, ফ্রেম, ব্রেক, পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেম্, আরও কত রকম ব্যাপার! প্রতিটি সম্বন্ধে বলতে গেলে সে এক আলাদা মহাভারত হয়ে যাবে।

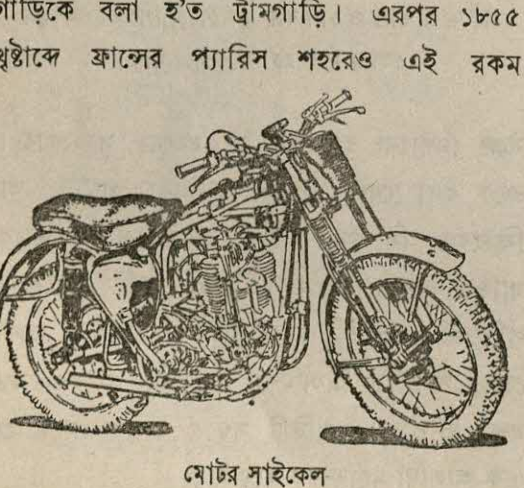


ফ্লাট হুইলের ঘূর্ণনের জন্য পিস্টন আবার ভিতরের দিকে চলতে থাকে। সিলিণ্ডারের শেষ মাথায় যখন হাজির হয় পিস্টন, তখন প্রবেশপথ দিয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে গ্যাস মিশ্রণ।

সাইকেলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে মোটরের এঞ্জিন যুড়ে তৈরি হয়েছে মোটর সাইকেল। স্কুটার এরই একটি বিশেষ শাখা।

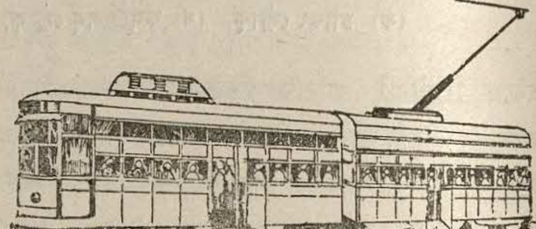
ট্রামগাড়ির কথা

মোটর গাড়ির কথা বলতে গেলেই ট্রাম গাড়ির কথাও বলতে হয়। লোহার রেল লাইনের বদলে কাঠের তৈরি রেল লাইনকে বলা হ'ত ট্রাম। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এই রকম কাঠের বরগা বা রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলত বলে ঐ গাড়িকে বলা হ'ত ট্রামগাড়ি। এরপর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিস শহরেও এই রকম ট্রামগাড়ি চালু হয়। ইংল্যাণ্ডে ঐ গাড়ি আসে আরও পরে—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তী যুগে অবশ্য ট্রামগাড়িও কাঠের লাইনের বদলে লোহার রেল লাইনের ওপর দিয়েই চালানো হ'তে থাকে।



মোটর সাইকেল

প্রথম যুগের ট্রামগাড়ি রেল লাইনের ওপর দিয়ে চললেও তা টানা হ'ত ঘোড়া দিয়ে, তার



ট্রাম গাড়ি—মাথার ওপরকার ডাণ্ডাটি হচ্ছে ট্রলী

পর কিছুদিন চলল স্টীম্ এঞ্জিন দিয়ে। অবশেষে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ির চলন হয়। আমাদের কলকাতাতেও প্রথম প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রামই চলত। সে হচ্ছে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। এখনকার বৈদ্যুতিক ট্রাম আরও পরে চালু হয়েছে,—১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে। ট্রাম লাইনের মাথার ওপর থাকে পুরু তামার তার—মাটি থেকে ২১ ফুট উঁচুতে। তারই মধ্যে দিয়ে চলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বা ইলেকট্রিক কারেন্ট। গাড়ির ছাদে থাকে একটা লোহার ডাণ্ডা, তাতে চাকা লাগানো। ঐ চাকার সাহায্যে ওপরের তামার তার থেকে বিদ্যুৎশক্তি টেনে নেওয়া হয় ট্রাম-গাড়ি চালাবার যন্ত্রে। ঐ ডাণ্ডাকে ইংরেজিতে বলা হয় ট্রলী। এখানকার ট্রামের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টাররা অবশ্য ওর নাম দিয়েছে টালী। ট্রলী কোন কারণে ওপরের তার থেকে খুলে গেলে ট্রামগাড়ি অচল হয়ে যায়।



ইতিহাসের কথা

ইয়োরোপে মধ্যযুগ

ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগকে ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' বা 'ডার্ক্ এজ্'। এর কারণ হ'ল, এ সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। ইতিহাস জানা যায় ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে, সমসাময়িক লেখক বা সাহিত্যিকদের অথবা পর্যটকদের বিবরণী থেকে। কিন্তু গোটা মধ্যযুগে বোধ হয় এরকম দু'জনের বেশি ঐতিহাসিক খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এই দু'জন হলেন সেণ্ট অগাস্টাইন আর ইবন খালদুন। দু'জনেই আবার মূলত উত্তর আফ্রিকার লোক। সেণ্ট অগাস্টাইনের বই 'দেবতাদের নগর' থেকে আমরা পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যের একটি চিত্র পাই। ইবন খালদুন মধ্যযুগের শেষভাগে তাঁর বিখ্যাত বই 'বর্বরদের ইতিহাস' লেখেন। এতে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের ইতিহাস আমরা মোটেই পাই না, বর্বর বা বার্বার্রা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী। তবে বর্তমানে মধ্যযুগের ইয়োরোপের ইতিহাস নিয়ে বিস্তর গবেষণার ফলে আমরা আর এখন এ যুগ সম্বন্ধে ততটা অন্ধকারে নেই।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, পঞ্চম শতকের শেষভাগে (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে বর্বরদের আক্রমণে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনকেই আমরা মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ইতিহাসের আদিপর্ব বলে ধরে নিতে পারি।

বর্বর রাজাদের কথা

এখন, প্রশ্ন হ'ল, বর্বর বলতে কাদের বোঝানো হয়? বর্বর বলতে কিন্তু আমরা প্রস্তরযুগের পশুর ছাল-পরা পশুমানবকে বোঝাই না, বর্বর বলা হ'ত তাদেরকেই, রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে যাদের অবস্থান। সাধারণত গথ্, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক—এদেরকেই বর্বর বলা হ'ত। ফ্রান্স, জার্মেনি প্রভৃতি রাজ্য এদের অধীনে ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্যযুগের ইয়োরোপে ছোট ছোট বর্বর রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্করাই বেশি শক্তিশালী হিসেবে



রাজা ক্লভিসের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ

দেখা দেয়। ফ্রাঙ্কদের রাজা ক্লভিস শৌর্যেবীর্যে তখনকার যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি ৪৮১ সাল থেকে ৫১১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অস্ট্রোগথদের রাজা থিওডোরিকের প্রতিভা কিন্তু ক্লভিসকে ম্লান করে দেয়। থিওডোরিকের শাসনকালে (খৃঃ ৪৯৩-৫২৬) রোমান এবং বর্বরদের শাসনপদ্ধতির এক অপূর্ব সমন্বয় আমাদের চোখে পড়ে। থিওডোরিকের সাম্রাজ্য ছিল বর্তমানে আমরা যাকে জার্মেনি বলি সেখানে। থিওডোরিকের কৃতিত্বপূর্ণ রাজত্বের জন্য তাঁকে ইতিহাসে 'মহান্ থিওডোরিক' আখ্যা দেওয়া হয়।

বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্য

এদিকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরও একদল রোমান এবং গ্রীক কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের ধারাকে বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। এঁরা পূর্ব ইয়োরোপে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লকে কেন্দ্র করে রোমান সাম্রাজ্যের অনুকরণে বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাই একে ইতিহাসে 'পূর্ব রোম সাম্রাজ্য' এই আখ্যাও দেওয়া হয়। এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হলেন সম্রাট্ জাস্টিনিয়ান (খৃঃ ৫২৭-৫৬৫)।

সম্রাট্ জাস্টিনিয়ান যুদ্ধবিগ্রহের চাইতে 'রোম সাম্রাজ্য' পুনর্গঠনের কাজেই বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। বর্বররাও তখন নিজেদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল; ফলে জাস্টিনিয়ানকে তাদের সম্মুখীন হতে হয় নি। তবে তিনি পারস্যের সঙ্গে তু'বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ও আফ্রিকায়ও সৈন্যসামন্ত পাঠিয়েছিলেন।

জাস্টিনিয়ানের প্রসিদ্ধি মূলত সুশাসক হিসেবে, দিগ্বিজয়ী পুরুষ হিসেবে নয়। জাস্টিনিয়ানের পরে কিন্তু বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে বাইজ্যানটাইন সম্রাট্দের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পোপের অধিষ্ঠান ছিল ইতালিতে। বর্বররা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে পোপের আধিপত্যও বেড়ে যায় অনেক। তখন প্রশ্ন ওঠে খৃষ্টান ইয়োরোপের



সভাসদ্‌দের সঙ্গে জাস্টিনিয়ান

সম্রাট্ শার্লেমান

ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে শুধু ফ্রাঙ্ক কেন, সম্ভবত সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন শার্লেমান (৭৬৮-৮১৪)। মুঘল সম্রাট্ আকবরের মত সম্রাট্ শার্লেমানও অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তা হলে হবে কি, আকবরের মতই তিনি বিচক্ষণ, সুশাসক ও দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে তাঁকে 'মহান্ চার্ল্‌স্' বা চার্ল্‌স্ দি গ্রেট্ বলা হয়।

সর্বময় কর্তা কে? সম্রাট্ না ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপ? পোপ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেগরী বাইজ্যানটাইন সম্রাট্‌দের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রাখেন। এই সময় লম্বার্ডরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও ইতালি আক্রমণ করে। তারা বাইজ্যানটাইনদের র‍্যাভেনা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং প্রায় অর্ধেক ইতালি দখল করে নিয়ে দৃষ্টি দেয় রোমের দিকে। পোপ তৃতীয় গ্রেগরী বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে ফ্রাঙ্কদের কাছে সাহায্য চান। ফ্রাঙ্কদের রাজা পিপিন লম্বার্ডদের তাড়িয়ে দিয়ে লম্বার্ড-অধিকৃত ইতালির বাইজ্যানটাইন রাজ্যগুলি পোপকে দান করেন এবং পোপও পিপিনকে আশীর্বাদ করে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এইভাবে পোপ ফ্রাঙ্ক রাজাদের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে বাইজ্যানটাইন সম্রাটের প্রভাব থেকে মুক্ত হন।



সম্রাট্ শার্লেমান

সিংহাসনে বসেই শার্লেমান সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দু'টি—প্রথমত, বহিঃশত্রুদের বশীভূত করা, যাতে তারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে, আর দ্বিতীয়ত, যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের প্রসার সাধন। তাঁর আমলে খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এতে পোপ খুব খুশি হন। শার্লেমানকে জীবনে মোট চুয়ান্ন বার যুদ্ধ করতে হয়। তার মধ্যে লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে পাঁচ বার, স্যাক্‌সন, ফ্রিজিয়ান ও ডেন্‌দের বিরুদ্ধে আঠারো বার, স্লাভদের বিরুদ্ধে চার বার, গ্যাসকন্‌দের বিরুদ্ধে দু'বার, ইতালিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাঁচবার, বাইজ্যানটাইনদের বিরুদ্ধে দু'বার। এ ছাড়া আরও আঠারো বার। এইভাবে অনবরত যুদ্ধ করে করে শার্লেমান গোটা জার্মেনির অধীশ্বর হন।

৮০০ খৃষ্টাব্দে শার্লেমানের জীবনে আসে চূড়ান্ত সম্মান। পোপ তৃতীয় লিও খৃষ্টমাসের উৎসবমুখর দিনে রোম নগরীতে শার্লেমানের মাথায় পরিয়ে দেন সম্রাটের মুকুট এবং তাঁকে অভিহিত করেন ইতালির সম্রাট্ বলে। আসলে কিন্তু ইতালি এ-যাবৎ বাইজ্যানটাইন সম্রাট্‌দের



পোপ তৃতীয় লিও শার্লেমানের মাথায় পরিয়ে দেন সম্রাটের মুকুট।

অধীনে ছিল ; কিন্তু বাইজ্যানটাইনদের অক্ষমতায় পোপ তিক্তবিরক্ত হয়ে ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লেমানকেই ইতালির সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করলেন। এই অভিষেক কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খৃষ্টান-জগতের ধর্মীয় প্রধান পোপ খৃষ্টান সাম্রাজ্যের প্রধানকে মনোনয়নের মাধ্যমে নিজেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না—মধ্যযুগের ইয়োরোপের ইতিহাস পোপ ও সম্রাটের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে শার্লেমানের এই ঐতিহাসিক অভিষেক যেমন তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা, তেমনি পোপেরও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

কিন্তু শার্লেমান ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান্‌ সম্রাট্‌। তিনি শাসনকার্যে পোপকে হস্তক্ষেপ করতে দেন নি। বরং, বলা যায়, পোপকেই তিনি সব সময় তাঁর ওপর নির্ভরশীল করে রেখেছিলেন। সুশাসক হিসেবে শার্লেমানের নাম ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে।

শার্লেমানের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ভার্ড্যনের ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে শার্লেমানের সাম্রাজ্য টুক্‌রো টুক্‌রো—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে বহিঃশত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মেনির ওপর।

মধ্যযুগের আরও দু'টি শক্তি

মধ্যযুগের ইতিহাস পড়তে গেলে খৃষ্টান ছাড়াও আর দু'টি শক্তির কথা আমাদের জানতে হবে। এদের মধ্যে একটি হ'ল মুসলমান শক্তি, অপরটি কোন বিশেষ ধর্মের শক্তি নয়, এদের বলা হয় জলদস্যু। অষ্টম শতাব্দী থেকে এদের অভ্যুত্থান ঘটে ইয়োরোপে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যেও আবার তখন অনেক জলদস্যু ছিল। তবে তাদের ওপর ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছিল খুবই কম। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল লুঠতরাজ এবং সুবিধামত উপনিবেশ স্থাপন। মুসলমানেরা কিন্তু মহম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচারেই বেশি উৎসাহী ছিল। তারা ইতিমধ্যেই আফ্রিকার বেশ কিছু অঞ্চল অধিকার করে নিয়ে নজর দেয় খৃষ্টান ইয়োরোপের দিকে। ৮৩১ সালে তারা দখল করে নেয় প্যালারমো। এর পর বার বার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতালির ওপর। সিসিলিও চলে যায় মুসলমানদের অধিকারে।

জলদস্যুদের অত্যাচার

অন্যদিকে জলদস্যুরা সমস্ত ইয়োরোপে সৃষ্টি করে চলেছিল এক প্রচণ্ড বিভীষিকা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আয়ারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্‌, ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে সুদূর গ্রীনল্যাণ্ড এবং আমেরিকা পর্যন্ত ছিল তাদের অবাধ গতিবিধি। পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়াও তাদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। পূর্বদিকে জলদস্যুরা কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া থেকে আরম্ভ করে যে যে দেশে জলদস্যুদের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। কিন্তু জার্মেনি আর ইতালি সৌভাগ্যবশত জলদস্যুদের শ্যেনদৃষ্টির আওতায় পড়ে নি। দশম শতকের শেষভা গ

জলদস্যুদের সম্রাট্ ভ্লাদিমির সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এর পর থেকে জলদস্যুদের ত্রাস অনেকটা কমে যায়।

সম্রাট্ অটো

খৃষ্টান ইয়োরোপে যখন মুসলমানেরা মূর্তিমান্ বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল ঠিক সেই সময়ে জার্মেনির সিংহাসনে আসেন এক শক্ত সমর্থ মানুষ—সম্রাট্ অটো (৯৩৬-৯৭৩)। তাঁর প্রথম লক্ষ্য হ'ল খণ্ডবিখণ্ড জার্মেনিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এ কাজে তিনি সফলতা লাভ করেন। এর পর অটো নজর দেন ইতালির দিকে। লক্ষ্য ইতালির সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হওয়া। ৯৬২ সালে পোপ দ্বাদশ জন্ অটোকে ইতালির সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন। এর পর অটো মুসলমান-দের ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ইতালিকে রক্ষা করলেন। অটোর বংশধরদের মধ্যে তৃতীয় অটো (৯৮৩-১০০২) খুবই শক্তিশালী সম্রাট্ ছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হ'ল, তিনি পোপের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেন। তৃতীয় অটোর উত্তরাধিকারীরা খুবই দুর্বল ছিলেন এবং এই দুর্বলতার সুযোগে পোপই খৃষ্টান জগতের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন। তিনিই খেয়াল খুশিমত সম্রাট্ সৃষ্টি করতে লাগলেন। পোপদের মধ্যে যাঁরা সে যুগের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে সপ্তম গ্রেগরী (১০৭৩-৮৫) ও তৃতীয় ইনোসেন্টের (১১৯৮-১২১৬) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।



তৃতীয় অটো

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে যে সম্রাট্‌রা জার্মেনি ও ইতালি শাসন করেন তাঁদের মধ্যে ফ্রেডারিক বারবারোসা (১১২৩-১১৯০), ষষ্ঠ হেনরী (১১৬৫-১১৯৭) ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (১১৯৪-১২৫০) নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ফ্রেডারিক বারবারোসার লালচে দাড়ির জন্যই তাঁকে বারবারোসা বলা হয়। এই তিনজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সব চাইতে প্রতিভাবান্ ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তোমরা এদেশের মহম্মদ বিন্ তুঘলক্‌কে পাগলা রাজা বলে



পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট

জান। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন ইয়োরোপের মহম্মদ বিন্ তুঘলক্। আসলে কিন্তু দু'জনের কেউই পাগলা রাজা ছিলেন না। এঁরা দর্শনে, বিজ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। কূটনীতির কষ্টিপাথরে তাই এঁদের প্রতিভার যাচাই হয় না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে।

তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। একবার তিনি মানুষের আদি এবং অকৃত্রিম ভাষা জানবার জন্য ক্ষেপে ওঠেন। সম্রাটের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে সূতিকাগার থেকে সবেমাত্র জন্মানো শিশুদের নিয়ে জমা করা হ'ল একটি বিরাট ঘরে, যেখানে থাকতে পারবে না আর কেউ। সম্রাট্ রোজ আসতেন তাদের মুখের প্রথম ভাষা শোনার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সব ক'টি শিশুই যত্নের অভাবে অকালে প্রাণ হারায়। এই পাগলামিই কিন্তু ফ্রেডারিকের একমাত্র পরিচয় নয়। মধ্যযুগের ইয়োরোপে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অ্যারিষ্টটলের তর্ক-বিজ্ঞানে খুঁত ধরেছিলেন।

সমসাময়িক ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, এই দুই দেশের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। স্যাক্সন্ ও নর্ম্যান্দের মধ্যেও আবার অন্তর্বিরোধ ছিল। ফ্রান্সের সিংহাসনে তখন ক্যাপেসিয়ান রাজবংশ। তাঁদের সুশাসনে ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল শ্রী, সমৃদ্ধি আর এক নবজাগরণ। এই রাজাদের মধ্যে ফিলিপ অগাস্টাসের (১১৮০-১২২৩) নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।



দ্বিতীয় ফ্রেডারিক

ক্রুসেডের কথা

রাজারাজড়াদের কাহিনী ছেড়ে এবার তাকানো যাক ইয়োরোপের সাধারণ পরিস্থিতির দিকে। আগেই বলেছি মুসলমানেরা ইতিমধ্যেই প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল খৃষ্টান ইয়োরোপের দিকে। এরা ইতিমধ্যেই সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দখল করে নেয়। ক্রমবর্ধমান মুসলমান শক্তির ধর্মীয় অভিযানের বিরুদ্ধে খৃষ্টান জগতে প্রথম বিষোদ্‌গার করেন পোপ দ্বিতীয় আরবান্। তিনি খৃষ্টানদের আহ্বান জানান ধর্মতীর্থ জেরুজালেম পুনরুদ্ধার-কাজে এগিয়ে আসতে। এদিকে স্যারাসেন ও তুর্কীরাও যুদ্ধোন্মাদ হয়ে এগিয়ে চলে একটার পর একটা রাজ্য গ্রাস করতে করতে। এইবার পোপের আহ্বানে খৃষ্টানরাও রুখে দাঁড়াল তাদের বিরুদ্ধে। বেজে উঠল রণদামামা। শুরু হ'ল প্রলয়ংকর যুদ্ধ, ইতিহাসে যা ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড নামে পরিচিত।

তোমরা, যারা স্যর ওয়াল্টর স্কট-এর আইভ্যান্ হো কিংবা কুলদারঞ্জন রায়ের অনূদিত রবিন হুড পড়েছ, তারা ক্রুসেডের আর সিংহ-হৃদয় রিচার্ড-এর কথাও পড়েছ—যিনি ক্রুসেডে ইংল্যাণ্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফ্রেডারিক বারবারোসা, ষষ্ঠ হেনরী ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক—সকলেই ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খৃষ্টানদের। অপর পক্ষে প্রথম দিকে মুসলমানদের নেতা ছিলেন রণকুশলী সালাদিন। এই ধর্মযুদ্ধ চলেছিল শতাধিক বছর। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলেও এর তাৎপর্য ছিল অনেক। এই ক্রুসেড সংখ্যায় অনেকগুলি হলেও এদের প্রথম চারটিই উল্লেখযোগ্য।

ক্রুসেডের ফলে ইয়োরোপে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রসারলাভ ঘটে। এর ফলে বণিক্ বা ব্যবসায়ী শ্রেণী ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে। অপর দিকে রক্ষণশীল সামন্ত প্রভুরা যুদ্ধবিগ্রহে নিজেদের শক্তিক্ষয় করে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলে। এইভাবে ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে এবং তার স্থান নেয় ধনতন্ত্র। ক্রুসেডের একটি মস্ত বড় সুফল হ'ল পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়। খৃষ্টান ও মুসলমানের এই দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মযুদ্ধে একে অপরের সংস্পর্শে আসে নানাভাবে। এই ভাবে গড়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি ধীরে ধীরে কমে আসে, সৃষ্টি হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের নবজাগরণের পটভূমিকা। মনে রাখতে হবে, উদার—কুসংস্কারমুক্ত মনই ছিল এই নবজাগরণের ধারক ও বাহক।

অবশ্য পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণের আগে দ্বাদশ শতকেও ইয়োরোপ যুড়ে দেখা দিয়েছিল এক জাগরণ। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে এই যুগ রেখে গেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, যা সে যুগের দিক্ থেকে ভাবলে বিস্ময়কর মনে হবে। এ যুগের মনীষীদের মধ্যে পিটার আবেলার্ড, গ্রেসিয়ান, বার্নার্ড ও রোজার বেকনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রোজার বেকন ছিলেন বৈজ্ঞানিক। পিটার আবেলার্ড ছিলেন এক বিখ্যাত দার্শনিক।

এ সবই চলেছিল ক্রুসেড চলা-কালীন। তাই ইয়োরোপের নবজাগরণের কথা বলতে গিয়ে তার সঙ্গে ক্রুসেডের সম্পর্ক আলোচনা করলে তাকে একেবারেই অবান্তর ও অযৌক্তিক বলা চলে না।

হর্ষবর্ধন

ইয়োরোপ থেকে এবারে আমরা চোখ ফিরিয়ে আবার চলে আসছি নিজেদের দেশ ভারতের দিকে। বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে তোমরা গুপ্তযুগের ইতিহাস পর্যন্ত পড়েছ। গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরই ভারত-ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হ'ল, এ কথা বলা ঠিক নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে ক'জন সম্রাট বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হর্ষবর্ধন নিঃসন্দেহে অন্যতম। হর্ষবর্ধন হলেন পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন ৬০৫ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কনৌজের মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মণের। সেই সময়ে কনৌজ ও মালব রাজ্যের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে মিত্রতা করে কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যশ্রীও বন্দিনী হন। রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাস্ত করেন কিন্তু তিনি গৌড়ের রাজার কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এর পর থানেশ্বরের রাজা হন হর্ষবর্ধন (৬০৬ খৃঃ)। সুদীর্ঘ ৪১ বছর (৬০৬ খৃঃ-৬৪৭ খৃঃ) ধরে তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আজীবন বহু যুদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে তুষারবৃত হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে কাথিয়াড় থেকে পূর্বে কঙ্গোদ (গঞ্জাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশ্য তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষবর্ধনের প্রথম কাজ হ'ল ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেও কিন্তু তিনি গৌড় (বা বাংলার) রাজা শশাঙ্ককে কাবু করতে পারেন নি। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বহুযুদ্ধজয়ী হর্ষবর্ধনকে



হিউয়েন সাঙ

কিন্তু একাধিক বার পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়। দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ও বলভী-রাজ ধ্রুবসেনের কাছে হর্ষবর্ধনকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ ভারত পরিদর্শন করেন (৬৩০ খৃঃ-৬৪৪ খৃঃ)। তাঁর বিবরণে হর্ষবর্ধনের শাসন-পদ্ধতির কিছু পরিচয় মেলে। কেবল বীর যোদ্ধা হিসেবে নয়, সুশাসক হিসেবেও হর্ষবর্ধন প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। হর্ষবর্ধনের সাহিত্য-কৃতিত্বও ভুলবার নয়। 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' তাঁর লেখা অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বানভট্ট ছিলেন সম্রাটের সভাকবি। সে সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর খ্যাতি। হর্ষবর্ধন ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক

বাংলা দেশে গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক। ইনি গুপ্তবংশের শেষ রাজা মহাসেনগুপ্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাংলা দেশে এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। আগেই বলেছি যে ভাই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হর্ষবর্ধন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেন নি।

শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিংবদন্তী আছে যে বৌদ্ধদের ওপর তিনি নাকি অত্যাচার চালান। তবে তাঁর আমলেই গৌড় রাজ্য খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

কামরূপ রাজ্য ও উড়িষ্যা

কামরূপ রাজ্য বর্তমান আসাম, রংপুর ও কুচবিহার নিয়ে গঠিত ছিল। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কামরূপের উল্লেখ আছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্য হিসেবে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ কামরূপ রাজ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কামরূপের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের বন্ধু ভাস্কর-বর্মণ। তিনি ব্রাহ্মণ হলেও পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি খুব সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ দখল করে নেন। বাংলার পালযুগে কামরূপ রাজ্য পাল রাজাদের অধীনে আসে।

গুপ্তযুগে উড়িষ্যা গুপ্ত রাজাদের অধীনে ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উড়িষ্যায় দুই রাজপরিবারের উত্থান ঘটে—উত্তরাংশে 'মান' বংশ ও দক্ষিণাংশে 'শৈলোদ্ভব' বংশ। সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে সমস্ত উড়িষ্যাই গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন উড়িষ্যা দখল করে নেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর শৈলোদ্ভব বংশ এক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। এই বংশের রাজা সৈন্যভীত মাধবরাজ (দ্বিতীয়) অত্যন্ত প্রতাপ-শালী রাজা ছিলেন। শোনা যায় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও করেছিলেন। মাধবরাজের পর বিখ্যাত রাজা হলেন অনন্তবর্মণ (১০৭৬-১১৪৮)। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরটি এঁর আমলেই

নির্মিত হয়েছিল। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নরসিংহবর্মণের নাম (১২৩৮-৬৪)। এঁরই আদেশে কোণারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। পাথর কেটে রথের মত করে এই মন্দির নির্মাণ করা হয়। রথের চাকার গায়ে আছে অপূর্ব কারুকার্য যা দেখে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার কর্‌রাণী সুলতান উড়িষ্যা জয় করেন। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশে জগন্নাথ-মন্দির ও কোণারকের সূর্যমন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এই কালাপাহাড় নাকি আগে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু অবস্থাচক্রে তাঁকে বাধ্য হয়ে মুসলমান হতে হয়। মুসলমান হবার পর তিনি ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে পড়েন।

রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পল্লব, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য

এই সব রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সৃষ্টি সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অমোঘবর্ষ। আরব পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন রাজার একজন বলে বর্ণনা করেছেন। অমোঘবর্ষের পর রাষ্ট্রকূট রাজ্য চালুক্যদের অধীনস্থ হয়। রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রথম কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল।

চালুক্য জাতি নিজেদের রাজপুত জাতি বলে দাবী করলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এরা ছিল গুর্জর জাতিরই একটি শাখা। চালুক্যরা দাক্ষিণাত্যে বাতাপি ও কল্যাণী এই দুই অঞ্চলে পৃথক্ রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বিজাপুরে গড়ে-ওঠা বাতাপি রাজ্যই বেশি শক্তিশালী ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কীর্তিবর্মা। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। ইনি হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে হারিয়ে দেন ও দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনের অগ্রগতিতে বাধা দেন। হিউয়েন সাঙ্ দ্বিতীয় পুলকেশীকে দাক্ষিণাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। চালুক্যদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নির্মিত হয় সঙ্গমেশ্বরের মন্দির, বিরূপাক্ষ মন্দির প্রভৃতি। এগুলি অপূর্ব কারুকার্য-সমন্বিত স্থাপত্যশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই আমলেই অজন্তা ও এলিফ্যাণ্টার কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

পল্লব-ইতিহাস ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে জানা যায়। পল্লবরাজ সিংহবাহুর আমলে দাক্ষিণাত্যের বহু রাজ্য,—এমন কি সিংহল (এখন যার নাম শ্রীলঙ্কা) পর্যন্ত, পল্লব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পল্লব রাজাদের সঙ্গে চালুক্যদের দীর্ঘকাল ধরে সংঘর্ষ চলে। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মার রাজত্ব-কালে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ পল্লব-রাজধানী কাঞ্চী নগর পরিদর্শন করেন। কাঞ্চী ছিল সমসাময়িক কালের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ। পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বরের মন্দির, ঐরাবতেশ্বরের মন্দির এবং কৈলাস মন্দির বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

চোল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কারিকাল। সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিতে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শোনা যায় কারিকাল সিংহলও জয় করেন। তবে পরবর্তী কালে

চোল রাজ্য পল্লব রাজারা অধিকার করে নেন। কিন্তু দশম শতকের প্রথম ভাগে চোল রাজারা আবার স্বাধীন হন। চোলদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রাজেন্দ্র চোলদেব। চোল রাজ্যেই বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রামানুজের আবির্ভাব



রামানুজ

ঘটে। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের (শিব) মন্দির চোল স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে এবং একটি বিরাট পাথর বৃত্তাকারে কেটে বসানো হয়েছে। চোল শিল্পের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি।

পাণ্ড্য রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এই রাজ্য দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ছিল। ত্রয়োদশ শতকে এরা দাক্ষিণাত্যের এক প্রতিপত্তিশালী রাজ্য হিসেবে দেখা দেয়। পাণ্ড্যরাজ্যের বাণিজ্যবন্দর কায়ল সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল।

পাল ও সেন বংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা দেশে দু'টি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। একটি বঙ্গ ও অপরটি গৌড়। পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গ রাজ্য। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে গৌড়। গৌড়ের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বঙ্গ রাজ্যর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপচন্দ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ।

গৌড়ের পরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের সর্বত্র দেখা দেয় এক সাংঘাতিক অরাজকতা, যাকে ঐতিহাসিকেরা বলেন 'মাৎস্য ন্যায়'। অর্থাৎ ঠিক বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে ফেলে ঠিক তেমনি যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল ব্যাপক হারে। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই মহা দুর্দিনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গোপাল নামে জনৈক স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করেন। এইভাবেই বাংলা দেশে স্থাপিত হয় পাল সাম্রাজ্য। পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্মপালের সাম্রাজ্য উত্তরে বঙ্গোপসাগর থেকে জলন্ধর, দিল্লী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল বাংলা দেশকে এনে দিয়েছিলেন

সাম্রাজ্যর মর্যাদা। তিনি পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই আদেশে মগধে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিহার নির্মিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃঃ) পিতার মতই পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। দেবপালের পর নাম করতে হয় প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খৃঃ)। এর পরেই কিন্তু পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন (১০৯৬-১১৫৮ খৃঃ) বাংলা দেশ (গৌড়) দখল করে নেন ও সেন রাজবংশের পত্তন করেন।

সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ)। তাঁর রাজ্য বাংলা ও উত্তর বিহার নিয়ে গঠিত ছিল। বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নতুন ভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথার সূচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খৃঃ)। ইনি ছিলেন বৈষ্ণব। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি জয়দেব এঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। এঁরই রাজত্বকালে কুতবউদ্দীনের সেনাপতি মহম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার খল্‌জী এক আকস্মিক আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনকে পরাস্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন তখন খুব বৃদ্ধ। তিনি রাজধানী ত্যাগ করে এসে আশ্রয় নেন পূর্ববঙ্গে এবং সেখানেই স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

রাজপুত জাতির কথা

রাজপুত জাতি সূর্যবংশীয় না চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এই নিয়ে মতবিরোধ আছে। তাঁদের আদি পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়েছিল। এরা ছিল প্রকৃতই বীরের জাত। তবে শক, কুষাণ প্রভৃতির মত এরাও হিন্দু সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। উল্লেখযোগ্য শাখাগুলি হ'ল—চৌহান, পরমার, তোমর, চান্দেল্ল, গুর্জর-প্রতিহার ইত্যাদি। এই বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ লেগেই ছিল। এই অন্তর্বিরোধই দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে দুর্বল করে ফেলেছিল—যার সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা বার বার ভারতবর্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও অবশেষে এখানে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছিল।

ভারতে মুসলমান আক্রমণ

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের (৫৭০-৬৩২ খৃঃ) মৃত্যুর পর মুসলমানরা এক হাতে তলোয়ার, আর এক হাতে কোরাণ নিয়ে ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার এক বৃহৎ অংশে চালায় দুর্নিবার অভিযান। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের দিকে মুসলমানদের সর্বপ্রথম নজর পড়ে দশম শতকে। এর আগেই অবশ্য আরবরা সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুদেশ অধিকার করে নেয়। তবে সামগ্রিক ভাবে এর গুরুত্ব তেমন ছিল না।

দশম শতকে গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন রাজপুত রাজা জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধনসম্পদ্ লুঠ করেন। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ সুলতান



সুলতান মামুদ

হন। ঐতিহাসিক স্যর হেনরী এলিয়টের মতে ইনি মোট ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১০২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান মামুদ বার বার ভারতবর্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও মুলতান, কাংড়া দুর্গ, থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, সোমনাথের মন্দির প্রভৃতি লুঠ করে প্রভূত ধনসম্পদ্ গজনীতে নিয়ে যান। তিনি অবশ্য ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসুক ছিলেন না। সুলতান মামুদের রাজসভা শাহ্‌নামা রচয়িতা ফির্‌দৌসী, ঐতিহাসিক উৎবী, দার্শনিক ফারাবী, কবি আনসারি এবং তখনকার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী অল্‌বিরুণী কর্তৃক অলংকৃত ছিল। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল তোমরা যেন মনে না কর যে সুলতান মামুদ কেবল একটা বর্বর দস্যুই ছিলেন—যাঁর পেশা হ'ল লুণ্ঠন। নিষ্ঠুরতা ও দস্যুতার জন্য ভারতের ইতিহাসে তাঁর কুখ্যাতি অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু গুণীর আদরও ছিল তাঁর কাছে। তা ছাড়া এত ঐশ্বর্য আহরণ করা সত্ত্বেও শেষ জীবনে তিনি মোটেই শান্তি পান নি।

সুলতান মামুদের পর যে মুসলমান সুলতানের নাম করতে হয়, তিনি হলেন ঘুর বংশের মহম্মদ ঘুরী। ভারতবিজয় ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ১১৭৫ সালে তিনি মুলতান জয় করেন, কিন্তু গুজরাটের রাজা ভীমের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয় তাঁকে। মহম্মদ ঘুরী এর পর পেশোয়ার ও লাহোর অধিকার করে চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হন। তরাইনের প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ



মহম্মদ ঘুরী

হয়। মহম্মদ ঘুরী এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন (১১৯১ খৃঃ)। কিন্তু পরের বছরই তিনি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করেন। হিন্দুদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। গল্প আছে, যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দু শিবিরে বহু উনুন জ্বলতে দেখে মহম্মদ ঘুরী অবাক্ হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তাঁর অনুচরদের। তিনি যখন জানতে পারলেন যে হিন্দুদের মধ্যে এক জাত আর এক জাতের ছোঁয়া খাবার গ্রহণ করে না তখন তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন, এর পর ভারতবর্ষ দখল করা কঠিন হবে না।

পৃথ্বীরাজ অনেক হিন্দু রাজার সহায়তা লাভ করলেও কনৌজের রাজা জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি, উল্টে ঘুরীকেই সাহায্যে করেছিলেন। কথিত আছে পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের অমতে তাঁর কন্যা সংযুক্তাকে স্বয়ম্বর-সভা থেকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। জয়চাঁদ ঐ ভাবে তার প্রতিশোধ নিলেন, কিন্তু ইতিহাসে চিরকালের জন্য দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

সিংহাসনে দাস বংশ

মহম্মদ ঘুরী ভারত-অভিযান শেষ করে তাঁর বিজিত রাজ্যগুলি শাসনের ভার কুতবউদ্দীন নামে জনৈক ক্রীতদাসের ওপর দিয়ে ঘুর রাজ্যে ফিরে যান। কুতবউদ্দীন আইবক মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর সুলতান উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২০৬ খৃঃ)। ক্রীতদাস থেকে রাজা—তাই ইতিহাসে তাঁর বংশকে দাসবংশ বা 'স্লেভ ডায়নাস্টি' বলা হয়।

কুতবউদ্দীনের অনুচর ইখ্ তিয়ার-উদ্দীন-বিন্-বখ্ তিয়ার খল্জী পশ্চিম বাংলা ও বিহার দখল করে নেন। কুতবউদ্দীন কুশলী যোদ্ধা ও উদারচেতা সুলতান ছিলেন। ইনি ১২১০ সালে পোলো খেলবার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান।

কুতবউদ্দীনের পর তাঁর অপদার্থ পোষ্যপুত্র আরাম শাহ্ সিংহাসনে বসেন; কিন্তু কুতব-উদ্দীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সুদর্শন ইলতুৎমিস তাঁকে গদীচ্যুত করে দিল্লীর সুলতান হন। ইলতুৎমিস অভিজাত ইল্‌বেরী তুর্কী বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ভাইদের চক্রান্তে তাঁকে ক্রীতদাস হতে হয়। ইলতুৎমিস নিজের যোগ্যতা-বলে কুতবউদ্দীনের বিশ্বাসভাজন হন ও সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করেন।

ইলতুৎমিস সিংহাসনে বসেই সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দেন। সিন্ধুদেশের বিদ্রোহী নায়ক নাসিরউদ্দীন কুবাচাকে তিনি পরাস্ত করেন। গজনীর উচ্চাভিলাষী সুলতান তাজউদ্দীন

ইল্‌দিজ্‌ দিল্লীর সিংহাসন দখলের চেষ্টা করলে তিনি তাঁকেও পরাজিত ও বন্দী করেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষে দেখা দেয় এক মহাসঙ্কট। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ পশ্চিম এশিয়ার খারিজম্‌ রাজ্যের শাহ্‌ জালালউদ্দীনকে তাড়া করে এসে হাজির হন ভারতবর্ষের দরজায়। জালালউদ্দীন ইলতুৎমিসের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলে ইলতুৎমিস চেঙ্গিসের ভয়ে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। ফলে জালাল-উদ্দীন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যান আর পেছনে শিকারী কুকুরের মত তাঁকে তাড়া করে চলেন চেঙ্গিস খাঁ।

এর পর ইলতুৎমিস বাংলার বিদ্রোহী সুলতান আলীমর্দান খল্‌জীকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন। ইলতুৎমিস তাঁর কৃতিত্বের জন্য মুসলমান-জগতের সর্বোচ্চ শাসক বাগ্‌দাদের খলিফার কাছ থেকে সুলতান-ই-আজম উপাধি লাভ করেন। ইলতুৎমিসেরই পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনার ধর্মজ্ঞানী খাজা কুতবউদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল।

ইলতুৎমিসের পর দাসবংশের সুলতানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০) ও গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭)।

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিসের সুযোগ্যা কন্যা। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর কেবলমাত্র একটি অপরাধ ছিল ; তা হ'ল তিনি ছিলেন নারী এবং পুরুষ ওমরাহ্‌দের ঈর্ষার পাত্র। এ সম্পর্কে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। তিনি পুরুষের পোশাকে দরবারে আসতেন ও ঘোড়ায় চড়তেন। চক্রান্তকারী আমীর-ওমরাহ্‌গণ তাঁর এক ভাই মুইজউদ্দীন বাহ্‌রামকে দিল্লীর সিংহাসনে বসালেন এমন সময় যখন সুলতানা রাজিয়া বিদ্রোহী আলতুনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। রাজিয়া চক্রান্তের খবর পেয়ে আলতুনিয়াকে বিয়ে করেন ও তাঁর সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারান।

গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন ইলতুৎমিসের চল্লিশজন প্রধান ক্রীতদাসের অন্যতম। তিনি দিল্লীর সুলতান নাসিরউদ্দীনের মন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন ও ১২৬৬ সালে দিল্লীর মসনদে বসেন। বলবনের দীর্ঘ রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ বার বার ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলবনের কৃতিত্ব হ'ল প্রত্যেক বারই তিনি মোঙ্গল আক্রমণ দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করেন। তাঁর সামরিক সংগঠন-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ ; তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, শাসনকার্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদ করতেন না।

দাস বংশের পতন ঃ খল্‌জী ও তুঘলক্‌ বংশ

বলবনের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে দাস বংশের পতন ঘটে। ১২৯০ সালে জালালউদ্দীন ফিরুজ খল্‌জী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং খল্‌জী বংশের গোড়াপত্তন করেন। ১২৯৬ সালে জালালউদ্দীনকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন নিজেকে দিল্লীর সুলতান বলে ঘোষণা করেন।

আলাউদ্দীন নৃশংস ও লোভী হলেও তিনি নিঃসন্দেহে খল্‌জী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ভাগে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু

সেনাপতি জাফর খাঁর হাতে পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করে। আলাউদ্দীন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করান।

আলাউদ্দীন গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি নিজেকে দ্বিতীয় সেকেন্দার বলেও অভিহিত করতেন। তিনি একে একে গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার, চান্দেরী, বরঙ্গল, হোয়সল রাজ্য ও মাদুরা জয় করেন। পাণ্ডুরাজ্য জয় করে তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিংবদন্তী আছে, চিতোরের রাণী পদ্মিনীর অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দীন তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত দেখে পদ্মিনী সহ রাজপুত নারীরা চিতা জ্বালিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। অবশ্য এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

শুধু দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষই ন'ন, আলাউদ্দীন শাসনকার্যেও দেখিয়েছেন অদ্ভুত দক্ষতা। তিনি মুসলমান কাজী বা উলেমাদের প্রভাবাধীন ছিলেন না। কবি ও পণ্ডিতদের প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ১৩১৬ সালে আলাউদ্দীন খল্‌জীর মৃত্যু হয়।

১৩২০ সালে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক্ দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। তুঘলক্ বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান হলেন মহম্মদ বিন্ তুঘলক্ (১৩২৫-১৩৫১ খৃঃ)। তিনি পাগলা রাজা বলে পরিচিত হলেও আসল ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। কেউ কেউ তাঁকে উন্মাদ ও রক্তপিপাসু বলে বর্ণনা করলেও বর্তমান ঐতিহাসিকেরা তাঁকে ভুল বোঝেন নি। মহম্মদ তুঘলকের মধ্যে অনেক বিপরীত গুণের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তাঁর চরিত্রের প্রধান ত্রুটি হ'ল ধৈর্যহীনতা। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত, চরিত্রবান্ ও প্রতিভাবান্ সুলতান সমস্ত মধ্যযুগে সন্ধান করলে আর একটিও পাওয়া যাবে না। দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানীর স্থানান্তর, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা, কারাজল অভিযান ও তামার নোট প্রচলন—এ সবেরই পেছনে ছিল মহৎ উদ্দেশ্য ও দূরদর্শিতা, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধির অভাবে এ সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এঁর আমলেই আফ্রিকার পর্যটক ইব্‌ন্-বতুতা ভারতভ্রমণে আসেন। তাঁর বই থেকে মহম্মদ তুঘলক্ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। মহম্মদের পর সিংহাসনে বসেন ফিরুজ শাহ্ তুঘলক্ (১৩৫১-৮৮ খৃঃ)। ইনি স্বধর্মানুরাগী ও সুশাসক ছিলেন, তবে নিজে সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন বলে হিন্দু ও শিয়াদের ওপর অনেক অত্যাচারও চালান।

১৩৯৮ সালে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা রক্ত-পিপাসু তৈমুর লঙ্ ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ও ব্যাপক হত্যা, লুঠ-তরাজ চালিয়ে দিল্লীকে প্রায় শ্মশানভূমি করে তোলেন। তৈমুরের প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষতবিক্ষত ধ্বংস-প্রায় দিল্লী সাম্রাজ্যের গদীতে বসেন সৈয়দ (১৪১৪-৫১ খৃঃ) ও পরে লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)।

ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস মোগল যুগের ইতিহাস। এর কথা পরবর্তী খণ্ডে বলব।



বাংলা সাহিত্যের কথা

বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ—বাংলা দেশে হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকাল। এ সময়ে চৈতন্য দেবের জ্যোতির্ময় জীবন সমাজে ও সাহিত্যে এক অপূর্ব চেতনার আলো জ্বেলে দিল। জীর্ণ সংস্কার আর অন্ধ গোঁড়ামির মোহ ভেদ করে বেজে উঠল শ্রীচৈতন্যের দিব্য বাণী—'হরিভক্তি-পরায়ণ হ'লে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।' সাহিত্যে, সঙ্গীতে প্রকাশিত হতে লাগল দেবতার স্তুতি-গানের বদলে মানুষের জয়গান।

এত দিন বাংলা সাহিত্যের সীমানা ছিল বিশেষ করে অনুবাদ-কাব্য আর মঙ্গলকাব্য নিয়ে। এইবার দেখা দিল এক নতুন দিগন্ত। শুরু হ'ল জীবনীকাব্যের ধারা—শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন নিয়েই যার আরম্ভ।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব

সমস্ত বাংলা তথা ভারতের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি শুধু আমাদের শ্রদ্ধার জন ন'ন, ভালবাসার ধনও। ছেলেবেলার নাম ছিল তাঁর বিশ্বম্ভর, আদরের নাম নিমাই। দীক্ষাগ্রহণের পর নাম হ'ল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার এক পবিত্র সন্ধ্যায় নবদ্বীপে তাঁর আবির্ভাব জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। মা শচীদেবী তাঁকে বুকে ধরে আনন্দে আত্মহারা হলেন। চঞ্চলতা-চপলতা-মেশানো হাসিখেলায় কেটে গেল শৈশবকাল। তারপর এল বিদ্যাচর্চার সময়। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী নিমাই অধ্যয়ন শেষ করে অধ্যাপনা শুরু করলেন। খ্যাতিও লাভ করলেন পণ্ডিত হিসেবে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দিতে গিয়েই নিমাই-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন এল। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁর হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হ'ল। ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ভাবান্তরিত হয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কোনো কাজে আর মন সেই—শুধু শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ আর অশ্রু বিসর্জন। চব্বিশ বছর বয়সে এক গভীর রাতে নিদ্রিতা মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে তিনি চলে যান কাটোয়ায় এবং সেখানে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর দিব্যভাবের অনুপম মূর্তিতে সমগ্র ভারতকে নামপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত করে, বহু দাম্ভিক পণ্ডিত ও উদ্ধত নৃপতিকে বিনত ভক্তে রূপান্তরিত করে ৪৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।



অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত

মহাপ্রভুকে নিয়ে লেখা কাব্য

এতকাল ধরে বাংলা সাহিত্য যে ভাবে রচিত হয়ে আসছিল এইবার তাতে এল এক বিরাট পরিবর্তন। দেবদেবীর চরিত্রে যে-সব গুণ আমরা কল্পনা করতে পারি তা সবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠেছিল মহাপ্রভুর জীবনে ও চরিত্রে, চিন্তায় ও আচরণে। তাই তিনি হলেন কবিদের কাছে কাব্যপ্রেরণার উৎস। অজানা, অদেখা দেবদেবীদের চেয়ে এই প্রত্যক্ষ দেবোপম মানুষকে তাঁরা অনেক বেশি মহৎ ও সুন্দর বলে উপলব্ধি করলেন আর তাই বহু কাব্য রচিত হতে লাগল তাঁর জীবন অবলম্বন করে। সর্বপ্রথমে রচিত যে-সব জীবনী-কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়। তারপর বাংলা ভাষায় যে-সব চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় বৃন্দাবনদাসের লেখা 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

বৃন্দাবনদাসের মায়ের নাম নারায়ণী। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বৃন্দাবন দাস অল্প বয়সেই নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য হন এবং তাঁরই প্রেরণায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনায় অগ্রসর হন। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার সমতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর জীবনীগ্রন্থের নামও দিয়েছেন চৈতন্যভাগবত। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। সে জন্যেই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে কবি নানা অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ সব ঘটনাকে কাল্পনিক বলে যদি বর্জন করাও যায়, তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে সে যুগের পশ্চিম বাংলার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা রয়েছে। বইখানি ঐতিহাসিকদের কাছে যেমন মূল্যবান্, তেমনি ভক্ত-ভাবুকদের কাছেও অতি শ্রদ্ধা ও আদরের।

চৈতন্যভাগবতের ভাষা সহজ, সরল, অথচ তারই মধ্যে অপূর্ব কবিত্বের লাবণ্য ফুটে উঠেছে। একটু পরিচয় দেওয়া যাক—

"প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥

ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥"

এই গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল চৈতন্যমঙ্গল, পরে তা পরিবর্তন করে রাখা হয় চৈতন্যভাগবত।

লোচনদাস ও জয়ানন্দ

লোচনদাস এবং জয়ানন্দ—দু'জনেই চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বন করে দু'খানা কাব্য রচনা করেন। তাঁদের জীবনী-কাব্যের নামও একই—'চৈতন্যমঙ্গল'। দু'খানা কাব্যই গান গাওয়ার জন্য রচনা করা হয়েছিল, তাই তাতে রাগ-রাগিনীর নামও লিখে দেওয়া হয়েছে। ভাষার সৌন্দর্য ও কবিত্বের মাধুর্য লোচনদাসের কাব্যে অনেক বেশি, আর সেজন্যই এ গ্রন্থ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং বৈষ্ণব-সমাজেও সমাদর পেয়েছিল। তবে জীবনী-কাব্যের চাইতে মঙ্গলকাব্যের উপাদানই এ গ্রন্থে বেশি। লোচনদাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর দাস ও মাতার নাম সদানন্দী। লোচনদাস উচ্চশিক্ষিত না হলেও কবিত্বশক্তিতে উচ্চস্থান অধিকার করতে পেরেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পদাবলী রচনা করে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন লোচনদাস তাঁদেরই একজন। চৈতন্যমঙ্গল থেকে তাঁর রচনার একটু পরিচয় দিচ্ছি—

"কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের
হলদি বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল
পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥"

জয়ানন্দের কাব্য লোচনদাসের কাব্যের তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। তাই এটি তত জনপ্রিয় হতে পারে নি। জয়ানন্দও বর্ধমান জেলার লোক। গ্রাম আমাইপুরা। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রচলিত মত থেকে ভিন্ন; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে অনেকেই এই গ্রন্থটিকে ততটা প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন নি।

গোবিন্দদাসের কড়চা

'গোবিন্দদাসের কড়চা' গ্রন্থখানিও চৈতন্যজীবনের উপাদান হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ডায়েরী বা রোজনামচার ধরনে সে-যুগে কিছু লেখা হলেই তাকে বলা হ'ত কড়চা। চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধেও সংস্কৃত ও বাংলায় কিছু কিছু কড়চা লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় গোবিন্দদাসের কড়চা তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাস কর্মকার বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন। ইনি গৃহত্যাগ করে চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং দু'বছর ধরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে মহাপ্রভুর জীবনের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই কড়চা গ্রন্থে সেই সব ঘটনাই তিনি প্রকাশ করেছেন। বইখানির ভাষা সরল এবং সুন্দর, তা ছাড়া এতে চৈতন্যজীবনের এমন অনেক ঘটনার বিবরণ আছে যা অন্য কোনও জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তবে এই বইখানি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন এই

বইটি চৈতন্য-জীবনীর পক্ষে একটি অমূল্য উপাদান। আবার কেউ কেউ মনে করেন বইখানা সম্পূর্ণ জাল এবং পরবর্তী কালের এই রচনাকে গোবিন্দদাসের নামে চালানো হয়েছে। গ্রন্থের রচয়িতা এই গোবিন্দদাস যে কে তা নিয়েও মতভেদ আছে। ভাষার নমুনা—

"নারীগণ বলে নাপিত এ কাজ কোরো না।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না ॥"

কোনও কোনও সমালোচক দু' রকম মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, বইখানি মূলত জাল নয়, তবে এতে ভেজাল মেশানো থাকতে পারে।

চৈতন্যচরিতামৃত

বিভিন্ন চৈতন্য-জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রামাণিক গ্রন্থ হচ্ছে 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। শুধু শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্যই নয়, বিভিন্ন দিক্ থেকে বিচার করলে একে আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাও বলা যেতে পারে। রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই কাব্যের মাধ্যমে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্য-ভাগবতের মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে প্রধানত মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের চরিতকথাই বর্ণনা করেছেন, কারণ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে তা লেখা হয় নি। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যজীবনের যে-সব অংশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে-সব ঘটনা অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এইভাবেই সামগ্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যাবিচারও এতে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই ভক্ত বা দার্শনিক, পণ্ডিত বা সাহিত্যিক—সকলের কাছেই 'চৈতন্য-চরিতামৃত' সমানভাবে আদৃত।

বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ ও মাতার নাম সুনন্দা। কবি একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করেন এবং তাঁর আদেশে বৃন্দাবনে এসে বাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কালক্রমে তিনি বৈষ্ণব পণ্ডিত রূপে খ্যাতিলাভ করেন। জানা যায় বৈষ্ণব-ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং বহু দিনের পরিশ্রমে তা সমাপ্ত করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, তবে মোটামুটি বলা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কোনও সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই বইএর ভাষার একটু পরিচয় দিই—

"আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতই একমাত্র গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় যার টীকা রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর পক্ষে এ ঘটনা খুবই গৌরবজনক।

কয়েকটি বৈষ্ণবগ্রন্থে চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে একটি বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত আছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে কিছু হাতে-লেখা পুঁথি গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। তার মধ্যে নাকি কবিরাজ গোস্বামীর লেখা চৈতন্যচরিতামৃতের পাণ্ডুলিপিও ছিল। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুরা ধনরত্ন মনে করে ঐ পুঁথি-ভরা সিন্ধুকটি লুট করে নেয়। তখন শ্রীনিবাস আচার্য স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁর সৌম্য মূর্তি ও তাঁর মুখে ভাগবৎকথা শুনে রাজা হাম্বীর মুগ্ধ হন ও তাঁর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। ইতিমধ্যে সিন্ধুক লুটের খবর বৃন্দাবনে এসে পৌঁছলে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শোকে মূর্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে আরো কিছু কিছু কাব্য রচিত হয়েছিল এবং তার অনুকরণে অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর স্ত্রী সীতাদেবীর জীবন নিয়েও কাব্য রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে শ্যামদাস আচার্যের অদ্বৈতমঙ্গল, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেব ও পদাবলী কাব্য

মধ্যযুগের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অবদান পদাবলী-সাহিত্য। যদিও চৈতন্যদেবের পূর্বেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সুললিত পদাবলীতে ভক্তির প্রথম অর্ঘ্য রচনা করেছিলেন, তবু তাঁদের আরাধ্য রাধাকৃষ্ণ ছিলেন সম্পূর্ণই কল্পলোকবিহারী সুদূরের দেবতা, যাকে শুধু অনুভবের ভাষাতেই রূপ দেওয়া যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবনে সে যুগের ভক্ত-ভাবুকেরা শাস্ত্রে-লেখা বৃন্দাবন-লীলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ রাধার ভাব-কান্তি নিয়েই তো শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গদেহ ধারণ, তাই তাঁর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সমস্ত মিলিত মহিমাই একে একে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই দেখা যায়, এ যুগের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু কবি তাঁদের অন্তরের ভক্তি দিয়ে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মুক্তামালা গেঁথেছেন, আর সে মালা রাধাকৃষ্ণকে বন্দনার ছলে মহাপ্রভুর গলায়ই পরিয়ে দিয়েছেন।

গৌরচন্দ্রিকা

সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করেও এ যুগে বহু পদ রচিত হয়েছিল। এ সকল পদে বর্ণনা করা হয়েছে মহাপ্রভুরই ভাব, রূপ ও মহিমা। গৌরাঙ্গের বিষয়ে রচিত বলেই এ সব পদকে বলা হয় 'গৌরচন্দ্রিকা'।

চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে শ্রেষ্ঠ পদ-কর্তাদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই গোবিন্দদাস ও জ্ঞান-দাসের নাম উল্লেখ করতে হয়। এঁরা যেন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ও দ্বিতীয় চণ্ডীদাস। গোবিন্দ-দাসের ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি দেখে বিদ্যাপতির কথা মনে হয়, আর জ্ঞানদাসের সহজ বাংলায় রচিত পদগুলি চণ্ডীদাসের রচনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রজবুলি ভাষা সম্বন্ধে এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৮)।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস নামে দু'জন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। দু'জনেই বর্তমান ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। তবে গোবিন্দদাস বলতে সাধারণত যাঁকে বোঝানো হয়ে থাকে তিনি হলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। কেউ কেউ মনে করেন সমস্ত বৈষ্ণব গীতিকবিদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী। গোবিন্দদাসের পিতা ছিলেন চৈতন্যদেবের সহচর চিরঞ্জীব সেন, মায়ের নাম সুনন্দা।

যতদূর জানা যায়, গোবিন্দদাস কবিরাজের পদগুলি সবই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। অসংখ্য পদ ইনি রচনা করেছিলেন। অসাধারণ কাব্যগুণে এই পদগুলি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শুধু নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে আদরণীয়।

গোবিন্দদাসের পদের একটি প্রধান গুণ তার ছন্দবৈচিত্র্য। এ বিষয়ে আধুনিক যুগে যেমন প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ, প্রাচীন যুগে তেমনি প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করেছেন এক অপরূপ ছন্দে—

"নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।"
ইত্যাদি।

আবার নীচের অংশে আর এক ধরনের ছন্দ ব্যবহার করেছেন—

"শুনইতে কানু মুরলীরবমাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ
তব মোহে রোখলি ভোর।
সুন্দরী তৈখনে কহল মো তোয়
ভরমহি তা সঞে নেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়।" ইত্যাদি।

এইভাবে গোবিন্দদাসের বহু পদে শব্দ-ঝঙ্কার, পদ-লালিত্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাব-মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে।

জ্ঞানদাস

জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পরিচয় বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু তাঁর রচিত সুন্দর পদগুলিই এই বিখ্যাত কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদরচনা করেছিলেন। তাঁর বাংলা পদগুলি সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ এর মধ্যে শিল্পচাতুর্যের থেকে বেশি রয়েছে স্বাভাবিক সরলতা ও আন্তরিকতা, যা মানুষের মনকে সহজেই স্পর্শ করতে পারে। এ ছাড়া গভীর আধ্যাত্মিকতার সুরে তাঁর পদগুলি লাবণ্যমণ্ডিত। জ্ঞানদাসের কিছু কিছু পদ প্রায় সকলেরই জানা। যেমন—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

অথবা—"বঁধু হে, আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া দিব॥"

নরোত্তমদাস ও অন্যান্য পদকর্তা

এ সময়ের অন্যান্য বিখ্যাত পদকর্তাদের

মধ্যে মুরারিগুপ্ত, নরহরিদাস, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন, লোচনদাস, অনন্তদাস, বলরাম দাস, নরোত্তমদাস, শ্যামানন্দদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ নরোত্তমদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব গীতিকবিতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন। নরোত্তম ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে প্রার্থনা ও ভজনের পদগুলিই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয়। একটি অতি পরিচিত পদের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হৈবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হৈবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।" ইত্যাদি।

অনেক মুসলমান কবিও রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিয়ে বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বহু পদরচনা করেছেন। নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, আলি রাজা প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

লৌকিক কাব্য ও আরাকানের মুসলমান কবিগণ

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে বাংলা দেশের সীমান্ত অঞ্চলে বিকশিত আর একটি অভিনব কাব্যধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ লৌকিক কাব্যের ধারা—মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়েই যা রচিত—যার সঙ্গে দেবদেবীর কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলা সাহিত্যের গতি মানবমুখী হয়েছিল শ্রীচৈতন্যকে পেয়ে, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবনাকে সে বর্জন করতে পারে নি। এই চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ হ'ল আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনায়। আরাকান বা রোসাঙ্গের রাজসভার পোষকতায় সেখানকার কবিরা বিভিন্ন লৌকিক কাব্য বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন।

এ বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বিখ্যাত মুসলমান কবি দৌলত কাজী। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সতী ময়নামতী' বা 'লোর-চন্দ্রানী' (সুকুমার সেনের মতে 'লোর-চন্দ্রালী')। রোসাঙ্গে রাজমন্ত্রী আশরফ খানের আদেশে ভোজপুরী কাব্যের অনুসরণ করে দৌলত কাজী এই গ্রন্থ রচনা করেন। রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। তিন খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হবার আগেই দৌলত কাজীর মৃত্যু হয়। বাকি অংশ পরবর্তী সময়ে রচনা করেন কবি সৈয়দ আলাওল।

সৈয়দ আলাওল আরাকানের দ্বিতীয় উল্লেখ-যোগ্য কবি। তিনি মালেক মুহম্মদ জায়সীর লেখা হিন্দী কাব্য 'পদুমাবৎ' অবলম্বন করে তাঁর 'পদ্মাবতী' পাঁচালী রচনা করেন। বাদশাহ্ আলাউদ্দীন ও চিতোরের রাণী পদ্মাবতীর কাহিনী নিয়ে এই কাব্য রচিত। পদ্মাবতী কাব্য ছাড়া কবি আলাওল ফারসী গ্রন্থের অনুসরণে আরো কয়েকখানি বাংলা কাব্য রচনা করেন। আলাওল অসামান্য কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। নিজের জীবনকথা তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করেছেন সহজ সরল ভাষায়। যেমন,—

"মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন।
তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন ॥

গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি।
গীতনাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গভঙ্গ করি ॥"

সৈয়দ সুলতান রচিত তিনখানি কাব্য—'জ্ঞান-প্রদীপ', 'নবীবংশ' ও 'ওফাৎ রসুল' সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য রচনার মধ্যে শেখ চাঁদের 'রসুল বিজয়', মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা', আব্দুল নবীর 'আমীর হামজা' প্রভৃতি কাব্যের নাম করা যেতে পারে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে এই সব নতুন ধারার পাশে পাশে পুরোনো ধারাও সমানে বয়ে চলেছিল। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অনুবাদ-কাব্য শাখা ও মঙ্গলকাব্য শাখা।

রামায়ণ কাব্যধারা

অনুবাদ শাখায় কবি কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ববর্তী সময়েই তাঁর বিখ্যাত বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৯)। তারপর অন্যান্য কবিও রামায়ণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ ছিলেন না, তাই তাঁদের রচনাও তেমন জন-প্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। কৃত্তিবাসের পরবর্তী রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন 'অদ্ভুতাচার্য'। এঁর আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং এঁর রামায়ণ উত্তর বঙ্গেই সুপ্রচলিত ছিল। ইনি রামায়ণের কবি এবং গায়কও ছিলেন। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তিনি রামায়ণ রচনা করেন।

চন্দ্রাবতী নামে একজন মহিলা কবি-রচিত একটি রামায়ণ কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ময়মনসিংহ জেলায় বংশীদাস ছিলেন এক বিখ্যাত কবি যিনি একখানা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই বংশীদাসেরই কন্যা চন্দ্রাবতী। তাঁর রচনা মাধুর্যময়, ভাষা অনেকটা আধুনিক। তাই অনেকে এ রচনায় পরে ভেজাল মিশেছে বলে সন্দেহ করেন। তবে চন্দ্রাবতীর জীবন সম্বন্ধে যে-কাহিনী ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাতে মনে হয় তিনি সত্যিই রামায়ণ গাথা রচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে—

"রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি দুঃখের ভারতী ॥
অঙ্গের আভরণ খুলি মারিনু রাক্ষসে।
পর্বতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে ॥
কতক্ষণ পরে আমি হইলাম অচেতন।
এখনো স্মরিলে কথা হারাই চেতন ॥"

অন্যান্য রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে রামশঙ্কর দত্ত, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

মহাভারত ও কাশীরাম দাস

মহাভারত-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাসের মত তিনিও বাংলার জাতীয় কবিরূপে গণ্য হতে পারেন। বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভারতও চিরকাল শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে পঠিত হয়ে এসেছে।

বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে প্রাচীন মহাভারত হচ্ছে কবীন্দ্র-রচিত পাণ্ডববিজয়-কথা বা ভারত-পাঁচালী। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্‌র সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে

ষোড়শ শতাব্দীতে এটি রচিত হয়েছিল। তাই এই মহাভারতকে 'পরাগলী মহাভারত' বলেও আখ্যাত করা হয়। এই কাব্য নাকি প্রত্যেক দিন পরাগল খানের সভায় পাঠ করা হ'ত। কারো কারো মতে এই কবির নাম ছিল পরমেশ্বর।

এই পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বেশ বিস্তৃত ভাবেই করা হয়েছিল। অনেকের মতে কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তির নাম।

সঞ্জয়ের মহাভারত নামে আরও একখানি গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এই সঞ্জয় কে ছিলেন তা এক সমস্যার বিষয়। কেউ কেউ মনে করেন যে একাধিক কবি রচিত ভারত-পাঁচালী মিলিত হয়ে এই বিরাট গ্রন্থখানির সৃষ্টি হয়েছে।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। এঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে দেশত্যাগ করে সম্ভবত শেষে উড়িষ্যাতে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। কারণ কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতার লেখাতে দেখা যায়—

"দেব কমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস।"

কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একটি প্রবাদে বলে—

"আদি, সভা, বন, বিরাটের কত দূর
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।"

তাই কেউ কেউ বলেন যে বিরাট পর্ব অবধি রচনা করার পর কাশীরাম দাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র কাব্যটি শেষ করেন। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে তেমন কোনও প্রমাণ নেই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীদাসের মহাভারতকেও বাংলার জাতীয় কাব্য বলা হয়ে থাকে, কারণ বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাব গঠনে এই দু'টি কাব্যের অবদান অপরিসীম।

কাশীরাম দাসের রচনার একটু উদাহরণ দেওয়া যাক—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥"

আংশিক বা সম্পূর্ণ মহাভারত রচনায় আরো বহু কবি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, ঘনশ্যাম দাস, ভৃগুরাম দাস, গঙ্গাদাস সেন, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভাগবতের অনুবাদ

ভাগবত-অনুবাদকদের মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি মালাধর বসু চৈতন্যদেবের পূর্বেই তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচনা করেন (ছোটদের বিশ্বকোষ —২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০০)। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর জীবনকালে রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' কাব্য রচনা করেন। মহাপ্রভুই নাকি তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দান করেন। প্রায় এই সময়েই দ্বিজ মাধব আচার্য এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে কাব্য রচনা করেন। কবিশেখর-রচিত

'গোপালবিজয়' কাব্যখানিও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভাগবতের ব্রজলীলার সঙ্গে দানলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনীগুলি মিলিয়ে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর সঙ্গে এ কাব্যের কাহিনীর অনেক মিল আছে। রচনা-কাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। 'দুঃখী' শ্যামদাস-রচিত গোবিন্দমঙ্গল কাব্যটি অনেকটা 'গোপালবিজয়' কাব্যের ধরনেই রচিত। মধ্য-যুগের শেষভাগে অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'কবিচন্দ্র' শঙ্কর চক্রবর্তীর 'ভাগবতামৃত' অথবা 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যখানি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কবি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের অধি-বাসী ছিলেন এবং আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও মধ্যযুগে বিভিন্ন সময়ে রচিত বহু কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলকাব্য

এবারে মঙ্গলকাব্য শাখা নিয়ে আলোচনা করা যাক। চৈতন্যদেবের পূর্বেই বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১-৫০২)

পরবর্তী সময়েও বহু বিখ্যাত কবি বিভিন্ন প্রকার মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস ষোড়শ শতাব্দীতে একখানি মনসার ভাসান লিখেছিলেন। এ কাব্য তিনি নিজেই গান করতেন। শোনা যায় তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে দস্যু কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ ক'রে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বংশীদাস ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী। তাঁর কাব্যের ভাষা সরল ও সুন্দর।

নারায়ণদেব রচিত পদ্মাপুরাণ কাব্যখানিও প্রসিদ্ধ। কোনও কোনও সমালোচক এঁর কাব্যকেই মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেন। নারায়ণদেব ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এঁর কাব্য বাংলা ও আসাম উভয় প্রদেশেই যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এঁর পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রত্নাবতী বা রুক্মিনী। নারায়ণদেব কোন্ সময়ের লোক ছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন ইনি চৈতন্যদেবের পরবর্তী, কারণ তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যদেবের একটি বন্দনা পাওয়া যায়। আবার অনেকে এই চৈতন্যবন্দনাকে পরবর্তী কালে সংযুক্ত বলে মনে করেন, কিন্তু কাব্যের ভাষা প্রভৃতি বিচার করে এঁকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলেই মনে করেন। এমন কি কেউ কেউ নারায়ণদেবকে বিজয়গুপ্তেরও পূর্ববর্তী ব'লেও অনুমান করেন।

নারায়ণদেবের রচনায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় আছে। করুণ রস সৃষ্টিতে ইনি সুদক্ষ ছিলেন। চরিত্র-চিত্র ও সমাজ-চিত্র অঙ্কনে কবি সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এঁর ভাষার নমুনা—

"তোমার সনে বাদ করিতে মোর শক্তি নাই।
আপনার তুসে পাইলুম আপনে সাজাই॥
বারে ২ জথ মন্দ বোলিছি তোমারে।
সকল ক্ষেমিলানি কহও আমারে॥"

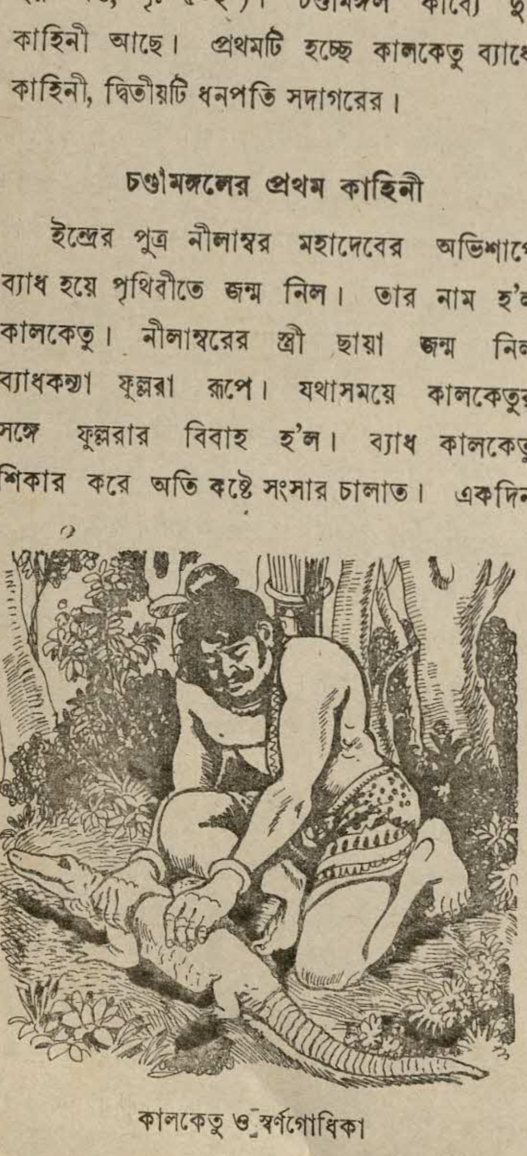
মনসামঙ্গলের আর একজন বিখ্যাত কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ। ইনি বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন। কবির গ্রন্থে দেখা যায় যে

মনসার এক নাম 'কেতঙ্কা'। তাই তিনি নিজেকে কেতঙ্কাদাস বলেছেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও মধ্যযুগের বাংলা দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদেবীও ছিলেন মনসাদেবীর মত মূলত অনার্য-দেবতা (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০২)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হু'টি কাহিনী আছে। প্রথমটি হচ্ছে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয়টি ধনপতি সদাগরের।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম কাহিনী

ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর মহাদেবের অভিশাপে ব্যাধ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিল। তার নাম হ'ল কালকেতু। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়া জন্ম নিল ব্যাধকন্যা ফুল্লরা রূপে। যথাসময়ে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ হ'ল। ব্যাধ কালকেতু শিকার করে অতি কষ্টে সংসার চালাত। একদিন

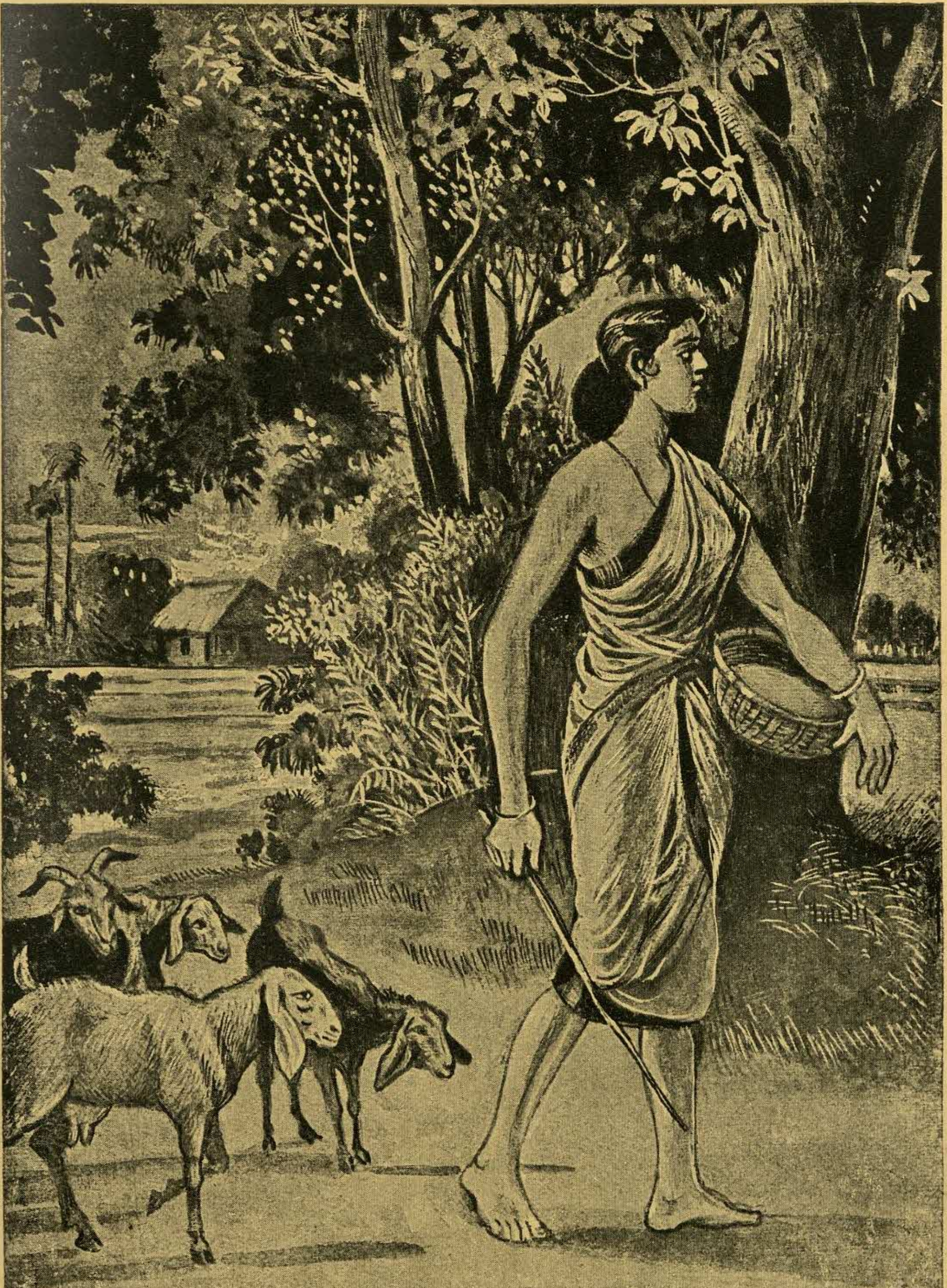


কালকেতু ও স্বর্ণগোধিকা

বনে গিয়ে কালকেতু কোনও শিকার খুঁজে পেল না। পথে এক স্বর্ণগোধিকা (সোনালি গোসাপ) দেখতে পেয়ে তাকেই ঘরে নিয়ে এল। ওই গোসাপ কিন্তু আসলে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীদেবী। তিনি কালকেতুর কুটীরে এসে এক সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করলেন। কালকেতু বা ফুল্লরা কেউই তাঁকে চিনতে পারল না। দেবী অবশেষে নিজের পরিচয় দিলেন এবং কালকেতুকে একটি আংটি ও সাত ঘড়া ধনরত্ন দিলেন। দেবীর আদেশে কালকেতু গুজরাতে বন কাটিয়ে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে লাগল। কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত নামে এক খলের ষড়যন্ত্রে কলিঙ্গরাজের বিরাগভাজন হ'ল। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কালকেতু বন্দী হ'ল। অবশেষে চণ্ডীদেবীর কাছ থেকে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে দেবীর ভক্ত বলে জানতে পারল এবং তাকে মুক্ত করে রাজ্য ফিরিয়ে দিল। কালকেতু তারপর দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও পূজা মর্ত্যে প্রচার করিল। অভিশাপ অন্তে কালকেতু ও ফুল্লরা নীলাম্বর ও ছায়া রূপে স্বর্গে ফিরে গেল।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনী

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীটি হচ্ছে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। উজানী নগরের যুবক ধনপতি সদাগর লহনাকে বিবাহ করার পর খুল্লনাকে বিবাহ করল। রাজার আদেশে গৌড় দেশে যাবার সময়ে ধনপতি খুল্লনাকে লহনার হাতেই সমর্পণ করে গেল। দাসী হুর্বলার কুমন্ত্রণায় লহনা খুল্লনার উপর নানারূপ অত্যাচার করতে লাগল এবং বনে গিয়ে ছাগল চরাতে বাধ্য



খুল্লনা

—ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড

(বাংলা সাহিত্যের কথা পৃঃ ৮৩৬)



লহনাকে দাসী দুর্বলা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

করল। অবশেষে চণ্ডীর কৃপায় ধনপতি দেশে ফিরে এল এবং লহনা খুল্লনার বিরোধও মিটে গেল। কিছুকাল পরে ধনপতি সিংহল দেশে বাণিজ্যযাত্রা করল। কিন্তু যাত্রার পূর্বে চণ্ডী দেবীকে অপমান করায় ধনপতি অকূল সমুদ্রে তার সব ডিঙ্গা হারাল। একটিমাত্র ডিঙ্গা আশ্রয় ক'রে কোনমতে সে গিয়ে পৌঁছল সিংহলে। পথে কালীদহে ধনপতি কমলে-কামিনী মূর্তি দর্শন করল কিন্তু সিংহলরাজকে সে মূর্তি দেখাতে না পারায় বারো বছরের জন্য কারারুদ্ধ হ'ল। এদিকে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করল এবং সেও পথে সেই পরম আশ্চর্য 'কমলে-কামিনী' দেখল। সিংহলরাজকে সে কথা বললে রাজা বিশ্বাস করল না এবং শর্ত হ'ল যে 'কমলে-কামিনী' দেখাতে পারলে শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হবে, নইলে দক্ষিণ মশানে তার শিরশ্ছেদ হবে। শ্রীমন্তও রাজাকে ঐ মূর্তি দেখাতে পারল না, তাই তাকে মশানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শ্রীমন্তের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে চণ্ডীদেবী অবশেষে রাজাকে 'কমলে-কামিনী' মূর্তি দেখালেন। ধনপতি মুক্তিলাভ করল এবং শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যা সুশীলার বিবাহ হ'ল। দেবীর কৃপায় ধনপতি তার হারানো সম্পদ্‌ও ফিরে পেল এবং দেশে এসে চণ্ডীদেবীর পূজা করল।

অনেকে মনে করেন চণ্ডী-মঙ্গলের আদি রচয়িতা হচ্ছেন মাণিক দত্ত। তাঁর কাব্য খুব প্রাচীন বলেই মনে হয়। তিনি সম্ভবত মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তবে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নি।

মাধবাচার্য চণ্ডীমঙ্গলের একজন বিখ্যাত কবি। সপ্তগ্রাম-নিবাসী মহাপণ্ডিত পরাশরের পুত্র বলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম। ইনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবিকঙ্কণকে বাংলার 'চসার' বলা হয়। এঁর কাব্যের কিছু অংশ বাউয়েল সাহেব কর্তৃক ইংরেজি পদ্যে অনূদিত হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন

ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।”

মুকুন্দরামের পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে সে স্থান ত্যাগ করে এসে তিনি মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামে বসবাস করেন। সেখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের অনুরোধে তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেই এই কাব্য রচিত হয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল'। দরিদ্র নর-নারীর দুঃখ-বেদনার চিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম অসামান্য দক্ষতা ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবন যে মানবতাবোধের সঞ্চার করেছিল কবিকঙ্কণের রচনায় তারই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই কবি ফুল্লরার মুখ দিয়ে সমাজের দরিদ্রতম মানুষেরই দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করেছেন—

“ভাঙ্গা কুঁড়েঘর তালপাতার ছাউনি ॥
ভেরেণ্ডার থাম এক আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥
বৈশাখে অনল সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পশরা ॥
... ...
বড় অভাগ্য গনি বড় অভাগ্য গনি।
শত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফনী ॥”

ধর্ম ঠাকুর ও ধর্মপূজা

ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়দেশের (পশ্চিম বঙ্গ) জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়। এই কাব্যের কাহিনীতে রাঢ়দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া আছে বলে অনেকে মনে করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। এই ধর্ম ঠাকুর কে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ইনি মূলত কোনও অনার্য দেবতা। আবার অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্ম থেকেই পরবর্তীকালে ধর্মপূজার উদ্ভব এবং তা থেকেই ধর্ম ঠাকুরের সৃষ্টি। আবার অন্য এক মতে ধর্ম ঠাকুর হচ্ছেন প্রধানত সূর্য, তবে তাঁর সঙ্গে আরো অনেক লৌকিক দেবতা-উপদেবতা এসে মিশে গেছেন।

শূন্যপুরাণ

ধর্ম ঠাকুরের ছড়া ও পুরাণ-কাহিনী বহুকাল থেকেই বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও আদি পুরোহিত ছিলেন রামাই পণ্ডিত। তাঁরই রচিত বলে একটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে,—তার নাম 'শূন্যপুরাণ'। কিন্তু 'শূন্য-পুরাণে'র যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে তার কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার বলে মনে হয় না। হয়তো অতি প্রাচীন কিছু ছড়া অবলম্বন করে পরবর্তী কালে এই 'শূন্যপুরাণ' রচিত হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। এই কাব্যের কাহিনী অতি সংক্ষেপে বলছি:

ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের সামন্ত-রাজা ছিলেন কর্ণসেন। তিনি ছিলেন ঢেকুরগড়ের

শাসনকর্তা। সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ বিদ্রোহী হয়ে ঢেকুরগড় দখল করলে গৌড়েশ্বর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঢেকুর আক্রমণ করলেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে এলেন। এই যুদ্ধে কর্ণসেন স্ত্রী-পুত্র সকলকেই হারালেন এবং নিদারুণ শোকে অভিভূত হলেন। গৌড়েশ্বর তখন নিজের রূপবতী ও গুণবতী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিয়ে দিয়ে তাঁকে ময়নাগড়ের সামন্ত-রাজা নিযুক্ত করলেন। এই বিবাহে রঞ্জাবতীর ভাই মহামদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্মরাজের পূজা করে এক শাপভ্রষ্ট দেবতাকে পুত্ররূপে লাভ করলেন এবং তার নাম দিলেন লাউসেন। লাউসেনের একা থাকতে কষ্ট হবে বলে ধর্মরাজ কর্পূরধবল নামে আর একটি শিশু সৃষ্টি করে রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দিলেন। বীর হনুমান বৃদ্ধের ছদ্মবেশে এসে দু'জনকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। দেবী পার্বতী লাউসেনের চরিত্রবলে প্রসন্ন হয়ে তাকে নিজের অজেয় খড়্গ দান করলেন। এইবার মা-বাবার অনুমতি নিয়ে লাউসেন ও কর্পূরধবল দু'জনে গৌড় যাত্রা করলেন এবং পথে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে গৌড়ে এসে পৌঁছলেন। মাতুল মহামদের ষড়যন্ত্রে লাউসেনের এখানে কারাবাস হ'ল। পরে ধর্মরাজের কৃপায় মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর মহামদের পরামর্শে লাউসেনকে পাঠিয়ে দিলেন কামরূপের রাজাকে দমন করতে। লাউসেন কৃতকার্য হয়ে রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করলেন। তারপর গৌড়েশ্বরের আদেশে লোহার গণ্ডার কেটে সিমুলের রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহ করলেন।



গৌড়েশ্বরের আদেশে লাউসেন লোহার গণ্ডার কাটছেন।

এর পর মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর ইছাইঘোষকে দমন করবার জন্যে লাউসেনকে পাঠালেন। লাউসেন বহু চেষ্টার পর ইছাই ঘোষকে বধ করলেন। অবশেষে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে বললেন পশ্চিমে সূর্য উদয় করাতে। লাউসেন কঠোর তপস্যা শুরু করলেন এবং তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মরাজ অমাবস্যার রাতে পশ্চিমে সূর্য উদিত করালেন। লাউসেন সম্মানিত হলেন এবং মহামদ তাঁর কৃতকর্মের জন্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন। লাউসেন ধর্মরাজের কৃপায় তাঁকে রোগমুক্ত করলেন এবং মর্ত্যে ধর্মপূজা প্রচার করে স্বর্গগমন করলেন।

ধর্মমঙ্গলের কবি

ধর্মমঙ্গলের আদি কবিরূপে ময়ূরভট্টের নাম প্রচলিত। পরবর্তী বহু কবি আদি কবি হিসেবে তাঁর বন্দনা করেছেন। কিন্তু ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গলের নাম ছিল 'হাকন্দপুরাণ'। রূপরাম

ধর্মমঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি। ইনি বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন এবং এঁর নিজের গানের দল ছিল। তাঁর কাব্যরচনার সময় সঠিক জানা যায় না। রূপরামের পরবর্তী আর একজন কবি হচ্ছেন খেলারাম। তাঁর ধর্মমঙ্গল - কাব্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে।

ঘনরাম চক্রবর্তী ও অন্যান্য কবি

ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম সীতাদেবী। তিনি অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তির জন্য দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম তাঁর কাব্য রচনা করেন—সম্ভবত বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই কাব্যে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়েরই পরিচয় আছে, কিন্তু অত্যধিক উপকরণের ভারে মাঝে মাঝে রচনা প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

এ ছাড়া মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্তী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, বলদেব চক্রবর্তী প্রভৃতিও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন

ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

মধ্যযুগে রচিত এই তিন শ্রেণীর প্রধান মঙ্গলকাব্য ছাড়া অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শিবমঙ্গল বা শিবায়ন প্রভৃতি আরো বহু রকম মঙ্গলকাব্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ভারতচন্দ্র-রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রায়গুণাকর উপাধিধারী ভারতচন্দ্রকে অনেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করেন। অন্তত পক্ষে তিনি যে মধ্যযুগের শেষ কীর্তিমান্ কবি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নদীয়ার অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়। মহারাজই কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। ভুরশুট পরগণায় এক জমিদার বংশে কবির জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন 'রাজা' উপাধিধারী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ভারতচন্দ্রের ভাষা ঐশ্বর্যময়। নতুন নতুন ছন্দ ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কৃতের বহু ছন্দ ও অলঙ্কারকে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেন। ভারতচন্দ্রের রচনার খানিকটা নমুনা দিলে তোমাদের ভালো লাগবে :

"আমার উমা মেয়ের চূড়া,
ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া।
ভারত কহে, পাগল নহে,
ওই ভুবনেশ্বর লো।"

অথবা, "অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ, দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে, সতী দে, সতী দে, সতী দে॥"

ভারতচন্দ্র-রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানটি অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত। আরো কয়েকজন কবি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রামপ্রসাদের আসল খ্যাতি তাঁর রচিত কালীকীর্তনে। আজও তার আদর আমাদের ঘরে ঘরে।

ভারতচন্দ্র প্রাচীন যুগের কবি হলেও তাঁর রচনার মধ্যে আধুনিক যুগের আভাস পাওয়া যায়। রাত্রিশেষে উষার আকাশ যখন রক্তিম হয়ে ওঠে তখন যেমন বোঝা যায় যে নতুন প্রভাত আসছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের রচনা পাঠ করলেও বোঝা যায় যে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন যুগ আসছে।

শৈবসিদ্ধাদের কাহিনী

মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শৈবসিদ্ধাদের মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী বাংলা দেশে বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে এই কাহিনীগুলো নিয়ে কাব্য রচিত হয়। এই কাহিনী দু' ভাগে বিভক্ত—

(১) মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী

(২) গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী

এই কাহিনীর যে-সব পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা সবই মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কতকগুলি পল্লী-গাথা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এই সব গাথার কিছু কিছু সংগ্রহ 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর বঙ্গের রংপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ যোগীদের মুখ থেকে এই রকম আর একটি কাব্য সংগ্রহ করেন শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। এটিও 'গোপীচন্দ্রের গান' নাম দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন।

যুগসন্ধি ও বাংলা সাহিত্য

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির জন্যে দেশে ছিল নানা রকমের অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। তাই এ অবস্থার মধ্যে কিছুকাল ধরে কোনও উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নি। শুধু বিভিন্ন দলের লোক নানা রকম গান ও ছড়া রচনা করে তাই গেয়ে বেড়াতেন। এঁদের এক দলকে বলা হ'ত কবিয়াল আর এঁরা গান গেয়ে গেয়ে পরস্পরের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ চালাতেন তাকে বলা হ'ত কবির লড়াই। রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, এণ্টনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। অন্যান্য দলের মধ্যে তরজা, খেঁড়ু বা খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালী



কবিগানের আসর

প্রভৃতি গান প্রচলিত ছিল এবং এর দ্বারাই বাংলা কাব্যের ধারা অব্যাহত ছিল। আধুনিক পাঁচালী-রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায়ের নাম প্রসিদ্ধ। সুরুচিসম্পন্ন 'টপ্পা' গানের প্রবর্তন করেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু। এঁর গানগুলি নিধু বাবুর টপ্পা নামে বিখ্যাত।

এই সব কবিরা মহৎ কিছু রচনা করতে না পারলেও সেই দুর্দিনে বাংলা সাহিত্যের ধারাকে এঁরাই অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন। তাই এঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

আধুনিক যুগের শুরু

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। অবশ্য যে মানবতাবোধ আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ তার জন্ম হয়েছিল আরো অনেক আগে—শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েই, কিন্তু প্রধানত যে রচনাবৈশিষ্ট্য ও বিষয়বৈচিত্র্যের দ্বারা আধুনিক সাহিত্য চিহ্নিত হয়ে থাকে তার মূলে রয়েছে বাংলা গদ্য রচনা আর এই গদ্য রচনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকেই। তা ছাড়া আরো তিনটি ঘটনা বিশেষ করে এ যুগের প্রবর্তনে সহায়তা করেছিল—(১) মুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা, (২) খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা, (৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্থাপনা।

মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হবার আগে বই হ'ত হাতে লেখা, এবং যে হেতু কোনো বই নির্দিষ্ট কয়েকটি সংখ্যার বেশি হাতে লিখে নকল করা সম্ভব হ'ত না, তাই জনসাধারণের মধ্যে তা প্রচার লাভের সুযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এক-একখানি বই প্রচুর সংখ্যায় ছাপানো সম্ভব হ'ল এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের পথ সুগম হ'ল।

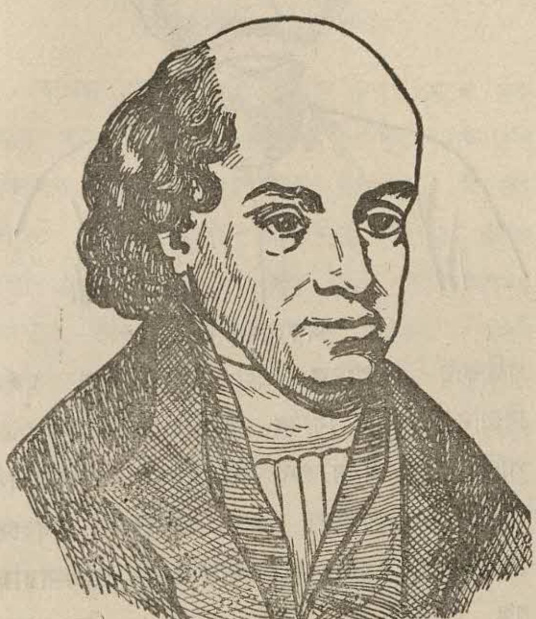
খৃষ্টান মিশনারীরা এদেশে এসে তাঁদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজি বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করতে লাগলেন আর তার ফলেই বাংলা ভাষায় দেখা দিল গদ্য রচনা। বাংলা সংবাদ-পত্রের জন্মও এই মিশনারীদের হাতেই। তাতেও গদ্যের রচনা ও প্রচার হতে লাগল।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্যরচনার বিকাশে আরো বেশি সহায়তা করল। যে সব ইংরেজ এ-দেশে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে বাংলা ভাষা শেখাবার উদ্দেশ্যে ঐ কলেজে অনেক বাংলা গদ্যপুস্তক রচিত হতে লাগল। প্রথম যুগের প্রায় সব গদ্যগ্রন্থই এই কলেজের দৌলতেই লেখা হয়েছিল।

এদিকে আবার ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরাও ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর হ'ল। এইভাবে ইংরেজরা বাংলা এবং বাঙ্গালীরা ইংরেজি লিখতে থাকায় ইংরেজি ও বাংলা ভাষার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। তাতে করে ইংরেজির অনেক ভালো ভালো জিনিস বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হতে লাগল। ফলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অনেক নতুন রচনাধারার জন্ম হ'ল। যথা—(১) গদ্যের ধারা, (২) উপন্যাসের ধারা, (৩) কাব্যের ধারা, (৪) নাটকের ধারা, (৫) ছোটগল্পের ধারা।

গদ্যের ধারা

বাংলা গদ্যের আদিযুগের ইতিহাস ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে জড়িত। এই কলেজে



উইলিয়াম কেরী

প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী ও তাঁর অধীনস্থ বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মিলে কলেজের ছাত্রদের জন্যে ১৩খানা গদ্যপুস্তক লিখেছিলেন। রামরাম বসু এই কলেজেরই একজন পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র' নামক তাঁর গ্রন্থখানিই বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্যপুস্তক। আধুনিক গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে এ গ্রন্থের ভাষা হাস্যকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভুললে চলবে না যে এ হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম গদ্যপুস্তক। এ ছাড়া স্বয়ং কেরী সাহেব রচিত 'কথোপকথন', গোলোক শর্মার 'হিতোপদেশ', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা 'রাজাবলী', চণ্ডীচরণ মুন্‌সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' প্রভৃতি বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজা রামমোহন রায়

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এই বইগুলি বিশেষ ভাবে ছাত্রদের জন্য রচিত বলে এবং এদের দাম একটু বেশি ছিল বলে জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রচার লাভ করে নি। জনসাধারণের সামনে বাংলা গদ্য রচনাকে নিয়ে এলেন সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায়। সে সময়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সঙ্গে রামমোহনের বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। তাই তিনি বেদান্তদর্শন ও শাস্ত্র-বিচার সম্পর্কে কয়েকখানা চমৎকার গদ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। 'বেদান্তসার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ', 'গোস্বামীর সহিত বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা



রাজা রামমোহন রায়

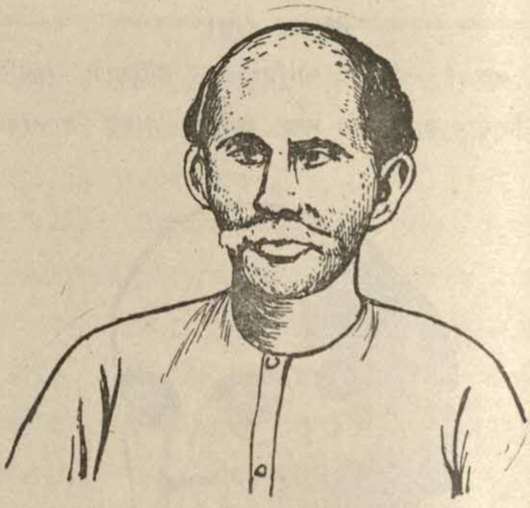
করে তিনি পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই এ সব রচনা সেকালে জনসাধারণের কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

বাংলা সাময়িকপত্র

কিন্তু বাংলা গদ্য জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হ'ল দৈনিক ও মাসিক সাময়িক পত্রিকার প্রবর্তনে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরাই প্রথমে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এবং তার পর 'সমাচার-দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। অনেকের মতে এর পূর্বেই গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 'বেঙ্গলী গেজেট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমে বাংলায় এক এক করে আরও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল এবং গদ্য রচনার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগও ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। যদিও প্রথম যুগের এই সব সংবাদপত্র অধিকাংশই অল্পকালস্থায়ী ছিল, তবু বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান অল্প নয়।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথে এ পত্রিকাটি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সংবাদ প্রভাকর জন্মলাভ করেছিল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্রপূর্ব-যুগের বহু বিখ্যাত লেখক এই পত্রিকার লেখক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

এর পরই নাম করতে হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই



অক্ষয়কুমার দত্ত

পত্রিকার সম্পাদক এবং ধর্ম, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রথম শুরু করা হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সে সময়ে হুগলী কলেজে এবং অন্যান্য অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই পত্রিকা পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

এর পরই রবীন্দ্রপূর্ব-যুগের বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় পত্রিকা হচ্ছে 'বঙ্গদর্শন'। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের অনেক বিখ্যাত রচনাই সর্বপ্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন প্রথম চার খণ্ড প্রকাশিত হবার পর এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র।

সাময়িক পত্রিকার প্রথম যুগে তার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্য যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করল বটে, কিন্তু তখনও তার রচনা-রীতিতে কিছু কিছু দোষ-

ত্রুটী ছিল এবং তার ফলে বাংলা গদ্য খানিকটা পঙ্গু হয়েই ছিল। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচনা তাই সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব

বাংলা গদ্যকে এই শ্রীহীন দশা থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য সঞ্চারিত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাধুভাষার গদ্যের জনক বলা যেতে পারে। বাংলা গদ্যে সাহিত্যরসের আস্বাদ তাঁর রচনাতেই প্রথম পাওয়া গেল। তা ছাড়া গদ্যরচনায়ও যে একটা বিশেষ ছন্দ বা তাল আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে তাঁর রচনায় তা পরিস্ফুট করলেন। বিদ্যাসাগর যে-সব গদ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই ইংরেজি, সংস্কৃত অথবা হিন্দি গ্রন্থ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অবলম্বনে রচিত। যেমন,—বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, চরিতাবলী, বোধোদয়, কথামালা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী, ভ্রান্তি-বিলাস প্রভৃতি। কিন্তু তাঁর মৌলিক রচনাও আছে, যেমন—সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাবতীসম্ভাষণ, বিদ্যাসাগর-চরিত (স্বরচিত)। তা ছাড়া বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কীয় প্রস্তাব কয়েক খণ্ড। ছদ্মনামেও তিনি বই লিখেছিলেন, যেমন—ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি। বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব অসামান্য। এ কাজে যাঁরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এর পর এলেন বঙ্কিমচন্দ্র

এর পরই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা আলোচনা করতে হয়। বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার সবচেয়ে বড় অবদান উপন্যাস-সাহিত্য। এই উপন্যাসের ধারার প্রবর্তন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তার সৃষ্টি বঙ্কিমেরই হাতে। ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে তিনি বাংলায় উপন্যাস রচনা করতে শুরু করেছিলেন। এর আগে ভারতীয় সাহিত্যে উপন্যাস বলতে কিছুই ছিল না, সুতরাং বাংলা উপন্যাসের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজি সাহিত্যের কাছেই ঋণী। এখন পর্যন্ত যতদূর



বঙ্কিমচন্দ্র

রচিত এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম যথার্থ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর পর ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষ-বৃক্ষ', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব উপন্যাস লিখেছিলেন সেগুলিকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

ঐতিহাসিক উপন্যাস—দুর্গেশ-নন্দিনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর।

সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে ঠিক উপন্যাস না হলেও উপন্যাস জাতীয় একখানি বই বাংলায় প্রথম রচিত হয় এদেশে আগত একজন বিদেশিনী খৃষ্টান মহিলার দ্বারা। বইখানির নাম 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। এর পর উপন্যাস জাতীয় আর একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'। এ বইখানি পুরোপুরি কথ্যভাষায় লেখা। লেখক কিন্তু তাঁর গ্রন্থে টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমের পূর্বে

সামাজিক উপন্যাস—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল।
দেশাত্মবোধক উপন্যাস—আনন্দমঠ, সীতারাম।
অন্যান্য ছোট-বড় উপন্যাস—ইন্দিরা, মৃণালিনী, রাধারাণী, রজনী, কপালকুণ্ডলা, যুগলাঙ্গুরীয়, দেবী চৌধুরাণী।

আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গানটি আনন্দমঠ উপন্যাসে আছে।

কোন কোন সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'ই একমাত্র যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস;



প্যারীচাঁদ মিত্র

অন্যগুলিকে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস বলা যেতে পারে।

উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত', 'ধর্মতত্ত্ব', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী, তাই সে যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকেরা, বিশেষ করে গদ্য-লেখকগণ,—কেউই বঙ্কিমের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যেও এই প্রতিভা স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একাই একটি যুগের সৃষ্টি করে গেছেন। কি উপন্যাস রচনায়, কি হাস্যরস সৃষ্টিতে, কি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনায় অথবা সুযোগ্য পত্রিকা-সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এমন কি সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে তিনি 'ললিতা ও মানস' নামে কাব্যগ্রন্থ এবং 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ্' নামে একটি ইংরেজি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সর্বসমেত ছ'খানি উপন্যাস রচনা করেন। 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণ' ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। 'সমাজ' ও 'সংসার' সামাজিক উপন্যাস। আর 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। অনেক সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক উপন্যাসটিও সে যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।



রমেশচন্দ্র দত্ত

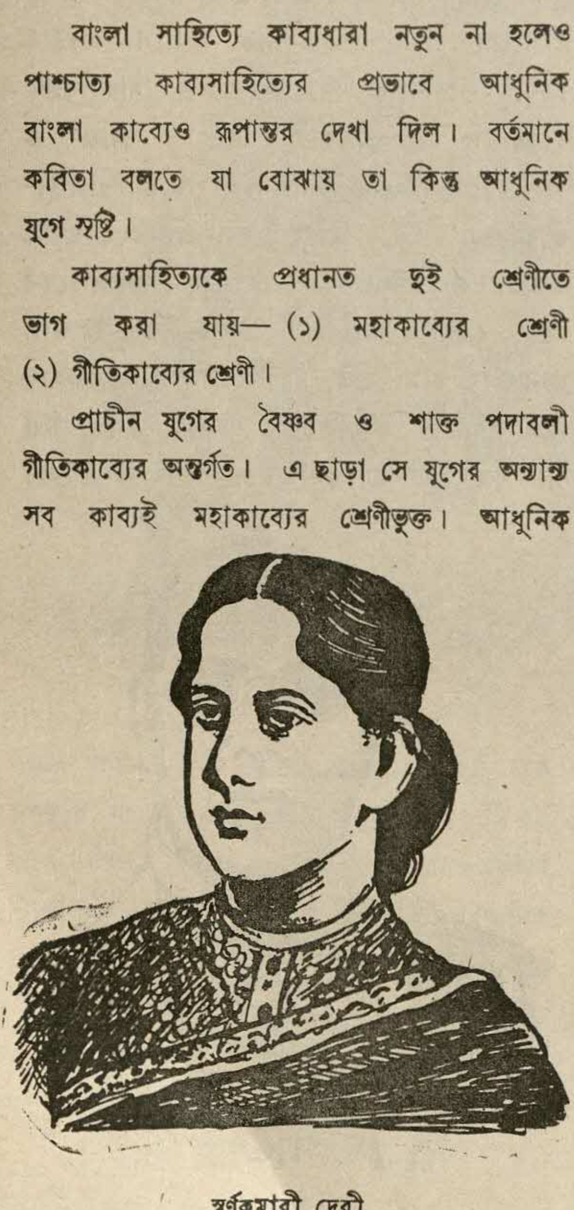
রবীন্দ্রপূর্ব যুগের অন্যান্য গদ্যলেখকদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে কাব্যধারা

বাংলা সাহিত্যে কাব্যধারা নতুন না হলেও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্যেও রূপান্তর দেখা দিল। বর্তমানে কবিতা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু আধুনিক যুগে সৃষ্টি।

কাব্যসাহিত্যকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— (১) মহাকাব্যের শ্রেণী (২) গীতিকাব্যের শ্রেণী।

প্রাচীন যুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী গীতিকাব্যের অন্তর্গত। এ ছাড়া সে যুগের অন্যান্য সব কাব্যই মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত। আধুনিক যুগে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবির বিখ্যাত কাব্যগুলি মহাকাব্য জাতীয় হলেও বিহারীলাল চক্রবর্তীর সময় থেকেই বাংলা কাব্যধারা গীতিকবিতার খাতেই প্রবাহিত হতে লাগল। সে ধারা আজও সমানে বয়ে চলেছে।



স্বর্ণকুমারী দেবী

গুপ্তকবি

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত, সংক্ষেপে গুপ্তকবি। তাঁর কবিতায় পূর্ববর্তী কবিয়ালদের রচনার কিছু কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অন্য দিকে আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবও এঁরই রচনায় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাই এঁর কবিতাগুলিতে অনেক কিছু নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে হয়তো প্রাথমিক স্তরের কবিতাই বলতে হবে, তবু বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি যাঁর কবিতাগুলি শুধুমাত্র পড়বার জন্যেই রচিত, পূর্ববর্তী কবিদের মত গান করবার জন্যে রচিত নয় এবং তিনিই প্রথম কবি যাঁর কবিতায় দেশাত্মবোধের আভাস পাওয়া যায়। এঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সে যুগে বহু নবীন সাহিত্যিকের মনে অপূর্ব প্রেরণার সঞ্চার করেছিল।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয়দের মধ্যে প্রধান ছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গুপ্তকবির কবিতার দেশাত্মবোধের আভাস রঙ্গলালের কবিতায় আরও গভীর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল।



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু এঁরও ঝোঁক ছিল মহাকাব্য জাতীয় উপাখ্যান-কাব্য রচনার দিকে। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' এই শ্রেণীর রচনা।

মাইকেল মধুসূদন

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বলা যায় বিদ্রোহী কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন সংস্কার ও প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এঁর মনে জেগেছিল প্রবল বিদ্রোহ। তাই সংস্কারের সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নতুন ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে, সৃষ্টি করলেন অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর এ ছন্দ প্রথম ব্যবহার করলেন তাঁর 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে। তার পর 'মেঘনাদবধ' কাব্য নামক বিখ্যাত রচনায় এবং 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও তিনি এ ছন্দ সার্থক ভাবে ব্যবহার করলেন। পাশ্চাত্য সনেটের অনুকরণে বাংলা ভাষায় সনেটও লেখেন প্রথম তিনিই। এ ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তিনি 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যও রচনা করেন। এ কাব্যে সমিল ছন্দেও তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত করেছেন। বাংলা ভাষা যে শুধু বিলাপের কোমল ভাষাই নয়, এ ভাষায় তেজস্বিতা এবং গাম্ভীর্যও যে প্রকাশিত হতে পারে মধুসূদন তা ভালো ভাবেই প্রমাণ করেছেন।

মধুসূদন প্রথমে কিন্তু ইংরেজিতেই 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডি' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তবে, সুখের বিষয় পরে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন।

নবীনচন্দ্র সেন

এর পর আমরা পাই আর একজন খ্যাতনামা কবি নবীনচন্দ্র সেনকে। কাব্যরচনায় তাঁর পরিকল্পনা ছিল যেমন বিরাট, দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল



মাইকেল মধুসূদন দত্ত



নবীনচন্দ্র সেন

তেমনি নতুন। এঁর বিখ্যাত কাব্য হচ্ছে 'পলাশীর যুদ্ধ', 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' ও 'প্রভাস'। শেষের তিনখানি কাব্য তিনি একই মহাকাব্যের তিনটি অংশরূপে রচনা করেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে সংগৃহীত। মহাভারতের অনেক ঘটনাকেই তিনি এই কাব্য তিনটিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হাজির করেছেন। তাই এই তিনটি কাব্যকে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' বলা হয়। নবীন সেনের রচনা মহাকাব্য শ্রেণীর হলেও তার মধ্যে গীতিকাব্যের গুণও আছে। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে 'অমিতাভ', 'খৃষ্ট', 'অমৃতাভ', 'রঙ্গমতী', 'ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগের আর একজন খ্যাতনামা কবি। এঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য-জাতীয় রচনা। সম্ভবত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রেরণায় এই কাব্য রচিত। হেমচন্দ্র ছন্দনিপুণ ছিলেন এবং তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রীতির গভীর পরিচয় মেলে। 'বৃত্রসংহার' ছাড়াও তিনি যে সব কাব্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'কবিতাবলী', 'বীরবাহু' কাব্য, 'ছায়াময়ী',



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'আশাকানন', 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রধান। তাঁর রচিত 'ভারতসঙ্গীত' প্রভৃতি গীতিকাব্যগুলিও কম জনপ্রিয় নয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হ'ল তাঁদের কারো রচনায়ই আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণ যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট হয় নি। বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনায়ই প্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁকেই আধুনিক গীতিকবিতার জন্মদাতা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে তাঁর গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। বিহারীলালের কাব্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্যের আভাস আছে যা



বিহারীলাল চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল'। তা ছাড়া ইনি 'বঙ্গসুন্দরী', 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'নিসর্গসন্দর্শন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রবীন্দ্রপূর্ব যুগে ইনিই শেষ বিশিষ্ট কবি।

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে নাটকের ধারা

বাংলা সাহিত্যে নাটক বস্তুটি উপন্যাসের মত নিছক ইংরেজি সাহিত্যের অবদান নয়। ভারতীয় সাহিত্যে সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। প্রথম প্রথম বাংলা নাটক সংস্কৃত নাটকের অনুকরণেই রচিত হ'ত এবং সংস্কৃত নাটকের প্রাচীন রীতিনীতিই মেনে চলত। কিন্তু ইংরেজি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হবার পর এই সব প্রাচীন সংস্কার শিক্ষিত মানুষদের কাছে অর্থহীন মনে হ'ল। তাই নবীন সাহিত্যিকেরা ইংরেজি নাটকের প্রেরণায় নতুন ধরনের নাটক লিখতে এগিয়ে এলেন।

প্রাচীন সংস্কারের বেড়ী ভেঙ্গে নাটকে নূতনত্বের সূচনা করেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সে যুগে বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার—যাঁর খ্যাতি ছিল 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে। ইনি সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এই নাটকের একটি ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদনের মনে আগ্রহ জন্মে বাংলায় ভালো নাটক রচনা করবার এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' ও পরে 'পদ্মাবতী' নাটক। অবশ্য এতে প্রাচীনতার মোহ তিনি সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা সাহিত্যে সংস্কারমুক্ত প্রথম বিষাদান্ত নাটক। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটক হচ্ছে 'মায়াকানন', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। শেষ দু'টি নাটক প্রহসন বা ব্যঙ্গনাট্য।

দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র রবীন্দ্রপূর্ব যুগের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। নাটকের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে



দীনবন্ধু মিত্র

বাস্তবতা। দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে আমরা এই বাস্তব দৃষ্টির যে পরিচয় পাই তা নাটকের ইতিহাসে প্রায় অতুলনীয়। দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'লীলাবতী', 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি অনেক নাটক লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'নীলদর্পণ' নাটকটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এই নাটকে দরিদ্র কৃষকদের প্রতি নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী অতি বাস্তব ও জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে যুগে এ নাটকখানি প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিবারণে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনি সর্বসমেত ৮০খানা নাটক রচনা করেছেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক—সব রকমের নাটক রচনায়ই ইনি



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে কয়েকখানি হচ্ছে 'প্রফুল্ল', 'জনা', 'বিল্বমঙ্গল', 'শিবাজী', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাসীম', 'পাণ্ডবগৌরব', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেবচরিত', 'বলিদান' প্রভৃতি। ইনি প্রহসন, গীতিনাট্য এবং অনেক গানও রচনা করেছেন। এঁর সমস্ত নাটকে তিনি আটশ'র বেশি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু, আশ্চর্য, প্রতিটি চরিত্রের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই শিল্পকর্ম অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক। শুধু নাট্যকার হিসেবে নয়, অভিনেতা হিসেবেও ইনি ছিলেন বিশেষ দক্ষ।

গিরিশচন্দ্র অনুবাদেও যে কতখানি দক্ষ ছিলেন বাংলা 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকই তার প্রমাণ। নাটক রচনায় ইংরেজ নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়ারই ছিলেন গিরিশচন্দ্রের আদর্শ, তাই তাঁর রচনায় শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ করা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অন্যান্য নাট্যকার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও নাট্যকার হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইনি ঐতিহাসিক নাটকই বেশি রচনা করেছেন। 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবারপতন' প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটকের অন্তর্গত। হাস্যরস সৃষ্টিতেও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শুধু নাটকই নয়, গান এবং ব্যঙ্গকবিতায়ও এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' যেমন বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিল তেমনি মুগ্ধ করেছিল তাঁর রচিত স্বদেশপ্রীতিমূলক গানগুলি। তাঁর রচিত "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আমার দেশ", "ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র" অথবা "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" কিংবা "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" প্রভৃতি গানগুলি এক সময়ে বাঙ্গালীকে স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এখনও এ সব গান শুনলে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে।

এ যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, মনোমোহন বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত ও ফরাসী নাটকের অনুবাদগুলি এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তেমনি জনপ্রিয় ছিল তাঁর প্রহসন "অলীক বাবু"।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন আরও জনপ্রিয় নাট্যকার। তাঁর 'আলিবাবা', 'নরনারায়ণ', ভীষ্ম প্রভৃতি নাটকগুলি এখনও নানা জায়গায় অভিনীত হয়। মনোমোহন বসুর 'রিজিয়া'ও এক সময়ে প্রচুর সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তেমনি সাফল্য লাভ করেছিল অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলি—যেমন 'খাস দখল', 'বাবু', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রভৃতি। ইনিও দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

প্রবন্ধের ধারা

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে বাংলা গদ্য ভাষা প্রচলিত হবার পর প্রবন্ধ রচনারও সূত্রপাত হয় এবং এই ধারা ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও সরস প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এ যুগে প্রবন্ধকার হিসেবেও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তা ছাড়া প্রবন্ধকার হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পের ধারা

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অনেক কাহিনী ছোটগল্পের কাছাকাছি এলেও প্রকৃত ছোটগল্প একটিও লেখা হয় নি। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা ভাষায় ছোটগল্প প্রবর্তন করেন। পরের খণ্ডে আমরা সে কথা আলোচনা করব।

ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হবার ফলে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারার সঞ্চার হয়েছিল এবং রবীন্দ্রপূর্ব যুগেই বাংলা সাহিত্য সমস্ত দিক্ থেকে সমৃদ্ধ হয়ে পরবর্তী যুগের পরিপূর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করছিল।



ভাষা ও লিপির কথা

বর্ণমালার বিবর্তন

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণমালার সৃষ্টি এক স্মরণীয় ঘটনা। এর ফলে মানুষের মনের ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার পথ উন্মুক্ত হ'ল। মুখোমুখি কথা বলেই হোক, আর লিখেই হোক, একজন আর একজনকে সহজেই তার মনের কথা বলতে শিখল। সবচেয়ে বড় কথা, লিখিত জিনিস স্থায়িত্ব লাভ করে ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ্ হয়ে উঠল।

তবে এটা একদিনে হয় নি। যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের পথে চলে চলে আধুনিক বর্ণমালা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। বাংলা বর্ণমালা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কি ভাবে বর্তমান রূপে এসে পৌঁছেছে ছোটদের বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৫২৬-৫২৮) তা পড়েছ। বাংলার মত অন্যান্য ভাষার বর্ণমালাও এম্‌নি নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই বর্তমান রূপ পেয়েছে।

এর কারণ কি? বর্ণমালা সৃষ্টির বহু পরে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। আজকাল যেমন ছাপানো বইয়ের অক্ষর প্রায় একই ধরনের হয়, তখনকার দিনে তা সম্ভব ছিল না। কারণ তখন একই অক্ষর এক একজন লিপিকারের হাতে এক এক রূপ নিত।

লেখার জন্য তখন এক বিশেষ শিল্পী-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের কাজই ছিল পাথরের গায়ে, ইটের চাকতিতে, চামড়ায়, প্যাপিরাসে লেখা নকল করা। এই কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পেত। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে স্বভাবতই তাদের ঝোঁক থাকত।

পাথরের গায়ে বা ইটের চাকতিতে যারা অক্ষর খোদাই করত, স্বভাবতই তাদের হাতুড়ি, বাটালি দিয়ে আস্তে আস্তে পাথর খোদাই করতে বা তীরের মত তীক্ষ্ণ শলা দিয়ে ইটের চাকতির উপর লিখতে প্রায় একই রকম ধৈর্যের প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু প্যাপিরাস বা ঐ জাতীয় 'কাগজের' উপর শরের কলম দিয়ে যাদের লিখতে হ'ত তারা এতটা ধৈর্য ধরা দরকার মনে করত না। তাদের চেষ্টা থাকত অক্ষরগুলিকে যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজানো,

আর সে সাজানো যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই তাদের লাভ।

ফলে অক্ষরের মাত্রা, অক্ষর সাজানো, এমন কি অক্ষরের চেহারা পর্যন্ত একটু একটু করে পাল্টাতে লাগল। কারো লেখা জড়ানো, কারো লেখা পরিষ্কার হতে লাগল। ফলে বর্ণমালার ছাঁচেরও একটু একটু করে পরিবর্তন শুরু হ'ল।

অলঙ্করণ

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। লিপিকারেরা তাদের লেখার মধ্যে শিল্পকর্মকে বেশ উঁচু স্থান দিতে শুরু করল। অর্থাৎ তারা বই বা পুঁথি নকল করার সময় তার মধ্যে নানা অলঙ্করণের বৈচিত্র্যও আনতে লাগল। কালক্রমে এই অলঙ্করণ একটি উঁচু পর্যায়ের আর্টে পরিণত হ'ল। আমাদের দেশেও মুসলমান আমলে কোন কোন ধর্মপ্রাণ সম্রাট্ নিজ হাতে কোরাণ নকল করতে গিয়ে তার পাতায় পাতায় চমৎকার কারুকর্মের নিদর্শন রেখে গেছেন। এখানে অষ্টম শতাব্দীতে হাতে-লেখা বাইবেলের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হ'ল। এ থেকে বুঝতে পারবে তখনও হাতে-লেখা পুঁথিতে অলঙ্করণের কাজ কি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।



৮ম শতাব্দীর হাতে-লেখা বাইবেলের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

প্রাচীন যুগের লেখার উপাদান

এখানে একটা কথা বলা দরকার। লেখার কাজটা আজকাল যত সহজ প্রাচীন যুগে মোটেই তা ছিল না। তোমরা জান লেখার প্রধান উপকরণ হ'ল কাগজ, কলম, কালি। প্রাচীন যুগে এদের কোনটাই সহজলভ্য ছিল না।

তা হলে তখনকার মানুষ কিসে লিখত? কি করে লিখত? মানুষের প্রথম 'কাগজ' ছিল পাহাড়ের গা। কলম ছিল ছেনি, বাটালি জাতীয় তীক্ষ্ণধার জিনিস। পাথর খুদে খুদে লিখতে হ'ত। সে লেখা আধুনিক বর্ণলিপি নয়, সে ছিল চিত্রলিপি। বর্ণমালা



মিশরের চিত্রলিপি

সৃষ্টির পর পাহাড়ের গায়ে বা পাথরে চিত্রলিপির পরিবর্তে বর্ণলিপি খোদাই শুরু হ'ল। সুবিখ্যাত রোজেটা পাথরের ছবি তোমরা ছোটদের বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখেছ (পৃঃ ৫২৪)। নীচে তেমনি আর একটি প্রস্তরলিপির ছবি দেওয়া হ'ল। এটা প্রাচীন যুগের মিশরীদের কীর্তি। ইতিহাসে এটি



পালারমো পাথর

পালারমো পাথর নামে খ্যাত। রাজা নেফেরুর রাজত্বকালে জাহাজ তৈরির ও বিজিত রাজ্য থেকে লুণ্ঠনের বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশেও হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা, বিশেষ করে সম্রাট্ অশোক তাঁর অনেক আদেশ-উপদেশ পাথরের গায়ে খোদাই করিয়ে প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করিয়েছিলেন। এগুলিকে বলা হয় প্রস্তর-লিপি বা প্রস্তর-অনুশাসন। এগুলির একটা বড় সুবিধে এই যে একবার খোদাই করার পর লেখা সহজে নষ্ট হয় না। তবে এ ভাবে পাথর খোদাই



পাথরের গায়ে খোদাই করা অশোকের অনুশাসন

করে বই লেখা চলে না। তা ছাড়া এগুলি নাড়াচাড়া করাও সহজসাধ্য নয়।

কাজেই তখনকার মানুষ ভাবতে লাগল পাথর ছাড়া আর কিসের ওপর লেখা যায়? এ প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দেখা দিল সেই সব জায়গায় যেখানে পাথর সহজলভ্য নয়।

ছোটদের বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ডে তোমরা বাণমুখো বা কীলক আকারে লেখা ইটের ছবি দেখেছ (পৃঃ ৫২২)। মাটির ইট তৈরি করে তার উপর তীরের মত শক্ত শলা দিয়ে এ সব লেখা হ'ত। তার পর সেই ইট আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হ'ত—যাতে সহজে নষ্ট না হয় বা ভেঙ্গে না যায়।

তোমাদের মধ্যে যাদের পাড়াগাঁয়ের অভিজ্ঞতা আছে তারা দেখে থাকবে, গাঁয়ের মেয়েরা মাটির চাকতি দিয়ে কি ভাবে নাড়ু বা সন্দেশের ছাঁচ তৈরি করে। প্রথমে এঁটেল মাটি জলে বেশ করে ছেনে নেওয়া হয়। তার পর যে আকারের ছাঁচ হবে মাটির তালটিকে সেই আকারে আনা হয়। তার পর ওটা সামান্য একটু শুকোলে, অথচ নরম থাকতে থাকতে, নরুণ দিয়ে তার একদিকে সুন্দর সুন্দর নক্সা খোদাই করা হয়। সব শেষে আগুনে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়। এই সব ছাঁচের ফুলফল, লতাপাতা ইত্যাদি নক্সার কি বাহার!

আর যারা শহরে ময়রার দোকানে সন্দেশ করতে দেখেছ, তারাও লক্ষ করে থাকবে কারিগরেরা কাঠের ছাঁচে ছানা দিয়ে শঙ্খ, আতা, তালশাঁস, মাছ, লিচু ইত্যাদি কত রকমের সন্দেশ তৈরি করে! তফাৎ এই যে, সন্দেশের ছাঁচগুলি মাটির নয়, কাঠের। ছোট ছোট বাটালি দিয়ে কাঠ খোদাই করে এই সব ছাঁচ তৈরি হয়।

প্রাচীন গ্রন্থাগার

নাড়ু-সন্দেশের কথা থাক, আবার সেই মাটির ইটের কথায়ই ফিরে আসা যাক। আজকাল যেমন ছাপাখানায় কাগজ ছেপে বই বাঁধাই হয়, তখনকার দিনে এই মাটির ইট দিয়েই বই তৈরি হ'ত। কথাটা শুনতে অদ্ভুত শোনালেও, সত্যি। তবে সে বই বাঁধানো যেত না। ইটগুলি পর পর সাজান থাকত, আর একটি একটি করে পড়তে হ'ত।

বর্তমান তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকার উত্তর-পূর্বে আসুর নামে একটি প্রাচীন রাজ্য ছিল। তার একজন রাজার নাম ছিল আসুরবানীপাল। তাঁর রাজত্বকাল



আসুরবানীপালের গ্রন্থাগারের একটি অভিধানের অংশ

ছিল খৃঃ পূঃ ৬৬৮ থেকে খৃঃ পূঃ ৬২৬। নানা রকম বই সংগ্রহ করা ছিল তাঁর বাতিক। এ ভাবে তিনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। তাতে বইয়ের সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার। সে যুগে একটি গ্রন্থাগারে এতগুলি বইয়ের সংগ্রহ বড় কম কথা নয়!



ইটের উপর লেখা ভেষজ-বিজ্ঞানের বইএর একটি পাতা

পণ্ডিতেরা সেই গ্রন্থাগারের ১০।১২ হাজার বইয়ের অংশ অর্থাৎ ইট আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে আছে অভিধান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিজ্ঞান, ইতিহাস, মানচিত্র ইত্যাদি নানা ধরনের বই। অমূল্য সম্পদ্ হিসেবে সেগুলি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এখানে রাজা আস্থরবানীপালের গ্রন্থাগারের ছু'টি বইয়ের পাতা বা ইটের ছবি দেওয়া হ'ল। একটি অভিধানের অংশ, দ্বিতীয়টি মেটিরিয়া মেডিকা বা ভেষজ-বিজ্ঞানের একটি পাতা।

রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে আলেকজেন্দ্রিয়াতেও এক বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। তার গ্রন্থসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও বেশি। এইসব গ্রন্থ ছিল প্যাপিরাসে তৈরি। দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিত ও জিজ্ঞাসুর দল সর্বদাই এখানে নতুন জ্ঞানলাভের আশায় আসতেন। তখনকার দিনে কোন বই গ্রন্থাগার থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। গ্রন্থাগারে বসেই পড়তে হ'ত বা দরকার হলে টুকে নেওয়া যেত। রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ২৭২ খৃষ্টাব্দে এই মূল্যবান্ গ্রন্থাগারটি শত্রুদের হাতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

নতুন উপকরণের অনুসন্ধান

ইটের উপরেই হোক বা প্যাপিরাসের উপরেই হোক—এ ধরনের বই লেখা, পড়া বা রক্ষা করা—কোনটাই সহজ ছিল না। আগেই



আস্থরবানীপালের গ্রন্থাগার



দু'জন প্রাচীন লিপিকার

বলা হয়েছে, এ সব বই লেখার জন্য এক বিশেষ শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে এই রকম দু'জন প্রাচীন লিপিকারের ছবি দেওয়া হ'ল। এঁদের মধ্যে একজন আসিরিয়ান, তাঁর মুখে লম্বা দাড়ি। ইনি মাটির ইটের উপর কিউনিফর্ম লিপিতে অক্ষর খোদাই করছেন। দ্বিতীয় জন আরেমিক। ইনি শরের কলম দিয়ে প্যাপিরাসের উপর লিখছেন।

পাথর বা ইট ছাড়া মানুষ ক্রমে ক্রমে লেখার জন্য যে সব জিনিস ব্যবহার করতে থাকে তা হ'ল চামড়া, প্যাপিরাস, পার্চমেন্ট, ভূর্জপত্র, তালপাতা, কলাপাতা, ব্রোঞ্জ, সিল্ক এবং সর্বশেষে কাগজ।

লেখার সব চেয়ে পুরোনো নমুনা পাওয়া গেছে সুমের দেশের ইবেক নগরে। এখানকার মাটি খুঁড়ে যে লেখা-ইটগুলি আবিষ্কার করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু হ'ল মন্দিরের হিসেবপত্র। ঠিক তার পরের যুগে আক্কদের জেমদেৎ নাস্র্‌এও যে লেখাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তাদেরও বিষয়বস্তু এক। সুতরাং ধনসম্পত্তির হিসেবপত্র রাখবার তাগিদেই যে প্রথমে লেখার আবিষ্কার হয়েছিল এমন অনুমান করা যায়। এই লেখাগুলির জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৩২০০ সাল।

ডেড্‌ সী স্ক্রল্

পশুচর্মের উপর লেখা যে এক সময় খুবই চলতি ছিল সাম্প্রতিক কালেও তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লেখার ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, আর এ আবিষ্কারের কাহিনীটিও চমৎকার।

জর্ডন ও ইসরাইলের মধ্যে যে লবণাক্ত হ্রদটি আছে, তার নাম ডেড্‌ সী। বাংলায় একে বলা হয় মরুসাগর। কেউ কেউ মৃতসাগরও বলেন। এর জল এত বেশি লোনা যে কোন মাছই এখানে বেঁচে থাকতে পারে না। এত বেশি লোনা বলে জলও এত ভারী যে কোন সাঁতারুরই এখানে ডুবে মরার আশঙ্কা নেই। আনাড়িদের সাঁতার শিখবার চমৎকার জায়গা বটে!

আরব দেশের একটি রাখাল বালক তার হারানো ভেড়ার পালের খোঁজে এই ডেড্‌ সীর উত্তর-পশ্চিম দিকে এক পাহাড়ে ওঠে। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, পাহাড়ের গায়ে একটি প্রকাণ্ড গুহার মুখ। খেলার ছলে সে সেই গুহার মুখে পর পর



জালার ভিতরে আছে শুধু তাড়া তাড়া ভেড়ার চামড়া।

কয়েকবার ঢিল ছোঁড়ে। একবার ঢিল ছুঁড়তেই তার কানে এল কি যেন ভাঙল। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পটি তার শোনা ছিল। তাই তার মনে হ'ল, গুহার ভিতরে বোধ হয় লুকানো ধনরত্ন আছে। এক সঙ্গীকে নিয়ে সাহসে ভর করে সে সেই গুহায় প্রবেশ করে দেখে সারি সারি মাটির জালা, সরা দিয়ে মুখ বন্ধ। ঢাকনা সরাতেই দেখা গেল, ভেতরে ধনরত্ন কিছুই নেই, আছে শুধু কাপড়ে জড়ানো তাড়া তাড়া ভেড়ার চামড়া। একটার সঙ্গে আর একটা সেলাই করা।

এটি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের কথা। এই চামড়ার তাড়াগুলিই 'ডেড সী স্ক্রল্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্ক্রল্ বলতে বোঝায় গোল করে পাকানো পুঁথি। অনেকগুলি স্ক্রল্ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ২৪ ফুট লম্বা, আর সবচেয়ে ছোটটি ৩ ফুট। আলকাতরার মত কালো কালিতে হিব্রু অক্ষরে গোটা ওল্ড টেষ্টামেণ্টটি এতে লেখা। বর্তমানে প্রচলিত ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছে খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতকে। এই পুঁথিগুলি তারও অনেক আগে খৃষ্টপূর্ব যুগের লেখা।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই পুঁথিগুলি ঐ ভাবে ওখানে রাখা হয়েছিল কেন? এই গুহা থেকে প্রায় দু'শ' ফুট দূরে প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা একটি ভগ্নস্তূপ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে এটি ছিল ইহুদীদের একটি ধর্মমন্দির। তখনকার দিনে এই সব ধর্মমন্দিরে পুঁথি নকল করার একটি ঘর থাকত। এই মন্দিরেও তেমন একটি ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তা ছাড়া সে ঘরে আরও পাওয়া গেছে একটি টেবিল ও কয়েকটি দোয়াত। একটি দোয়াতে কালিও শুকিয়ে আছে। এখানে বসেই মন্দিরের কোন পুরোহিত পুঁথিগুলি লিখেছিলেন—পণ্ডিতদের এই অনুমান।

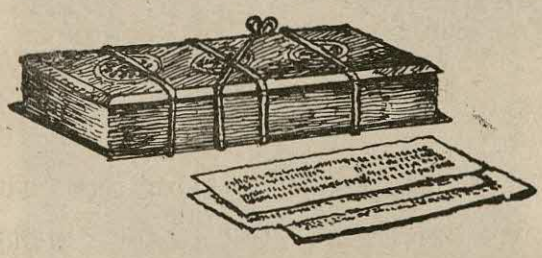
এ ছাড়া কয়েকটি পুরোনো মুদ্রা ও অন্যান্য নানা তথ্য পরীক্ষা করেও তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ৬৮ খৃষ্টাব্দে রোমান বাহিনীর

আক্রমণের ভয়ে মন্দিরবাসী ইহুদীরা তাদের এতদিনের পরিশ্রমের ফল, তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই পুঁথিগুলি জালায় ভরে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয়ে আমাদের দেশেও হিন্দু পুরোহিতেরা দেবতার ধনরত্ন এমনি করেই মন্দিরের গর্ভগৃহে লুকিয়ে রাখত।

এই গুহার আশেপাশে অন্যান্য গুহায়ও এ রকম আরও লুকানো পুঁথি পাওয়া গেছে। সব পুঁথিগুলির পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। তাদের পাঠোদ্ধার হলে হয়তো অনেক নতুন মূল্যবান্ তথ্য জানা যাবে।

এদেশের পুঁথি

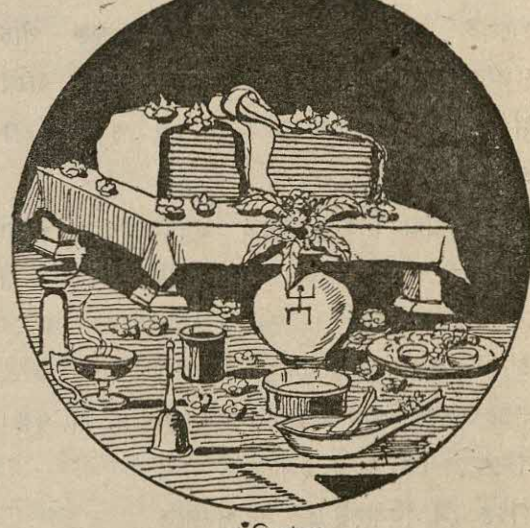
মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের আগে সব দেশেই সব পুঁথি হাতে লেখা হ'ত। এ দেশেও ভূর্জপাতায় ও তালপাতায় লেখা অনেক প্রাচীন



এদেশের পুঁথি

পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। অবহেলায়, অযত্নে অনেক পুঁথি নষ্টও হয়ে গেছে। কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে অনেক পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এখানকার বাংলা পুঁথির সংগ্রহ অতি মূল্যবান্ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষকদের কাছে অপরিহার্য।

যে সব পাড়াগাঁয়ে এখনও শিক্ষার আলো প্রবেশ করে নি সেখানে তালপাতা বা তুলট



পুঁথি পূজা

কাগজে লেখা শনি বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী কিংবা মনসামঙ্গল বা চণ্ডী ছাপাখানায় ছাপা বইএর চাইতে অনেক বেশি পবিত্র মনে করা হয়। অনেক বাড়ীতে চণ্ডীর পুঁথিকে দেবদেবীর মত পূজোও করা হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের প্রথম যুগে পাশ্চাত্য দেশেও মুদ্রিত পুস্তকের চেয়ে হাতে-লেখা পুঁথির বেশি আদর ছিল। এখন অবশ্য পুরোনো পুঁথির ঐতিহাসিক বা গবেষণার মূল্য ছাড়া আর কোন বিশেষ মূল্য নেই। ছাপা বই পেলে এখন আর কেউ হাতে-লেখা পুঁথি পড়বার কষ্ট করতে চায় না। শুধু পণ্ডিত আর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের কাছেই এখন তাদের সমাদর।

মৃতের পুস্তক

মিশর দেশে যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে পুরোনো হ'ল 'মৃতের পুস্তক'। এই পুঁথির কোনও কোনও অংশ পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন। পিরামিড-

গুলির বয়স খৃঃ পূর্ব ৩০০০ থেকে খৃঃ পূর্ব ২৩০০। কাজেই মৃতের পুস্তকের বয়স অন্তত পাঁচ হাজার বছরের কম হবে না। মিশরের রাজা বা ফ্যারাওদের কবরের মধ্যে এই পুঁথির এক একটি অংশ রাখা হ'ত।

মিশরীরা বিশ্বাস করত জীবিতাবস্থায় তারা যে ভাবে জীবন যাপন করে মৃত্যুর পরেও তারা সেই ভাবেই চলবে। তাই ফ্যারাওদের কবরে তাঁদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হ'ত, যাতে তাঁদের কোন অভাব বা অসুবিধে না হয়। পরলোকে কি ভাবে চলাফেরা করা উচিত সে বিষয়েই এই সব পুঁথিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ থাকত।

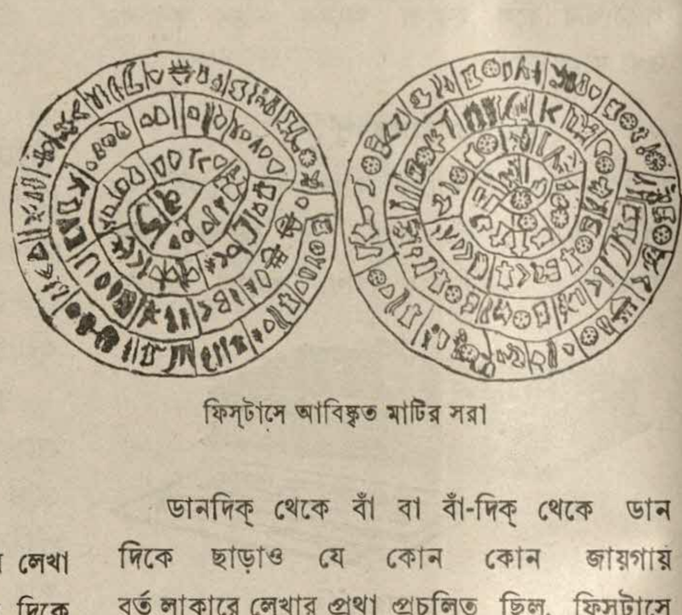
লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে এই মৃতের পুস্তকের কিছু কিছু অংশ সযত্নে রাখা আছে। এই পুঁথি থেকে প্রাচীন মিশরের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়।

লেখার রীতি-পরিবর্তন

প্রথম দিকে যখন পাথর খোদাই করে লেখা হ'ত তখন অক্ষরগুলি উপর থেকে নীচের দিকে খোদাই হ'ত। এইভাবে এক একটি স্তম্ভ তৈরি হ'লে তার বাঁ-দিকে আর একটি স্তম্ভ খোদাই হ'ত। এই স্তম্ভগুলি ছিল ছোট ছোট। একখানা পাথরে এ ধরনের অনেকগুলি ছোট ছোট স্তম্ভের সারি থাকত। এগুলি ডানদিক্ থেকে বাঁ-দিকে পড়তে হ'ত।

পরে যখন মাটির চাকতিতে লেখা শুরু হ'ল তখন লেখার রীতিরও আমূল পরিবর্তন হ'ল। আজকালকার মতই তখন বাঁ-দিক্ থেকে ডান দিকে লেখার চলতি হ'ল, আর স্তম্ভের পরিবর্তে প্রায় আজকালকার মতই লাইন শুরু হ'ল তখন থেকে।

ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা ছাড়া অন্যান্য সব ভাষারই বর্তমান লেখার রীতি হচ্ছে বাঁ-দিক্ থেকে ডানদিকে এক এক লাইন করে লেখা। অবশ্য চীনে ও জাপানী ভাষায় এখনও লেখা হয় ওপর থেকে নীচে। সে লেখা হয়তো তোমরা অনেকে দেখেও থাকবে।



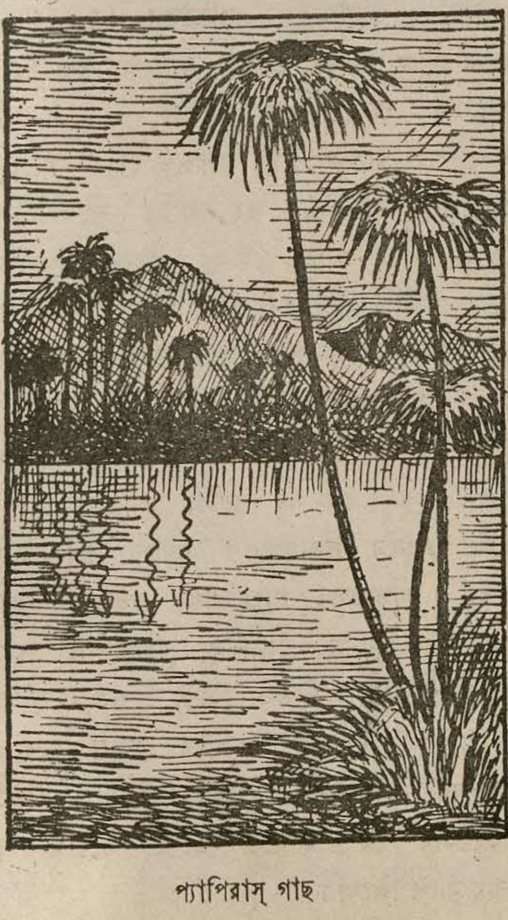
ফিস্টাসে আবিষ্কৃত মাটির সরা

ডানদিক্ থেকে বাঁ বা বাঁ-দিক্ থেকে ডান দিকে ছাড়াও যে কোন কোন জায়গায় বর্তুলাকারে লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল, ফিস্টাসে আবিষ্কৃত একটি মাটির সরা তার প্রমাণ। এই সরাটির লেখা একেবারে ধারের দিক্ থেকে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে ঘুরে ঘুরে ভিতরের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এশিয়া মাইনরের বিপরীত দিকে অবস্থিত লাইসিয়া এই লেখার জন্মভূমি। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই লেখার প্রত্যেকটি অক্ষরই আলাদা আলাদা ছাঁচে তৈরি।

প্যাপিরাস

এবার প্যাপিরাসের কথা বলা যাক। প্রাচীন মিশরে নীল নদের মোহানার দিকে প্যাপিরাসের প্রচুর চাষ হ'ত। গাছগুলি অনেকটা নলখাগড়ার মত। লম্বায় তিন থেকে দশ ফুট পর্যন্ত, পাতাগুলিও বেশ লম্বা। পাতার নীচের দিকে যে লম্বা শিরা আছে তা বেশ ধারালো। গাছের ডগার দিকে ফুল ফোটে।

মিশরে প্যাপিরাসের অনেক রকম ব্যবহার ছিল। ছোটগুলি দিয়ে বোনা হ'ত ঝুড়ি। বড়গুলি একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি হ'ত—আমাদের দেশেও যেমন কলাগাছের ভেলা বাঁধা হয়।



প্যাপিরাস্ গাছ

আঁশ থেকে তৈরি হ'ত দড়ি, নৌকোর পাল, চাঁদোয়া, পাপোষ ইত্যাদি গৃহস্থের বহু প্রয়োজনীয় জিনিস। গাছের শাঁস ছিল গরীব মিশরীদের প্রধান খাদ্য। শিকড়গুলি শুকিয়ে হ'ত জ্বালানী। তা ছাড়া নানা তৈজসও তৈরি হ'ত। এ যেন আমাদের দেশের কলা বা নারকেল গাছের মত—পাতা থেকে শিকড় পর্যন্ত একটা না একটা কাজে লাগেই!

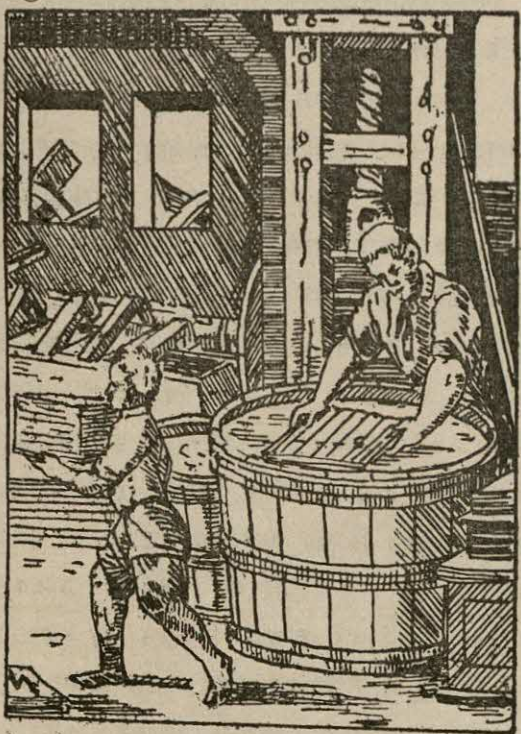
কিন্তু প্যাপিরাসের প্রধান ব্যবহার ছিল—এ দিয়ে রোল করা এক রকম কাগজ তৈরি করা। সে কাগজকেও বলা হ'ত প্যাপিরাস্। গাছের আঁশগুলি বের করে জলে ভিজিয়ে রাখলেই তা থেকে আঠা বেরুত। সেই আঠা বেরুনো আঁশগুলি প্রথমে পাশাপাশি বিছিয়ে তার উপর আর এক স্তর আঠা-বেরুনো আঁশ আড়াআড়ি ভাবে রাখা হ'ত। এ ভাবে দু'টি বা তিনটি স্তর সাজিয়ে তার উপর খুব ভারী কিছু চাপা দেওয়া হ'ত। এই চাপের ফলে আঁশ থেকে জল ঝরে এগুলি শুকিয়ে একসঙ্গে জোড়া লেগে যেত। তখন উপরের দিক্‌টা পাথর বা হাতীর দাঁত দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নিলেই লিখবার চমৎকার উপাদানে পরিণত হ'ত। মিশরের বহু প্রাচীন পুঁথিই এই প্যাপিরাসের উপর শরের কলম দিয়ে লেখা। প্যাপিরাস্ কথাটা থেকেই বর্তমানের 'পেপার' কথাটির উৎপত্তি। ('কাগজ' কথাটা ফার্সী শব্দ। চীনে নাকি ওকে বলা হ'ত 'কায়গদ্')। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্যাপিরাস্ রোলের খুব প্রচলন ছিল। তার পর কাগজ আবিষ্কারের ফলে প্যাপিরাসের ব্যবহার কমতে কমতে একবারে হ্রাস পায়।

মিশরে আর আজকাল প্যাপিরাসের তেমন

চাষ হয় না। এখন প্যাপিরাস্ পাওয়া যায় শুধু মিশরের দক্ষিণাংশে, সিরিয়া ও আবিসিনিয়ায়।

কাগজ

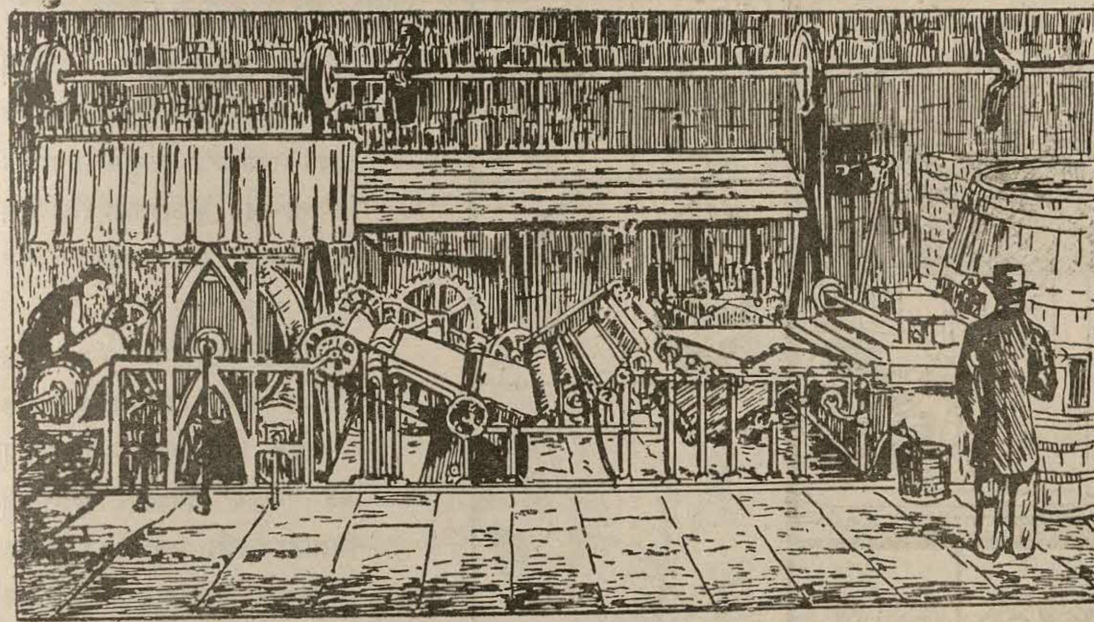
কাগজ আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব চীনের ৎসাই লুনের। আনুমানিক ১০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গাছের ছাল, শণ, ছেঁড়া কাপড়, মাছধরা ছেঁড়া



১৫৬৮ সালের একটি কাগজ তৈরির কারখানা
(জার্মান উড ব্লক থেকে)

জাল থেকে কাগজ তৈরি করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের তথ্য ৭৫১ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দে পৌছয়। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবেরা কাগজ তৈরির কৌশল প্রথমে সিসিলি এবং পরে স্পেনে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে তা যায় ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলে। প্রথমে ইয়োরোপে কলে তৈরি কাগজের তেমন আদর হয় নি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর স্বভাবতই কাগজের চাহিদা দ্রুত বর্ধিত হয়। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই বড় বড় কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বড় বড় কাগজের কলগুলি হ'ল—টিটাগড়, ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প্, ষ্টার, ওরিয়েন্ট, বেঙ্গল, নেপা ইত্যাদি। এখানে প্রাচীন যুগের একটি কাগজের কলের ছবি দেওয়া হ'ল।

কাগজের কল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কাগজ তৈরির উপাদানেরও পরিবর্তন হতে থাকে। এখন অবশ্য বিভিন্ন ধরনের কাগজের জন্য বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হয়। তবে এদেশে বাঁশ ও সেবাই ঘাস-ই বেশি ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশে- বেশি ব্যবহৃত হয় কাঠের মণ্ড। বাঁশই হোক আর কাঠই হোক, প্রথমে সেগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করা হয়। তারপর সেগুলিকে রাসায়নিক দ্রব্যে সিদ্ধ করে মণ্ডে পরিণত করা হয়। সেই মণ্ডকে 'ব্লিচ্' অর্থাৎ সাদা করে এবং সেই সঙ্গে পরিশুদ্ধ করে নানা প্রক্রিয়ায় কাগজ তৈরি হয়। সে সব জটিল প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। এখানে শুধু কয়েক রকম কাগজের নামোল্লেখ করছি: আর্ট, আইভরি ফিনিস্, অ্যান্টিক্, সেলুলোজ, ব্যাঙ্ক, ম্যাপ লিথো, নিউজ প্রিন্ট, বোর্ড, ক্র্যাফ্ট্ ইত্যাদি। এক-এক রকমের কাজে এক-এক রকমের কাগজের প্রয়োজন হয়। ছোটদের বিশ্বকোষ যে কাগজে ছাপা হয়েছে তার নাম ম্যাপ লিথো।



উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের একটি কাগজের কল

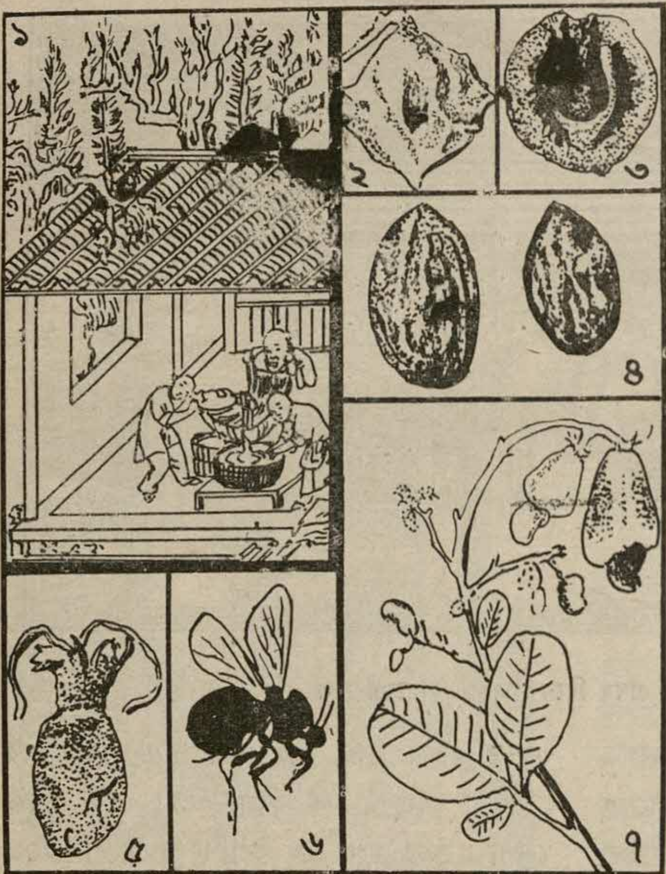
আমাদের দেশে হাতে তৈরি এক রকম কাগজ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় তুলট কাগজ। কাগজের কলের প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতই এই কাগজের চাহিদা অনেক কমে গেছে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এই কাগজের আদর আবার একটু একটু করে বাড়তে থাকে। এখনও অনেক স্বদেশপ্রেমিক নেতা তাঁদের চিঠিপত্রের জন্য এই কাগজ ব্যবহার করে থাকেন। মাঙ্গলিক কাজেও তুলট কাগজ ব্যবহার করা অনেকে পছন্দ করেন।

কালি

এবার কালির কথা বলা যাক। প্রাচীন কাল থেকে 'ভেলা' কালির প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এশিয়া মাইনরের এক শ্রেণীর গাছের কচি ডালে বোলতার মত এক ধরনের মাছি ছোট ছোট গর্ত করে ডিম পেড়ে রাখে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গর্তগুলি ঢেকে যায় আর সেখানটা ফোঁড়ার মত ফুলে ওঠে। এই হচ্ছে 'ভেলা'। এর মধ্যে যে ট্যানিন্ আছে তাই হচ্ছে কালির মূল্যবান্ উপাদান।

ধোপারা একে বলে ভেলা গোটা। পশারী দোকানে এগুলি পাওয়া যায়। এই ভেলার কালি দিয়েই ধোপারা কাপড়ে মার্কা দিয়ে থাকে। এখন অ্যানিলিন্ রং, ভেলা গোটা, হিরাকস মিশিয়ে লিখবার কালি তৈরি হয়।

আজকাল অবশ্য রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর এবং নানা উঁচুদরের কালিও তৈরি হচ্ছে। কালি তৈরির কয়েকটি উপাদানের ছবি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল। আমাদের দেশে এখনও হরতুকী, আমলকী, বহেড়া, হিরাকস দিয়ে সুন্দর কালি তৈরি হয়। আমরা যখন পাঠশালার পড়ুয়া ছিলাম তখন



(১) প্রাচীন চীনে কি ভাবে কালি তৈরি করা হ'ত। (২)-(৭) কালি তৈরির বিভিন্ন উপাদান : (২), (৩) ভেলা গোটা। (৪) হরতুকী। (৫) কাট্‌ল্ ফিশ্,—এই মাছের গ্রন্থি থেকে সিপিয়া কালি তৈরি হয়। (৬ গল্ ফ্লাই। (৭) একরকম দেশী কষ ফল।

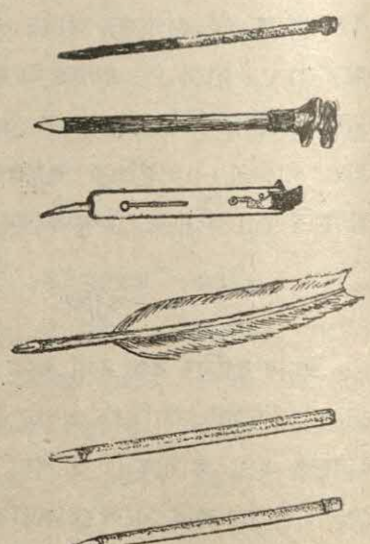
কলাপাতায় লিখবার জন্য নিজেরাই এই ধরনের কালি তৈরি করে নিতাম। শুধু তফাৎ এই যে, হিরাকসের পরিবর্তে আমরা সাধারণ লোহা ব্যবহার করতাম। (হিরাকস হচ্ছে লোহা, গন্ধক আর অক্সিজেন-ঘটিত একটি পদার্থ—ফেরাস্ সালফেট)। শুকনো আমলকী, হরতুকী, বহেড়া ও লোহার কয়েকটি টুকরো একটা মাটির ছোট হাঁড়িতে জলে ভিজিয়ে কয়েক দিন রাখলেই চমৎকার কালো কালি তৈরি হ'ত। এবার শুধু ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিলেই হ'ল।

কলম

পাহাড়ের গুহায় দেয়াল যেমন ছিল প্রাচীন যুগের মানুষের প্রথম 'কাগজ', তেমনি চকমকি বা পাথরের ছুঁচলো মুখই ছিল তার প্রথম 'কলম'। তার পর আসে শরের কলম।

রোমে বহুদিন পর্যন্ত এক ধরনের কলম ব্যবহার করা হ'ত—তাকে বলা হ'ত স্টাইলাস্। এই কলম দিয়েই জুলিয়াস্ সিজারকে হত্যা করার পর থেকে এ কলমের ব্যবহার ধীরে ধীরে লোপ পায়।

ক্রমবিবর্তনের ফলে এখন আমরা কত রকমের কলমই না ব্যবহার করছি!—স্টীল পেন, ফাউণ্টেন পেন্, ডট্ পেন্ ইত্যাদি। আমাদের ছোটবেলায় আমরা



নানা ধরনের কলম

খাগের কলম, বাঁশের কঞ্চির কলম, হাঁস বা ময়ূরের পালকের কলমে লিখেছি। ছুরি দিয়ে এই সব কলম কাটা হ'ত বলে এখনও ছোট ছোট ছুরিকে ইংরেজিতে পেন্-নাইফ্ বলা হয়। আগের পৃষ্ঠায় আগের দিনের কয়েকটি কলমের ছবি দেওয়া হ'ল।

হাতে-লেখা পুঁথি

পশ্চিম দেশে যেমন প্যাপিরাস্ বা পার্চমেণ্টে পুঁথি লেখা হ'ত, প্রাচীন যুগে চীন দেশে তেমনি পাতলা কাঠের বোর্ডে পেন্সিল দিয়ে লেখা হ'ত। কালক্রমে সেখানে পেন্সিলের বদলে কালি দিয়ে লেখার চল হ'ল। চীনে কালি আজও সুবিখ্যাত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখনও ছবি আঁকার জন্য চীনে কালি ব্যবহৃত হয় এবং তা সাধারণত চীন ও জাপানেই বেশি তৈরি হয়।

দুঃখের বিষয় কাঠের ফলকে লেখা চীনে পুঁথি আর পাবার উপায় নেই। কারণ খৃঃ



আগেকার দিনে চীন দেশে পাতলা কাঠের বোর্ডে পেন্সিল দিয়ে লেখা হ'ত।

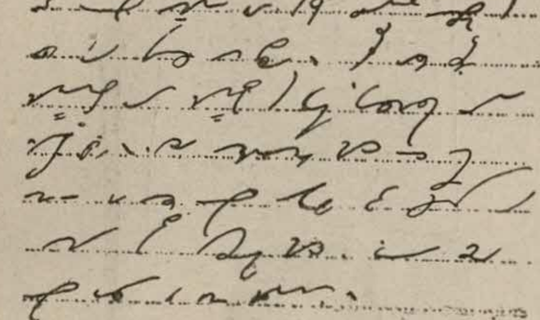


সেকালের লেখা, দোয়াত ও কলম

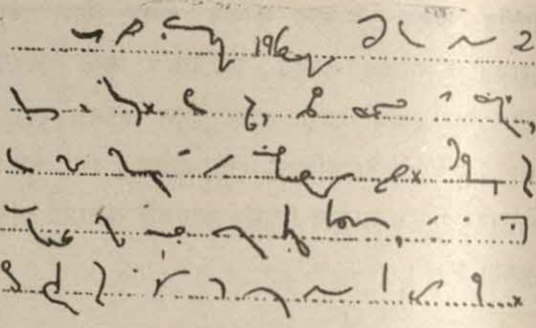
পূর্ব ২১৩ অব্দে তদানীন্তন চীন-সম্রাটের আদেশে চীনের এ সমস্ত পুঁথি পুড়িয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করা হয়। এর ফলে পরবর্তী কালে চীন দেশে লেখার ব্যাপারে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এবার চীনেরা কাঠের ফলকের পরিবর্তে রেশমী কাপড়ে লেখা শুরু করে। এজন্য তারা বাঁশের কলম বা ব্রাশ ব্যবহার করত। ক্রমে তারাই কাগজও আবিষ্কার করে—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ওপরে প্রাচীন কালের লেখা, দোয়াত ও কলমের ছবি দেওয়া হ'ল।

টাইপ রাইটিং

মুদ্রাযন্ত্রে যেমন বই ছাপা হয়, টাইপ রাইটিং যন্ত্রেও আজকাল চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি লেখা হয়। এতে লেখা পরিষ্কার ও তাড়াতাড়ি হয়। আজকাল নানা ভাষার অক্ষরের টাইপ রাইটার পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইংরেজি ছাড়া বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি অক্ষরের টাইপ রাইটারের প্রচলন অনেকদিন আগেই হয়েছে।



গ্রীগের সাঙ্কেতিক লিপি



পিটম্যানের সাঙ্কেতিক লিপি

শর্ট হ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক লিপি

গোটা অক্ষর লিখতে সময় লাগে বলে, কোন বিষয়—বিশেষত বক্তৃতা ইত্যাদির অনুলেখনে শর্ট হ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক লিপি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লেখার রহস্য এই যে এখানে কতকগুলি সঙ্কেত বর্ণমালার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এই লিপির সুবিধে এই যে এতে মিনিটে দু'শ'-আড়াইশ' পর্যন্ত শব্দ লেখা চলে। খবরের কাগজে তোমরা বক্তৃতার যে রিপোর্ট পড়ে থাক তার সবই প্রথমে শর্ট হ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক লিপিতে টুকে নেওয়া হয়। প্রাচীন কালেও এক ধরনের সাঙ্কেতিক লিপি প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১০৬-৪৩ অব্দে রোমান রাজনীতিজ্ঞ সিসারোর বক্তৃতা সাঙ্কেতিক লিপিতেই লিখে নেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমানে যে শর্ট হ্যাণ্ড প্রচলিত তা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আইজাক্ পিটম্যান আবিষ্কার করেন। বাংলা ভাষায়ও এখন সাঙ্কেতিক লিপির প্রচলন হয়েছে।

ব্রেইল্ লিপি

যারা চোখে দেখতে পায় না তাদের পক্ষে সাধারণ বই পড়া সম্ভব নয়। তাই তাদের এক বিশেষ ধরনে লেখাপড়া শেখাতে হয়। শক্ত কাগজে সূচ ফোটালে একটা দিক্ একটু উঁচু হয়ে ফুটে ওঠে এ তোমরা অনেকেই লক্ষ করে থাকবে। অন্ধদের জন্য লেখা বই এই পদ্ধতিতেই 'ছাপা' হয়। ফলে তারা হাত দিয়ে উঁচু উঁচু ফুটোগুলি স্পর্শ করে অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। এইভাবে অনেক অন্ধ উচ্চশিক্ষাও লাভ করতে পারে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে অন্ধদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে ব্রেইল্ পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা লুই ব্রেইল্। ফরাসী দেশে তাঁর জন্ম। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর এই আবিষ্কার অন্ধদের শিক্ষার ব্যাপারে পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মাত্র ছ'টি ফুটো নানা রকম বিন্যাস করে সব রকম বর্ণমালা, সংখ্যা, যতিচিহ্ন ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থাগার

প্রাচীন কালে কোন গ্রন্থই গ্রন্থাগার থেকে বাইরে নেবার নিয়ম ছিল না। গ্রন্থাগারের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। তাই যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করত তারা গ্রন্থাগারে বসে বসেই বইটি পড়ত বা তার অংশ নকল করে

নিত। বর্তমানে সে অসুবিধা আর নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই এখন বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। যেমন ইংল্যাণ্ডের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, আমেরিকার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ফ্রান্সের বিব্‌লিওথিক ন্যাশনেল প্রভৃতি। এমন কি আমাদের কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীও বেশ বড় গ্রন্থাগার। এ সব লাইব্রেরীতে বসেও যেমন পড়াশোনা করা যায়, তেমনি ওখান থেকে বই বাড়িতে এনেও ব্যবহার করা যায়।

এই সব লাইব্রেরীতে প্রায় সকল রকমের বই—এমন কি অনেক দুষ্প্রাপ্য বইও থাকে ব'লে পণ্ডিত ও গবেষকদের পক্ষে এই সব পাঠাগার অপরিহার্য। কারণ কারও একার পক্ষে এত বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশেও পাঠাগারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, পাঠকের পাঠস্পৃহাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে কি পাই

কোন কোন পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে প্রাচীন হিন্দুরা লিখবার কাগজ হিসেবে কোন্ কোন্ জিনিস বা কোন্ কোন্ গাছের পাতা ব্যবহার করত। হরিবংশে (২৫৬।৭৬) একটি শ্লোক আছে যা থেকে জানা যায় যে লিখবার উপকরণ হিসেবে ভূর্জপত্র, তেজপত্র, তালপত্র, তাড়িপত্র, অগুরুপত্র ব্যবহৃত হ'ত। সম্ভব হলে সোনার, তামার বা রূপোর ফলকও ব্যবহার করা হ'ত। অন্যান্য পাতার মধ্যে কেতকী, অর্ক, বট এবং বকপাতারও ব্যবহার ছিল।

শ্লোকটি থেকে খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি, অর্থ তো আগেই বলে দিয়েছি।

"ভূর্জ্জে বা তেজপত্রে বা তালে বা তাড়িপত্রকে।
অগুরুণাপি দেবেশি! পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে॥
সম্ভবে স্বর্ণপত্রে চ তাম্রপত্রেণ শঙ্করি।
অন্য বৃক্ষত্বচি দেবি! তথা কেতকীপত্রকে॥
মার্ত্তণ্ডপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে।
অন্য পাত্রে বসুদলে লিখিত্বা যঃ সমভ্যসেৎ॥"

কলম সম্পর্কেও যোগিনী তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে যার অর্থ বাঁশের কলম অশুভ, তামার কলম দারিদ্র্য, সোনার কলম লক্ষ্মীলাভ, খাগের কলম মতিবৃদ্ধি, রূপোর কলম বিপুল ধনলাভ, কাঁসার কলম মৃত্যু সূচিত করে। কলম ৮ বা ১০ আঙুল লম্বা হওয়া উচিত। ৪ আঙুল কলমে পুস্তক লিখলে আয়ুক্ষয় হবে ইত্যাদি।

"বংশ-সূচ্যা লিখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তাম্র-সূচ্যা তু বিভবো ভবেন্ন তৎ ক্ষয়ো ভবেৎ॥"
ইত্যাদি।

এই অনুশাসনে খানিকটা রূপক আছে সন্দেহ নেই যার অর্থ বোঝা মুশ্‌কিল। তবে হিন্দুরা যে এ সব কলম ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল এই শ্লোক তারই পরিচয় বহন করে।

বই লেখা আমাদের দেশে একটা পুণ্য কাজ বলেও গণ্য হ'ত। দেবীপুরাণে নিজ হাতে বই লিখে দান করার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। যেমন—যে ব্যক্তি তালপাতায় নিজ হাতে ১২ হাজার শ্লোকের সংহিতা লিখে সুন্দর একখণ্ড কাপড় বা চামড়ায় জড়িয়ে তা দান করবে তার নরজন্ম সার্থক হবে। বলা বাহুল্য, এই রূপকের মধ্যেও বই লিখবারই অনুপ্রেরণা আছে।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে পুস্তক মুদ্রণ ব্যাপারে যুগান্তর ঘটেছে। পরবর্তী খণ্ডে আমরা সেই সব নিয়ে আলোচনা করব।



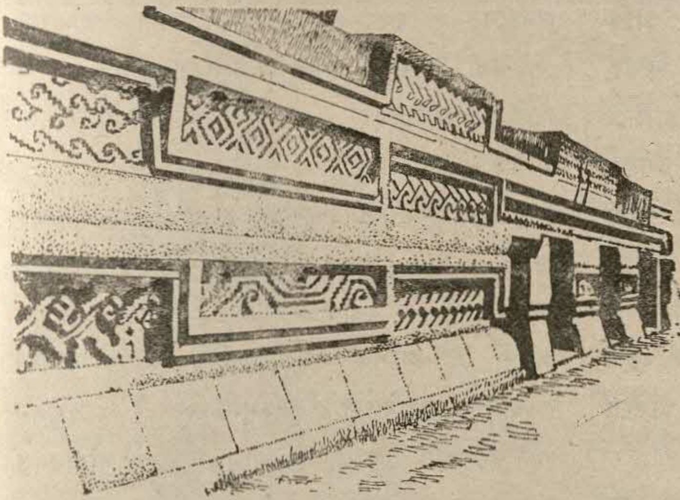
এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

মধ্যযুগের কথা

এবারে আমরা ধীরে ধীরে মধ্যযুগে চলে আসছি।

মধ্যযুগের এ ঞ্জি নী য়া রিং-কীর্তিকলাপের কাহিনী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। সাধারণত মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি? অনেকের ধারণা বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ শুরু হবার আগে বেশ কিছুটা দিন ধরে ছিল 'অন্ধকার যুগ'। কারণ সেই সময়ে মানুষের উন্নতি, আবিষ্কার এবং সংস্কৃতির ধারা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়ে ছিল। বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এক হাজার খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে ধরা যেতে পারে।

এই সময়ে বর্তমানের মানদণ্ডে অবাক্ করার মত কোন হর্ম্য বা প্রাসাদ হয়তো সত্যি গড়ে ওঠে নি, কিন্তু তখনকার দিনের সীমিত জ্ঞান আর সাজসরঞ্জামের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি নগণ্য নয়—এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। যেমন ধর বাইজেনটাইন্ স্থাপত্য ধারায় রচিত একশ' ফুট ব্যাসের গম্বুজ সান্তা সোফিয়া (৫৩৭ খৃষ্টাব্দ), র‍্যাভেনার স্যান ভিটেল গীর্জা (৫২৬-৫৪৭ খৃঃ), একেনয়ের সলেম্যানের গীর্জা (৭৯৬-৮০৪ খৃঃ), ইতালির মিলান শহরের স্যান এমব্রোগিয়োর গীর্জা, জার্মানীর লাচ শহরের গীর্জা। এদিকে ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নানা কীর্তিকলাপ, মধ্য ভারতের খাজুরাহো, দাক্ষিণাত্যের নানা মন্দির গোপুরমের মাধ্যমে ও দক্ষিণ আমেরিকার মায়া সভ্যতার প্রচুর নিদর্শনের মধ্যেও এঞ্জিনীয়ারিং-এর বৈচিত্র্যময় বিকাশ দেখা যায়। এরও আগে চীন দেশের সেই বিখ্যাত প্রাচীর,—যার ওপর দিয়ে ৫।৬ জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি ছুটে যেতে পারত,—তৈরি শুরু হয়েছিল খৃষ্টজন্মের ২০৪ বছর আগে, আর সেটি সম্পূর্ণ করতে লেগেছিল দশ বছর। দেশ-বিদেশের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯-৬০) এর কথা তোমরা আগেই পড়েছ। চীনেরা গভীর কুয়ো খুঁড়বার পদ্ধতি তখনও জানত। কখনও কখনও তারা হাজার ফুটেরও বেশি গভীর কুয়ো খুঁড়েছে পানীয় জলের সন্ধানে।



দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া সভ্যতার নিদর্শন

রাস্তা তৈরি, প্রাকৃতিক ও জৈব শক্তিকে কাজে লাগানো

মধ্যযুগে প্রাচীন রোমান রাস্তা তৈরির উদ্দীপনা সাম্রাজ্যবিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের অভাবে কিছুটা মন্থর হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা তৈরির পদ্ধতিকে ঋতু ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরে আরও উন্নতও তো করা হয়েছিল! যেমন ধরা যাক—এক স্তর বালির ওপর ভাঙ্গা পাথর সাজিয়ে আর সেই পাথরের মাঝে মাঝে ফাঁকগুলিকে বালি দিয়ে ভরাট করে রাস্তা তৈরি করার পদ্ধতি। কোথাও আবার ইট বিছিয়ে, খোয়া দিয়ে, তার ওপর বালি বা মাটি ছড়িয়ে বা মোরাম ছড়িয়ে, অর্থাৎ যেখানে যেমন স্থানীয় জিনিস পাওয়া যেত তারই সাহায্য নিয়ে রাস্তা তৈরি করা হ'ত।

তার পর গৃহপালিত বলদের বদলে শক্তিশালী ঘোড়ার ব্যবহার আরম্ভ হ'ল জমি চষতে, ভার বইতে, মানুষকে পিঠে করে বা গাড়িতে ক'রে টেনে বয়ে নিয়ে যেতে। আগে ঘোড়ার গলায় চামড়ার ফিতে বাঁধা থাকত, যার ফলে ভার টানার সময় ঘোড়ার দম নেওয়ার অসুবিধে হ'ত। পরে সে অসুবিধে দূর করতে গলায় মোটা হাঁসুলির মত চামড়ার গলাবন্ধের উদ্ভাবন হ'ল। এতে ঘোড়া তার সমস্ত শক্তি গাড়ি টানতে দিতে পারত। তারপর ঘোড়ার পাশে ও পেছনে আরও ঘোড়া যুতে আরও ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। ঘোড়ার পায়ে নাল লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, যাতে ক্ষুরে আঘাত লেগে সে খোঁড়া হয়ে না যায়। পিঠে চড়বার রেকাবি, জিন, লাগাম প্রভৃতি সংযোজিত হতে লাগল। এই সময়েই দেখা গেল ক্রীতদাস প্রথাও সাধ্যমত কমাবার চেষ্টা চলছে। যে সব শারীরিক কাজ আগে মানুষকে দিয়ে করানো হ'ত, মানুষের বদলে পশু ব্যবহার করে তা থেকে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হতে লাগল। তারপর পশুর বদলে এল যন্ত্র। নানারকম ভাবে মানুষের কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উন্নতির যে চেষ্টা তার সবই মুখ্যত এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা। এই বিদ্যা প্রয়োগের ফলে কোথাও বেশি শস্য উৎপাদন সম্ভব হ'ল, জমি চষা, জমিতে মই দেওয়া যন্ত্রের সাহায্যে চলতে লাগল। শক্তি আহরণের নানান্ ধরনের পালা শুরু হ'ল—বিশেষ ক'রে চলমান জল ও বহমান বায়ু থেকে। জল-চাকা আদিম যুগের ব্যাপার। তাতে আরও উন্নতি করা হ'ল মধ্যযুগে। যেখানে

নদীতে সব সময়ে জল থাকে সেখানে চাকি চালিয়ে ভুট্টা-গম পিষে আটা-ময়দা তৈরি ক'রে, ছুতোরের কাঠ চিরিয়ে, কামারের হাপর চালিয়ে এই জল-চাকার (ওয়াটার হুইল) ব্যবহার চলল। এই সময় জল-চাকার হাপর চালিয়ে ঢালাই লোহা গলানো ও সেই ঢালাই লোহা নানান্ কাজে লাগানোও শুরু হ'ল। এই সময়কার আর একটা বড় আবিষ্কার হ'চ্ছে সরলরেখার গতিকে ঘূর্ণায়মান অর্থাৎ পাক-খাওয়া গতিতে রূপান্তরিত করা।

প্রাগৈতিহাসিক ও মধ্যযুগের আবিষ্কারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়া হ'ল। এ ব্যাপারে যে সব মনীষীদের অবদান অতি মূল্যবান্ তার মধ্যে আর্কিমিডিসের কথা বাদ দিলে লিওনার্দ দা ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) অবদান বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। তারপর এলেন মিকেল-এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৩১); এলেন সাইমন স্টেভিন (১৫৪৮-১৬২০), এলেন হুক (১৬৩৫-১৭০৩) [যাঁর নামানুসারে হুক্‌স্ ল'], এলেন নিউটন, লাইবনিৎস্। এঁদের যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রযুক্তিবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করল।

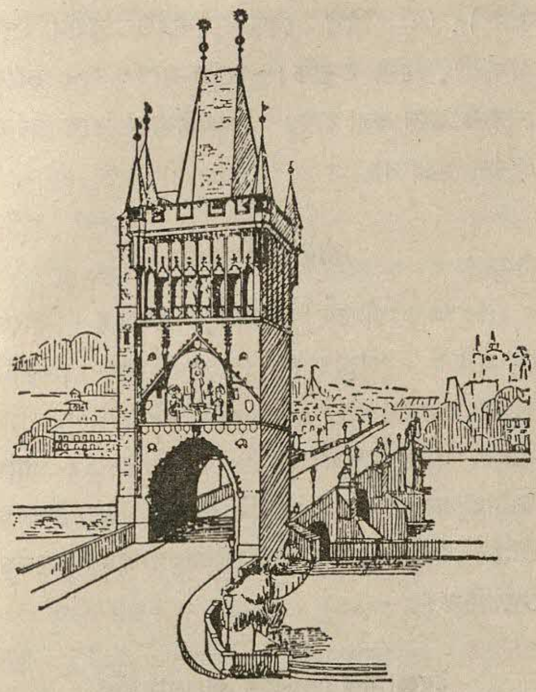
মধ্যযুগের সেতু

লম্বা রাস্তা নিয়ে যেতে হলে মাঝে মাঝে পোল বা সেতু তৈরি করতে হয়, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত রোমানদের সময়কার তৈরি সেতুগুলোই কাজে লাগানো হ'ত। একাদশ শতক পর্যন্ত সামান্য কিছু কাঠের সেতু গড়ে উঠেছিল মাত্র।

চীন দেশে নদীর ওপর চওড়া সেতু ছিল জনগণের মিলনের স্থান। খোলা হাওয়ায় লোকেরা সেখানে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও সেই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাত।

সেতু নির্মাণের বিশেষ কৃতিত্ব রোমানদেরই দেওয়া যেতে পারে। রোমের টাইবার নদীর ওপর সেতু ও রোমান-অধিকৃত স্পেনে, ফ্রান্সে আদি ঐতিহাসিক সেতুনির্মাণের কীর্তি আজও বর্তমান। মধ্যযুগের সেতু-নির্মাণকারী হ'লেন ধর্মযাজকেরা। আগেকার দিনে সেতুস্তম্ভ সাধারণত হ'ত পাথরের।

অন্ধকার যুগের অন্তে বিজ্ঞানী ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানীর ভূমিকায় নামলেন পাদরীরা—তাঁদের মুখ্য ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার পর। গড়ে উঠল দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফরাসী দেশে এভিগনন শহরে রোন নদীর ওপরকার সেতু। তার চারটি খিলেন আজও অতীতের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এঞ্জিনীয়ার হলেন বেনেজেৎ; পরে তিনিও সেন্ট নামে পরিচিত হন। ইংল্যাণ্ডে পীটার কোল চার্চ টেম্‌স্ নদীর ওপর প্রথম পাথরের খিলেনের সেতু তৈরি করেন লণ্ডনে। এটি পুরোনো লণ্ডন সেতু নামে পরিচিত ছিল। সেতুটি যখন শেষ হ'ল ১২০৯ খৃষ্টাব্দে তখন দেখা গেল এটি তৈরি করতে তেত্রিশ বছর লেগেছে। প্রাগ্ শহরে কার্ল্‌স্‌ব্রুক্ সেতু চতুর্দশ শতকের এক অভিনব কীর্তি। এটি তৈরি করতে দেড়শ' বছর লাগে। এ সময়ে সেতু তৈরির জন্য চুন-সুরকির মশলা ও পাথর ব্যবহার করা হ'ত। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বার্ন্ শহরে ত্রয়োদশ শতকে ১৫০ ফুট উত্তারের (স্প্যান্) সেতু তৈরি হয়। ভেনিসের গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের ওপর রিয়ালটো



প্রাগ্‌ শহরে কার্ল্‌স্‌ব্রুক্‌ সেতু
(চতুর্দশ শতক)

সেতু ষোড়শ শতকের বিখ্যাত ঢ্য পন্তে পরিকল্পিত সেতু। নরম মাটি থাকার জন্য পাইল পুঁতে এর ভিত মজবুত করা হয়। এটি আসলে খিলেনের আকৃতির সেতু। ইতালি ছাড়াও ফ্রান্সে এ-ধরনের সেতু নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। ষোড়শ শতকের গোড়াতেই প্রথম পাথরের সেতু গড়া হয় সীন্‌ নদীর ওপর 'নোতর্‌দ্যম' সেতু নামে। এর পর এল নতুন সেতু—পন্ট নিউঅফ্‌। আগেকার দিনে সেতুর ব্যয় কমাবার জন্যে সেতুর ওপর বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হ'ত ; তাতে সেতু নির্মাণের খরচ কিছুটা উঠে যেত।

তবে পরিবহনের সুবিধার জন্য ত্রয়োদশ শতকে আল্‌প্‌স্‌ পর্বত ফুঁড়ে সেন্ট গথার্ড সুড়ঙ্গটি নির্মাণ এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার এক অনন্য কীর্তি।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে কাঠের সেতুর বদলে পাথরের সেতুর নির্মাণ শুরু হয়। এর মধ্যে প্রধান প্রধান সেতু হ'ল দানিয়ুব নদীর ওপর, রেটিসবানের কাছে ড্রেসডেনে এল্‌ব্‌ নদীর ওপর (নির্মাণ-কাল ১১৩৫-১১৪৬ খৃঃ), উর্জবুর্গে মেন নদীর ওপর, প্রাগে মাণ্ডাউ নদীর ওপর, ফ্লোরেন্স শহরে আর্নো নদীর ওপর ও লণ্ডনে টেম্‌স্‌ নদীর ওপর। লণ্ডন সেতুটি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস ক'রে পুনর্গঠন করা হয়। রোমান ধাঁচে এডিসনের রোন নদীর ওপরকার সেতুটি (১১৭৭-১১৮৫) চারটি খিলেন দিয়ে তৈরি। সেটি মহাকালকে ভ্রূকুটি হেনে আজও জলের ওপর দাঁড়িয়ে। তবে মধ্যযুগের সেতুনির্মাণের ইতিহাসে উত্তর ইতালির ট্রেজো নগরীতে আদ্দা নদীর ওপর ২৩৬ ফুট উত্তারের খিলেন-সেতুটি সমকালীন সেতুনির্মাণের এক ইতিহাস রচনা করেছিল। এটির জলের ওপরের উচ্চতা ৭০ ফুট এবং তার ওপর দিয়ে ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা গিয়েছে। এটির এঞ্জিনীয়ার ছিলেন বার্নবো ভাইকন্টি। এর নির্মাণ-কাল ১৩৭০-১৩৭৭ খৃঃ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এটিকে বিনষ্ট করা হয়, যুদ্ধের পরে আবার ঠিক প্রাচীন কালের মত করে এটিকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছে।

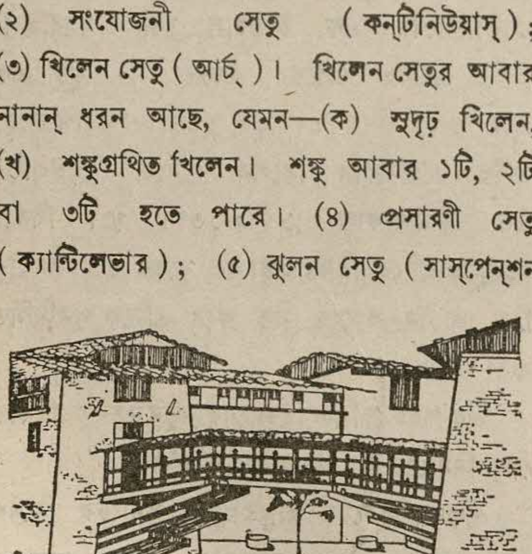
এর পরই ফলিত বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সেতু নির্মাণের কাজেও লাগানো হ'ল।

পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে সম্রাটের নির্দেশ হ'ল—মধ্য ফ্রান্সের রাজকীয় রাস্তা, সেতু ও খালের নক্‌সা আগে এঞ্জিনীয়ারিং কমিটির কাছ থেকে মনোনয়ন করিয়ে নিতে হবে। হিউবার্ট গার্টিয়ার ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সেতু নির্মাণের ওপর একটি বই লেখেন। নতুন সেতু নির্মাণে জঁা

রুদ্‌ল্‌ফ্‌ পেরোঁনে তাঁর কীর্তি রেখে গেছেন প্যারিসের অনতিদূরে। ইংল্যাণ্ডেও সেন্ট ম্যাক্‌সেন্স ও জন রেনী অনুরূপ নাম করেন। যেমন—ওয়াটারলু, সাউথ ওয়ার্ক ও নিউ লণ্ডন সেতু। ১৯৩৮ সালে যখন এই সেতুটিকে ভেঙ্গে ফেলা হয় তখন ভিতের তলায় কাচের কৌটোয় সে যুগের সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা পাওয়া যায়। কাঠ দিয়ে সেতুর শুরু, তারপর নানা ধাতুও ওর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সেতুর নানা বিভাগ

মোটামুটি ভার সংস্থাপনের ওপর সেতুকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়:—(১) সহজ ভাবে বসানো সেতু (সিম্প্‌লি সাপোর্টেড্‌); (২) সংযোজনী সেতু (কন্‌টিনিউয়াস্‌); (৩) খিলেন সেতু (আর্চ্‌)। খিলেন সেতুর আবার নানান্‌ ধরন আছে, যেমন—(ক) সুদৃঢ় খিলেন, (খ) শঙ্কুগ্রথিত খিলেন। শঙ্কু আবার ১টি, ২টি বা ৩টি হতে পারে। (৪) প্রসারণী সেতু (ক্যান্টিলেভার); (৫) ঝুলন সেতু (সাস্‌পেন্‌শন্‌ ব্রীজ); (৬) মিশ্র সেতু—প্রসারণী ঝুলন বা প্রসারণী বৃত্তীয় প্রভৃতি। অবশ্য আরও নানা ভাবে সেতুকে ভাগ করা যায়। কিন্তু এখানে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।



প্রাচীন প্রসারণী সেতু (তিব্বত)

সেচ পরিকল্পনা

১১৭৯ খৃষ্টাব্দে মিলান শহরের কাছে লোম্বাডিক সমভূমিতে সেচের জন্য একটা প্রকল্প নেওয়া হয়। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দেরও পরে এটির কাজ শেষ হয়। বিস্তৃত সেচের খাল কাটার ফলে শুধু বন্যা-নিরোধই নয়, উপরন্তু সেচের জন্য এই জল প্রচুর শস্যোৎপাদনের কাজেও লেগেছিল।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এঞ্জিনীয়ারিং

এর পর এল এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যাকে গাণিতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। কোন কিছু তৈরি হলে বেশ কিছুদিন পরেও যদি দেখা যেত তা ধ্বসে পড়ছে না তখনই সেটি গ্রহণযোগ্য হ'ত। কিন্তু যতক্ষণ না কোন গণিতশাস্ত্রের ভিত্তিতে এটিকে স্থাপিত করা যাচ্ছে ততক্ষণ এর ভুল নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না, কেন না গাণিতিক সত্যই সব সময়ে নির্ভুল সত্য। শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মর্জির ওপর প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকবে এ তো বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, তাই এ বিষয়ে বিরাট গবেষণা চলতে লাগল। ফলে সত্যিকারের প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হ'ল। এই সময় থেকেই স্থিতি-বিদ্যার ও গঠন-উপাদানের তত্ত্ব ও মান নির্ণয়ে নানারকম গবেষণা চলতে থাকে, নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার

হতে থাকে। বিশেষ করে ইতালি অঞ্চলে এই সময় গাণিতিক ভিত্তিতে গবেষণার উন্নতিকল্পে ইউক্লিড, আর্কিমিডিস্, হেরো, এপোলোনিয়াস, টলেমী, পাপ্পাস্, এরিস্টারকাস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের রচনা ল্যাটিনে অনূদিত হয়। ইতালির গবেষকেরাও বহু গবেষণা চালান। এ বিষয়েও লিওনার্দ দা ভিঞ্চির অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এর পর বেটাভিন, গেলিলি, রোবারভাল, ভ্যরিগনন্, নিউটন, লাইবনিৎস্, অয়লার প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণা প্রযুক্তিবিদ্যাকে পুরোপুরি গাণিতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

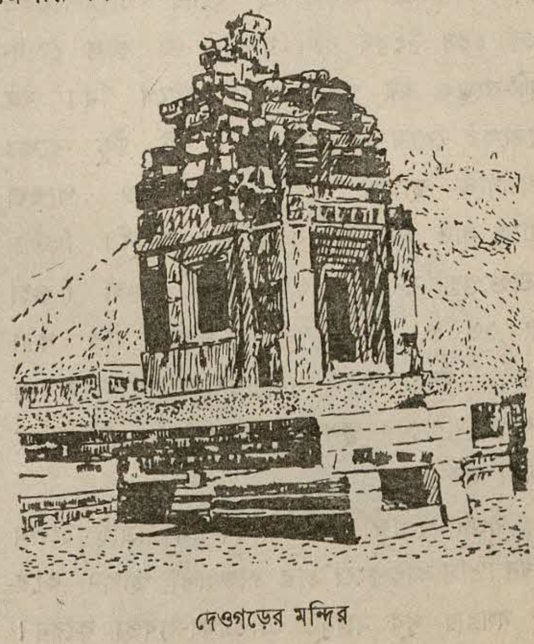
ইতালিতেও ফিলিপে ব্রুনেলেসচী, ঘিবার্টী, লিঁও বতিস্তা এলবার্টী, ফ্রা গিরোকোণ্ডা প্রভৃতির প্রচেষ্টায় গঠন ও স্থাপত্যবিদ্যায় এক নব অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। সেন্ট পীটার্সের বিরাট্ গীর্জা তৈরি করার সময় ৭৯ ফুট ব্যাসের খিলেন ধরার জন্য বিরাট একটি অংশ তৈরি হয় যা ১৪১ ফুট উঁচু। এর কৃতিত্ব ব্রমান্তির (১৪৪৪-১৫১৪)। তাঁর মৃত্যুর পরে গুইলিয়ানো দ্য মাঙ্গালো, ফ্রা গিরোকোণ্ডা ও র‍্যাফেলের তত্ত্বাবধানে সেন্ট পীটার্সের কাজ চলতে থাকে।

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসনে দুর্গনির্মাণ বিদ্যার পারদর্শিতাও লক্ষ করবার মত।

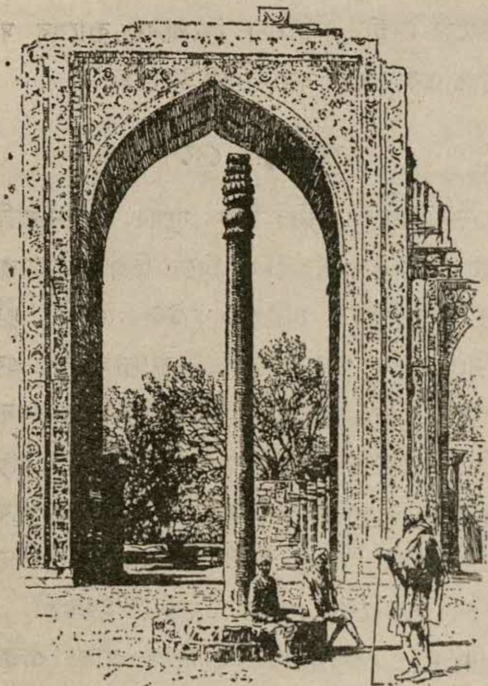
এই সময়ে ঠাউকো হিসেব (যাকে বলা হয় রুল্ অব্ থাম্ব্) চালু হয়। লিঁও বতিস্তা এলবার্টী তাঁর বইএ কতকগুলি এ রকম থাম্ব্ রুলের প্রচলন করেন। যেমন—সেতুর স্তম্ভের প্রস্থ সেতুর খাড়াইয়ের সিকি ভাগ হওয়া চাই, খিলেনের ব্যাস ভারগ্রাহী স্তম্ভের মাপের ছ'গুণের বেশি অথবা চারগুণের কম না হয়, খিলেনের পাল্লার গভীরতা খিলেনের ব্যাসের দশ ভাগের এক ভাগের কম না হয় ইত্যাদি।

আমাদের দেশে

ভারতবর্ষেও ঐতিহাসিক যুগের এঞ্জিনীয়ারিং ক্রিয়াকলাপ উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে ছিল অসামান্য। অশোকের যুগের চল্লিশ ফুটের একটি দীর্ঘ ত্রিসিংহ-মণ্ডিত ধর্মচক্র-চিহ্নিত অশোকস্তম্ভ এবং সারনাথ স্তূপের প্রবেশদ্বার ও রেলিং এক অনন্য কীর্তি। কুষাণ রাজত্বের কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকালে গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রভাব দেখা যায়। এই সময়কার স্থাপত্য-কীর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় অমরাবতী ও নাগার্জুনে। সেখানকার বুদ্ধমূর্তিতে গ্রীক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এর পর আসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণময় যুগ। গড়ে ওঠে ঝাঁসি জেলায় ললিতপুর দেওগড়ের পাথরের মন্দির, কানপুর জেলায় বিরাট ইটের তৈরি মন্দির। ঐ রকম



দেওগড়ের মন্দির



কুতুব মিনারের কাছে বসানো পেটা লোহার স্তম্ভ

সারনাথের কাছেও। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে পরবর্তী কালের দিল্লীর কুতুব মিনারের কাছে বসানো পেটা লোহার স্তম্ভটি ঐ যুগের ধাতুশিল্পেরও এক চরম উৎকর্ষ বলা যায়। এত কাল রোদ-বৃষ্টি-ঝড়েও এর গায়ে মরচে লাগে নি। ষষ্ঠ শতকের শেষে নালন্দায় ৮০ ফুট উঁচু বুদ্ধের তাম্রমূর্তি স্থাপিত হয়। সুলতানগঞ্জে পাওয়া সাড়ে সাত ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তিটিও অপূর্ব। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অজন্তার দু'টি গুহা (গুহা নং ১৬ ও ১৭) পাথর খুঁড়ে বার করা হয়। ইলোরার পাহাড়-খোদাই-করে-বার-করা কৈলাস-মন্দিরের তুলনা তো গোটা পৃথিবীতেই মেলা ভার!

সপ্তম শতাব্দীতে যখন হর্ষবর্ধন সম্রাট্ হলেন তখন তিনি কান্যকুব্জে তাঁর রাজধানী স্থাপন করে ঐ নগরীর খুব মজবুত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করেন। দশম ও একাদশ শতকে এক নবীন স্থাপত্যের ধারা বুন্দেলখণ্ডের খাজুরাহো থেকে বিস্তার লাভ ক'রে নর্মদার উৎস অমরকন্টক, বিরাট-নগর, পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনারকে ছড়িয়ে পড়ে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ ও কাছাকাছি বহু মন্দিরে ও কোনারকের সূর্যমন্দিরে অনেকে তা দেখে থাকবে। খাজুরাহোর প্রান্তরে শুধু শাক্ত বা তান্ত্রিক দেবদেবীর মন্দির গ'ড়ে ওঠে নি, তার সন্নিকটে জৈন তীর্থঙ্করদের বহু মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দিরেও গ'ড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত কাণ্ডারীয় শিবমন্দিরের ভাস্কর্য ও পরিকল্পনা এক কথায় অপূর্ব। মন্দিরময়ী নগরী খাজুরাহোতে এক সময়ে শতাধিক মন্দির ছিল, আজ তার অনেকগুলিই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। চাণ্ডেল রাজাদের নির্মিত কালিঞ্জর দুর্গ গঠনশিল্পের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। গজনীর বিখ্যাত সুলতান মামুদ



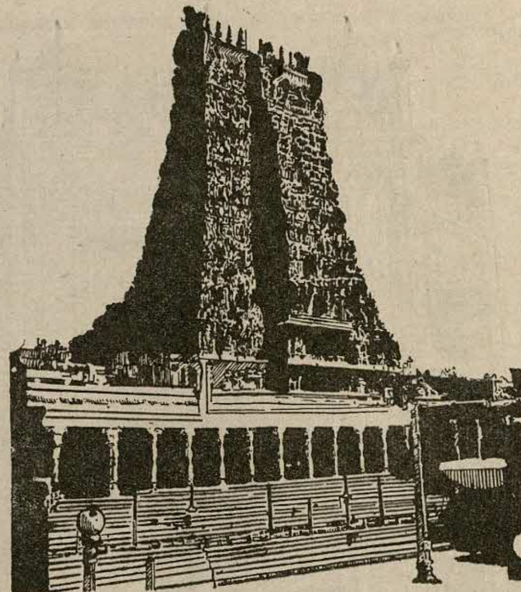
ইলোরার কৈলাস মন্দির

কিংবদন্তী-বিজড়িত সোমনাথের মন্দির ধ্বংস সাধন করেন একাদশ শতাব্দীতে। ভারত স্বাধীন হবার পর এটি আবার নতুন করে গড়া হয়েছে। দশম শতাব্দীতে শ্রাবণ বেলগোলায় পাহাড়ের গা কেটে গড়া সাড়ে-ছাপ্পান্ন ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্তি আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে



লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর

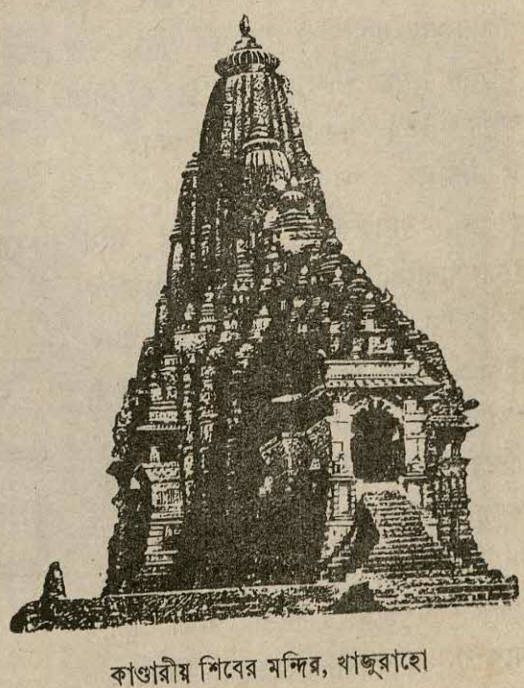
দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর মূর্তিশিল্পের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে হয়শালার বল্লালদের রাজত্বকালে চালুক্য স্থাপত্যের ধারা বিশেষ এক রূপ গ্রহণ করে। চালুক্য স্থাপত্যের নিদর্শন পাই কাবেরী নদীকূলে সোমনাথপুরমের কেশব-মন্দিরে, দাক্ষিণাত্যের বেলুড়ে চেন্নাকেশবের মন্দিরে, বালগামীর কেদারেশ্বরের মন্দিরে, হেলিবিডের



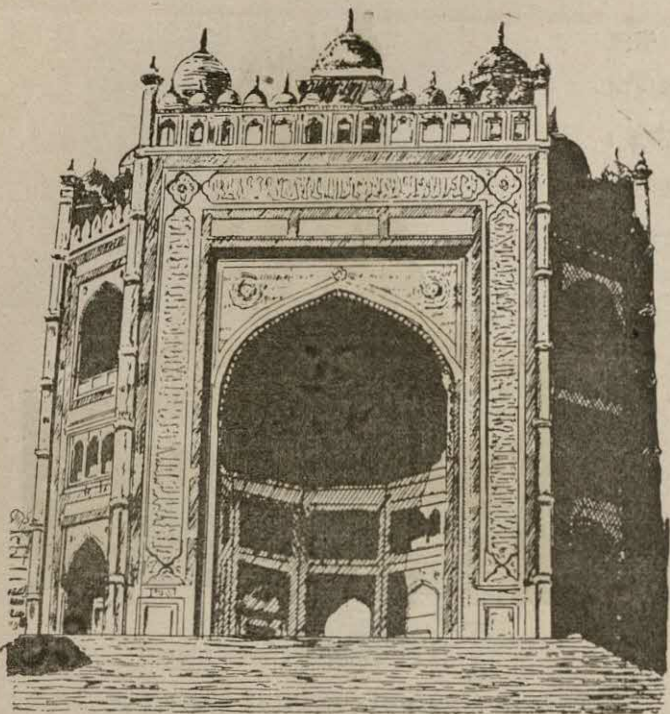
দাক্ষিণাত্যের মন্দির (মাদুরা)

বা ডোরাসমুদ্রের কেদারেশ্বরের মন্দিরে, হয়শালেশ্বরের মন্দিরে।

পহ্লব রাজত্বের সময়ে কাঞ্জিভরমের



কাণ্ডারীয় শিবের মন্দির, খাজুরাহো



বুলন্দ দরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রী

গুজরাট বিজয়ের স্মারকস্বরূপ বিখ্যাত 'বুলন্দ দরওয়াজা', সেলিম চিস্তির সমাধি-মন্দির। সেখানে আকবরের রাজধানী মাত্র পনেরো বছরের জন্য ছিল, জলের অভাবে আবার তা স্থানান্তরিত করতে হয়। পরে সম্রাট্ শাজাহান আগ্রা দুর্গ ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করান। শাজাহানের কীর্তি হ'ল দিল্লীর লালকেল্লা, আগ্রায় শ্বেতপাথরের তৈরি প্রিয়তমা মমতাজ-মহলের সমাধি-মন্দির তাজমহল ও মোতি মসজিদ। মোগল সাম্রাজ্যের অতীতের সমস্ত কীর্তিকলাপকে ছাড়িয়ে গেছে 'কালের কপোলতলে শুভ সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।'

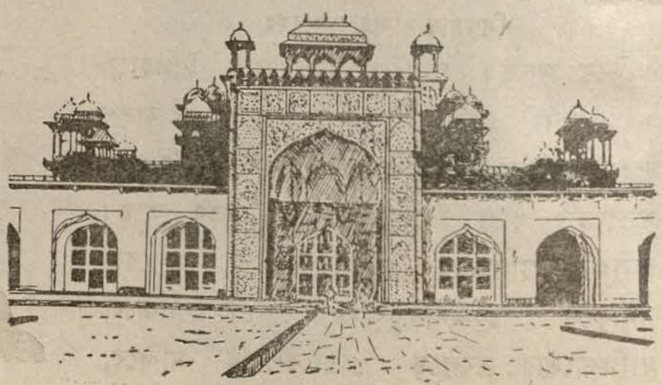
মুক্তেশ্বরের মন্দির, মহাবলীপুরমের সপ্তরথ ও পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির ও পাহাড়ের গায়ে খুদে-তোলা অর্জুনের তপস্যা-মূর্তি এঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পের এক অপূর্ব কীর্ত। কত আর নাম করব ?

দিল্লীতে আবার মুসলমান অধিকারের শুরুতে অন্যূন সাতটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস ক'রে ইন্দো-সারাসেনীয় ধারায় কুতুব মসজিদ তৈরি হয়। এরই সংলগ্ন হচ্ছে সেই বিখ্যাত কুতুব মিনার। এর পর শুরু হ'ল পাঠান ও মোগল সম্রাট্দের সমাধি-মন্দির ও মসজিদ। এই ধারায় উল্লেখ-যোগ্য হ'ল সাসারামে শেরশাহের সমাধি-মন্দির, দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির, আকবরের সময়ে আগ্রা দুর্গ, সেকেন্দ্রা, নবনগরী ফতেপুর সিক্রীতে

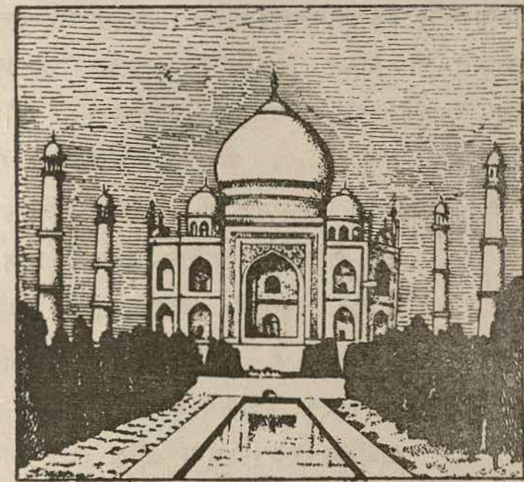
স্থাপত্যের ধারা

ফার্গুসন সাহেব ভারতীয় স্থাপত্যের ধারাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করেছেন ঃ

১। বৌদ্ধ স্থাপত্য। ২। দ্রাবিড় ধারা। ৩। চালুক্য ধারা। ৪। জৈন স্থাপত্য। ৫। ভারতীয় আর্য ধারা। ৬। ভারতীয়



সেকেন্দ্রা



তাজমহল

সারাসেনীয় স্থাপত্য : (ক) গজনী রীতি (খ) পাঠান রীতি। (গ) জোনপুর রীতি। (ঘ) গুর্জর রীতি। (ঙ) মালব রীতি। (চ) বাংলা রীতি। (ছ) কুলবার্গ রীতি। (জ) বিজাপুর রীতি। (ঝ) মুঘল স্থাপত্য।

প্রত্যেক ধারারই আবার পৃথক্ পৃথক্ ধরন আছে, তা ছাড়া উপরোক্ত বিভাগ সম্বন্ধে নানা মতভেদও আছে।

ব্যানিস্টর ফ্লেচার ভারতীয় স্থাপত্যকে তিনটি মুখ্য ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হচ্ছে :

(১) বৌদ্ধ স্থাপত্য (২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ-৭৫০ খৃষ্টাব্দ)। (২) জৈন স্থাপত্য (৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ-১৩০০ খৃষ্টাব্দ)। (৩) হিন্দু স্থাপত্য : (ক) উত্তর-ভারতীয় (৬০০ খৃষ্টাব্দ-বর্তমান কাল) (খ) মধ্য ভারতীয় বা চালুক্য (১০০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ)। (গ) দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড় (১৩৫০-১৭৫০ খৃষ্টাব্দ)।

ভারতীয় স্থাপত্যের ধারা বিভাগ

বর্তমানে হিন্দু স্থাপত্যের প্রচুর বই নানা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত ও অজস্র পুঁথির আকারে নানা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারতীয় স্থাপত্যের তিনটি মুখ্য ধারা দেখা যায়। যেমন :

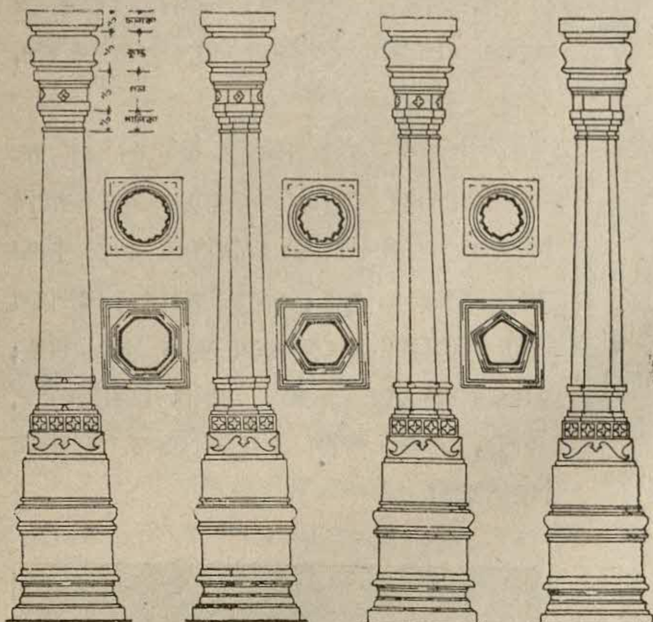
১। নাগর, ২। বেসর, ৩। দ্রাবিড়। এটি বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন প্রকাশের ধারার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভক্ত। নাগর, বেসর ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল যথাক্রমে চতুষ্কোণ, বৃত্তাকৃতি ও অষ্টকোণ।

কোন মন্দির ও অট্টালিকার ঊর্দ্ধাংশে এই সব বিভিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নাগর ধারার অঞ্চল হ'ল আর্যাবর্ত অর্থাৎ হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত; বেসর ধারার বিকাশস্থল বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী থেকে কৃষ্ণা নদীর কূল পর্যন্ত; আরও দক্ষিণের অঞ্চল অর্থাৎ তামিলনাদ, মহীশূর, কেরল অঞ্চল হ'ল দ্রাবিড় স্থাপত্যধারার বিকাশস্থল।



আগ্রার মোতি মস্‌জিদের ভিতরকার দৃশ্য

স্তম্ভের আকৃতি ও সৌষ্ঠব অনুযায়ী গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যকে যেমন ডোরিক, আয়োনিক ও কোরিন্থিয়ানে ভাগ করা হয়েছে তেমনি হিন্দু স্থাপত্যকেও স্তম্ভের আকৃতি অনুযায়ী যথাক্রমে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ



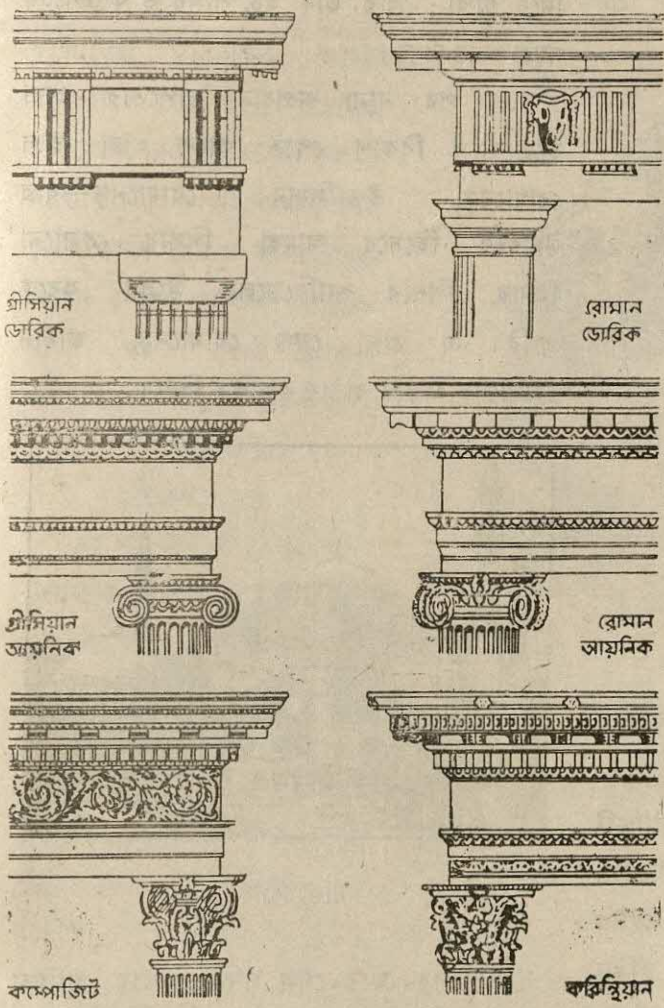
ব্রহ্মকান্ত বা রুদ্রকান্ত বিষ্ণুকান্ত স্কন্দকান্ত শিবকান্ত

১। ব্রহ্মকান্ত বা রুদ্রকান্ত (চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকৃতি)। ২। বিষ্ণুকান্ত (অষ্টভূজ)। ৩। স্কন্দকান্ত (ষড়্ভূজ)। ৪। শিবকান্ত (পঞ্চভুজ)।

অন্যান্য দেশের স্থাপত্য

স্থাপত্যের কথা বলতে গিয়ে মধ্যযুগের আগেকার যুগের কথাও একটু বলা দরকার। মিশরীয় স্থাপত্যের ধারায় মন্দিরের ভিতরের দিকে স্তম্ভের বিন্যাস ছিল, কিন্তু বাইরে হেলানো সাধারণ পাথরের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে মন্দিরের প্রবেশপথ থাকত। দেয়ালের গায়ে কখনও বা থাকত চিত্রলিপি। স্তম্ভের গলকুম্ভ হয় অর্ধস্ফুট পদ্মফুল বা ফোটা পদ্মফুল। গ্রীক স্থাপত্যের ধারায় এর আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। স্তম্ভগুলি ভিতরে না বসিয়ে মন্দিরের মূল প্রকোষ্ঠের বাইরে বসানো হ'ল। বাইরে থেকেই বোঝা যাবে কোন্ গোত্রের ঐ থামগুলো। গ্রীকদের অনুকরণে রোমান স্থাপত্যের ধারা প্রচলিত হয়। মুখ্য গ্রীক স্থাপত্যের ধারা হ'ল ঃ ১। ডোরিক ২। আয়োনিক ৩। কোরিন্থিয়ান। এটির বিন্যাস কাল ৭০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ। গ্রীক স্থাপত্যের ধারায় এথেন্সের পার্থেনন, এফিসাসের আর্টেমিসের মন্দির ও এথেন্সের লাইসিক্রেটিসের স্মৃতিমন্দির যথাক্রমে ডোরিক, আয়োনিক ও কোরিন্থিয়ান স্থাপত্যের ধারার বিখ্যাত উদাহরণ।

গ্রীকদের মত রোমানরা এই ধারাগুলিকে কিছু সংশোধন, কিছু উন্নত ও ব্যাসের অনুপাতে দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়ে একই ধারার অনুসরণে রোমান ডোরিক, রোমান আয়োনিক ও রোমান কোরিন্থিয়ান স্থাপত্যের ধারার প্রচলন করেন। এটির বিস্তারকাল ১৪৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৬৫ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে দেয়াল, খিলেন ও গম্বুজের নানা উৎকর্ষ সাধিত হয়। ফর্মা ক'রে কংক্রীট (সিমেন্ট দিয়ে নয়), চুন-সুরকি দিয়ে ঢেলে দেয়াল প্রস্তুত শুরু হয়। এই সময় জনগণের স্নানাগার, কলোসিয়াম্, প্রমোদোদ্যান, অ্যাম্ফিথিয়েটার প্রভৃতি আনন্দবর্ধনের সম্ভার



গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যের শ্রেণীবিভাগ

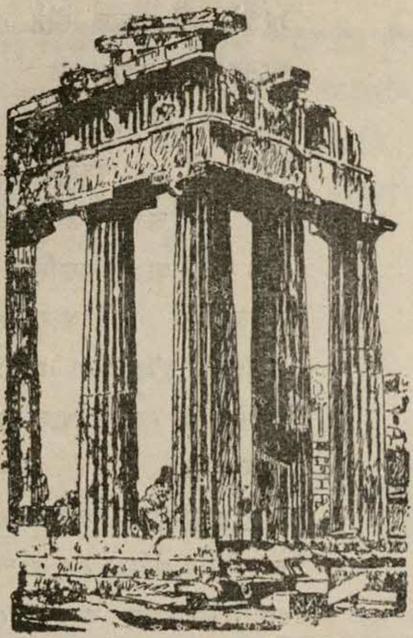
১৫৭½ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। অনেকটা কলকাতার ইডেন গার্ডেনের স্টেডিয়ামের মত, কিন্তু চারদিকেই এর বসবার জায়গা। এটি উপবৃত্তের মত একদিকে ৬২০ ফুট লম্বা ও অন্যদিকে ৫১৩ ফুট চওড়া। কিন্তু আসল খেলার জায়গাটি হ'ল ২৮৭ ফুট × ১৮০ ফুট। গোল নয়—দেখতে অনেকটা ডিমের মত।

রোমানরা কোরিন্থিয়ানের সঙ্গে আয়োনিক জড়িয়ে এক কম্পোজিট ধারার প্রচলন করে। রোমান স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হ'ল প্যান্থিয়ান রোম বা পাঁথে।

এর পর স্থাপত্যের ধারা গ্রীস ও রোম থেকে সরে কনষ্ট্যান্টি-নোপ্‌লে (প্রাচীন নাম বাইজেন-টিয়ান্) আসে। বাইজেনটিয়ান্‌কে বলা হ'ত নব রোম। বাইজেনটাইন্ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল গম্বুজের আবিষ্কার বা বৃত্তাকৃতি, বহুভুজ, এমন কি চতুর্ভুজ নক্সার,—যা ভূমিকে ঢাকতে পারে। সর্বোপরি ছাদের বদলে একাধিক গম্বুজের সন্নিবেশ এর এক বিশেষ নিপুণতা। এর বিখ্যাত নিদর্শন হ'ল সান্তা সোফিয়া (৫৩২-৫৩৭ খৃষ্টাব্দ)। এটি সম্রাট্ জাস্টিনিয়ানের আদেশে এন্থিমিয়াস্ ও আই-সোডোরাসের পরিকল্পনায় তৈরি হয়। এটিতে ১০৭ ফুট সম-চতুর্ভুজ স্থানের চার কোণে চারটি পাথরের বৃহদাকার থাম (২৫ ফুট × ৬০ ফুট) স্থাপিত।

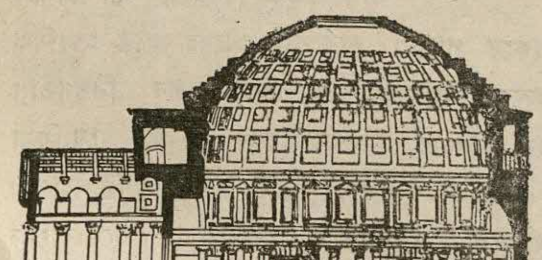
গড়ে তোলা হয়; তৈরি হয় বিজয়োৎসবের জন্য বিজয়-তোরণ ও বিজয়-স্তম্ভ।

কলোসিয়ামে সিংহের মুখে প্রথম যুগের খৃষ্টানদের ফেলে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করত রোমের নৃশংস সম্রাট্ ও নির্দয় নরনারী। সেখানে লেখা আছে "যেদিন কলোসিয়াম ধ্বংস হবে সেদিন রোমও ধ্বংস হবে"। আজও সেই কলোসিয়াম ভগ্নদশায় পুরাকীর্তির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোলাকৃতি চার স্তবকে এটি



পার্থেনন (এথেন্স)

থামের চারদিকে চারটি অর্ধবৃত্তাকার খিলেন, যার উপর ১০৭ ফুট ব্যাসের গম্বুজটি উঠেছে—মাটি থেকে ১৮০ ফুট উঁচুতে। সমস্ত বাড়িটি ২২৫ ফুট × ১০৭ ফুট জায়গা যুড়ে। বাইজেন-টাইন্ স্থাপত্যের অট্টালিকার দেয়াল ইটের তৈরি কিন্তু ভিতরের দেয়াল ও মেঝেতে রঙিন মর্মর বা চকচকে কাচের মোজেক টালিও আঁটা থাকত। দরজার মাথা অর্ধগোলাকার খিলেন



প্যান্থিয়ান রোম বা পাঁথে

দিয়ে চাপা ; আর ছাদ ইট, পাথর ও কংক্রীটের গম্বুজ দিয়ে ঢাকা।

এর পর নানা অপ্রধান স্থাপত্যের ধারা ইয়োরোপে বিকাশ পেতে থাকে। তা হ'ল রোমানেস্ক, ইতালিয়ান রোমানেস্ক—যার উদাহরণ হিসেবে আমরা পিসার হেলানো মিনার, পিসার ক্যাথিড্রেলের উল্লেখ করতে পারি। এ ছাড়া ফ্রেঞ্চ রোমানেস্ক, জার্মান রোমানেস্ক প্রভৃতি ধারাও প্রচলিত ছিল।



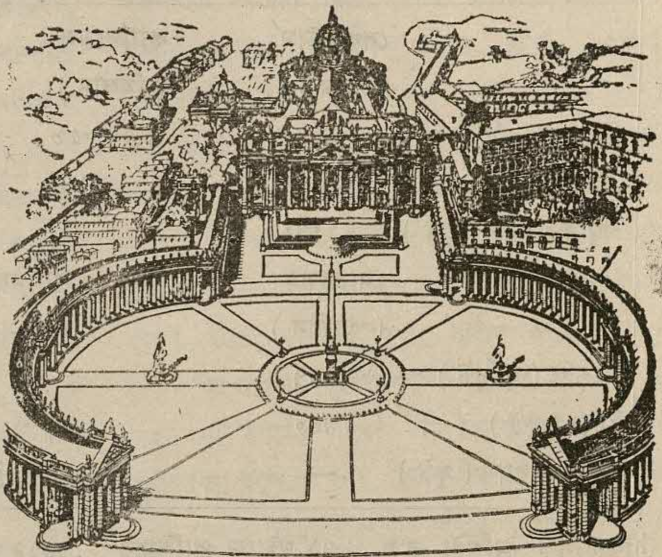
সান্তা সোফিয়া

এর পর ছেয়ে গেল গথিক ধারার স্থাপত্য সারা ইয়োরোপে। শুধু এর ছাপ পড়ল না স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া রাজ্যে ও রুশ দেশে। রোমানেস্কদের কাল ৮০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ। এদেরই ফলশ্রুতি হ'ল 'গথিক'। এর প্রভাবকাল ১২০০-১৫০০ খৃষ্টাব্দ। এটিকে মুখ্যত মধ্যযুগের স্থাপত্য বলা যেতে পারে। 'গথিক' স্থাপত্যের মুখ্য বস্তু হ'ল ছুঁচোলো খিলেন আর পাশের চাপ নেবার জন্য অধিমূলের ও সুউচ্চ চূড়ার প্রয়োগ। গথিক নিদর্শনে আমরা পাই প্যারিসের নোতর্‌ড্যম ; তা ছাড়া মিলানের,

কলোনের, স্ট্রাসবুর্গের, অ্যান্ট-ওয়ার্পের, ভিয়েনার, রুয়েনের, এমিয়েনেসের চারটাবসের ভজনালয়গুলিতে। আবার নানা দেশের কৃষ্টির জারক রসে ও স্থানমাহাত্ম্যে বিশেষ দেশের গথিক ধারারও সূচনা হয়। যেমন—ইংলিশ, স্কটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ গথিক প্রভৃতি।

রেনেসাঁর যুগ

এর পর এল রেনেসাঁর যুগ। ইতালিতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর শুরু, তারপর সারা ইয়োরোপে এটি বিস্তার লাভ করে। রেনেসাঁর সময়ে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত অট্টালিকা নির্মিত হয়। তার মধ্যে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল, ওয়েষ্ট মিনষ্টার অ্যাবি, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে সেণ্ট লরেঞ্জো, পেলেজো পিডি, পেলেজো রিক্কার্ড, জেনোয়ার পেলেজো মিউনিসিপিও। সবচেয়ে বিখ্যাত হ'ল রোমের সেণ্ট পীটার্স্ (১৫০৬-১৬২৬)। পোপ ২য় জুলিয়াস্-এর মনে একটি গীর্জা নির্মাণের বাসনা জাগে—যার তলায় তিনি সমাহিত হ'তে চান। যাই হোক, পরে সেণ্ট পীটার্স্ নির্মাণের জন্য তখনকার দিনের বিখ্যাত স্থপতিদের কাছ থেকে নক্‌সা চাওয়া হয়। কতকগুলি নক্‌সা পাওয়া যায়, যেমন র‍্যাফেল, পেরুজি, সাঙ্গালো প্রভৃতির কাছ থেকে। এগুলি ফ্লোরেন্সের ইফুজী সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। প্রতিযোগিতায় ব্রেমেণ্টের নক্‌সাটি মনোনীত হয়। সেই নক্‌সা অনুযায়ী ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তারপর



সেণ্ট পীটার্স্ গীর্জা, রোম

নানা সময়ে নানা স্থপতির হাতে অদলবদলের পর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মোটামুটি মূল গীর্জাটি তৈরি শেষ হয়। কিন্তু গীর্জার সামনে ৬৫০ ফুট চওড়া, ২৮৪টি থাম দিয়ে ঘেরা হাঁসুলির মত বিরাট প্রাঙ্গণ তৈরি হয় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে।

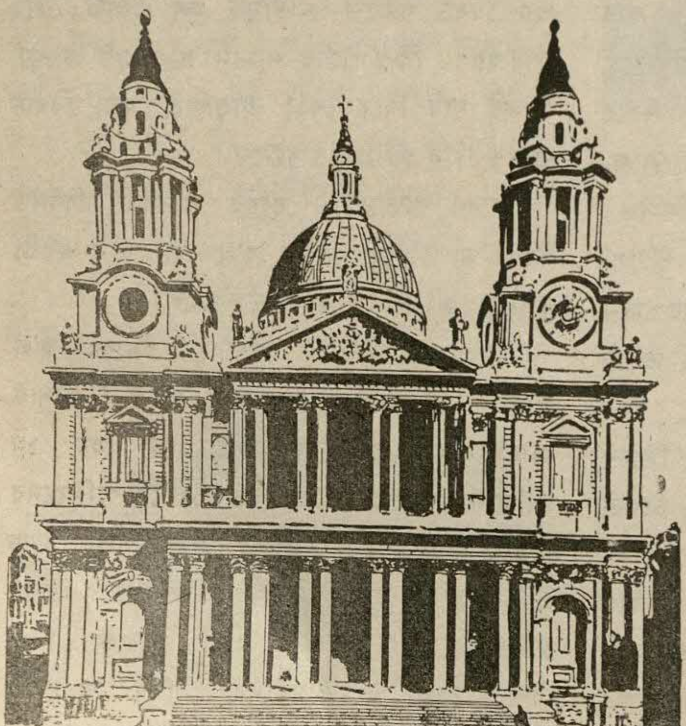
পরের পাতায় এ যুগের কয়েকটি বিখ্যাত গীর্জার মাপজোঁক দেওয়া হ'ল—যা থেকে একটা তুলনামূলক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ফ্রেঞ্চ রেনেসাঁর বিখ্যাত ইমারৎ হ'ল ল্যুভর রাজপ্রাসাদ (১৫৪৬-১৮৭৮), ভার্সাই রাজপ্রাসাদ। ল্যুভারের কাজ শুরু হয় ১ম ফ্রান্সিসের সময় থেকে, শেষ হয় ৩য় নেপোলিয়নের সময়ে। এটি ৪৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছিল। আজ এটি জাতীয় প্রদর্শনাগারে রূপান্তরিত হয়েছে,—সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্করদের বিশিষ্ট অবদান। ভার্সাই রাজপ্রাসাদের শুরু হয় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। ভার্সাই প্রাসাদের

	সেন্টপীটার্স (রোম)	ক্যাথিড্রেল (মিলান)	সেন্টপলস্ (লণ্ডন)	সান্তা সোফিয়া (কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল্)
বিস্তৃতি (বর্গফুট)	২,২৭,০৭০	১,২৫,৮৫৬	৮৪,০২৪	১,০৩,২০৩
দৈর্ঘ্য (ফুট)	৭১০	৫১৪	৫১০	৩৫৩
গম্বুজের ব্যাস (ফুট)	১৩৭½	—	১০৯	১০৭

	নোতরড্যাম (প্যারিস)	প্যান্থিয়ান (রোম)	ক্যাথিড্রেল (ফ্লোরেন্স)
বিস্তৃতি (বর্গফুট)	৬৭,৩৪৭	—	—
দৈর্ঘ্য (ফুট)	৪৬০	—	—
গম্বুজের ব্যাস (ফুট)	—	১৪২½	১৩৮½

ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হ'ল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে এখানে জার্মান সম্রাট্ বলে ঘোষণা করা হয় এবং এখানেই ১ম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানরা শান্তির সর্ত দলিলে সই ক'রে পরাজয় বরণ ক'রে নেয়।



সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল, লণ্ডন

ইংলিশ রেনেসাঁর (বৃটিশ নয়) স্যর ক্রীষ্টোফার রেনের পরিকল্পনায় সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল (১৬৭৫-১৭১০) হ'ল একটি সর্বোৎকৃষ্ট অবদান। এটি গ্রীক ক্রুশ পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরি। এর মূল গম্বুজটি আটটি থামের ওপর রাখা।

মধ্য আমেরিকা বা হিন্দু আমেরিকার প্রগতি

হিন্দু আমেরিকার ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সভ্যতাকে পূর্ব-ক্লাসিক, ক্লাসিক ও ক্লাসিক-উত্তর যুগ বলা হয়। ক্লাসিক ও ক্লাসিক-ত্তর যুগের নব নব স্থাপত্যের ধারা দেখলে মুগ্ধ হ'তে হয়। মন্দির, মন্দিরের সামনে

নাটমন্দির, ধাপে ধাপে তোলা পিরামিড, রাজপ্রাসাদ, নাট্যশালা, মহিলানিবাস, সাধারণ স্নানাগার, মহিলা ও বৃদ্ধদের অবসর-ভবন প্রভৃতিতে মায়া সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মায়া সভ্যতা ও স্থাপত্যের গঠনবিজ্ঞানের বিশাল বিকাশক্ষেত্র হ'ল মেক্সিকোর অন্তর্গত ছ্যকাটন (যক্ষস্থান?) উপদ্বীপ, গুয়াতেমালা, হণ্ডুরস (হিন্দুরাষ্ট্র?), স্যালভাডোর (শীলভদ্র?) প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে যে সব নগরকে কেন্দ্র ক'রে এর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা হ'ল মায়াপান, চিচিনইৎজা, কোবা, উস্‌মল, লাবনা, কাম্পেচি, এজনা, টিকল, বোনাম্‌পেক্‌, চিন-কুলটিক, বেলজী প্রভৃতি। মুখ্য মায়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে পাঁচটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে। তা হ'ল 'পেটেন ধারা', 'পালাঙ্কু ধারা', 'কুয়োবেক ধারা', 'পুক চেনীস ধারা', 'টোলটেক ধারা'। এদের পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে বোঝানো সম্ভব নয়।

রাস্তা : আমাদের দেশে

আগেকার দিনে রাস্তা তৈরি রাজাদের করণীয় কাজ ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে রাস্তার দূরত্ব ঠিক করার জন্য রাস্তার ধারে সমান দূরে দূরে 'কোশ মিনার'-এর মত পাথর বসানো হ'ত। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন প্রস্থের রাস্তার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের বইএ পথের নানা বিভাগ দেখতে পাই। যেমন :

(১) 'রাজমার্গ' বা 'রাজবর্ত্ম', 'রাজপথ' 'রাজবীথি', 'নরপতিপথ'—যাতে হাতী-টানা রথ ও বহু মানুষ চলতে পারে। এটি চওড়ায় দশ ধনু বা চল্লিশ হাত। (২) 'দেশমার্গ' বা 'দিশামার্গ'—এটা দিয়ে দেশ হ'তে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা থাকে। এটার মাপ চওড়ায় ত্রিশ ধনু অর্থাৎ ১২০ হাত। (৩) 'গ্রামমার্গ'—এটি গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে যাবার পথ। শাস্ত্র-মতে এটি বিশ ধনু অর্থাৎ আশি হাত। (৪) 'সীমামার্গ'—এটি গ্রামের প্রান্তদেশ দিয়ে যায় এবং এটি দিয়ে গ্রামের সীমা নির্ধারণ করা যায়। এটিও দশ ধনু অর্থাৎ চল্লিশ হাত চওড়া। (৫) 'শাখাপথ'—মূল রাজপথ থেকে যে সব পথ শহর বা গ্রামের মধ্যে যায় তাকে শাখাপথ বা শাখারথ্যা বলে। (৬) 'জঙ্ঘাপথ'—পাহাড়ের গা দিয়ে যাবার পথকে জঙ্ঘাপথ বলে। (৭) 'সুড়ঙ্গপথ'—পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কাটা পথকে সুড়ঙ্গপথ বলে।

যে পথ গ্রামকে বেষ্টন ক'রে আয়তাকারে গড়া তাকে বলে 'মঙ্গলবীথি'। বীথি অর্থে দু'-ধারে-গাছ-দেওয়া পথ। গ্রামের কেন্দ্র দিয়ে চলে-যাওয়া পথকে বলে 'ব্রহ্মবীথি'। পুর অঞ্চলকে বেষ্টন ক'রে যে পথ যায় তাকে বলে 'পুরবীথি'। মূল পথ থেকে ছোট ছোট পথকে বলা হয় 'ক্ষুদ্রপথ', 'অর্গলপথ' বা 'বামনপথ'।

বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে রাস্তা নির্মাণের কৌশল সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাতে রাস্তার বর্ণনায় দুই পাশ নীচু, মাঝখান উঁচু করার নির্দেশ আছে,—যাতে বৃষ্টির জল গড়িয়ে দু'পাশের নালায় পড়ে যেতে পারে। পাথরের টুকরো ও খোয়া দিয়ে এমন শক্ত ভাবে রাস্তা তৈরি করতে হবে যে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ বা হাতীর পায়ের ছাপ রাস্তার উপর বসা না দেখা যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও রাস্তা নির্মাণের বিধি ও প্রস্থের বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া আছে। মৌর্য

সাম্রাজ্যের যুগে তক্ষশিলা থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত এক দীর্ঘ রাস্তা তৈরি হয়েছিল।

নানা ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান, যা প্রাচীন ভারতে হ'ত, তার অধিকাংশই পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা পশুযানে এবং বেশ খানিকটা জলপথেও যাবার ব্যবস্থা ছিল। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন গোবি মরুভূমি পার হয়ে তক্ষশিলা, পুরুষপুর (পেশোয়ার) হয়ে পাটলিপুত্রে (পাটনা) আসেন। তিনি নিশ্চয়ই এমনি কোন এক পরিচিত পথেই এসেছিলেন। তেমনি হুয়েন সাংও ভারতের নানা প্রচলিত পথে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহে ঘুরে বেড়ান। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য ভারতের চারটি দিক্‌প্রান্তে চারটি বিখ্যাত মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে যোশী মঠ, পূর্বে গোবর্ধন মঠ (পুরী), পশ্চিমে সারদা মঠ (দ্বারকা) ও দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ (মহীশূর রাজ্যে)। তাঁরও পথ-পরিক্রমার নক্‌সা সারদা মঠ থেকে বর্তমানে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়েছে।

সম্রাট্ অশোক যে সব পাহাড়ের গায়ে তাঁর শিলালিপি খুদে গিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই সেগুলো তখনকার কালের প্রসিদ্ধ রাজপথেরই ধারে ধারে ছিল। সেখানে পথিক ও ব্যবসায়ীদের ধর্মের নীতি স্মরণ করিয়ে দেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তা অশোকের শিলালিপি থেকে বোঝা যায়। রাজকীয় অভিযানে সেকেন্দর শাহ্ সুদূর ম্যাসিডন থেকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত যে পথে এসেছিলেন তারও বিশদ এক নক্সা আছে। বহু রাজকীয় অভিযান শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে আসছে; নিশ্চয়ই তার বেশির ভাগই স্থলপথে। সেখানে হয়তো অনেক কাঁচা রাস্তা ছিল। করতোয়া নদীর উপর বিশ খিলেনের পাথরের এক সেতু ছিল—যার ওপর দিয়ে পার হ'য়ে বক্তিয়ার খিল্‌জীর পুত্র মহম্মদ তিব্বত রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় ঐ সেতুটি ধ্বংস করে। ফলে মহম্মদের আর নিজস্থানে ফেরা হ'ল না। শের শাহের সংস্কার করা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘ রাস্তা। পুণ্যশীলা রমণী অহল্যাবাঈ তাঁর বিখ্যাত 'অহল্যাবাঈ পথ' বারাণসী পর্যন্ত প্রস্তুত করান।

এদেশের সেচ

মৌর্য রাজত্বের সময় খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা ছিল ও জলের প্রবাহ 'জলকপাট' দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হ'ত। দক্ষিণ ভারতে আড় বাঁধ দিয়ে সেচের ব্যবস্থা কাবেরী নদীর প্রাচীন আড় বাঁধ থেকে জানা যায়।

ভোজরাজের রাজত্বকালে বেত্রবতীর বুকে আড় বাঁধ বেঁধে ২৫ বর্গ মাইল যুড়ে 'ভোজপুর হ্রদ' তৈরির ফলে বহু জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। আবার পঞ্চদশ শতকে সে বাঁধ কেটে জল বার করে সেখানকার পলি-পড়া জমিতে চাষের ব্যবস্থা হয়। চাণ্ডেল রাজারা বড় বড় পুষ্করিণী কেটে জল সরবরাহ ও সেচের ব্যবস্থা করতেন তার নিদর্শন মধ্যপ্রদেশে আজও দেখা যায়। দক্ষিণের 'চোল' রাজাদের (৮০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে নদীর বুকে আড় বাঁধ দিয়ে ও নদীর দু'পাশে সমান্তরাল বাঁধ দিয়ে জলের 'লেভেল' উঁচু করে খাল কেটে ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। আজও কাবেরী নদীর ওপর প্রাচীন জলমগ্ন আড় বাঁধ দেখা যায়। ইংরেজ

রাজত্বে নানাভাবে সেচের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলিবর্দি খাঁ ভাগীরথীকে সরস্বতীর খাদের সঙ্গে যুক্ত করায় আদিগঙ্গার স্রোত ম'জে যায় আর ভাগীরথী দক্ষিণমুখী পথ ছেড়ে পশ্চিম মুখে চলে যায়। আজও সেই পথে ভাগীরথী বয়ে চলেছে। ইংরেজরা এরই নাম দিয়েছে হুগলী নদী।

ভারতের গ্রাম ও নগর-পরিকল্পনা

যদিও ঋগ্বেদে গ্রামেরই শুধু উল্লেখ আছে, তবু বহু মনীষীর মতে নগরের উদ্ভব গ্রামেরই প্রায় সমকালীন। এও এক সুপ্রাচীন মানুষের দলবদ্ধ হ'য়ে থাকার নামান্তর। 'মানসারে' গ্রামকে আটটি মুখ্যভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) দণ্ডক, (২) সর্বতোভদ্র, (৩) নন্দাবর্ত, (৪) পদ্মক, (৫) স্বস্তিকা, (৬) প্রস্তর, (৭) কার্মুক, (৮) চতুর্মুখ।

বিশ্বকর্মা বাস্তুশাস্ত্রে আবার নগরকেও নানা স্তরের নরপতির অধিবাস অনুযায়ী নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

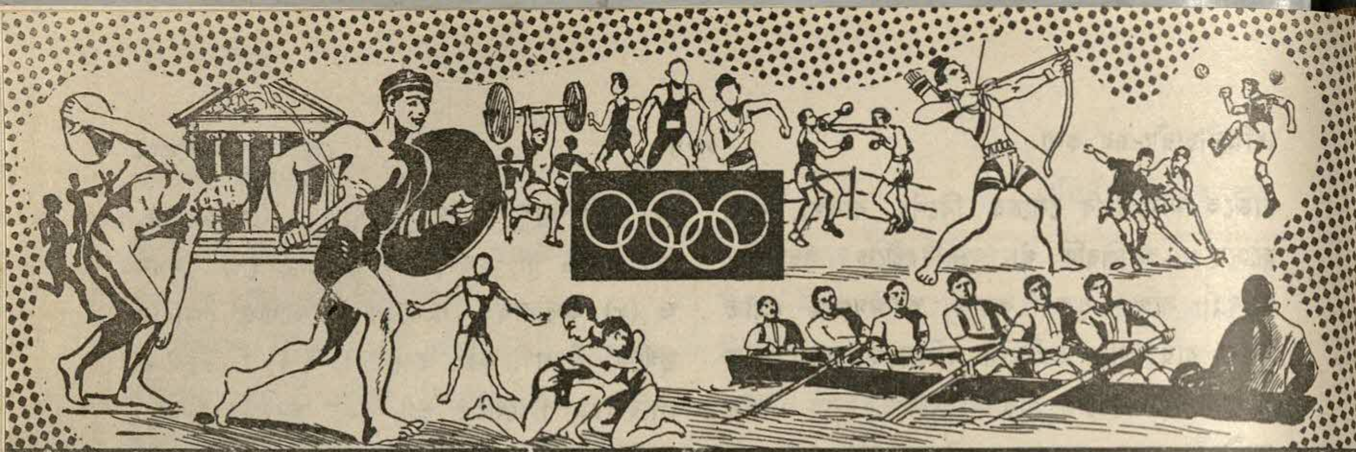
(১) নরেন্দ্রের নিবাস যে নগরে সেটি 'পদ্মনগর', (২) মহারাজের বসতি যেখানে সেই নগর 'সর্বতোভদ্র', (৩) অষ্টগ্রহ যেখানে বাস করেন সেটি হচ্ছে 'প্রস্তর', (৪) পট্টভাবের যেখানে রাজধানী সেটি হ'ল 'শ্রীপ্রতিষ্ঠা', (৫) যুবরাজের যেখানে বসবাস সেটি হ'ল 'পুর', (৬) মাণ্ডলিক যেখান থেকে রাজত্ব করেন সেটি 'অষ্টমুখ' ও (৭) সার্বভৌম যেখানে অধিষ্ঠান করেন সেটি হ'ল রাজধানী।

মানসারের বিভাগ অনুযায়ী দুর্গ বা দুর্গযুক্ত নগরীকে বলা হয় যথাক্রমে (১) শিবির, (২) বাহিনীমুখ, (৩) স্থানীয়, (৪) দ্রোণক, (৫) সম্বিদ্ধ বা বর্ধক, (৬) কোলক, (৭) নিগম ও (৮) স্কন্দাবার। সামরিক উদ্দেশ্যেও আবার দুর্গকে ভাগ করা হয়েছে: (১) গিরিদুর্গ—গিরিধারা পরিবেষ্টিত দুর্গ, (২) বনদুর্গ—বনমধ্যে স্থাপিত দুর্গ, (৩) সলিল বা জলদুর্গ, (৪) পঙ্কদুর্গ, (৫) রথদুর্গ, (৬) দেবদুর্গ—মানে দেবতার দুর্গ অর্থাৎ নৈসর্গিক অবস্থান হেতু সুরক্ষিত স্থান ও (৭) মিশ্রদুর্গ। দুর্গের নক্সায় দুর্গের আকৃতি চতুষ্কোণ, আয়তাকার বা বৃত্তাকার হ'তে পারে, তবে তার বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য হ'ল চারিদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা, তারপর উঁচু বেষ্টনী-প্রাচীর এবং এতে প্রবেশের বিশেষ দরজা থাকবে। দেয়ালে গোপন সিঁড়ি ও স্থানে স্থানে দূরের জিনিস দেখার জন্য স্তম্ভ বা মিনার এবং নানা-স্থানে অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখার ব্যবস্থাও থাকবে।

এদেশের প্রাসাদ

মধ্যযুগে বহুতল প্রাসাদের বর্ণনা আছে 'মানসার' নামক স্থাপত্য ও এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ের বইএ। যেমন: একতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা বাড়ী প্রত্যেকটি আট রকমের, ছ'তলা তেরো রকমের, সাততলা আট রকমে', আটতলা আট রকমের, ন'তলা সাত রকমের, দশতলা ছ' রকমের, এগারোতলা ছ' রকমের, বারোতলা দশ রকমের।

'কামিকাগমে' প্রাসাদের অনেক প্রতিশব্দও আছে। যেমন: বিমান, ভবন, হর্ম্য, সৌধ, ধাম, নিকেতন, প্রাসাদ, সদন, সদ্ম, গেহ, অবস্থানগৃহম্, আলয়, নিলয়, বাস, বাস্তু প্রভৃতি।



খেলাধূলার কথা

নানান রকমের খেলা

খেলাধূলার কথা বলতে গিয়ে অলিম্পিক্স্-এর কথা তো আগেই বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০)। সেটা অবশ্য 'একটা' খেলা নয়—সেটা হ'ল অনেক রকম খেলার উৎসব। এবার নানারকম খেলার কথা একটা একটা করে বলব।

খেলার রাজা ক্রিকেট

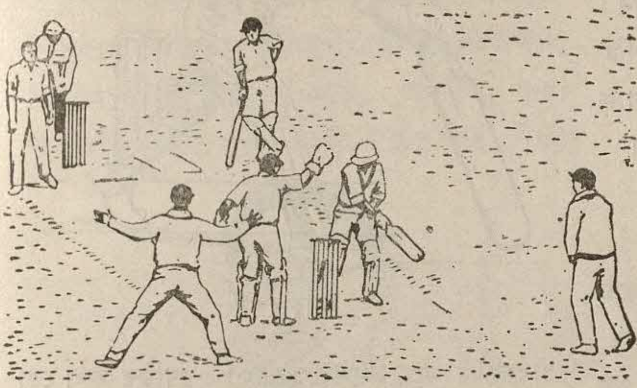
ইংরেজরা বলে, খেলার রাজা ক্রিকেট। তা হলে সেই রাজার কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

এ খেলার উৎপত্তি ইংরেজেদের দেশেই। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দেই বোধ হয় সর্বপ্রথম এ খেলার নাম শোনা যায়। নামটা যে কি করে হ'ল: তা সঠিক বলা কঠিন, তবে আগেকার দিনে বোল্স্ বলে এক রকম খেলায় বল গড়িয়ে দিয়ে মাটিতে পোঁতা খুঁটিতে লাগাতে হ'ত, সেই খুঁটিকে বলা হ'ত 'ক্রিকে'। হয়তো সেই 'ক্রিকে' থেকেই এই 'ক্রিকেট' নামটা আসছে। এ খেলাতেও তো বল ছুঁড়ে মাটিতে পোঁতা কাঠিতে লাগাতে হয়!

কিন্তু বোল্স্ খেলার সঙ্গে ক্রিকেটের মিল ঐটুকুই। ক্রিকেটে ঐ কাঠিকে বলে স্টাম্প্। তিনটে স্টাম্প্ পাশাপাশি পোঁতা হবে ৮ ইঞ্চি জায়গা নিয়ে, আর উঁচু হয়ে থাকবে, ২৬-২৭ ইঞ্চি। তার মাথায় দু'টি ৪ ইঞ্চি লম্বা কাঠি আলগা করে শোয়ানো থাকবে, তাদের নাম বেল্। এই দুই বেল্ আর তিনটে স্টাম্প্ নিয়ে নাম হচ্ছে উইকেট। মুখোমুখি করে ২২ গজ তফাতে আর একটি উইকেট বসানো থাকবে। মাঝখানকার এই ২২ গজ জায়গাকে বলে পিচ্।

এক উইকেটের পাশে দাঁড়িয়ে বল ঘুরিয়ে ছুঁড়ে অন্য উইকেটে লাগাতে হবে। শুনতে সোজা, না? সোজা হ'ত, কিন্তু ওপাশে উইকেটকে বাঁচাবার জন্যে একজন বিপক্ষের খেলোয়াড় ব্যাট্ হাতে দাঁড়িয়ে আছে যে! তাকে বলে ব্যাট্স্ম্যান, আর যে বল ছোঁড়ে তাকে বলা হয় বোলার। দুই দিক্ থেকেই পালা করে বল ছোঁড়া হয় বলে দুই উইকেটেই দু'জন ব্যাট্স্ম্যান্ থাকে। মাঠে বাদ বাকি আর ১১ জন খেলোয়াড়ই তাদের বিপক্ষের। একজন তো বোলার। আর একজন বোলারের বিপরীত দিকের ব্যাট্স্ম্যানের উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে

বল ধরে, সে হ'ল উইকেট-কীপার। বাকি ৯ জন মাঠের নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে বল ধরবার জন্যে। তাদের বলে ফিল্ডার।



ক্রিকেট খেলা

ব্যাট্স্‌ম্যান ব্যাট দিয়ে বলটাকে দূরে পাঠালে সেই বল না ফেরা পর্যন্ত যতবার সে ও তার সঙ্গী পিচের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছুটতে পারে, তার তত রান্ ধরা হয়। মাঝপথে থাকতেই বিপক্ষের কেউ বলটাকে কোনও উইকেটে লাগাতে পারলে সে আউট হয়ে যাবে। আউট তো আরও নানা ভাবেই হতে পারে। বোলারের ছোঁড়া বল যদি উইকেটে লাগে, কিংবা যদি ব্যাট্স্‌ম্যানের মারা বল কেউ লুফে নেয়, কিংবা তার ব্যাট যদি উইকেটে লেগে যায়, বা পা দিয়ে উইকেটে আড়াল করায় যদি বল উইকেটে না লেগে তার পায়ে লাগে তা হলেও সে আউট হবে। সে আউট হলেই তার দলের আর একজন এসে ব্যাট ধরবে। এই ভাবে তাদের ১১ জন একে একে খেলে মোট কতকগুলি রান্ করবে। তাদের সব শেষ হলে (একজন অবশ্য আউট না হয়েই থেকে যাবে—সে হ'ল নট্ আউট্) তখন তাদের দল আসবে বল দিতে আর ফিল্ডিং করতে। আর বিপক্ষের দু'জন আসবে ব্যাট করতে। এ রকম দু'দান বা 'ইনিংস' খেলা হয়ে যে দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি রান্ করতে পারবে সেই দলের জিত। খেলা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না হয় তা হলেই ড্র। রান্ যে সব সময়ে দৌড়িয়েই নিতে হবে তা নয়। মাঠের সীমানায় (বাউণ্ডারীতে) বল পাঠাতে পারলে না দৌড়িয়েই ৪ রান্ পাবে, উঁচু করে মাঠের বাইরে পাঠাতে পারলে ৬ রান্।

ক্রিকেটের রাজা রণজি

খেলার রাজা ক্রিকেট, আবার ক্রিকেটের রাজা ছিলেন রণজি। আর সত্যি সত্যিই তিনি রাজা ছিলেন, এই ভারতবর্ষেরই নবনগর রাজ্যের। তাঁর আসল নাম ছিল প্রিন্স রণজিৎ সিংজি। ভারত তখন ইংরেজদের অধীন, তারা আমাদের তুচ্ছ মনে করত। কিন্তু তাদেরই দেশে পড়তে গিয়ে রণজি যখন বার বার সে দেশের সেরা ব্যাট্স্-

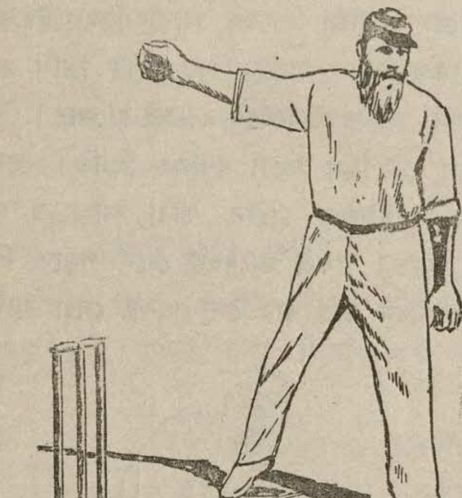


রণজি

ম্যান্‌দের চাইতেও ভালো খেলতে লাগলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে তাঁকে ইংল্যাণ্ডের দলে খেলতে নেওয়া হ'ল। সেই দলের সেরা খেলোয়াড় হয়ে তিনি বার বার টেস্ট খেলেছেন। তাঁরই নামে এদেশে 'রণজি' ট্রফি হয়েছে, 'রণজি' স্টেডিয়াম হয়েছে ইডেন গার্ডেনে। রণজি প্রতিযোগিতা হয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে।

টেস্ট ম্যাচ

টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কা—এই সাতটি দেশের যে কোনও দুই



ডক্টর গ্রেস

দেশের মধ্যে খেলা। আগে দক্ষিণ আফ্রিকাও টেস্ট খেলত, এখন আর তাদের সঙ্গে কোন দেশ খেলতে চায় না—রাজনৈতিক কারণে। প্রথমে শুধু হ'ত ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই টেস্ট, যার আরম্ভ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। ভারত প্রথম খেলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে।

পুরোনো দিনের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে



জ্যাক্ হব্‌স্

চারজনের নাম বিশেষ স্মরণীয়। রণজির কথা তো আগেই বলেছি। তা ছাড়া গত শতাব্দীর ইংরেজ খেলোয়াড় ডক্টর গ্রেস আর অস্ট্রেলিয়ার ভিক্‌টর ট্রাম্পার। আর, অল্পদিন আগেকার বিস্ময়কর ব্যাট্‌স্‌ম্যান অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান্।

এ ছাড়া, ইংল্যাণ্ডের ফ্র্যাঙ্ক উলী, জ্যাক হব্‌স্, লেন হাটন, ওয়ালী হ্যামণ্ড; অস্ট্রেলিয়ার স্পফোর্থ, হার্ভে; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কন্‌স্ট্যানটাইন, ওরেল, হল প্রভৃতি অনেকের নাম করা যেতে পারে। এঁরাও আগেকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়।



সি. কে. নাইডু

ভারতীয়দের মধ্যে রণজির ভাইপো দলীপ-সিংজি, পাটাউডির নবাব ইফতিকার আলি খান, আর এঁরই ছেলে মনসুর আলি খান হচ্ছেন রণজির মতই ক্রিকেট-খেলোয়াড় রাজপুত্র। কিছুকাল আগেকার বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে সি. কে. নাইডু, সি. এস্. নাইডু, অমরসিং, লালা অমরনাথ, নিসার, মুস্তাক আলী, উজির আলী, বিজয়



অমর সিং

মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে, সুশীল (শুঁটে) ব্যানার্জি, পঙ্কজ রায়—এঁদের নাম অবশ্যই করতে হয়। ভিনু মানকড়ও একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এখন অবশ্য নতুন যুগে আরও নতুন নতুন খেলোয়াড় উঠছেন। এঁদের মধ্যে সুনীল গাভাসকর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি টেস্ট ম্যাচে ৩০টি সেঞ্চুরী করে ব্র্যাডম্যানের ২৯টির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন. এবং টেস্ট ম্যাচে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের অধিকারী হয়েছেন।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার যে টেস্ট খেলা, তাতে ইংল্যাণ্ড প্রথম হেরে যায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। তখন বিলেতের কাগজে ঠাট্টা করে লেখে যে ইংরেজদের ক্রিকেট মারা গেছে, তাকে পুড়িয়ে তার ছাই (অ্যাশেস্) অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেই থেকেই এই টেস্ট খেলায় যে দল জেতে, তার বিষয়েই বলা হয় যে এবার তারা 'দি অ্যাশেজ্' লাভ করেছে। এই অ্যাশেস্ পাওয়া, বলা বাহুল্য, খুব গৌরবের বিষয়।



মুস্তাক আলি

ফুটবল

ইংরেজরা যা-ই বলুক, আমাদের দেশে খেলার রাজা ফুটবল ছাড়া আর কেউ নয়। সেটাও অবশ্য ইংরেজদের থেকেই আমরা পেয়েছি। এ খেলায় বলটা গোল, আর তা খেলতে হয় শুধু পা দিয়ে (এক গোলকীপার ছাড়া)। আর একরকম ফুটবল খেলাও আছে। তাতে বলটা হয় দু'মুখ-সরু আর পেটমোটা, আর সে খেলায় হাত আর পা দু'টো দিয়েই বল খেলা হয়। তাকে বলে 'রাগ্‌বী ফুটবল' বা 'রাগার'। সেটা এদেশে বিশেষ চলে না।

আমাদের চেনা ফুটবল খেলাটার পুরো নাম হচ্ছে 'অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল', কেননা বিলেতে একটা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন হয়ে তারা ১৮৬৫ সনে এ খেলার নিয়মগুলো বেঁধে দেয়। একে আবার 'সকার' খেলাও বলে এটা অ্যাসো-সিয়েশন্ শব্দের সংক্ষেপও হতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে খুব আগেকার দিনে 'সকার' শব্দে 'গুণ্ডা' বোঝাত—এই খেলাটা গুণ্ডামির খেলা ছিল বলে এর নাম 'সকার' রাখা হয়।

গুণ্ডামির কথাটা বড় মিথ্যে নয়। গোড়ায়

এ খেলায় ভারি হুড়োহুড়ি, লাথালাথি হ'ত, প্রতিপক্ষকে জখম করবার জন্যে লোহার কাঁটা জুতোয় বেঁধে নিয়ে খেলতে নামা হ'ত। তারপর যত ইচ্ছে লোক এক-এক দলে ভিড়ে গিয়ে একটা বল নিয়ে এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড লাগিয়ে দিত যে তাকে খেলা না বলে দাঙ্গা বলাই উচিত।



ফুটবল খেলা

তারপর, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সব নিয়ম বেঁধে দিল। ফুটবল খেলার মাঠ হবে ১০০ থেকে ১২০ গজ লম্বা, আর ৮০ গজ চওড়া। গোল ২৪ ফুট চওড়া আর ৮ ফুট উঁচু। গোলের সামনে ১৮ গজ পর্যন্ত জায়গা হবে পেনাল্টি এরিয়া। নিজেদের দিকের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে নিয়মভঙ্গ করলে তার শাস্তি হবে পেনাল্টি কিক্। তার মানে, গোলের সামনে ১২ গজ দূরে বল বসিয়ে অপর পক্ষের খেলোয়াড় গোলে বল মারবে, একা গোলকীপারই সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারবে।

এক এক দলে ১১ জন হিসেবে দু'দলে ২২ জন খেলবে। এগারো জনের মধ্যে একজন গোলকীপার। বাকি দশজনের মধ্যে আগেকার দিনে ২ জন ফুল ব্যাক, ৩ জন হাফ্ ব্যাক আর ৫ জন ফরোয়ার্ড খেলত। আজকাল ৪ জন ব্যাক, ২ জন হাফ্ ব্যাক আর ৪ জন ফরোয়ার্ড —এই ভাবেই খেলোয়াড়দের সাজানো হয় বেশির ভাগ খেলায়। আগেকার দিনে এদেশে এক ঘণ্টা খেলা হ'ত, আজকাল হয় দেড়ঘণ্টা। মাঝে অবশ্য মিনিট দশেক বিরতির ব্যবস্থা আছে।

ফুটবলটা কত বড় হবে তাও ঠিক করা আছে। তার বেড় হবে ২৭-২৮ ইঞ্চি। সেই বলকে অপরের গোলে ঢুকিয়ে দেওয়া, আর নিজেদের গোলে ঢুকতে না দেওয়া'ই এই খেলার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে ফুটবল

আমাদের দেশে এ খেলা আরম্ভ হয়েছিল ১৯ শতাব্দীর শেষ দিকে। শোনা যায় নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী নামে একটি বছর দশেকের ছেলে গড়ের মাঠে জাহাজী সৈন্যদের কাছে এই খেলা প্রথম শেখেন এবং তাঁর স্কুলে (হেয়ার স্কুল) বন্ধুদের নিয়ে প্রথম ফুটবল খেলা শুরু করেন। ঐ সময় পাশের প্রেসিডেন্সী কলেজের দু'জন ইংরেজ অধ্যাপক, যাঁরা আগেই ঐ খেলা জানতেন, তাঁদের নানা ভাবে সাহায্য করেন এবং এর পরেই হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাব নাম দিয়ে হেয়ার স্কুলের মাঠে এদেশের প্রথম ফুটবল ক্লাব তৈরি হয়।

তাই থেকে ক্রমে আরও নানা জায়গায় ফুটবল ক্লাব গজিয়ে ওঠে। প্রথম দিকের ক্লাবগুলির মধ্যে শোভাবাজার ক্লাব খুব শক্তিশালী ছিল। কুচবিহারের মহারাজাও এ খেলার খুব অনুরাগী ছিলেন। তাঁরই সহযোগিতায় নগেন্দ্রপ্রসাদ ট্রেড্স্ কাপ্ প্রতিযোগিতার চলন

করেন—যা নাকি সে যুগে আই. এফ. এ. শীল্ডের মতই জনপ্রিয় ছিল। ইংরেজরা এবং গোরা দলেরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন এবং একবার শোভাবাজার ক্লাব তাঁদের হারিয়ে ট্রেড্‌স্ কাপ্ জিতে নেয়। আই. এফ. এ. শীল্ডের গোড়াপত্তনেও নগেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা কম ছিল না। নিজেও তিনি ভালো খেলতেন এবং সারাজীবন ঐ খেলা নিয়ে মেতে ছিলেন।

আই. এফ. এ. মানে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিশেন। এটাই বোধ হয় এখনও সমস্ত ভারতের মধ্যে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা।

অবশ্য এটা ঠিক যে প্রথমে সাহেব দলগুলির সঙ্গে খেলায় আমাদের দেশী খেলোয়াড়রা তেমন সুবিধে করতে পারত না। তাই, কলকাতায় যখন ১৮৯৩ সনে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা আরম্ভ হ'ল, তখন থেকে ১৯১০ পর্যন্ত গোরা এবং সাহেব দলগুলিই প্রতিবার শীল্ড জিতত। তারপর ১৯১১ সনে এক আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। বাঙালী টীম মোহনবাগান গোরা সৈন্যদের টীম ইস্ট ইয়র্ক্‌স্‌কে ফাইন্যালে ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে শীল্ড জিতল। তখন বাঙালীরা বুট পরে খেলত না। কাজেই বাঙালীর এই জয় একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে উঠল। এক অজ্ঞাত কবি এ নিয়ে একটা গান বেঁধেছিলেন। সে সময়ে তা ছেলে-ছোকরাদের মুখে মুখে খুব শোনা যেত :

"সাবাস্ সাবাস্ মোহনবাগান,
খেলেছ তো ভাই বেশ,
গোল দিয়েছ গোরা দলে—
বাঙালীদের জিৎ !
আজকের এই জয়ের কথা
ভুলবে নাকো দেশ···।"

কলকাতার ফুটবল লীগেও ১৮৯৮ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত গোরা আর সাহেবদের একচ্ছত্র প্রাধান্য ছিল। ক্যালকাটা ক্লাব (ইংরেজ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত, কিন্তু গোরা দল নয়) ছিল খুব শক্তিশালী। তারপর বুট-পরা দেশী টীম মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪-এ প্রথম লীগ্‌বিজয়ী হয়। শুধু তাই নয়, তারপর ১৯৩৮ পর্যন্ত লীগে তারা একটানা প্রথম স্থান অধিকার করে। এর পর উঠল আর একটি বিখ্যাত দেশী ক্লাব ইষ্ট বেঙ্গল। এখন ইষ্ট বেঙ্গল মোহন-বাগানের খেলাই ফুটবল মাঠের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

ফুটবলের আরও কয়েকটা বড় প্রতিযোগিতা এদেশে হয়। যেমন বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপ্, সিমলায় বা দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপ্ ইত্যাদি। তা ছাড়া আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফিও উল্লেখযোগ্য। এতেও বাংলা দলই সেরা বলা যায়। কয়েক বছর হ'ল জবাহরলাল নেহেরু গোল্ড কাপ নাম দিয়ে কলকাতায় আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতাও শুরু হয়েছে।

অন্যান্য দেশে ফুটবল

পৃথিবীর অনেক দেশেই ফুটবল খেলার চল আছে। সব দেশের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে, তাকে বলে ওয়ার্ল্ড কাপ্ বা জুলে রিমে কাপ্। সেখানে পৃথিবীর সেরা টীমরাই খেলতে পায়। তার মধ্যে ব্রেজিল, উরুগুয়ে, ইটালী, হাঙ্গেরী, পঃ জার্মেনী, পর্টুগাল, আর্জেনটিনা আর ইংল্যাণ্ডের দলগুলিই প্রধান। ব্রেজিলের বিখ্যাত খেলোয়াড় পেলে, হাঙ্গেরীর পুস্কাস্, পর্টুগালের ইউসেবিও আর ইংল্যাণ্ডের স্ট্যানলী ম্যাথিউজ বিশ্ববিখ্যাত। ইদানীং পেলেকে বলা হ'ত ফুটবলের রাজা।

অলিম্পিক্‌স্‌এও ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়।

ইংল্যাণ্ডের এক বড় খেলোয়াড় ছিলেন ডিক্সি

ডীন। তিনি ছিলেন গোল দেবার রাজা। বিশেষত মাথা দিয়ে, অর্থাৎ হেড্ করে গোল দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। তিনি একদিন পথে চলেছেন, হঠাৎ দেখা হ'ল এলিশা স্কট নামে আর এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে। স্কট তাঁর বিপক্ষ দলের গোলকীপার ছিলেন অনেক খেলায়। তাঁকে দেখে ডীন মাথাটি নেড়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। আর যায় কোথা? স্কটের অমনি মনে হ'ল, ঐ যাঃ! ডীন হেড্ করেছে, গোল হয়ে গেল তো! তিনি অমনি সেই অদৃশ্য বল ঠেকাবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন শান-বাঁধানো ফুটপাথেরই ওপরে। এঁদেরকেই বলা যায় 'খেলা-পাগল'।

বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধ হয় এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মোহনবাগান ক্লাবের ব্যাক্ গোষ্ঠ পাল। পরে অবশ্য আরও অনেক দুর্ধর্ষ



গোষ্ঠ পাল

খেলোয়াড় তৈরি হয়েছেন। ১৯১১ সালে যে ১১টি খেলোয়াড় আই. এফ. এ. শীল্ড জিতেছিলেন তাঁদের নামও স্মরণীয় হয়ে আছে।

হকি

ক্রিকেট আর ফুটবলের পরই নাম করতে হয় হকি খেলার। আর, সেই হকি খেলায় বহু দিন পর্যন্ত ভারতই পৃথিবীর রাজা ছিল।

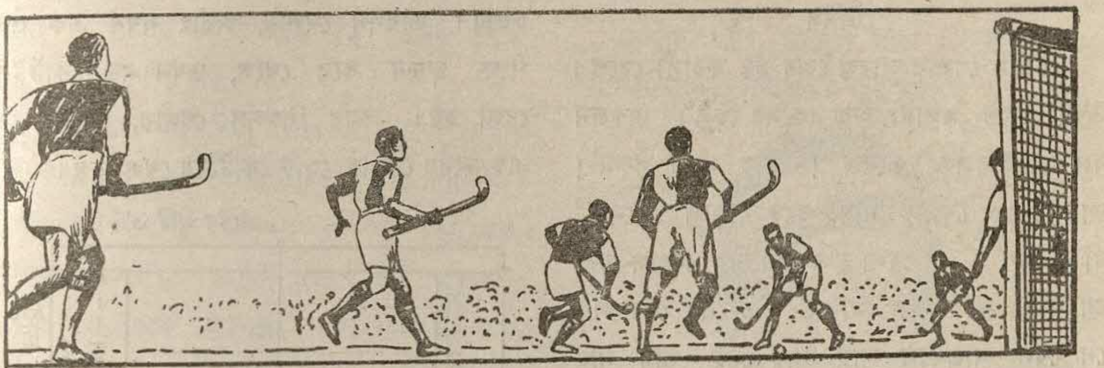
এখন আর ভারতের সে গৌরব নেই। ১৯২৮-এ অলিম্পিক্‌সে প্রথম হকি খেলা হয়। প্রথম বারই ভারত জেতে। তার পর প্রতিবারই ভারতের জয় হতে থাকে। লস্ এঞ্জেল্‌স্-এর অলিম্পিক্ ফাইন্যালে ভারত ২৪-১ গোলে আমেরিকাকে হারায়। তার পর ভারত ভেঙ্গে যখন ১৯৪৭-এ ভারত আর পাকিস্তান হ'ল, তখন পাকিস্তানের হকি দল ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। শেষে ১৯৬০-এর অলিম্পিক্‌সে ভারত পাকিস্তানের কাছে হেরে গেল। অবশ্য তার পরের বারই ১৯৬৪ তে ভারত আবার জয়ী হ'ল অলিম্পিক্‌সে। এর পর ১৯৬৮-র অলিম্পিক্‌সে ভারত আবার নেমে যায় একেবারে ৩য় স্থানে, তার পর আরও নীচে। ১৯৮০তে আবার তারা অলিম্পিক্-বিজয়ী হয়েছে।

হকি-ফকির ধ্যানচাঁদ

ক্রিকেটে রণজির মত হকিতে ভরতের গৌরব হচ্ছেন মেজর ধ্যানচাঁদ। তাঁর মত হকি-



ধ্যানচাঁদ



হকি খেলা

খেলোয়াড় বোধ হয় পৃথিবীতে আর জন্মান নি। ১৯২৮-এর অলিম্পিক্‌সে ফাইন্যালে তিনি হল্যাণ্ডকে তিন গোল দেন, সেবার জয়পাল সিং ছিলেন তাঁদের দলের ক্যাপ্টেন। তারপর ১৯৩২-এ তিনি ভারতের হয়ে মোট ১৩৩ গোল দেন, সেবার ফাইন্যালে ভারত জেতে ২৪-১ গোলে। ১৯৩৬-এ ধ্যানচাঁদ ক্যাপ্টেন হন, সেবার ফাইন্যালে জিত হ'ল ৮-১ গোলে। ধ্যানচাঁদ মোট ৫৯টি গোল দেন সেবার। এর আগে ১৯৩৪-এ নিউজিল্যাণ্ডে খেলতে গিয়ে ভারতীয় সেনাদলের হয়ে তিনি একাই মোট ২০১টি গোল দেন। এমনই আশ্চর্য আশ্চর্য সব কীর্তি তাঁর! জার্মেনীতে বার্লিন অলিম্পিক্‌সে তাঁর খেলা দেখে সেখানকার দর্শকেরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'হকি-ফকির'। ভারতীয় ফকিররা যাদু জানে বলে তাদের ধারণা,—তাই এই নাম।

হকির আর আর খবর

হকি খেলার মাঠ ফুটবলের চেয়ে ছোট,—৮০ গজ লম্বা আর ৫০ গজ চওড়া। গোল দু'টো হয় ১২ ফুট চওড়া, আর ৭ ফুট উঁচু। গোলের ১৫ গজ আগে একটা দাগ দেওয়া থাকে, তাকে বলে স্ট্রাইকিং সার্ক্‌ল্—তার বাইরে থেকে বল মেরে গোল করা চলবে না। হকি খেলার বল হয় ক্রিকেট বলেরই মত। তাকে একটা মাথা-বাঁকা লাঠি দিয়ে মেরে চালাতে হয়, তাকেই বলে হকি স্টিক্। এর ওজন হবে ২৮ আউন্স, তার বেশি নয়। বল মারবার সময় স্টিকের মাথা কোমরের চাইতে বেশি উঁচুতে তোলা বারণ, তার উল্টো পিঠ বলে ঠেকানোও দোষের। আর, এক গোলকীপারই পা দিয়ে বল ঠেকাতে বা ঠেলতে পারে, আর কেউ নয়।

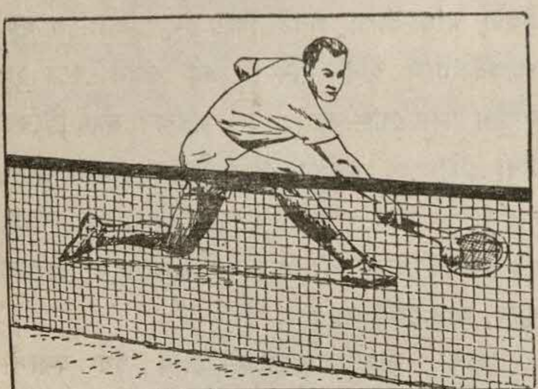
'হকি' নামটা এসেছে বোধ হয় ফরাসী ভাষার 'হোকে' শব্দটা থেকে—তার অর্থ হচ্ছে 'মাথা বাঁকা'। স্টিক মাথা বাঁকা হয় বলেই হয়তো এই নাম।

কলকাতায় হকি খেলার বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে বাইটন বা বেটন কাপ্। ১৮৯৫ সনে এটা আরম্ভ হয়। সেবার জিতেছিল নেভাল ভলান্টিয়ার্স। কলকাতার কাস্টম্‌স্ ক্লাব বহুকাল হকির শ্রেষ্ঠ দল ছিল। এখন মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল হকিতেও সেরা। অবশ্য ফুটবলের মত এখানেও লীগ্ খেলা হয়। বোম্বাইএর আগা খাঁ কাপ্ও হকির একটি বড় প্রতিযোগিতা।

টেনিস

টেনিস খেলার আরম্ভ বোধ হয় ফরাসী দেশে। তখন অবশ্য খেলাটা অন্য রকমের ছিল। একজন বল মেরেই বলত 'তেনেজ্'! তার মানে 'ধরুন'! তাই থেকে খেলার নামই হয়ে দাঁড়াল 'তেনেজ্' বা 'টেনিস'। সে খেলা হ'ত তিন দিক্ দেয়াল-ঘেরা জায়গায়, আর বল মারতে হ'ত সেই দেয়ালে। সে খেলা আজকাল আর প্রায় নেই—তার নাম 'রিয়াল' বা 'রয়্যাল' টেনিস।

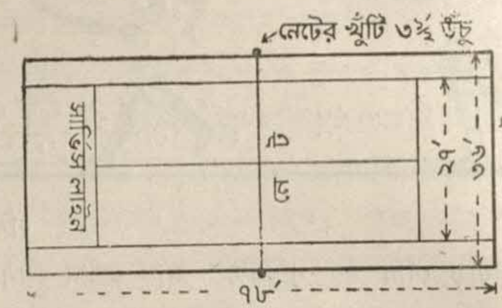
আজকাল আমরা যাকে টেনিস বলি তার আসল নাম হচ্ছে 'লন টেনিস'। লন মানে ঘাসজমি। লন টেনিস খেলার নাম প্রথমে ছিল স্ফেয়ারি-



টেনিস খেলা

স্টাইক। তার নিয়ম করে দিয়েছিলেন উইংফীল্ড নামে একজন ইংরেজ, ১৮৭৪ সনে। লন টেনিস খেলার জায়গাটা ঘাসজমিও হতে পারে কিংবা শান-বাঁধানোও (হার্ড কোর্ট) হতে পারে।

সেই জমি বা কোর্টে ৭৮ ফুট লম্বা আর ৩৬ ফুট চওড়া একটা জায়গা দাগ দিয়ে ঘেরা হয়। আব'র, দু'পাশ থেকে ৪½ ফুট করে ছেড়ে দিয়ে লম্বালম্বি দু'টো দাগ দেওয়া হয়—তা হলে এই ভিতরকার খোপটা হল ২৭ ফুট চওড়া। ডাবল্স্ খেলায়, অর্থাৎ যখন এক এক পক্ষে দু'জন করে খেলে, তখন বড় কোর্টটায় খেলা হয়। আর সিঙ্গল্স্ খেলায়, মানে এক এক জনের খেলায়, ছোট কোর্টটায় খেলা হয়।



টেনিস কোর্টের নক্সা

কোর্টের ঠিক মাঝখানে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটি নেট বা জাল টাঙ্গানো থাকে, সেটা দু'মাথায় ৩½ ফুট উঁচু খুঁটিতে বাঁধা থাকে। এই নেটের দুই দিকে দুই পক্ষ দাঁড়ায়, তাদের হাতে থাকে র‍্যাকেট, মানে জাল-বাঁধা ব্যাট। তাই দিয়ে একটা বলকে এমন ভাবে মারতে হয় যাতে অপর পক্ষ ফিরিয়ে দিতে না পারে। তা হলেই যে বল মেরেছে সে পয়েন্ট পায়।

উইম্ব্ল্ডন্ আর ডেভিস্ প্রতিযোগিতা

পৃথিবীর অনেক দেশেই নানা দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা হয়, তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের উইম্ব্ল্ডনেরটাই শ্রেষ্ঠ। এটাতে জিতলেই তাকে সেবারকার মত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন বলা যায়। তার ওপর আবার সে যদি আমেরিকার, অষ্ট্রেলিয়ার আর ফ্রান্সের লন টেনিস প্রতিযোগিতায়ও জিততে পারে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা! তাকে বলে 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' জেতা। এ কাজ এ পর্যন্ত করতে পেরেছেন আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ, ১৯৩৮

সনে। তার পর অষ্ট্রেলিয়ার রড্ লেভার গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম জিতেছেন দু'বার।

আমেরিকানরা কিন্তু বলে যে তাদের দেশের টিলডেন-এর মত খেলোয়াড় কখনও হয় নি। ইংল্যাণ্ডের পেরী, ফ্রান্সের কোশে, বোরোত্রা, লাকস্ত্, ক্রনোঁ, অষ্ট্রেলিয়ার রড্ লেভার—এঁরাও অতীতের নামকরা খেলোয়াড়। আর, মেয়েদের মধ্যে সব চাইতে নাম হচ্ছে ফ্রান্সের সুজান লেংলেন এবং আমেরিকার হেলেন উইল্স্ মুডি আর হেলেন জ্যাকব্স্-এর। ইদানীং অবশ্য আরও নতুন নতুন খেলোয়াড় উঠছেন।



পেরী

এদেশের রমানাথ কৃষ্ণান, ঘাউস্ মহম্মদ, দিলীপ বসু, প্রেমজিৎলাল, জয়দীপ মুখার্জি, অমৃতরাজ দুই ভাই প্রভৃতির টেনিসে নাম আছে, কিন্তু বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় এঁরা কিছু করতে পারেন নি।

কিন্তু নিজের নামের জন্যে না খেলে নিজের দেশের পক্ষ হয়ে পৃথিবীর অন্য দেশের দলের সঙ্গে খেলার প্রতিযোগিতাও আছে,—ডেভিস্ কাপ্-এর খেলা। ডোয়াইট ডেভিস ছিলেন আমেরিকার বড় টেনিস খেলোয়াড়, তাঁর নামেই এই কাপ্।

ডেভিস্ কাপ্ জিতলে যারা জিতল নাম হয় তাদের দেশের,—নিজেদের নাম নয়।



উইল্স্ মুডি

ব্যাডমিণ্টন

একটা খেলা কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে শিখে নিজেদের দেশে চালিয়েছিল। তার নাম তারা প্রথমে রেখেছিল 'পুনা' খেলা। বিলেতে একটা গ্রামে এক বড়লোকের বাড়ীতে একবার সেই খেলার উৎসব হয়, তখন থেকে সেই গ্রামটার নামে খেলাটারও নাম দেওয়া হ'ল 'ব্যাডমিণ্টন'।



ব্যাডমিণ্টন খেলা

এর পর সেটা পুরোদস্তুর সাহেবী খেলা হয়ে আমাদের দেশে চলে এল, আমরাও বিলেতের নতুন নিয়মে ব্যাডমিন্টন খেলতে শিখলাম।

টেনিসের মত ব্যাডমিন্টনেও ছ'পক্ষ একটা নেটের ছ' পাশে থেকে হাতে র‍্যাকেট নিয়ে খেলে। কিন্তু সে-র‍্যাকেট অনেক হাল্কা, তার ওজন হয় ৬ আউন্স। আর, বলটা হয় এক ইঞ্চি চওড়া কর্ক-এর তৈরি, তার একদিকে গোল করে ১৪টা থেকে ১৬টা পালক গোঁজা থাকে—তাকে বলে শাট্‌ল্‌-কক্ কিংবা কক্ বা বার্ড। তা ছাড়া, কোর্টের দৈর্ঘ্য হয় ৪৪ ফুট, আর সেটা চওড়া হয় ডাব্‌ল্‌স্ খেলায় ২০ ফুট, সিঙ্গল্‌স্-এ ১৭ ফুট। নেটও থাকে টেনিসের চাইতে উঁচুতে—জমি থেকে ৫ ফুট উঁচুতে।

ব্যাডমিন্টনের পয়েন্ট হয় যদি কেউ র‍্যাকেট দিয়ে মেরে ককটাকে বিপক্ষের কোর্টের মধ্যে মাটিতে ফেলতে পারে।

টেনিসে যেমন ডেভিস্ কাপ্, ব্যাডমিন্টনেও তেমনি টমাস্ কাপ্। আমাদের দেশের প্রকাশ পাড়ুকন ব্যাডমিন্টনে নাম করেছেন। কিন্তু চীন এদিকে আরও এগিয়ে গেছে।

টেবল টেনিস

আর একরকম খেলা হচ্ছে পিংপং বা টেবল টেনিস। এ খেলার 'মাঠ' হচ্ছে আড়াই ফুট উঁচু, ৯ ফুট লম্বা আর ৫ ফুট চওড়া একটি টেবল। কাজেই, ঘরের ভেতরেই এ খেলা হয়। এর মাঝখানকার নেটটি মোটে সাড়ে ছয় ইঞ্চি উঁচু হয়, আর এর বল হয় পাতলা সেলুলয়েডের তৈরি, ফাঁপা, মোটে সাড়ে চার ইঞ্চি বেড়ের ছোট্ট হাল্কা একটা গোল জিনিস। র‍্যাকেটও হয় ছোট্ট গোল চ্যাপ্টা একটুখানি তক্তার, একপাশে ধরবার জন্য একটু হাতল-লাগানো।



টেবল টেনিস খেলা

খেলোয়াড়রা অবশ্য টেবলের ওপর উঠে খেলে না, তার ছ'ধারে মেঝেয় দাঁড়িয়ে খেলে। বলটাকে র‍্যাকেট দিয়ে এমন ভাবে মারতে হয় যাতে ওটা আগে নিজের কোর্টে পড়েই লাফিয়ে নেট পেরিয়ে ওপাশের কোর্টে পড়ে। অপর পক্ষ সেটা ফিরিয়ে দিতে না পারলেই পয়েন্ট হয়।

পৃথিবীর বড় বড় টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছিলেন ভিক্টর বার্না, বার্গম্যান, বেলাক। মেয়েদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলিকা রোজিয়ান্নুরও এক সময়ে খুব নাম হয়েছিল। এখন নতুন নতুন খেলোয়াড়রাও নাম করছেন।

বাস্কেট বল

বাস্কেট বল খেলা প্রথম শুরু হয়

আমেরিকাতে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে এ খেলাটা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ হচ্ছে হাত দিয়ে বল খেলার একটা রকম। বলটা প্রায় ফুটবলেরই মত; দু'দলে পাঁচজন করে খেলে। খেলার কোর্ট হয় ৯০ ফুট লম্বা, ৫০ ফুট চওড়া। দু'মাথায় দু'টো খুঁটিতে বেশ উঁচুতে একটা করে কাঠের চৌকো বোর্ড খাড়া ভাবে লাগানো থাকে। তার মাঝখানে, মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে, একটা ১৮ ইঞ্চি রিং মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে লাগানো থাকে; তাতে একটা জালের ঝুলি আটকানো। এইটেই হল বাস্কেট। হাতে করে বল ঠেলে নিয়ে, কিংবা বলটাকে চাপড়ে চাপড়ে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ঐ রিংএর ভেতর ফেলতে হয়। রিংএ বল গলাতে পারলেই গোল।

ভলি বল

ভলি বলও ঐ রকম হাত দিয়েই একটু ছোট ফুটবল নিয়ে খেলা। তবে, ব্যাডমিণ্টনের মত, আর তার চাইতে উঁচু একটা নেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দুই দল এই খেলা খেলে। এ খেলাও আমেরিকায় শুরু হয়েছিল, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। এতে বাস্কেট বলের মত দৌড়োদৌড়ি নেই, তাই এটা অনেকের পছন্দ হয়ে গেল।

ভলি বলের কোর্ট হয় ৬০ ফুট লম্বা আর তার অর্ধেক চওড়া। মাঝখানে তিন ফুট চওড়া একটা জাল টাঙানো থাকে, তার মাথাটা মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচু হয়। তার এ-পাশে ৮ জন আর ও-পাশে ৮ জন খেলোয়াড় তিন লাইনে দাঁড়ায়—সামনের লাইনে তিন, মধ্যিখানে দুই, আর একেবারে পেছনে তিন। ঘুঁষি মেরে, থাবড়া দিয়ে কিংবা অন্য যে কোনও ভাবে হাত দিয়ে বলটাকে নেটের ওপাশে ফেলতে হবে। ভলিবল এখন এদেশেও জনপ্রিয় খেলা।

গল্‌ফ্

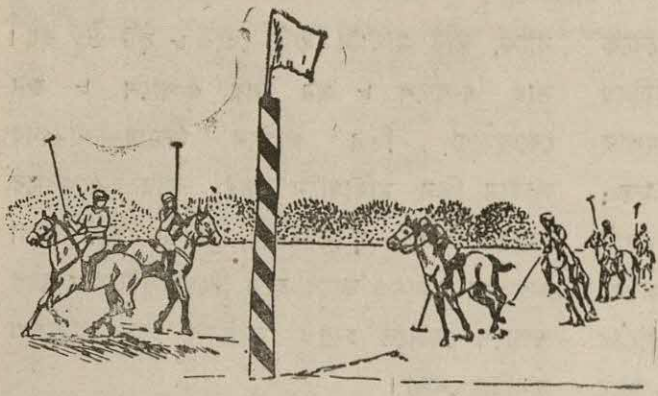
ছোট্ট একটা দারুণ শক্ত রবারের বলকে ভারী, মাথা-বাঁকানো লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে গিয়ে অনেক দূরের কয়েকটা গর্তে পর পর ফেলতে হয়। সব চাইতে কম বার মেরে খেলা শেষ করতে পারলে জিত।

পোলো

আবার, ঘোড়ায় চড়ে এক রকম বল খেলা



গল্‌ফ্ খেলা



পোলো খেলা

আছে, তার নাম এখন পোলো। আগে ইরান দেশে আর আমাদের দেশে এ খেলার চল ছিল, তখন এর নাম ছিল 'চৌগাম'। এক এক দলে চারজন করে খেলার নিয়ম। তারা ঘোড়ায় চড়ে, হাতে একটা লম্বা হাতলওলা হাতুড়ির-মত-মাথা-লাগানো লাঠি নিয়ে খেলে। মাটিতে বল থাকে, ঐ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সেটাকে অপর পক্ষের গোলে ঢোকাতে হয়। ঘোড়ায় চড়ে খেলা তো, তাই এর মাঠ হয় মস্ত বড়—৩০০ গজ লম্বা, আর ১৬০ গজ চওড়া। ফুটবলের মত এর গোলও হয় ৮ গজ তফাতে দু'টো খুঁটি পুঁতে, কিন্তু তার ওপরের কাঠটা থাকে না। পোলোর বল হয় একটা মজার জিনিস দিয়ে—তা হ'ল বাঁশের শিকড়। বলের ব্যাস হয় সওয়া তিন ইঞ্চি।

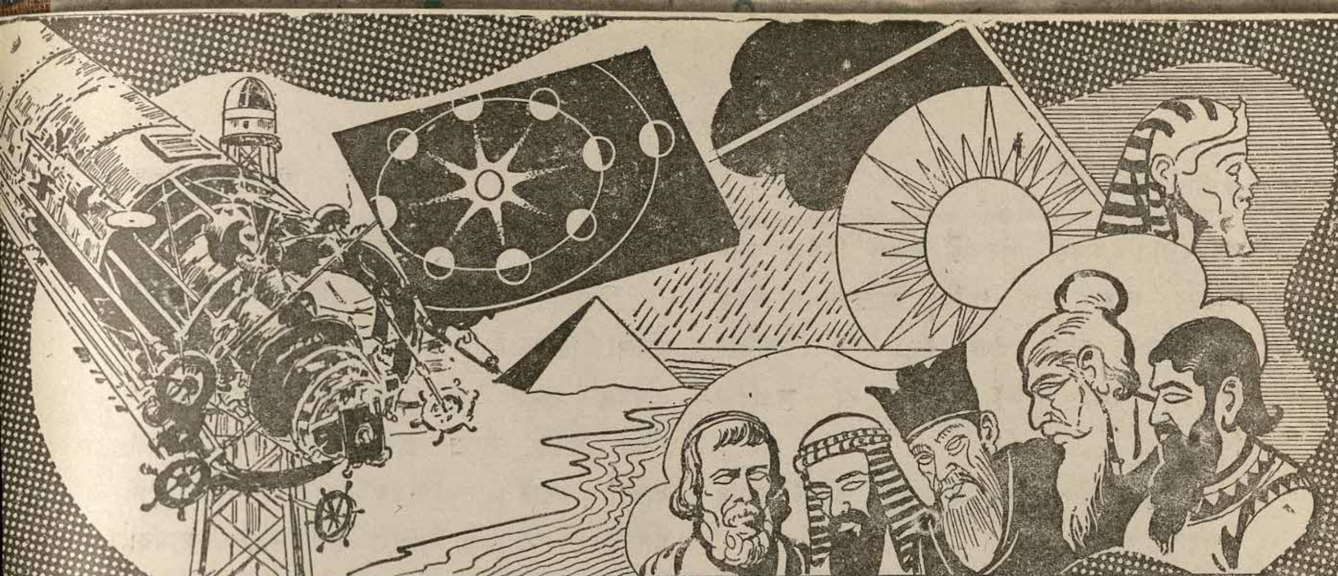
স্কেটিং, স্কিইং বা শিইং

তারপর, ধর, বরফের ওপর নানারকম খেলা আছে। আমাদের বাংলায় আমরা আর তা কোথায় দেখব, কিন্তু কাশ্মীরের মত জায়গায়, যেখানে বরফ জমে, সেখানে পায়ে 'স্কেট' কিংবা 'শি' বা 'স্কি' প'রে নানারকম খেলার চল আছে। স্কেট হ'ল চাকাওলা কাঠের জুতো, আর স্কি বা শি হ'ল চার হাত লম্বা, আগা-তোলা কাঠের সরু পাটা। এই স্কেটিং আর স্কি-ইং বা শিইং খেলার প্রতিযোগিতা ইয়োরোপ আর আমেরিকায় খুব। অলিম্পিক্‌স্‌-এও এ খেলা হয়। তা ছাড়া বরফের ওপরে হকি (আইস্ হকি) খেলারও রেওয়াজ আছে।



বরফের ওপর স্কেটিং

বরফের ওপর যেমন, জলের ওপরও তেমনি নানারকমের খেলা আছে। জলে সাঁতরে সাঁতরে কতকটা ফুটবলের মত খেলাকে বলা হয় ওয়াটার পোলো। তবে পা দিয়ে নয়, হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে খেলতে হয় এই খেলা। আবার, ঘরে বসে আলসে খেলাও আছে অনেক রকমের। আরও কত রকমের খেলা আছে,—যেমন কুস্তী, বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, আমাদের দেশের হাডুডু।



অঙ্ক শাস্ত্রের কথা

প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা

প্রাচীন ভারতে গণিতবিদ্যাকে যে খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছিল সে কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড) এখানে আমরা সে সম্বন্ধে আরও খানিকটা আলোচনা করছি। বেদের বিভিন্ন স্থানে অঙ্কশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কালে অবশ্য বিজ্ঞানের নানা শাখা আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে ওঠে আমাদের দেশে। বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিদেশী আক্রমণের অত্যাচারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কোন ধারা হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু সব কিছু চিরকালের মত হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যেই হিন্দুদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি আলাদা গোষ্ঠী। তাঁরাই ব্রাহ্মণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা এবং অনুশীলনে তাঁরা বংশানুক্রমে কাল কাটাতেন। গণিত-শাস্ত্রের চর্চাও ছিল তার মধ্যে একটি। দারিদ্র্য তাঁদের কোন রকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারত না।

স্বর্ণযুগ

খৃঃ পূঃ ৪০০ সাল থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আটশ' বছর সময় ছিল আমাদের দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ। জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থগুলিও,—যেমন সূর্যসিদ্ধান্ত, পিতামহ-সিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং গণিতের নানা নিয়মের অধিকাংশ এই সময়েই রচিত হয়েছিল।

হিন্দুরা কেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রথম দিকে এ সবের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বৈদিক কার্যবিধির সহযোগিতা। সে সময়ে বিজ্ঞানের জন্যেই শুধু বিজ্ঞানচর্চার রেওয়াজ হয়তো ছিল না, কারণ সেকালের হিন্দুদের প্রাচীনতম সাধনাই ছিল ভগবান্‌কে জানা এবং বোঝা। সেই পরম পুরুষের সম্বন্ধে জ্ঞানকে বলা হ'ত

পরাবিদ্যা। অবশ্য পরবর্তী কালে নিছক জ্ঞান লাভের জন্যে এবং পার্থিব প্রয়োজনের জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়। এ জাতীয় বিদ্যাকে বলা হ'ত অপরা বা অপ্রধান বিদ্যা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এ সম্বন্ধে একটি ভারি সুন্দর গল্প আছে।

একদিন মহর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করলেন। পৃথিবীতে যত রকম বিদ্যা রয়েছে



মহর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করলেন।

ব্রহ্মবিদ্যা হ'ল তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ঋষি সনৎকুমার নারদের কাছে জানতে চাইলেন, তিনি ইতিপূর্বে কি কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। নারদ তাঁর অর্জিত বিদ্যার একটি তালিকা পেশ করলেন। তার মধ্যে নক্ষত্র-বিদ্যা ও রাশি-বিদ্যাও ছিল। এগুলি যে আসলে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর অঙ্কশাস্ত্র আশা করি তা বুঝতে পারছ।

খুব বড় সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা

হিন্দুগণিতে খুব বড় সংখ্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তা লিখবার উপায়ও ছিল। এখনও ছোট ছেলেমেয়েদের আমরা একক দশক শতক সহস্র প্রভৃতি দিয়ে বড় সংখ্যার ধারণা করাই। এক-এর পরে সাতটা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি এক কোটি। একশ' কোটিকে বলা হ'ত সমুদ্র, এক হাজার কোটিকে বলা হ'ত মধ্য, দশ হাজার কোটিকে বলা হ'ত অন্ত এবং এক লক্ষ কোটিকে বলা হ'ত পরার্ধ। খুব বড় সংখ্যা প্রকাশের আরও নানা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। জৈন গণিতশাস্ত্রে 'শীর্ষপ্রহেলিকা' নামে একটি বড় সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন যে সংখ্যাটি আসলে ১এর পরে ১৯৩টি শূন্য বসালে যে বিরাট সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই।

সংখ্যাবাচক শব্দকে কি ভাবে কথায় প্রকাশ করা হ'ত

বারো শ' ত্রিশ সংখ্যাটি বললে তা অঙ্কে লেখা হবে ১২৩০। কিন্তু প্রাচীন কালে তা অন্য ভাবেও প্রকাশ করবার রীতি ছিল। যেমন, এই সংখ্যাটি নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ের যে কোন একটি উপায়ে প্রকাশ করা যেতে পারে :

(ক) খ-গুণ-কর-আদি,

(খ) খ-লোক-কর্ণ-চন্দ্র,

(গ) আকাশ-কাল-নেত্র-ধরা।

খ অর্থাৎ শূন্য, গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণ অর্থাৎ ৩, কর অর্থাৎ দুই হাত অর্থাৎ ২ এবং আদি অর্থাৎ ১। তা হলে 'খ-গুণ-কর-আদি'কে সংখ্যায়

প্রকাশ করলে পাওয়া যায় ০৩২১; সংখ্যাটি উলটিয়ে সাজালে আমরা পাব ১২৩০।

ঠিক একই ভাবে, 'খ-লোক-কর্ণ-চন্দ্র'-এর মানে ০ (খ=শূন্য), লোক (ত্রিলোক=৩), কর্ণ (কান=২) এবং চন্দ্র (চাঁদ=১) অর্থাৎ ০৩২১, উলটিয়ে দিলে পাব ১২৩০।

সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করার কয়েকটি ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হচ্ছে:

০=শূন্য, খ, গগন, অম্বর, আকাশ, ব্যোম, নভ, অনন্ত ইত্যাদি।

১=আদি, শশী, ইন্দু, বিন্দু, চন্দ্র, কলাধর, শীতাংশু, সোম, শশাঙ্ক, সুধাংশু, ভূমি, ক্ষিতি, ধরা, পৃথ্বী, মহী ইত্যাদি।

২=যম, যমল, লোচন, নেত্র, অক্ষি, দৃষ্টি, নয়ন, পক্ষ, বাহু, কর, কর্ণ, জানু, যুগ্ম ইত্যাদি।

৩=গুণ, লোক, ত্রিজগৎ, কাল, ত্রিকাল, ত্রিনেত্র, হরনেত্র, অগ্নি, পাবক, অনল, রত্ন ইত্যাদি।

৪=বেদ, শ্রুতি, সমুদ্র, সাগর, যুগ, দিশ, বারিধি, পয়োধি ইত্যাদি।

এমনি ভাবে, অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশের রীতিও সেকালে প্রচলিত ছিল। খুব পুরোনো দিনের মন্দিরের গায়ে এমনি ধরনের কথা দিয়ে সন-তারিখ আজও কিছু কিছু দেখা যায়।

শূন্য আবিষ্কার

ভারতীয় গণিতে শূন্যের (০) ব্যবহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'ছন্দ-সূত্র' লেখা হয়েছে খৃঃ পূঃ ২০০ সালের আগে। ছন্দ-সূত্রে শূন্যের ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবত কোন কিছুর শূন্যতা বোঝাতেই শূন্য ব্যবহার করা হ'ত; যেমন ৫ সংখ্যাটি থেকে ৫ বিয়োগ করলে বাকি কিছু থাকে না হাতে। কিছু না থাকাকেই শূন্য (০) দিয়ে প্রকাশ করা হ'ত। 'পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, শূন্যও ১, ২, ৩ প্রভৃতির মত একটি সংখ্যা বিশেষ। বর্তমান কালে যেমন 'বিন্দু' দিয়ে শূন্যকে প্রকাশ করা হয় সেকালেও তাই করা হ'ত। একক, দশক, শতক প্রভৃতি সংখ্যার স্থান নির্দেশ করতে শূন্যের ব্যবহারও হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে কোন অজানা সংখ্যা অর্থাৎ বীজ হিসেবে শূন্য (০) ব্যবহার করা হয়েছে। রুল অব্ থ্রী (ত্রৈরাশিক), রুল অব্ ফাইভ প্রভৃতি নিয়মের অঙ্কে শূন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন সংখ্যার ওপর বিন্দু ব্যবহার করে সংখ্যাটি যে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তাই বোঝানো হয়েছে। আরব এবং ইয়োরোপের নানা দেশে বিন্দুর এই ধরনের ব্যবহার ভারতীয় গণিতেরই প্রভাব। বর্তমান কালেও কোন সংখ্যার উপর একটি সরলরেখা বা 'বার' টেনে সংখ্যাটি যে ঋণাত্মক তা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জগতে সংখ্যা লিখবার কোন উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ছিল না। ভারতীয় গণিতের সংখ্যা ও অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করেই আরব্য গণিতের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

শূন্য সংখ্যাটির ব্যবহার পাটীগণিতে যেমনটি ছিল বীজগণিতে ছিল তা থেকে আলাদা। শূন্যের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ সম্বন্ধে হিন্দু গণিতজ্ঞরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোনও

সংখ্যা,—তা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন,—তাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় শূন্য। ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়) প্রণীত লীলাবতী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়।

কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় কোন অসীম সংখ্যা। এখানে শূন্যের মান 'পুরোপুরি কিছুই নয়' না ধরে অতি ক্ষুদ্র একটি ধনাত্মক সংখ্যা ধরা হয়ে থাকে। ভাস্করাচার্য এ সম্বন্ধে বলেছেন, কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে তা শূন্যে পরিণত হবে, কিন্তু পরে অন্য গাণিতিক প্রক্রিয়া করতে হলে গুণফলটিকে শূন্যের গুণফল বা 'খ-গুণ' হিসেবে রাখতে হবে। এ দেখে বোঝা যায় যে এখন যাকে আমরা বলি শূন্যের 'লিমিটিং' মান—সে সম্বন্ধে ধারণা তাঁর ছিল। উঁচু ক্লাসের অঙ্কে আমরা যাকে আধুনিক ক্যাল্‌কুলাসের কোন কোন ফাংশনের ডিফারেন্সিয়াল কোয়েফিসিয়েন্ট বলি তাও ভাস্করাচার্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গণিতাচার্য ব্রহ্মগুপ্তও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ করে গেছেন। অথচ ইয়োরোপে এই আবিষ্কার হয়েছে বহু শতাব্দী পরে, এবং সেটাকেই লোকে প্রথম আবিষ্কার বলে মনে করে।

অঙ্কের অন্যান্য প্রক্রিয়া

প্রাচীন ভারতীয় গণিতে সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ছাড়া বর্গ, ঘন, বর্গমূল এবং ঘনমূল—এই আটটি প্রক্রিয়ারই চল ছিল।

আধুনিক সময়-বিভাগের ক্ষুদ্রতম অংশ হ'ল সেকেণ্ড। শতপদ ব্রাহ্মণে (খ্রীঃ পূঃ ২০০০) উল্লিখিত একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম 'প্রাণ'। এক প্রাণ হ'ল আধুনিক এক সেকেণ্ড সময়ের সতেরো ভাগের এক ভাগ।

তেমনি বীজগণিতে দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের ফর্মুলাটিও তোমাদের অনেকের কণ্ঠস্থ। এই ফর্মুলাটি কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তই আবিষ্কার করেছিলেন। তা ছাড়া সরল সমীকরণের সমাধানেরও তিন-চার রকম উপায় প্রচলিত ছিল।

তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর গণিতের ছাত্র তাদের কাছে 'বাইনমিয়াল থিয়োরেমের' কথা বলার প্রয়োজন রাখে না। এ হেন জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সঙ্গেও আমাদের দেশের গণিতজ্ঞদের পরিচয় ছিল। মহাবীর গুণোত্তর শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্বন্ধেও আলোচনা করে গেছেন।

বীজগণিত সম্বন্ধে আমাদের দেশে সেকালে যে কত উঁচুস্তরের কাজ হয়েছে তা বলে শেষ করবার নয়। বড় হয়ে উচ্চস্তরের গণিত সম্বন্ধে পড়াশুনা করলে দেখতে পাবে যে আধুনিক গণিতের যে সব বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে আমাদের পড়াশুনা করতে হয় তার প্রায় প্রতিটি শাখাতেই রয়েছে প্রাচীন ভারতীয়দের অমূল্য দান। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে যে-সব বই স্কুল-কলেজে আমাদের পড়তে হয় তার মধ্যে এ-সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এর কারণ অনেক। তবে একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিতেরা এদিকে একেবারেই নজর দেন নি।

একটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের গণিত পড়বে তারা অয়লার এবং ল্যাগ্রাঞ্জের থিয়োরেমের সঙ্গে পরিচিত হবে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অয়লার

এবং তার চার বছর পর ল্যাগ্রাঞ্জ গণিতের এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু শুনলে অবাক্ হবে যে এই সময়ের প্রায় সাড়ে বারো শ' বছর আগে এই তত্ত্বটিই আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের দেশেরই গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট (৪৯৯ খৃষ্টাব্দ)।

জ্যামিতি বা ক্ষেত্রগণিত ও ত্রিকোণমিতি

যদিও আধুনিক জ্যামিতি গ্রীক জাতিরই সৃষ্টি, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞেরাও এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। বৈদিক যুগের ভারতীয়েরা ত্রিভুজ, সামান্তরিক, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রফল বার করতে জানতেন।

তোমরা হয়তো জান যে কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত একটি ধ্রুবক বা কন্‌স্ট্যান্ট। এ ব্যাপারটাও এদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল। এ ছাড়া শঙ্কু (কোন্), গোলক (স্ফিয়ার), শিখরীয় (পিরামিড) প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

তেমনি ত্রিকোণমিতির বহু তত্ত্বও আমাদের দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগেও এর বহু সূত্র ভারতীয় গণিতজ্ঞেরা ব্যবহার করতেন।

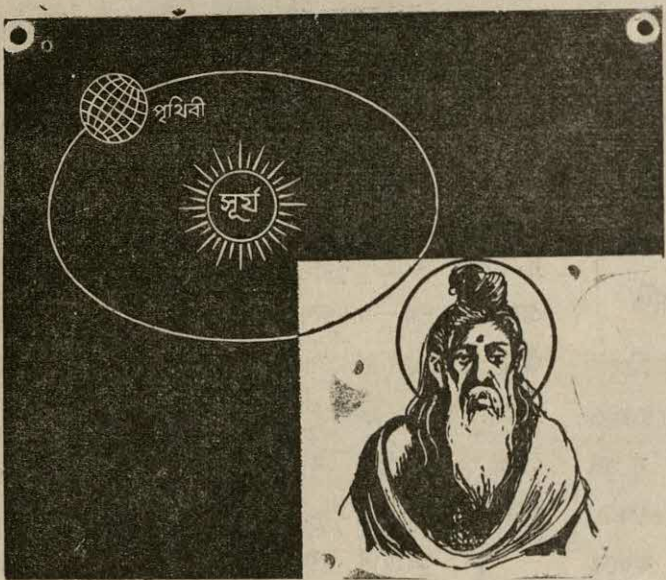
জ্যোতির্বিজ্ঞান

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কাজ সামান্য আগে-পিছে শুরু হলেও ভারতীয় গণিতজ্ঞেরা এ ব্যাপারেও অন্যান্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বেদ এবং বিশেষ করে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থে এর যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাই।

তোমাদের নিশ্চয়ই অজানা নয় যে পৃথিবী এবং সৌর জগতেও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহরা সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। তোমরা এও জান যে এখন থেকে চার শ' বছর আগে গ্যালিলিও এ তথ্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিবিধি লক্ষ করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত লোকেদের ধারণা ছিল যে পৃথিবীই হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। এ ভুল ধারণাটা প্রায় সব দেশেই প্রচলিত ছিল।

খুব প্রাচীন কালের ভারতীয় পণ্ডিতদের ধারণাও অনেকটা এ রকমই ছিল। কিন্তু প্রথম আর্যভট্টই প্রাচীন গণিতজ্ঞদের এই মতের সঙ্গে মত মেলাতে পারেন নি। তিনি বললেন, পৃথিবী আপন অক্ষের উপরে এবং সূর্যের চারদিকেই ঘুরপাক খায়। তবে হিসেব করবার সুবিধের জন্যে তিনি পৃথিবীকে স্থির ধরেই গণনাকার্য করতেন। প্রথম আর্যভট্ট ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে অশ্মক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান পাটনাতেই ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্র। তা হলে দেখা যাচ্ছে, গ্যালিলিওর এক হাজার পঞ্চাশ বছর আগেই আর্যভট্ট বলেছেন, পৃথিবী স্থির নয়, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

প্রাচীন মিশরীয় বা অন্যান্য সুসভ্য জাতের মত পৃথিবী ও আকাশ সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ ধারণা ছিল না ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। পৃথিবীর আকার গোল, এও তাঁরা জানতেন। সূর্যের বর্ষপথকে তাঁরা বারোটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। ঋক্‌বেদে আমরা দ্বাদশ সূর্যের



আর্যভট্ট বললেন, পৃথিবী আপন অক্ষের ওপরে এবং সূর্যের চারদিকেই ঘুরপাক খায়।

ভাগে ভাগ করেছিলেন। এদের বলা হ'ত সাতাশ নক্ষত্র। এক পূর্ণিমা থেকে অন্য পূর্ণিমা বা এক অমাবস্যা থেকে অন্য অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে এক মাস ধরা হ'ত।

সময় মাপবার জন্যে জলঘড়ির ব্যবহার তাঁদের জানা ছিল। জলঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সূর্যের অবস্থান দেখে কোনও স্থানের অক্ষাংশ এবং কাল নির্ণয় করতেও তাঁরা জানতেন।

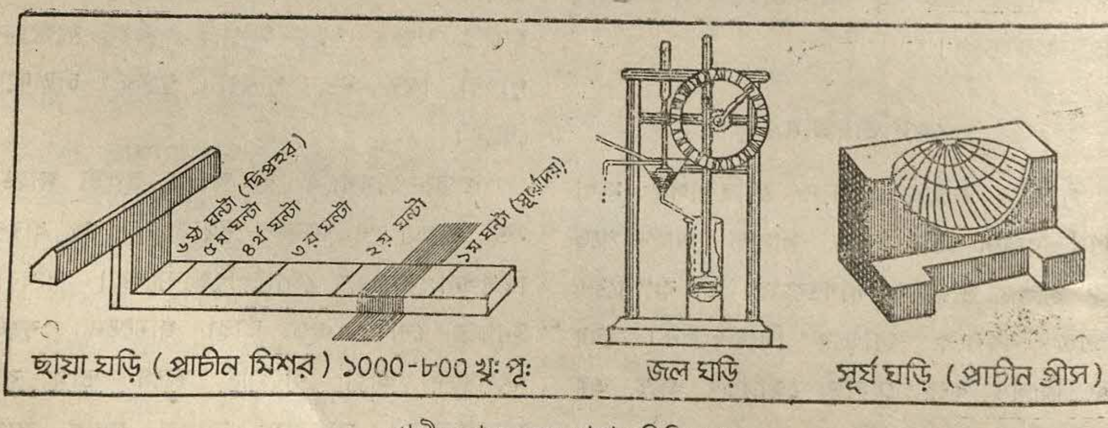
জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-সব তথ্য সেকালে আমাদের দেশে

উল্লেখ পাই। সূর্য যখন উপরোক্ত বারো ভাগের এক ভাগে অবস্থান করত তখনই তাকে এক-এক সূর্য বলে অভিহিত করা হ'ত। প্রাচীন ক্যালডিয়া ও ব্যাবিলনের অধিবাসীরা সূর্যপথের এই ভাগ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল ভারতীয় আর্যদের কাছ থেকেই।

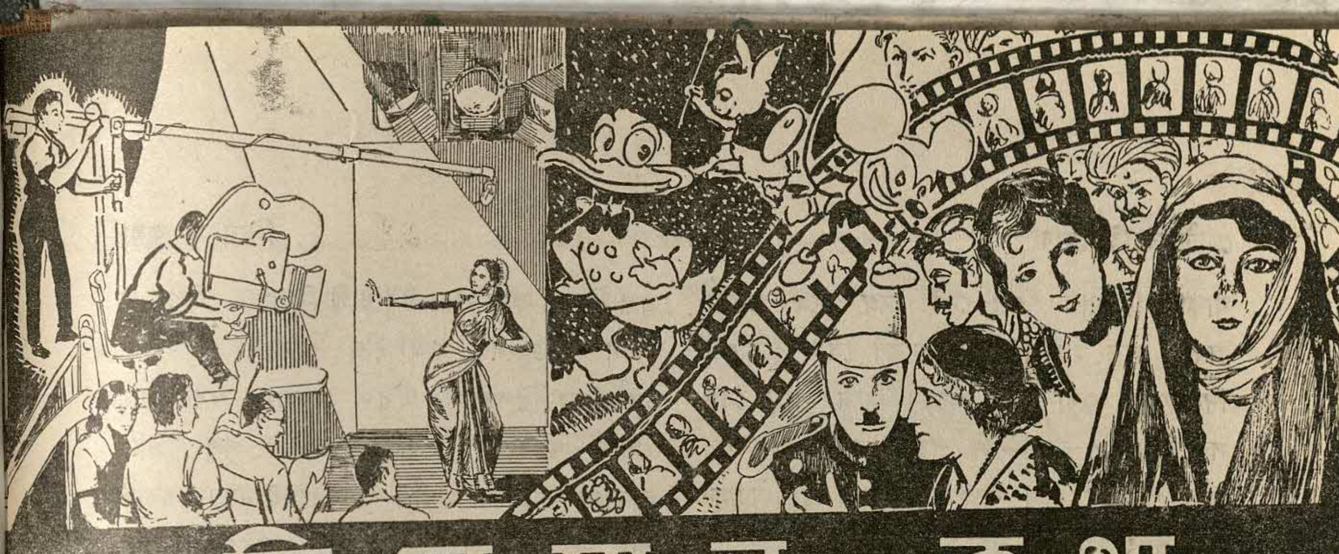
চন্দ্রের গতিপথকে ভারতীয়েরা সাতাশ

আবিষ্কৃত হয়েছিল পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেগুলিই নতুন করে আবিষ্কার করেছেন, আর সে-সব পড়ে এ যুগের আমরা একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানেরই জয় জয়কার করছি!

পরবর্তী খণ্ডে আমরা আধুনিক অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব।



প্রাচীন কালে সময় মাপার বিভিন্ন যন্ত্র



সিনেমার কথা

আগের নাম বায়স্কোপ

"উপেন্‌টি বায়স্কোপ
রাইটিনের টেস্কোপ,
চুলটানা বিবিয়ানা
দত্ত বাবুর বৈঠকখানা…"

ছেলেবেলার এই ছড়া এখনও হয়তো অনেকের মনে থাকতে পারে এবং হয়তো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে বায়স্কোপের সেই সব মজাদার দৃশ্যগুলো। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে আছড়ে পড়ল। পিঠে তলোয়ার হাতে এক সৈনিক। ওদিক্ থেকে মুখোস-পরা আর একটা লোক ছুটে আসছে বর্শা হাতে…

তারপর?

তারপর দত্ত বাবুর বৈঠকখানা।

এ-বৈঠকখানার বর্তমান হাল কেমন সে-খবর দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বায়স্কোপ অর্থাৎ চলচ্চিত্র,—এখন যাকে ইংরেজিতে বলে সিনেমা—সেই সিনেমার খবর যে বেশ মজার এবং দিনে দিনে এই সিনেমা যে কী সুন্দর হয়ে উঠেছে, সে-কথাই বলার জন্যে বসা।

এখনকার দিনে সিনেমা দেখে নি এমন মানুষ কোটিকে গোটিক। অজ পাড়াগাঁয়েও এখন সিনেমা। শহরের কথা বাদ-ই দিলাম। দু'পা পেরোতে-না-পেরোতেই এখানে সিনেমা হল্। হিন্দী, ইংরেজি, বাংলা এবং আরও নানান্ ভাষার সিনেমায় ছেয়ে গেছে দেশ। সিনেমা এখনকার যুগের আনন্দের একটা বড় মাধ্যম। যে-দৃশ্য অনেকেই স্বচক্ষে দেখে নি, সিনেমার মাধ্যমে সেই অবাক্-করা দৃশ্যই দেখা যাবে অতি সহজে। দু'-একটি টাকার বিনিময়ে তুমি দেখবে হিমালয়, দেখবে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল বুকের মধ্যে সেই-ছেলেটির আমেরিকা যাত্রার দুঃসাহসিক অভিযান; দেখবে, আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র সেই সব জন্তুজানোয়ারদের—যাদের সামনা-সামনি দেখলে আমরা অনেকেই হয়তো জ্ঞান হারাব। এই সিনেমার জন্যেই দেখতে পাবে অ্যাটম্ বোমার ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা। এই সিনেমার দৌলতেই দেখবে অ্যাপোলো ১১-র বিস্ময়কর চন্দ্রযাত্রা; দেখবে অলড্রিন্ কেমন গট্‌গট্ করে হাঁটছেন চাঁদের মাটিতে। এক কথায়, সিনেমা আমাদের সামনে এমন অনেক কিছু হাজির করেছে যা দেখে অবাক্ না হয়ে

থাকা যায় না। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো অবাক্ হতে হয় যখন চলচ্চিত্রের সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই সব বিজ্ঞানীদের—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পরিশ্রম করে যাঁরা চলচ্চিত্রের এই অবাক্-করা জগৎ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

চলচ্চিত্রের এই সব প্রথম যুগের আবিষ্কারের কথা ছোটদের বিশ্বকোষের ৪র্থ খণ্ডে দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ১২২৪-১২৩৬)। আমি তাই ও-সব কথা না বলে চলচ্চিত্র সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু বলব।

চলচ্চিত্রের গোড়ার কথা

ফ্রিজগ্রিনকে দিয়েই শুরু করা যাক।

ফ্রিজগ্রিন জন্মেছিলেন ব্রিষ্টলে, ১৮৫৫ সালে। চলচ্চিত্রের আবিষ্কারক হিসেবে এঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। ইনি আবিষ্কার করেছিলেন উন্নত ধরনের ক্যামেরা, প্রদর্শন-যন্ত্র



ফ্রিজগ্রিন

এবং নিজের ক্যামেরার উপযোগী ফিল্ম্। বিজ্ঞানী টমাস এডিসনের নাম তো শুনেছই তোমরা। চলচ্চিত্রের পেছনে এঁরও অবদান অসামান্য। এখানে আরমট্. অগস্টি. রবার্ট পল্ এবং লুমিয়ের ভাইদের কথাও না বললেই নয়। রবার্ট পল্ ১৮৭৬ সালে তুলেছিলেন পৃথিবীর প্রথম সংবাদ-চিত্র। এর নাম 'ডারবি'। নায়গ্রা জলপ্রপাতের দৃশ্য নিয়েও ছবি তুলেছিলেন ইনি। লুমিয়ের ভাইরা ছবি দেখান লণ্ডনে ১৮৯৬ সালে। এ ছবি দেখতে দর্শক জুটেছিলেন ৬৪ জন। অ্যালফ্রেড্ ওয়েষ্ট্ তোলেন 'আওয়ার নেভি' নামে ছবি। এ ছবিটিও সে যুগে ভালো লেগেছিল সকলের।

আগের তুলনায় এরপর যেন আরো বেশি ছবি তোলা হতে লাগল। জুল ভার্নের কাহিনী নিয়ে তোলা হ'ল 'এ ট্রিপ্ টু দি মুন্'। প্রায় ন' মাস ধরে লণ্ডনে দেখানো হয়েছিল এই ছবি। এ-ছবিটি দৈর্ঘ্যে ছিল তিনশ' ফুট। মাইল্স্ নামে এক চলচ্চিত্র-পরিচালক নিজের স্টুডিয়ো তৈরি করেন ১৮৯৬ সালে। তারপর ১৯০৩ সালের কথা। এ-বছরেই তৈরি হয় পৃথিবীর সে-যুগের দীর্ঘতম ছবি 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'। নামেই বুঝতে পারছ, এই ছবিটি দারুণ আলোড়ন তোলে। সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে এই ছবির নাম। এ ছবির দৈর্ঘ্য হ'ল আট শ' ফুট। এ ছবির প্রধানা চরিত্রে অংশ নেন মেরি মুরে।

অভিনেতা-অভিনেত্রী

এতদিন যেমন শুধু মাত্র চলচ্চিত্র নিয়েই মাথা ঘামাত সকলে, এবারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের

সম্পর্কেও আলোচনা হতে লাগল। অনেক খ্যাতকীর্তি অভিনেতা এলেন এ সময়ে বা এর কাছাকাছি সময়ে। অভিনয়েরও যে একটা আলাদা দাম আছে, এবারে যেন সেই ভাবনাই ঘুরতে লাগল সকলের মনে।

এই সময়ের আগে-পরে এমন বহু অভিনেতা এলেন যাঁরা পরের সবাক্ যুগেও মন কেড়ে নিয়েছিলেন কোটি কোটি দর্শকের।

মহিলাদের মধ্যে থেডাবারা, ক্লারা বো, গ্লোরিয়া সোয়ানসেন প্রভৃতির নাম করতে পারি। নির্বাক্ যুগের এক প্রখ্যাত অভিনেত্রীর নাম এখনও করি নি। ইনি হলেন পোলা নেগ্রি। পোল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন ইনি ১৮৯৯ সালে। মার্লিন ডিয়েট্রিস (আসল নাম মেরি ম্যাগডালেন) আর এক নামকরা অভিনেত্রী। প্রথম দিকে সামান্য 'এক্সট্রা' হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরে ইনি বহু বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে



পোলা নেগ্রি

অভিনয় করেন। বিখ্যাত গ্যারি কুপারের সঙ্গে 'মরক্কো' ছবিতে (১৯৩১) অভিনয় করেন ইনি।



গ্রেটা গার্বো

নির্বাক্ যুগের নামকরা আর এক অভিনেত্রীর নাম বারবারা লা মারে। এঁর অভিনয়-প্রতিভা অনেকের প্রশংসা পেয়েছিল। চলচ্চিত্র-জগতের আর এক স্মরণীয়া অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো। বহু ছবিতে অভিনয় করে সমস্ত পৃথিবীকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন ইনি। ডেন-মার্কের নিয়েলসানও কম যেতেন না। এঁর পুরো নাম আস্তা নিয়েলসান। যে ছবিতে অভিনয় করে ইনি সকলের মন জয় করেন তার নাম 'দি অ্যাবিস'। ১৯১০ সালে তোলা হয়েছিল এ ছবি।

নির্বাক্ বা সবাক্—যে যুগের কথাই বলা যাক না কেন, অভিনয়ের দিক্ থেকে কোন যুগের অভিনেতারাই কম যেতেন না। নির্বাক্ যুগের জন্ ব্যারিমুর, লায়নেল ব্যারিমুর, ভ্যালেনসিও এবং গিলবার্ট নামকরা নায়ক ছিলেন।

রোনাল্ড কোল্‌ম্যান্‌ জন্মেছিলেন ১৮৯১ সালে। নির্বাক্‌ এবং সবাক্‌—দু' যুগেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ইনি। এ ছাড়া ডগলাস্‌ ফেয়ারব্যাঙ্কস্‌, এল্‌মো লিঙ্কন, রুডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনো প্রভৃতি কত নামই না মনে আসছে!

সবাক্‌ চিত্র

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের নাম হয়তো শুনে থাকবে তোমরা। এঁরা ১৯২৭ সালে 'লাইট্‌স্‌ অব্‌ নিউ ইয়র্ক' নামে যে ছবিটি তোলেন সেটিকেই প্রথম সার্থক সবাক্‌ চিত্র বলতে পারি। ওয়ার্নার ব্রাদার্স্‌ এখনও ছবি তুলছেন। প্রথম সম্পূর্ণ বৃটিশ ছবি তুললেন হিচ্‌কক্‌। ছবির নাম ব্ল্যাক্‌মেল্‌'। এটা ১৯২৯ সালের কথা। হিচ্‌ককের নাম তোমরাও শুনেছ। রহস্যমূলক ছবি তোলায় এঁর জুড়ি নেই পৃথিবীতে।



হিচ্‌কক্‌

ইতালির প্রথম সবাক্‌ ছবির নাম 'দি সং অব্‌ লাভ্‌' (১৯৩০), রাশিয়ার 'অ্যালোন' (১৯৩১)। ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক্‌ ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' (১৯১২), প্রথম সবাক্‌ ছবি 'আলম আরা' (১৯৩০)।

বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র

বাংলার প্রথম নির্বাক্‌ ছবির নাম কি জান? 'বিল্বমঙ্গল'। এ ছবি মুক্তিলাভ করে ১৯১৯ সালে। আর প্রথম সবাক্‌ ছবির নাম হ'ল 'জামাইষষ্ঠী'। ১৯৩১-এ এটি মুক্তিলাভ করে।

ভারতবর্ষ এবং বাংলার ছবির কথা এখন থাক, এখানে বরঞ্চ মোটামুটি ভাবে সিনেমার দুনিয়ার কিছুটা পরিচয় দিই। এতক্ষণ কিছু বলেছি, এবারে বলব সিনেমার পরিচালকদের কথা, নামকরা ছবির কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা। বলব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কথা। সামগ্রিক ভাবে চলচ্চিত্র-দুনিয়ার সাধারণ কিছু খবরাখবর দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। অনেক কথা, কিন্তু সংক্ষেপেই বলতে হবে সব। কি করে ছবি তোলা হয় তা তো অন্য খণ্ডে শুনছই।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম সবাক্‌ চিত্র বলে যেটির খ্যাতি, সেটির নাম হ'ল 'জাজ্‌ সিঙ্গার'। এ ছবির নায়কের নাম জন্‌সন্‌। আজ অবশ্য সবই সবাক্‌ ছবি। অনেক ছবি, অনেক নায়ক, অনেক পরিচালক।

সিনেমা-জগতের একটি অদ্ভুত নাম: চার্লি চ্যাপলিন

এমন একজন নায়ক-পরিচালক হলেন চার্লি চ্যাপলিন। সিনেমার কথা এলেই তাই চার্লির

কথা আগে মনে আসে। এত বড় শিল্পীর অভিনয় দেখা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।



চার্লি চ্যাপলিন (মেক্-আপ্ না নিয়ে)

জীবিত অবস্থাতেই কিংবদন্তীর নায়কের মতই খ্যাতি পেয়েছিলেন ইনি। নির্বাক্ যুগ থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত একটানা অভিনয় করে গেছেন এই আশ্চর্য অভিনেতা। পঁচিশ বছর বয়স থেকেই যে বিপুল যশোগৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি পৃথিবীতে আর কোনও মানুষের পক্ষে এত কম বয়সে এত সম্মান বোধ হয় কখনও জোটে নি। ছোট্টখাট্ট সেই লোকটি, অগোছালো সেই মানুষটি—ভাগ্য আর মানুষের হাতে বার বার যিনি অপমানিত হয়েছেন, ছবির পর্দায় যখন ভেসে ওঠে তাঁর চেহারা তখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। যে দুরূহ সম্মান চ্যাপলিন লাভ করেছেন তা ছবির জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চ্যাপলিন জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালে, অল্প দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এখানে একটা মজার খবর দিই :

হিটলারের জন্মের ঠিক চারদিন আগে জন্মেছিলেন চ্যাপলিন। এবং, মজার কথা কি জান, হিটলার আর চার্লি—পরবর্তী জীবনে প্রায় একই মেক্-আপ্ গ্রহণ করেছিলেন এঁরা। সেই ঠোঁটের নীচে এক বাটারফ্লাই গোঁফ। তবে চার্লি শুধু ছবি তোলার সময়েই এ বেশে নামতেন। যাই হোক, সেই বিশেষ ধরনের চেহারাতেই এই দু'জন বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ আমাদের কাছে পরিচিত। তফাৎটা কোথায় জান? একজন বিশ্বমানবের কাছে অনন্ত হাসির ঝরণাধারা খুলে দিলেন, আর একজন সেই একই মেক্-আপে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন অনন্ত দুঃখ-বেদনার ছাপ আর নিজের জন্য রেখে গেলেন প্রচুর অখ্যাতি, যদিও নিজের দেশকে তিনি বড় করতেই চেয়েছিলেন। জানি না ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে কি ভাবে দেখবে।

ছেলেবেলায় চার্লি ছিলেন খুবই গরীব। রাস্তায় গান গেয়ে আর নেচে পয়সা রোজগার করতে হ'ত তাঁদের। কিন্তু চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকেই তিনি চলে আসেন আমেরিকায়। ঐ আমেরিকাই হচ্ছে চলচ্চিত্রের পীঠস্থান। আগে সেটা ছিল নিউইয়র্কে, পরে উদ্যোক্তারা আস্তে আস্তে চলে আসেন হলিউডে। এখানে আর একবার বলা দরকার ছবিকেও যে গতিশীল করে তোলা যায় তা প্রায় একই সঙ্গে ১৮৮৯ সালে আমেরিকায় এডিসন, ইংল্যাণ্ডে ফ্রিজগ্রিন আর ফ্রান্সে লুমিয়ের আবিষ্কার করেছিলেন।

হলিউডে চার্লি

চিত্র-নির্মাতাদের মধ্যে যিনি হলিউডে এসে তাঁবু ফেললেন, তাঁর নাম কর্ণেল সেলিগ। ইনি এসেছিলেন ১৯০৮ সালে। ১৯০৯-এ এলেন



চলচ্চিত্র আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী এডিসন্

বিলি অ্যাণ্ডারসন। ১৯১০-এ গ্রিফিথ। যাই হোক, চার্লি প্রথম যে ফিল্মে অভিনয় করেন তার নাম 'মেকিং এ লিভিং'। ছবিটা ছিল এক রিলের। প্রদর্শনের মেয়াদ দশ মিনিট। চার্লিকে দেওয়া হয়েছিল এক জোচ্চোরের পার্ট। নিন্দা-প্রশংসা সবই জুটেছিল তাঁর। তারপর নানান্ ইতিহাস। নানান্ ঘটনা। নানান্ চমক।

সে চমক উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়। চার্লি নিজে পরিচালক হলেন, অভিনেতা হলেন এবং অভিনেতা তৈরিও করলেন।

এক এক করে চার্লি তুললেন 'দি ফ্লোর-ওয়াকার', 'দি ফায়ারম্যান', 'দি ভ্যাগাবণ্ড', 'দি কিড্', 'দি কাউন্ট'। তুললেন 'দি পনশপ্', 'বিহাইণ্ড দি স্ক্রীন', 'দি ঈমিগ্র্যান্ট'। তুললেন 'দি কিওর', 'দি অ্যাডভেন্চার'।

চার্লির প্রথম মহৎ ছবি বলে যেটি পরিচিত, সেটির নাম 'এ ডগ্স্ লাইফ'।

এর মধ্যে মান-সম্মান, অর্থ-প্রতিপত্তি —সবই এসেছে চার্লির। তারপর কত ছবিই না তুললেন তিনি! তুললেন, 'গোল্ড রাশ্', তুললেন 'সিটি লাইট্স্', 'মডার্ন্ টাইম্স্', 'মসিঁয়ে ভার্দু'। হিটলারকে বিদ্রূপ করে তাঁর ছবি 'দি গ্রেট্ ডিক্টেটর' ২য় মহাযুদ্ধের আগেই তৈরি হয়েছিল। আশ্চর্য নকল করেছিলেন তিনি হিটলারকে এই ছবিতে। আর, আশ্চর্য, তাঁর ধারণা মত ঐ ভাবেই হিটলারের পতন ঘটল। 'লাইম্ লাইট্' চার্লির শেষ দিকের তোলা ছবি। এটিতে তিনি অন্য চেহারায় নেমেছেন।

অভিনয়ে চার্লি আমাদের হাসিয়েছেন যেমন, কাঁদিয়েছেনও তেমনি। তাঁর অভিনয় দেখে হাসতে হাসতে ভাবতে হয় আর ভাবতে ভাবতে হাসতে হয়। চার্লিকে দেখেই পুরো মাপের হাসির ছবি তুলতে অনেকেই এগিয়ে আসেন, কিন্তু অমনটা সফল হ'তে পারেন নি



'গোল্ড রাশ্' চিত্রে চার্লি চ্যাপলিন

তাঁরা। অবশ্য হ্যারল্ড লয়েড আর বাষ্টার কীটনও অনেকটা সাফল্য লাভ করতে পেরে-ছিলেন। আর পেরেছিলেন লরেল-হার্ডি জুটি।



কৌতুক-অভিনেতা হ্যারল্ড লয়েড্ (বাঁ-দিকে)

এখানে আর একজন উল্লেখযোগ্য কৌতুকাভিনেতার নাম না বললেই নয়। ইনি হলেন ম্যাক সেনেট।

আশি বছর বয়সেও চার্লি ছিলেন সমান কর্মক্ষম। জন্মেছিলেন চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্মকালেই, চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগও ছিল নাড়ীর। তাই চলচ্চিত্রের কথা এলেই চার্লি চ্যাপলিনের কথা সবার আগে মনে আসে। কিন্তু শুধু মাত্র অভিনেতা, শুধু মাত্র পরিচালকই ছিলেন না তিনি। লেখক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। নক্শারও স্রষ্টা তিনি। অপূর্ব সব নাটকও লিখেছেন। সুরস্রষ্টা হিসেবেও অসামান্য তিনি।

শিল্পী হিসেবে চার্লি চ্যাপলিন নোয়েল কাওয়ার্ড কি আইভর নভেলের চেয়ে অনেক বড়। চার্লির সমসাময়িক যে-ক'জন প্রতিভাবান্ শিল্পীকে আমরা চলচ্চিত্রের সাহায্য নিতে দেখেছি তাঁদের সকলের চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বড় তিনি। যে ভবঘুরে চরিত্রটির তিনি স্রষ্টা, তার মৃত্যু হবে না কোনদিন। বছরের পর বছর কেটে যাবে, যুগের পর যুগ কেটে যাবে, কিন্তু অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে সেই বিরাট বুট জোড়া, সেই গোল টুপি, আর সেই বাঁকানো ছড়ি। চার্লি চ্যাপলিন অমর হয়ে আছেন এই তিনটি প্রতীক চিহ্নের মধ্যে।

চলচ্চিত্রে আর একটি অদ্ভুত প্রতিভা ঃ ওয়াল্ট ডিস্নে

অমর হয়ে আছেন আর একজন। তিনি ওয়াল্ট ডিস্নে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ছিলেন যে ডিস্নে—যখন তাঁর বয়স ছিল ষোল, সেই ডিস্নেই পরবর্তী কালের চলচ্চিত্রের বিখ্যাত ওয়াল্ট ডিস্নে। মিকি মাউসের স্রষ্টা ডিস্নে। ডোনাল্ড ডাকের সৃষ্টিকর্তা ডিস্নে। নাটকের মত ঘটনায় ভরা ছিল তাঁর জীবন। এক সময় পেটের জালায়—সামান্য এক টুকরো রুটির জন্যে যাঁকে হাহাকার



ওয়াল্ট ডিস্নে

করতে হয়েছিল, পরে ত্ব'হাতে তিনিই রোজগার করেছেন কোটি কোটি টাকা। ন'বছর বয়সে সেই এক টুকরো রুটির জন্যে যাঁকে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হয়েছিল, ট্রেনে মিষ্টি ফেরি করতে হয়েছিল, সেই ওয়াল্ট ডিস্‌নে পরে অবাক্ করলেন সকলকে। কার্টুন ছবি তুলে জয় করলেন ছেলে-বুড়ো সকলের মন। অথচ এই কার্টুন ছবির ইতিহাসের পেছনে ছিল সামান্য একটা নেংটি ইঁত্বর।

যে গ্যারেজ ঘরে ডিস্‌নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারখানা ছিল সেখানে একটা ইঁত্বর আসে আর যায়, আর পাঁউরুটি খায়। খানিকক্ষণ বাদে আবার আসে, আবার খায়, পিটিপিটি চায়, আবার পালায়। পাঁউরুটিটা কিন্তু ডিস্‌নের খাবারের জন্যে। আমরা হলে তো রেগে গিয়ে মারতুম ইঁত্বরটাকে এক ঢিল। কিন্তু ডিস্‌নে রাগলেন না—হাসতে-হাসতে দেখতে লাগলেন ইঁত্বরটার কাণ্ড। এবং এই কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতেই মিকি মাউসের পরিকল্পনা এল তাঁর মাথায়।

চার্লির মত ডিস্‌নেও এসেছিলেন হলিউডে কপাল ফেরাবার আশায়। সেটা ১৯২৩ সালের কথা। এখানে সাদা-কালোয় তুললেন কার্টুনের অনেকগুলো নির্বাক্ ছবি। এ সিরিজের নাম দিলেন 'অ্যালিস ইন্ কার্টুন ল্যাণ্ড'। ১৯২৮-এ তুললেন 'স্টিমবোট উইলে'। তারপর তুললেন 'সিলি সিম্ফনি'। তুললেন 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ার্ফস'। এই ছবিটিই হ'ল প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অ্যানিমেটেড্ ফিল্ম্। অ্যানিমেটেড্ ফিল্ম্ হ'ল—যে ছবির কার্টুনগুলো মানুষের মতই সজীব। অর্থাৎ মানুষের মতই, বলা যায় ছোট ত্বরন্ত ছেলের মতই, ছবির কার্টুনগুলো লাফাবে, নাচবে, বল খেলবে, ছোলা ভাজা খাবে, গান গাইবে। বুঝতেই পারছ, কার্টুনের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে সকলেই অবাক্ হলেন।

এ ছাড়াও তিনি তুললেন 'ডাম্‌বি' (১৯৪১), 'ব্যাম্‌বি' (১৯৪২), 'পিটার প্যান' (১৯৫৭), 'সিণ্ডারেলা', 'স্লীপিং বিউটি' এবং আরো অনেক ছবি।

বন-জঙ্গল, অ্যাডভেঞ্চারের ওপরও ছবি তুললেন ডিস্‌নে। এঁর 'লিভিং ডেজার্ট্' ছবিটি এক আশ্চর্য তথ্যবহুল, চমকপ্রদ ছবি—যাতে তিনি সত্যিকারের মরুভূমির প্রাকৃতিক জীবন-যাত্রার ছবি দেখিয়েছেন। এ ছাড়া তুললেন 'দি ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'দি অ্যাবসেন্ট-মাইন্‌ডেড প্রফেসর' (১৯৬১), এমনি আরো কত কি!

ডিস্‌নে ল্যাণ্ড

ডিস্‌নে সাহেবের সর্বোত্তম কীর্তি 'ডিস্‌নে ল্যাণ্ডে'র কথা বলি এবার।

'ডিস্‌নে ল্যাণ্ড' হ'ল বিরাট এক ঘেরা জায়গায় তৈরি আজব এক পৃথিবী। ছোট বড় সকলের আনন্দের খোরাক এখানে সাজানো থরে থরে। এখানে কী নেই? নানান্ ধরনের ক্ষুদে ক্ষুদে জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, নদী-পুকুর, ঝরণা-পাহাড়, কুমির, হাঙর, গণ্ডার, তিমি, হিপো—সবই এখানে দেখতে পাবে। ক্ষুদে ক্ষুদে রেলগাড়ি, জাহাজ, স্টিমার—সব মিলে যেন এক রূপকথার রাজ্য! ছোটদের স্বর্গ বললেও ভুল হয় না। ডিস্‌নে ল্যাণ্ডের আয়তন একশ' পাঁচ একর। লস্ এন্‌জেল্‌সের কাছেই এই আজব

জগৎ। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দর্শকেরা প্রথম প্রবেশ করেন ডিস্‌নে ল্যাণ্ডে।

ডিস্‌নে সাহেব মারা যান ১৯৬৬ সালের পনেরোই ডিসেম্বর। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন কোটি কোটি শিশুর মধ্যে, কোটি কোটি পাখির মধ্যে, বনের হরিণের ছোটার মধ্যে, কোটি কোটি আকাশের তারার মধ্যে। চলচ্চিত্রের আকাশে ডিস্‌নে সত্যিই একটি নতুন তারা।

নতুন রীতি-কৌশল, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী

চলচ্চিত্র এখন আন্তর্জাতিক শিল্প। আর্ট এবং ইণ্ডাষ্ট্রি—তু'দিক্ থেকেই। এক দেশের রীতি-কৌশল অন্যান্য দেশ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। যেমন ইতালির 'নব্য বাস্তবতা', ফ্রান্সের 'নব তরঙ্গ' বা নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন চলচ্চিত্র-রীতি।

নতুন রীতি নানা ব্যাপারেই। অভিনয়ে, গানে, ক্যামেরায়—সবেতেই। এখানে তাই কত অভিনেতা-অভিনেত্রীই না এলেন! এলেন রুডল্‌ফ্ ভ্যালেন্টিনো, এমিল জেনিংস, জন্ ও লায়নেল ব্যারিমুর, ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্, অ্যাডল্‌ফ্ মুঞ্জে, লন্ চ্যানি, মরিস্ শ্যাভেলিয়ার, র‍্যামন নভেরো, ফ্রেডরিক মার্চ, এল্‌মো লিঙ্কন। এলেন জনি ওয়েসমুলার—টার্জানের ছবির বিখ্যাত নায়ক। এলেন হাস্যরসের মাণিকজোড় লরেল আর হার্ডি। তার পর লরেন্স অলিভার, চার্লস্ লটন, গ্যারি কুপার, মিকি রুনী, পল্ মুনি, টাইরন পাওয়ার এবং আরও কত প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র-অভিনেতা! কত ফর্দ দেব? এঁদের কারো কারো নাম তো আগেও বলেছি!

তেমনি নামকরা অভিনেত্রীর সংখ্যাও বড় কম নয়। তাঁদেরও কয়েকজনের নাম আগেই বলেছি। এঁরা ছাড়া নাম করা যায় নর্মা শিয়ারিয়ার, মেরী পিক্‌ফোর্ড, লিলিয়ান্ গিশ্, ভিল্‌মা বেঙ্কী, জিঞ্জার গ্রীয়ার, সোফিয়া লরেন্স এবং আরও কত জনের! এ ক্ষেত্রেও তালিকা অভিনেতাদের চাইতে ছোট হবে না।

তোমরা লরেল-হার্ডির হাসির ছবি সকলেই হয়তো দেখেছ। মোটা, হোঁৎকা, বিশাল-বপু হার্ডির সঙ্গী ছোট্টখাট্ট রোগাপট্‌কা লরেল। সব সময় এঁরা জোড় বেঁধে অভিনয় করতেন এবং এঁদের প্রতিটি চলাফেরায়—প্রতিটি চাল-চলনে দর্শকদের মধ্যে হাসির বন্যা বয়ে যেত। এমনি জোড়ে অভিনয় করতেন কোহেন্‌স্ অ্যাণ্ড কেলিজের অভিনেতা তু'জন। তেমনি গম্ভীর মুখে হাসাতেন বেঁটেখাটো বাস্টার কীটন। মরিস্ শ্যাভেলিয়ারও কম যেতেন না। অন্যান্যরা কেউ বা জীবনী-চিত্রে, কেউ বা ঐতিহাসিক নায়কের ভূমিকায়, কেউ বা তুর্বৃত্ত (ভিলেন্) চরিত্রে বা অন্য ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্, জনি ওয়েসমুলার, লন্ চ্যানি

লাফঝাঁপ, কসরৎ, ঘোড়া ছোটানো, তরোয়াল-যুদ্ধ এ সব অভিনয়ে ছিলেন সেরা ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্। এঁর 'থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ' বা 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স' প্রভৃতি ছবির অভিনয় যারা দেখেছে তারা কখনও ভুলতে পারবে না। এঁর ছেলেও ভালো অভিনয় করতেন। তেমনি বিপদ্‌সঙ্কুল অরণ্যজীবনের ছবিতে জনি ওয়েসমুলার অদ্বিতীয়। অদ্ভুত সাঁতারুও ইনি।



ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্

বন্য মানুষের মতই এক গাছের ঝুরি ধরে দুলতে দুলতে আর এক গাছে লাফিয়ে পড়তেন, হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে, বুনো হাতির সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করতেন। টার্জানের ভূমিকায় তাঁর ছবিগুলি সিনেমা-শিল্পে অমর হয়ে আছে।

লন্ চ্যানিকে বলা হ'ত "সহস্রমুখী লন্ চ্যানি"। এমন অদ্ভুত ছদ্মবেশ ধরতে পারতেন



'সহস্রমুখী' লন্ চ্যানি

ইনি যে লোকে বলত—'হঠাৎ সামনে যদি একটা সাপ দেখ তবে চমকে যেও না কিংবা মেরো না, কারণ সে ছদ্মবেশী লন্ চ্যানিও হতে পারে।' 'হাঞ্চব্যাক্ অব্ নোতর ডাম্' ছবিতে তিনি জড়বুদ্ধি বিকলাঙ্গ কুঁজো কোয়াসিমোদোর ভূমিকায় যে অপূর্ব চেহারা নিয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। (চার্লস্ লটন্‌ও এই ভূমিকায় সুন্দর সেজেছিলেন—কিন্তু আর একভাবে।)



হাঞ্চব্যাক্ অব্ নোতর ডাম্ ছবিতে কুঁজোর ভূমিকায় লন্ চ্যানি

'আন্‌নোন্' নামে একটা ছবিতে লন্ চ্যানি অভিনয় করেছিলেন একটা হাত-কাটা লোকের ভূমিকায়। এই ছবিতে সমস্ত কাজ তিনি পা দিয়ে করেছিলেন। পা দিয়ে চা তৈরি করা, পা দিয়ে সিগারেট ধরানো, এমন কি সার্কাসে খেলা দেখানো পর্যন্ত। তেমনি আবার 'ব্লিজার্ড' নামে একটা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন একটা পা-কাটা লোকের ভূমিকায়। পা দু'টি তাঁর চামড়ার পটি দিয়ে পেছন দিকে মুড়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ঐ অস্বস্তিকর অবস্থায়ই তিনি আগাগোড়া অভিনয় করে গিয়েছিলেন।

'আন্হোলি থ্রী' বইটাতে তিনি একা পাঁচজনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এমন চেহারা বদলেছিলেন যে ঐ পাঁচজন যে একই লোক তা বোঝা ছিল অসম্ভব। তার মধ্যে একটা আবার ছিল বুড়ীর পার্ট। শুধু চেহারা বদলানোই নয়, গলার স্বরও তিনি বদলেছিলেন পাঁচ রকম করে। চলন-বলন, ধরন-ধারণ সবই তাই। এই ছবিতেই একটা টিয়ে পাখির স্বর অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর গলার একটা শিরা ছিঁড়ে যায়, আর তাইতেই তিনি মারা যান।

শিশু-অভিনেতা

শিশুদের মধ্যেও কয়েকজন অভিনেতার বিশ্বযোড়া নাম। এদের মধ্যে জ্যাকি কুগানের নাম সবচেয়ে আগে করতে হয়। চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে 'কিড্' ছবিতে অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিল সে মাত্র সাত-আট বছর বয়সে। তার 'অলিভার টুইস্ট', 'পেক্স্ ব্যাড্ বয়' প্রভৃতি বইয়ের অভিনয়ও মনে রাখবার মত। জ্যাকি কুপার নামে একটি ছেলেও সুন্দর অভিনয় করত। তেমনি মিষ্টি ছেলে ফ্রেডি বার্থেলমিউ ছিল অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। 'ডেভিড্ কপারফিল্ড্', 'অ্যানা ক্যারেনিনা' প্রভৃতি বইয়ে অপূর্ব অভিনয় করেছিল সে। এই সম্পর্কে পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে শার্লি টেম্পলের নাম না করলেও শিশু-অভিনেতাদের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য এরা ছাড়াও অনেক প্রতিভাশালী শিশুর অভিনয় চলচ্চিত্রে বিখ্যাত হয়ে আছে। তবে বড় হয়ে আর তাঁরা কেউই আর ওদিকে যান নি।

নানা দেশের নানা ছবি ঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

এখন পৃথিবীর নানা দেশেই ছবি উঠছে। ইংল্যাণ্ড, জাপান, রাশিয়া, পেরু, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, সিংহল, মিশর, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, হংকং, ইজরায়েল, ইতালি, সুইট্জারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, টার্কি, জার্মেনি, চেকোস্লোভাকিয়া, নরওয়ে, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে নানা ধরনের ছবি উঠছে। আমেরিকার হলিউডের তো কথাই নেই! নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে।

নানা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল্। বার্লিন, এডিনবরা, কারলোভিভারি, লেবানন, মিলান, মস্কো, নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিস্কো, সিডনি, ভেনিস, ভারত প্রভৃতি দেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এখন রীতিমত বিখ্যাত। নানা দেশের ছবি আসে এই সব প্রতিযোগিতায়। পুরস্কারও কম নয়। এর ওপর আছে সম্মান। নানা দেশের মানুষ, শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা। ভারতের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এনেছিল—সে খবর তোমরা হয়তো জান।

নানা দেশে এখন ফিল্ম্ ইন্স্টিটিউট তৈরি হয়েছে। ফিল্মের নানা বিষয়ে শেখানো হচ্ছে এখানে। গল্প-উপন্যাস-নাটক ছাড়া ভালো ভালো ডকুমেন্টারি ছবিও তোলা হচ্ছে - যার দ্বারা নানা দেশের বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড আমরা জানতে পারছি সহজেই।

বিভিন্ন দেশ ছবি তৈরির ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গেই যে লেগে আছে তা তো আগেই বলেছি; কিন্তু, তারই মধ্যে, এমন

কয়েকটি দেশ আছে যারা ছবি নিয়ে সত্যি সত্যিই অনেক কিছু ভাবছে। এ সব দেশের মধ্যে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালি, জার্মেনি, রাশিয়া, জাপান এবং আমাদের ভারতবর্ষের নামও করতে পারি। অবশ্য ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম বাংলার ছবিই পৃথিবীর গুণিজনের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কথা তো আগেই বলেছি। ভারতেও এই উৎসব হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার হয়েছে এই উৎসব। যেমন, ১৯৬৯-এর ডিসেম্বর মাসে যে চতুর্থ উৎসব হয় তাতে ইতালির 'ড্যাম্‌ড্‌' পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার—সোনার ময়ুর। তারপর আরও কত ছবি এই পুরস্কার পেয়েছে।

এ ছাড়াও অনেক ফিল্‌ম্ ক্লাব হয়েছে এ দেশে। দেশ-বিদেশের, বিশেষ ক'রে বিদেশের নানা ছবি দেখানো হয়ে থাকে এই সব ফিল্‌ম্ ক্লাবে। যেমন হয়েছিল সায়ান্স ফিক্‌শন্ সিনে ক্লাব। এঁরা শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর ছবিগুলিই দেখাতেন। ফিল্‌মের ওপর নানান্ পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে নানা ভাষায়। আলোচনা-সভা, সেমিনারও বাদ যাচ্ছে না।

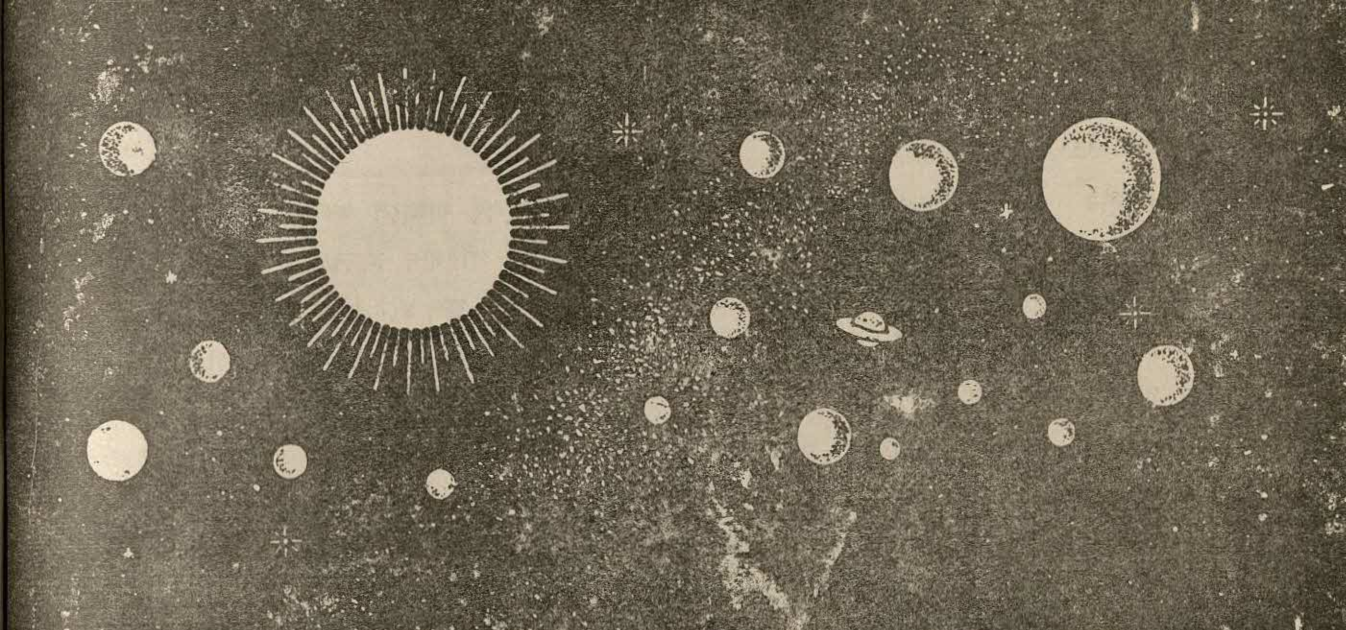
আধুনিক পরিচালক

আজকাল দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রে নানা ধরনের ভাবনা-চিন্তা এবং নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। এখনকার যুগের যন্ত্রণা, বর্তমান মানব-সমাজের নানান্ সমস্যা বর্তমান কালের ছবিগুলোতে জায়গা পাচ্ছে। বর্তমানের চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা অনেক বেশি সাহসী এদিক্ থেকে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: গোদার, ডি-সিকা, রসোলিনি, ডি স্পন্তিস, আন্তোনিয়োনি, ব্রেসঁ, বার্গম্যান, সত্যজিৎ রায়, ফেলিনি, কুরোসাওয়া, ইয়াসুজিরো ওজু, বেলেকিয়ো, ওল্‌মি, পাসোলিনি, বুনুয়েল, ফারম্যান, তেলিগাহোরা, ইচিকাওয়া। আমাদের বাংলার ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহও ভালো চিত্র-পরিচালক। কিন্তু সবচেয়ে বেশি নাম সত্যজিৎ রায়ের। চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান-সূচক ডি. লিট্ উপাধি পেয়েছেন, যা এক চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া আর কেউ পান নি।

চলচ্চিত্রের ভালোমন্দ

চলচ্চিত্র শুধু আমাদের অবসরবিনোদন আর আনন্দের খোরাকই যোগায় না—সংবাদ-চিত্র, প্রচার-চিত্র, জীবনী-চিত্র, বিজ্ঞান-চিত্র, শিক্ষামূলক চিত্র—নানাভাবে চলচ্চিত্রকে আজ আমাদের সামনে হাজির করা হচ্ছে। জনশিক্ষার এত বড় মাধ্যম খুব কমই পাওয়া যাবে। তবে কোনও কোনও অসাধু ব্যবসায়ী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে এমন অনেক জিনিসও আমাদের সামনে তুলে ধরছেন যা সমাজের পক্ষে—বিশেষ করে অপরিণতবয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে হিতকর তো নয়ই, বরং বলা যেতে পারে খুবই আপত্তিকর। অর্থাৎ সব জিনিসের মত সিনেমারও ভালোমন্দ দু'টি দিক্ই আছে।

যাই হোক, এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে চলচ্চিত্রের দুনিয়া। এ দুনিয়ার খবর রাখতে স্বভাবতই আমাদের আগ্রহ অসীম। বড়দের জন্যে হচ্ছে প্রচুর ছবি, নানা ধরনের ছবি। ছোটদের জন্যেও যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু আরো হওয়া উচিত। আমাদের দেশে ছোটদের জন্যে ভালো ছবির সংখ্যা নিতান্তই কম।



মহাকাশের কথা

রহস্যময় মঙ্গল

সূর্যের রাজত্বে শুক্রের পরের গ্রহ হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। তার গল্প তো আলাদা করেই বলা হচ্ছে 'পৃথিবীর কথায়'। তাই এবারে আমরা তারও পরের গ্রহ মঙ্গলে চলে আসব।

মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল বহুদিনের। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে গিয়ে থাকতে গেলে মানুষের পক্ষে মঙ্গলই যে সবচেয়ে সুবিধাজনক এ ধারণা বিজ্ঞানীরাই দিয়ে এসেছেন। সেখানে সামান্য জল আছে ; বাতাস, খুব হাল্কা হলেও, খানিকটা যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে সে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম, কার্বন ডাইঅক্সাইডই বেশি। তবে কিছু আর্গন আছে, আবার নাইট্রোজেনও খুবই কম। তবু সেখানে কোন কোন জাতের গাছপালা থাকা যে অসম্ভব নয়, এমন কি হয়তো জ্যান্ত প্রাণীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে এবং সে প্রাণী হয়তো মানুষের চাইতেও বুদ্ধিমান্—এক সময় এমন কথাও কেউ কেউ বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৬ সালে মঙ্গলে রকেট থেকে ভেলা নামিয়ে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সে ধারণা অমূলক বলেই জানা গেছে। ছোটদের বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ডে এ বিষয়ে বলা হয়েছে (পৃঃ ১৫৭৭-১৫৮১)।

আকাশে মঙ্গলকে খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না, কেন না ও-রকম উজ্জ্বল লালচে রঙ অন্য কোন গ্রহ-তারায় দেখা যায় না। অবশ্য বছরের সব সময় মঙ্গলকে দেখতে পাবে না। কখনও কখনও আবার পৃথিবী আর মঙ্গলের মধ্যে দূরত্ব হয়ে দাঁড়ায় মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইলের মত। তবে সব বছর নয়।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে

মঙ্গল কিন্তু পৃথিবীর চাইতে বেশ খানিকটা ছোট, ওজনেও বেশ কম। পৃথিবীর ব্যাস যেখানে ৮০০০ মাইল, মঙ্গলের সেখানে মাত্র ৪২১৫ মাইল। চার চারটে মঙ্গল একত্র বসালে বেড়ে পৃথিবীর সমান হবে। আয়তনেও সে পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

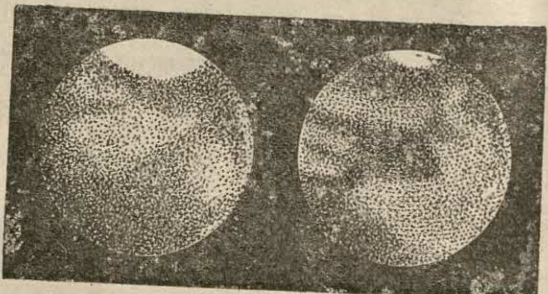
পৃথিবীর মত মঙ্গলও তার মেরুদণ্ডের চারপাশে লাট্টুর মত অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে, প্রায় পৃথিবীর মতই বেগে—প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার। অর্থাৎ পৃথিবীর যেমন ২৪ ঘণ্টায় এক-একটা দিন, মঙ্গলেরও তেমনি ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে এক-একটা দিন। কিন্তু সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব পৃথিবীর চাইতে বেশি, গতিবেগও পৃথিবীর চাইতে কম—প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ মাইল। তাই সূর্যকে একবার পাক খেয়ে আসতে মঙ্গলের লাগে আমাদের হিসেবে ৬৮৭ দিন।

মঙ্গলের জল আর বাতাস

মঙ্গলেও পৃথিবীর মত বাতাস আছে; কিন্তু, আগেই বলেছি, বড় হাল্কা সেই বাতাস। তার মধ্যে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভাগই বেশি, অক্সিজেন খুবই কম—তবে নেই বলা চলে না। নাইট্রোজেনও বেশ কম। আমাদের এভারেস্টের ওপর উঠলে বাতাস যতটা হাল্কা মনে হবে মঙ্গলের ডাঙ্গার ওপরেই বাতাস তার দ্বিগুণ হাল্কা। পৃথিবীর ওপর থেকে অন্ততঃ ১১ মাইল উঠে গেলে যে ধরনের হাল্কা বাতাসের মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ব অনেকটা সেই রকম। সে বাতাসের চাপ আমাদের পৃথিবীর ওপরকার বাতাসের চাপের মাত্র পনেরো ভাগের এক ভাগ হবে। মঙ্গল আকারে পৃথিবীর চাইতে ছোট, তাই তার আকর্ষণী শক্তি দিয়ে ওপরকার বাতাসকে টেনে রাখবার ক্ষমতাও তার অনেক কম। দিনের পর দিন কত বাতাস মঙ্গলের টান ছাড়িয়ে মহাশূন্যে ছুটে পালাচ্ছে—মঙ্গলের পরিষ্কার আকাশ দেখেই তা আন্দাজ করা যায়। বাতাস সম্বন্ধে যে কথা খাটে, জল সম্বন্ধেও ঠিক তাই। মঙ্গলের বাতাসে জলকণা আছে ঠিকই, কিন্তু তারও পরিমাণ হয়তো খুব বেশি নয়। শীতকালে এই জল জমে গিয়ে হয়তো মঙ্গলের দুই মেরু দেশে জমাট বাঁধে, তাই দেখতে সাদা লাগে। তবে এই বরফের আবরণ খুবই পাতলা বলে মনে হয়। বসন্ত এলেই মঙ্গলের এই মেরুর বরফ গলতে থাকে এবং হয়তো সারা গ্রীষ্মকাল ধরে তা মঙ্গলের সারা দেহ বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে কিংবা হয়তো বাষ্প বা জলকণায় পরিণত হয়ে বাতাসে ভাসতে থাকে। তবে কারও কারও অনুমান, মঙ্গলের মেরুর ঐ সাদা রঙ বরফের নয়, জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডেরও হতে পারে।

মঙ্গল দেখতে কেমন

দূরবীনে মঙ্গলের দেহে দু'রকম অংশ দেখা যায়—ছাই রঙের, কতকটা ইস্পাতের মত খানিকটা অংশ আর লালচে বা ঈষৎ কমলাভ খানিকটা অংশ। আগে পণ্ডিতেরা ও দুটিকে মঙ্গলের সমুদ্র আর ডাঙ্গা মনে করতেন। এখন কারো কারো ধারণা—যেটাকে সমুদ্র মনে হচ্ছিল সেটা আসলে মঙ্গলের গাছপালা। কারণ মঙ্গলের গ্রীষ্মের শেষে শরতের শুরুতেই নাকি ওগুলিও রঙ বদলাতে



মঙ্গল গ্রহ

বাঁ দিকে : মঙ্গলের মেরুতে বরফ (?) জমে আছে।
ডানদিকে : গ্রীষ্মে তা গলতে শুরু করেছে।

থাকে—যা গাছপালা থাকলেই সম্ভব। তবে, সে গাছপালা পৃথিবীর গাছপালার মত নয় নিশ্চয়ই। বর্ণালী পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, এগুলি যদি গাছপালা হয়ও তবে সম্ভবত শ্যাওলা-ট্যাওলা জাতীয় খুব নীচুস্তরের উদ্ভিদ্।

মঙ্গলের লালচে অংশটাকে অনেকে বলেন মঙ্গলের মরুঅঞ্চল—মরুভূমির রাজ্য। বালিতে ভর্তি। এ রকম মনে করার কারণও হচ্ছে ওর ঐ লালচে রং। কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে মঙ্গলের মাটিতে লোহার পরিমাণ খুব বেশি। সেই লোহা মঙ্গলের বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে অক্সিজেনকে টেনে নিয়ে ঐ রকম লালচে হয়ে গেছে—লোহায় মরচে ধরলে যেমন হয়। মঙ্গলের বাতাস থেকে অক্সিজেনের অদৃশ্য হবারও এটাই নাকি আসল কারণ।

নামকরণ

যাই হোক, মঙ্গলের নামকরণেও এই লালচে রংএর কথাই ভাবা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে মঙ্গলের নাম মার্স্, আর মার্স্ হচ্ছেন রোমান যুদ্ধদেবতা। যুদ্ধ বলতেই আগে মনে পড়ে রক্তের কথা, আর রক্ত হচ্ছে লাল। ঐ লাল রঙের জন্য মঙ্গলকে চিনে নেওয়াও সহজ।

মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে ঠাণ্ডা

মঙ্গল আমাদের পৃথিবীর চাইতে অনেকখানি ঠাণ্ডা। দিনের বেলা তার গায়ের উত্তাপ বেশির ভাগ জায়গায়ই শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের অনেক নীচে থাকে। রাত্রে তো তা আরও কমে যায়। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেরও শতাধিক ডিগ্রী নীচে। মঙ্গলের পাৎলা বাতাস তার উত্তাপকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না বলেই রাতে মঙ্গল অত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পৃথিবীর বেলায় কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কম্বলের মত তার তাপকে অনেকখানি আটকে রাখতে পারে।

রহস্যজনক আঁচড় বা 'খাল'

মঙ্গল মাঝে মাঝে পৃথিবীর খুব কাছে আসে, তখন তাকে খুঁটিয়ে দেখবার বেশ সুবিধে হয়। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল একবার এই রকম পৃথিবীর খুব কাছে চলে এসেছিল। তখন দু'টির মধ্যে ব্যবধান ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। শিয়াপ্যারেলি নামে এক ইটালিয়ান্ জ্যোতির্বিদ্ সেই সময় মঙ্গলের গায়ে কতকগুলি রহস্যময় লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পান। তিনি মনে করেন ওগুলি মঙ্গল গ্রহের কোন জলপ্রণালী। ঐ খাল কি করে হ'ল এই নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। লাওয়েল নামে একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ্ খালগুলি পরীক্ষা করে নানা হিসেবপত্র কষে বলেন ওগুলো অসম্ভব রকম সোজা—লম্বায় এক একটা ২০০ থেকে কয়েক হাজার মাইল, আর চওড়ায়ও ২।৩ মাইল থেকে ১৫।২০ মাইলের কম নয়। কোন কোনটা ২০০ মাইল চওড়াও হতে পারে। আবার, আশ্চর্য, কতকগুলি খালের ঠিক সমান্তরাল আর একটা করে খালও দেখা যাচ্ছে। আর এত নিখুঁত ভাবে ওগুলো তৈরি যে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না—নিশ্চয়ই ওখানকার অধিবাসী কোন বুদ্ধিমান্ প্রাণী ঐ খাল কেটেছে, উদ্দেশ্য—মঙ্গলের মাটিকে সরস করে রাখা।

লাওয়েলের এই বিবৃতি নিয়ে এক সময় সর্বত্র খুব চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। সত্যি যদি

সে রকম হয়ে থাকে, মঙ্গলের অধিবাসীরাই যদি অমন কাণ্ড করে থাকে,—তবে তারা যে মানুষের চাইতেও বুদ্ধিমান্ জাত তাতে সন্দেহ কি? এ নিয়ে অনেক গল্পটল্পও লেখা হয়েছিল। বুদ্ধি বেশি থাকলে মগজটাও বড় হবে, তার মানে মাথাটাও হবে বড়। অর্থাৎ হাত-পা'র তুলনায় মঙ্গলের প্রাণীদের মাথাটা হওয়া উচিত বিরাট। এক শিল্পী তার একটা কাল্পনিক ছবিও এঁকেছিলেন।

কিন্তু আর একজন জ্যোতির্বিদ্, তিনিও আমেরিকান্,—নাম হেনরি পিকেরিং, এর ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। তাঁর ধারণা ব্যাপারটা চোখের ধাঁধা। শেষ পর্যন্ত পিকেরিং-এর মতটাই বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন। বুদ্ধিমান্ প্রাণী দূরের কথা, মঙ্গল গ্রহে কোনও জীবেরই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

মঙ্গলের জোড়া চাঁদ

জীব থাকুক কি না থাকুক, একটা ব্যাপারে কিন্তু মঙ্গল পৃথিবীর ওপর টেক্কা দিয়েছে। পৃথিবীর একটি চাঁদ, তাই নিয়েই আমরা এতদিন কত আহা-উহু করে আসছি! মঙ্গলের আকাশে রয়েছে দু' দু'টি চাঁদ!

চাঁদ দু'টি আবিষ্কার করা হয় সেই ১৮৭৭ সালে, যখন মঙ্গল পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়েছিল। হল্ নামে আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী যন্ত্রপাতি নিয়ে মঙ্গলকে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল দু'টি আলোর বিন্দু যেন মঙ্গলের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। কি ও দু'টো? মঙ্গলের চাঁদ নয় তো! হ্যাঁ, ঠিক তাই। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিকে টেলিগ্রাম ছুটল—হৈ-হৈ পড়ে গেল জ্যোতির্বিদ্-মহলে।

কি নাম দেওয়া যায় চাঁদ দু'টোর? মার্স্ হচ্ছেন পৌরাণিক যুদ্ধের দেবতা। তাঁর দুই সহচর হচ্ছে ডাইমো অর্থাৎ বিভীষিকা, আর ফোবো অর্থাৎ ভয় বা শঙ্কা। এইভাবে পুরাণ ঘেঁটে নাম দু'টো খুঁজে বার করে তাই দিয়ে নামকরণ হ'ল ঐ দুই চাঁদের।

চাঁদ বললাম বটে, কিন্তু আমাদের চাঁদের তুলনায় মঙ্গলের এই দু'টি চাঁদই খুব ছোট। ডাইমোর ব্যাস মাত্র পাঁচ মাইল—বেড়ও তিরিশ মাইলের বেশি নয়। অর্থাৎ তেমন হাঁটিয়ে লোক হ'লে একদিনেই ডাইমোর চারপাশে একবার হেঁটে ঘুরে আসতে পারে। মঙ্গল থেকে ১৪,৬০০ মাইল দূর দিয়ে সে তাকে প্রদক্ষিণ করছে ৩০ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ডে একবার ক'রে। তার মানে প্রতি সাড়ে তেরো ঘণ্টা পর পর তার একবার করে পূর্ণিমা হচ্ছে। খালি চোখে ডাইমোকে মঙ্গলে বসেও আলোকবিন্দু বলেই মনে হবে। তবে দূরবীন দিয়ে দেখলে তার কলা অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি ঠিক বোঝা যাবে—যেমন আমরা দেখি আমাদের চাঁদে।

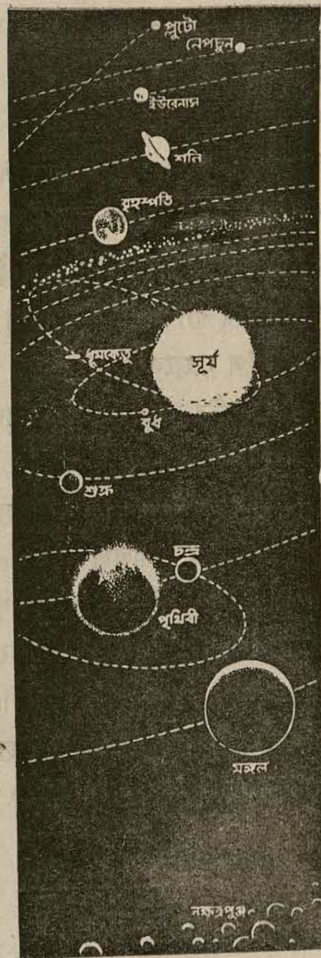
ফোবো কিন্তু ডাইমোর তুলনায় আকারেও বড়, আছেও মঙ্গলের অনেক কাছে। ফোবোর ব্যাস হচ্ছে দশ মাইল, বেড় প্রায় শ'খানেক মাইল। মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব ৫৮০০ মাইল। অতি দ্রুতবেগে—৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড পর পর সে একবার মঙ্গলকে পাক খেয়ে আসছে। অর্থাৎ দিনে তিনবার। আর, এই প্রত্যেক পাকেই প্রতিপদ থেকে শুরু করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা সবই একবার করে হচ্ছে। দিনে তিনবার পূর্ণিমা। যাকে বলে পূর্ণিমার হাট!

নতুন চেষ্টা

ইতিমধ্যে মঙ্গল আরও কয়েকবার পৃথিবীর কাছাকাছি এসে গেছে। প্রতি বারেই কিছু-না-কিছু নতুন তথ্য যোগাড়ের চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি রকেট-যুগে মঙ্গলের দিকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন-ক্যামেরা ইত্যাদি ভরে রকেট পাঠানোও শুরু হয়েছে এবং ঐ সব রকেট মঙ্গলের কিছু দূর দিয়ে ছুটে গিয়ে ওর সম্বন্ধে নানা তথ্য পাঠাতেও কসুর করে নি। এথেকে যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের পুরোনো ধারণা হয়তো অনেক বদলাতে হবে। যেমন, আগেই বলেছি,—মঙ্গলের মেরুতে যে বরফ দেখা যায় তা জল না হয়ে জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডও (ড্রাই আইস) হতে পারে। বুদ্ধিমান্ প্রাণী না থাকলেও জীবাণু গোছের কিছু হয়তো মঙ্গলে থাকতে পারে, থাকতে পারে নিম্নজাতীয় গাছপালাও। এ সম্বন্ধে নূতনতম তথ্য এ বই-এর ৫ম খণ্ডে (পৃঃ ১৫৭৭-১৫৮১) দেওয়া হ'ল।

মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে

মঙ্গলের পরের গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সূর্য থেকে রয়েছে ৪৮ কোটি ৩৩ লক্ষ মাইল দূরে, আর মঙ্গলের দূরত্ব সূর্য থেকে মাত্র ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ মাইল। মাঝখানে বিরাট একটা ফাঁক। অনেক দিন আগে জোহান্ বোড্ নামে এক জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাকাশে গ্রহগুলো কি ভাবে থাকবে সে সম্বন্ধে একটা নিয়ম বা সূত্র বার করেছিলেন। পরবর্তী যুগে অবশ্য এই সূত্রটি আর তেমন কাজে লাগছে না, কিন্তু এক সময়ে এরই ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা



মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের বিরাট সাম্রাজ্য

অনেক নতুন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মঙ্গল আর বৃহস্পতি এই দুই গ্রহের মাঝখানে ঐ বিরাট ফাঁকটা অনেকের চোখেই কেমন কেমন লাগছিল। বোডের সূত্র অনুযায়ী কিন্তু ওখানে আরও একটি গ্রহ থাকবার কথা। তাই পাঁতি পাঁতি অনুসন্ধান চলল। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সত্যিই পাওয়া গেল একটা গ্রহের মত বস্তু ঐখানটায়। কিন্তু এত ছোট যে তাকে গ্রহ বলা চলে না। কারণ ওটির ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। তাই ওকে বলা হ'ল—গ্রহাণু

অর্থাৎ গ্রহের কণা বা দানা। ইংরেজিতে—মাইনর প্ল্যানেট, প্ল্যানেটয়েড বা অ্যাস্টেরয়েড। গ্রহাণুটির নাম দেওয়া হ'ল 'সিরিস'।

কিছুদিন পরেই জানা গেল—শুধু সিরিসই নয়, ওখানে ঐ রকম আরও অসংখ্য গ্রহাণু ঘুরছে। তার মধ্যে সিরিস ছাড়া আরও তিনটে একটু বড় বড়। যেমন—প্যালাস (ব্যাস ৩০৫ মাইল), ভেস্টা (ব্যাস ২৪০ মাইল), জুনো (ব্যাস ১২০ মাইল)। ভেস্টা ওদের চারটির মধ্যে আকারে তৃতীয় হলেও সবচেয়ে উজ্জ্বল।

পরবর্তী কালে ওখানে আরও অনেক খুদে খুদে গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে—এ পর্যন্ত হাজারেরও বেশি। পণ্ডিতেরা হিসেব করে বলছেন সংখ্যায় ওরা অন্তত ৫০ হাজার। কোন কোনটা এত ছোট যে লম্বায় হয়তো হবে বড় জোর এক ফুট। অথচ, আশ্চর্য, গ্রহদের মতই ওরাও একই নিয়মে সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

গ্রহাণুরা কি করে এল

এই গ্রহাণুগুলো ওখানে কি করে এল এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত। একদল বলেন, সম্ভবত আগে ওখানেও একটা বড় গ্রহ ছিল; সৃষ্টির কোন্ আদ্যিকালেই তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় আর তারই টুকরোগুলো ঐ রকম গ্রহাণু হয়ে আজও ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। টুকরোগুলো সব গোল নয়, কোন কোনটা বেশ এবড়োখেবড়ো। ভাঙ্গা টুকরো হলেই তা সম্ভব, —যেমন উল্কাদের বেলা দেখা যায়।

কিন্তু তা হলে, কথা হচ্ছে, ভাঙ্গল কি করে? গ্রহটি যদি তেমন বড় না হয় তা হলে অতিকায় গ্রহ বৃহস্পতির টানে ও রকম হয়তো হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হলে ওর টুকরোগুলোর বেশির ভাগই বৃহস্পতির চারদিকেই ঘুরপাক খেত। কিন্তু তা তো ঘুরছে না!

আর একদলের মতে একটা বড় গ্রহ নয়, ছোট ছোট অনেকগুলো খুদে গ্রহ ছিল ঐখানে। তারাই হয়তো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে একত্র যুড়ে বড় একটি গ্রহ তৈরি করতে গিয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। আরও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে তারা।

তৃতীয় দলের মতে সৌর জগতের সৃষ্টির সময়ে ওখানে ছড়িয়ে ছিল বেশ খানিকটা বস্তুকণা, যা দিয়ে সৌর জগৎ তৈরি। কিন্তু সেই কণাগুলি আর জমাট বেঁধে একত্র হতে পারে নি—হয়তো অতিকায় বৃহস্পতিই তাতে বাদ সেধেছে। ফলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে ঐ গ্রহাণুপুঞ্জ।

গ্রহাণুরা কি ভাবে ঘুরছে

এই সব গ্রহাণুদের গতিপথ বা অক্ষপথ এক রকম নয়। কারো কারো পথ খুবই লম্বা। যেমন ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত ইকেরাস নামক গ্রহাণুটি মাঝে মাঝে সূর্যের এত কাছে চলে যায় যে বুধ গ্রহও সূর্যের অত কাছে যেতে পারে না। আবার, এক সময় ভয় হয়েছিল যে ওটি হয়তো পৃথিবীর দিকেই ছুটে আসছে এবং হয়তো পৃথিবীর সঙ্গেই ধাক্কা লাগিয়ে বসবে। তা অবশ্য হয় নি। ইকেরাস ছুটে চলে গেছে একেবারে সেই শনির রাজ্যে। তবে কোনও কোনও গ্রহাণু যে পৃথিবীর প্রায় গা ঘেঁষে চলে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। হার্মিস নামে একটি গ্রহাণু, যার ব্যাস

এক মাইল,—পৃথিবীর ২ লক্ষ মাইলের মধ্যে এসে পড়তে পারে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের যা দূরত্ব তার চেয়েও কাছে। তখন যদি পৃথিবীর আকর্ষণে সে পৃথিবীর গায়ে আছড়ে পড়ে তা হলে সে এক ভীষণ কাণ্ড হবে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতি

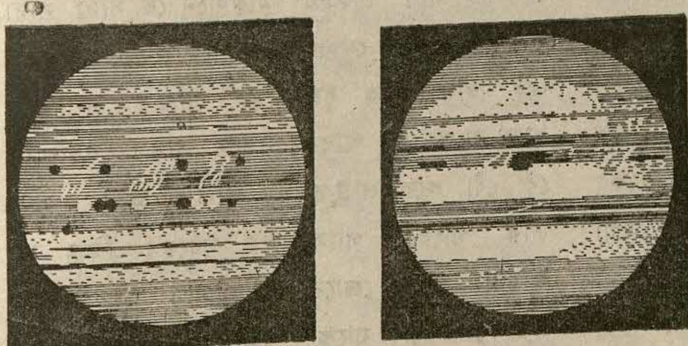
গ্রহাণুপুঞ্জ পার হয়ে এসে এর পর আমরা সৌর জগতের যে গ্রহটিকে পাব সেটিই হচ্ছে গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড়—গ্রহরাজ বৃহস্পতি বা জুপিটার। জুপিটার হচ্ছেন রোমানদের পুরাণের দেবরাজ,—আমাদের ইন্দ্রের মত। কিন্তু আমাদের পুরাণের মতে বৃহস্পতি দেবরাজ ন'ন, তিনি দেবতাদের গুরু। ইন্দ্রেরও গুরু। তাই তাঁকে দেবরাজ না বলে গ্রহরাজ বলাই ভালো।

বিরাট শরীর নিয়ে বৃহস্পতি সূর্যের চার দিকে চক্কর দিচ্ছে। বিরাট ব'লে বিরাট? তার যা আয়তন তার মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মত ১৩০০টা পৃথিবীকে ভরে রাখা যায়। বিষুব রেখার কাছে তার ব্যাস হচ্ছে ৮৯,৬০০ মাইল। তবে দুই মেরুর কাছে তা খানিকটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৪,৪০০ মাইল। অর্থাৎ বৃহস্পতি গোল বটে, কিন্তু সেই গোল চেহারার মধ্যেই তার বেশ একটু ভুঁড়িও আছে। ভুঁড়ি-সমেত ঐ বিরাট বপু নিয়েই বৃহস্পতিকে সূর্যের চারদিকে সর্বক্ষণ ছুটতে হচ্ছে। আর এমনি বরাত, তার কপালে রাস্তাটাও হয়েছে বুধ, শুক্র, এমন কি পৃথিবীর তুলনায়ও দারুণ লম্বা। পৃথিবীর মত দ্রুতবেগেও সে ছুটতে পারছে না; সেকেণ্ডে সে ছোটে মাত্র আট মাইল। ফলে এক একবার সূর্যকে পাক খেয়ে আসতে তার লাগছে আমাদের পৃথিবীর হিসেবে প্রায় বারোটি পুরো বছর।

কিন্তু বছর যাই হোক, দিনের দিক্ দিয়ে বৃহস্পতি কিন্তু পৃথিবীর ওপর টেক্কা মেরেছে। পৃথিবীর মত সেও নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীর মত ২৪ ঘণ্টায় নয়, মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে। অর্থাৎ প্রতি দশ ঘণ্টার মধ্যেই তার দিনরাত কাবার। এই বোঁ বোঁ করে ঘোরার দরুণই ওর মাঝখানটা ফেঁপে ঐ রকম ভুঁড়ির মত হয়ে গেছে।

তোমরা ভাবছ, অমন বিরাট যার বপু তার ওজনটাও না জানি কত! কিন্তু সেদিক্ দিয়ে বৃহস্পতি তোমাদের হতাশ করবে। বপুর তুলনায় অত্যন্ত হাল্‌কা সে, আকারে পৃথিবীর ১৩০০ গুণ হলেও ওজনে সে পৃথিবীর মাত্র ৩০০ গুণ।

এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। বৃহস্পতির দেহের কাঠামোর মধ্যে কঠিন অংশ বড়ই কম—ওপরের দিক্‌টা সবই ঘন



গ্রহরাজ বৃহস্পতি
কয়েক মাস পর পর তোলা দু'টি ছবি—মানচিত্র বদলে গেছে।

গ্যাসে তৈরি আর এই গ্যাস যেন স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্যাসের মধ্যে আমোনিয়া আর মিথেন রয়েছে অনেকখানি, আর সেই সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনের পরিমাণ ওখানে এত বেশি যে অন্যান্য মৌলিক পদার্থ—যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি সবই প্রায় ঐ হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে হয়েছে জল, হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেন মিশে হয়েছে অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন আর কার্বন মিশে হয়েছে মিথেন। কেউ কেউ বলেন, এ ছাড়া কিছু হিলিয়াম্‌ও থাকতে পারে। হিলিয়াম্ নিষ্ক্রিয় গ্যাস, তাই হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশতে পারে নি।

বৃহস্পতির ভিতরটা কি রকম

ডঃ উইল্ট্ নামে এক বড় বিজ্ঞানী নানা তথ্য ঘেঁটে বৃহস্পতির ভিতরকার চেহারারও একটা সুন্দর ছবি দিয়েছেন। তাঁর মতে বৃহস্পতির ব্যাসের ওপর দিক্‌কার শতকরা ১৮ ভাগ (৮০০০ মাইল) যুড়ে রয়েছে ঐ ঘন গ্যাসের আবরণ। ওই গ্যাসের মধ্যেও আবার কিছু অ্যামোনিয়া শক্ত স্ফটিকের মত ভাসছে। গ্যাসের স্তর কমতে কমতে ক্রমে কাদাটে হয়ে গেছে এবং তার নীচে রয়েছে একটা জমাট বরফের আস্তর। বৃহস্পতির গায়ের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চাইতেও ১৩০ থেকে ১৪০ ডিগ্রী কম। শূন্য ডিগ্রীতেই জল জমে বরফে হয়, অ্যামোনিয়া জমে শক্ত হয় শূন্য ডিগ্রীর ৪২ ডিগ্রী নীচে। সুতরাং বৃহস্পতির ভাসমান অ্যামোনিয়া আর তার নীচেকার জল যে কঠিন ও বরফ হয়ে থাকবে এ আর বিচিত্র কি? আগেই বলেছি, বৃহস্পতির সমস্ত অক্সিজেনই হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, অক্সিজেন-আকারে আর তার অস্তিত্ব নেই। বৃহস্পতির গ্যাসীয় আবরণের পর এই ভিতরকার স্তর তার ব্যাসের শতকরা ৩৯ ভাগ (১৭০০০ মাইল) দখল করে রয়েছে। এরও নীচে রয়েছে আর একটি স্তর—যার মধ্যে রয়েছে ধাতু আর পাথর এবং এইটিই বৃহস্পতির সবচেয়ে ভারী অংশ। এটা হবে ৮০০০ মাইল পুরু।

বৃহস্পতির মানচিত্রও বদলে যায়

বৃহস্পতিকে আকাশে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। খালি চোখে দেখলে তাকে খুব উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র বলে মনে হয়। কিন্তু ওর আসল রূপটি ধরা পড়ে যদি ভালো করে দূরবীন দিয়ে দেখা যায় বা দূরবীন-ক্যামেরা দিয়ে ওর ফটো তোলা যায়। কিছু দিন পর পর এই রকম ফটো তুললে দেখা যাবে ছ'টি ফটোতে বৃহস্পতির চেহারা এক রকম দেখাচ্ছে না। গ্রহটির মাঝখানে যে সাদা সাদা সমান্তরাল দাগ দেখা যাচ্ছে তা ছ'টিতে ছ'রকম। এই দাগগুলিকে বৃহস্পতির গায়ের ওপরকার 'মেঘ' বা গ্যাসের আবরণ বলতে পার। বৃহস্পতি বোঁ বোঁ করে লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের গ্যাসগুলিও ঘুরছে। কিন্তু সব জায়গায় সমান জোরে ঘুরছে না। এরই ফলে ওর চেহারা, যাকে বলা যায় বৃহস্পতির ম্যাপ বা মানচিত্র, থেকে থেকে বদলে যাচ্ছে।

বিরাট লালচে দাগ

কিন্তু মানচিত্র বদলালেও বিভিন্ন সমান্তরাল দাগগুলি যেন একটা নির্দিষ্ট ভাবেই সাজানো আছে। একটা গাঢ় দাগ, তার পর খানিকটা ফিকে দাগ, তারপর আবার গাঢ় দাগ—এই রকম ভাবে সাজানো। তবে কিনারার দিকে দাগগুলো সবই এবড়োখেবড়ো মত। তার মধ্যে গোল গোল চক্র, বিন্দু—এ সবও আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন এগুলি বৃহস্পতির গায়ের রঙিন মেঘ—ঝোড়ো হাওয়ায় ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে।

বৃহস্পতির ম্যাপ পরীক্ষা করলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা চোখে পড়বে সেটা হচ্ছে একটা খুব বড় লালচে দাগ—দেখতে অনেকটা হাঁসের ডিমের মত চ্যাপ্টা। দাগটি কিন্তু নেহাৎ ছোট নয়—লম্বায় তিরিশ হাজার মাইল, চওড়ায় আট হাজার মাইল। আমাদের এই পৃথিবীকে অনায়াসে ঐ দাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, দাগটা কিসের? দাগটার আর একটা বিশেষত্ব, ওটা বৃহস্পতির এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, এদিক্ ওদিক্ সরে সরে যাচ্ছে। দাগটা সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। কেউ বলেন, ওটা বাষ্প-জমা সমুদ্র; কেউ বলেন, সমুদ্র নয়—কঠিন কিংবা প্রায়-কঠিন কোন পদার্থ, হাইড্রোজেন কিংবা মিথেন-অ্যামোনিয়ার ওপর ভেসে রয়েছে; কেউ বলেন, ওটা সূর্যের কলঙ্ক (সান্‌স্পট্) জাতীয় কিছু। কেউ কেউ আবার ওটাকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে মনে করেন। এই লাল অংশটি থেকে খুব জোরাল বেতার-তরঙ্গও ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসে এবং তার কোন কোনটা পৃথিবীতেও এসে হাজির হয়। শুধু লাল অংশ থেকেই নয়, বৃহস্পতির গায়ের অন্য কয়েকটা জায়গা থেকেও এ রকম বেতার-তরঙ্গ বেরুতে দেখা গেছে।

বৃহস্পতির বারোটি চাঁদ

আমাদের পৃথিবীর একটি চাঁদ, মঙ্গলের দু'টি, কিন্তু বৃহস্পতিতে একেবারে চাঁদের হাট বলতে পার। একেবারে এক ডজন অর্থাৎ বারোটা চাঁদ! প্রথম চারটি চাঁদ তো প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগে গ্যালিলিওই আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে আয়ো, ইয়োরোপা, গ্যানিমিডে আর ক্যালিস্টো। ১, ২, ৩, ৪ নম্বর দিয়েও অনেক সময় এদের উল্লেখ করা হয়। বাকি আটটার নাম দেওয়া হয় নি, ৫ নম্বর চাঁদ, ৬ নম্বর চাঁদ—এই ভাবে উল্লেখ করা হয়। ১০ নম্বর আর ১১ নম্বর চাঁদ দু'টির খবর পাওয়া গেছে ১৯৩৮ সালে, এবং ১২ নম্বরেরটি আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন, ১৯৫১ সালে। এদের মধ্যে প্রথম ৪টিই, যা গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, সবচাইতে বড়। সবচেয়ে বড় গ্যানিমিডে। এটি আকারে বুধ গ্রহের চাইতেও বড়। গ্যানিমিডের পরেই ক্যালিস্টো, তার পর আয়ো আর ইয়োরোপা আকারে



বৃহস্পতি আর তার বারোটি চাঁদের ৪টি, যা গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন। বাঁ-দিক্ থেকে ক্যালিস্টো, ইয়োরোপা, আয়ো আর গ্যানিমিডে।

প্রায় একই রকম। পণ্ডিতদের ধারণা, শেষের দু'টি আমাদের চাঁদের মতই পাথর দিয়ে গড়া, কিন্তু গ্যানিমিডে তৈরি হয়েছে পাথর আর বরফ মিশিয়ে, আর ক্যালিস্টো গোটাটাই বরফ দিয়ে তৈরি।

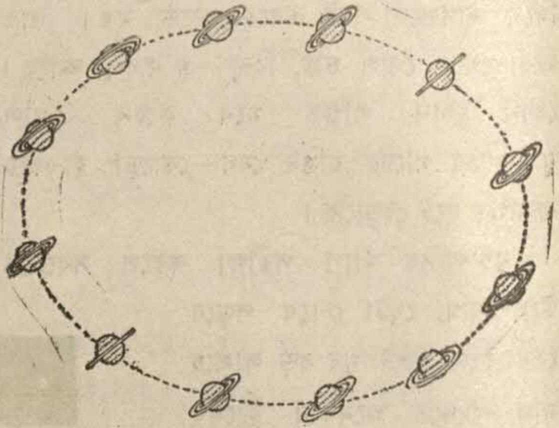
এই চারটি বড় চাঁদের ঘুরবার বেগ আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চাইতে অনেক দ্রুত। প্রথমটি একদিন সাড়ে আঠারো ঘণ্টায়, দ্বিতীয়টি তিনদিন সওয়া তেরো ঘণ্টায়, তৃতীয়টি সাতদিন পৌণে চার ঘণ্টায় এবং চতুর্থটি ষোল দিন সাড়ে ষোল ঘণ্টায় একবার করে বৃহস্পতিকে পাক খায়।

বাকি চাঁদগুলি প্রথম চারটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট। এদের মধ্যে ৮, ৯, ১১ এবং ১২ নম্বরের চাঁদ চারটি অন্য চাঁদগুলির বিপরীত দিকে মুখ করে ঘুরছে। এ থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে আসলে এগুলো আদৌ বৃহস্পতির উপগ্রহ ছিল না, গ্রহাণু হিসেবেই এরা আকাশে ঘুরছিল। কিন্তু বৃহস্পতির টানে শেষ পর্যন্ত এদের তার উপগ্রহে পরিণত হতে হয়েছে।

এর পর শনি

বৃহস্পতির রাজ্য ছাড়িয়ে এবার আমরা মহাকাশের আরও দূরে চলে যাব। এবারে আমাদের দেখা হবে শনিগ্রহের সঙ্গে। এক সময়ে শনিগ্রহকেই মনে করা হ'ত মহাকাশের দূরতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে, শনি তার ৯½ গুণ দূর দিয়ে ঘুরছে। গড়পড়তা সূর্য থেকে তার দূরত্ব ৮৮ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল। পৃথিবী থেকেও তার দূরত্ব এর চেয়ে খুব কম নয়। পৃথিবী আর শনি যখন সব চেয়ে কাছাকাছি এসে পড়ে তখনও তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে কম করে ৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল।

অত দূরের গ্রহ, তার কক্ষপথও তাই বিরাট। সূর্যকে একবার পাক খেতে তার লাগে আমাদের হিসেবে সাড়ে উনত্রিশ বছর।



সূর্যের চারদিকে শনির ২৯½ বছরের ঘুরপাক খাওয়ার পথে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী থেকে তাকে যেমন দেখায়।

দ্রুতগতি পৃথিবী প্রতি ৩৭৮ দিন পর পর তাকে এক-একবার ধরে ফেলে—তখন সূর্য, শনি আর পৃথিবী একই রেখায় এসে পড়ে। তার পর পৃথিবী আবার ছুটে এগিয়ে যায়।

গ্রহ হিসেবে শনির কিন্তু বড় বদ্‌নাম,—কি এদেশে, কি বিদেশে। কারও জন্মলগ্নে শনির ছোঁয়াচ লাগলে তার নাকি আর রক্ষা নেই! শুধু জন্মলগ্নেই নয়, জীবনের যে সময়েই তার প্রভাব দেখা যাবে অর্থাৎ শনির দশা আসবে, সে সময়টাই তার মন্দ।

কিন্তু বদ্‌নামই দাও আর যাই দাও, শনির মত সুন্দর গ্রহ কিন্তু আকাশে আর দ্বিতীয় একটি পাবে না। আর সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই

আকারে গোল বলের মত, কিন্তু শনির বেলায় সেই বলকে ঘিরে রয়েছে একটি উজ্জ্বল আংটি। সেই জন্যই শনিকে এত সুন্দর দেখায়।

দূর থেকে খালি চোখে নেহাৎ খুদে এবং মিটমিটে দেখালেও শনি কিন্তু আকারে মোটেই ছোট নয়—গ্রহরাজ বৃহস্পতির কাছাকাছি না হলেও গ্রহদের মধ্যে আকারের জন্য সে সেকেণ্ড প্রাইজ পেতে পারে। আমাদের পৃথিবীর মত ৭৬০টা পৃথিবী একত্র করলে তবেই আয়তনে তার সমান হবে। শনির ব্যাস তার মেরুর ভিতর দিয়ে ধরলে দাঁড়ায় ৬৭,০০০ মাইল, কিন্তু তার বিষুব রেখার মধ্যে দিয়ে ধরলে হয় ৭৫,০০০ মাইল।

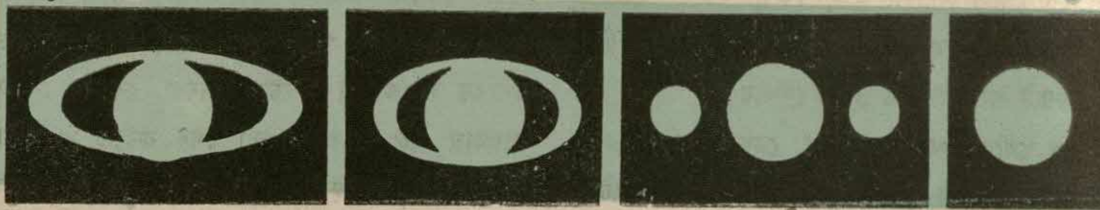
আয়তনে বড় হলেও শনি কিন্তু অসম্ভব হাল্কা। জলের চেয়েও হাল্কা। যদি তেমন বড় একটা সমুদ্র খুঁজে বার করা যেত তা হলে শনিকে তার মধ্যে ফেলে দিলে সে শোলার মতই ভেসে বেড়াত। সমস্ত গ্রহদের মধ্যে শনির ঘনত্ব সব চাইতে কম,—জলের ঘনত্বের তিন-চতুর্থাংশের বেশি নয়। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন যে শনির শরীরটা এখনও কঠিন অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারে নি; এমন কি তরল অবস্থায়ও হয়তো নয়। সমস্তটাই এখন পর্যন্ত গ্যাস বা বাষ্পের আকৃতি নিয়ে রয়েছে। এই জন্যই পৃথিবীর চেয়ে শনি আয়তনে ৭৬০ গুণ বড় হলেও ওজনে ৯৫ গুণের বেশি হবে না।

ঐ হাল্কা চেহারা নিয়ে শনি কিন্তু খুব দ্রুতবেগে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক খাচ্ছে। তবে শরীরটা গ্যাস দিয়ে তৈরি বলে এই পাক খাবার সময়টা সর্বত্র সমান নয়। বিষুব রেখার কাছে ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিটেই তার এক-একটি পাক শেষ হয়, কিন্তু আরও ওপরের দিকে বা নীচের দিকে কোন কোন জায়গায় এই পাক খাওয়া শেষ করতে ১০ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত লেগে যায়। তার মানে শনির সর্বত্র দিনরাত্রির মেয়াদ সমান নয়। কোথাও একটু বেশি, কোথাও একটু কম।

বৃহস্পতির গা-টা বেশ উজ্জ্বল, শনির আরও উজ্জ্বল। দূরত্বের জন্য তা আমরা ধরতে পারি না। শনির আকাশে যে বৃহস্পতির মতই রয়েছে প্রচুর হাইড্রোজেন আর সেই সঙ্গে মিথেন আর অ্যামোনিয়া গ্যাস সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অ্যামোনিয়ার চাইতে মিথেনের পরিমাণই বেশি; বৃহস্পতিতে ঠিক এর উল্টো।

শনির আংটি

শনির ঐ অদ্ভুত আংটিটির কথা এবারে বলি। খালি চোখে এ আংটি ধরা পড়ে না, তাই সেকালকার পণ্ডিতেরা শনিকে চিনলেও তার আংটির কথা জানতেন না। ব্যাপারটা ধরা পড়ে প্রথম গ্যালিলিওর চোখে। দূরবীন দিয়ে শনিকে লক্ষ করতে করতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—ওখানে যেন কেবল একটা গ্রহই নেই, শনির দু'পাশে, তার গা ঘেঁষে, আরও দু'টি গ্রহের মত দেখা যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, তা হলে বোধ হয় এখানে তিনটি গ্রহই রয়েছে এবং সে তিনটি বোধ হয় পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা। কিন্তু কিছুদিন লক্ষ করার পর দেখা গেল, পাশের গ্রহ দু'টি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বছর দুই বাদে সে দু'টি একদম মিলিয়ে গেল। তখনকার লোকেরা গ্যালিলিওর দূরবীনকে



গ্যালিলিওর আগে শনিকে যেমন দেখা যেত।

গ্যালিলিওর দূরবীনে শনিকে প্রথমে যেমন মনে হয়েছিল।

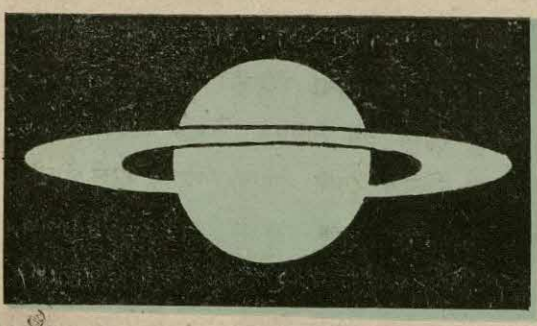
তারপর আবার শনির যে চেহারা ভেসে উঠল।

তারও পরেরকার চেহারা—গ্যালিলিও যেমনটা দেখেছিলেন

ভূতুড়ে বলে উড়িয়ে দিত। এই কাণ্ড দেখে গ্যালিলিওরও শেষে সন্দেহ হ'ল, তবে কি এটা তাঁর দূরবীনেরই কোন ফাঁকি?

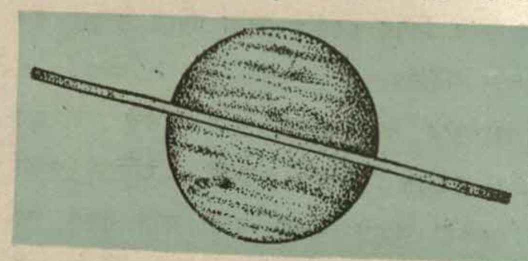
কিন্তু না, কিছুদিন পরেই আবার সেই গোলাকার বস্তু দু'টি শনির দু'পাশে আত্মপ্রকাশ করল, আরও স্পষ্টভাবে। এবার মনে হ'ল শনির গায়ে দু'টি পৃথক্ গ্রহ নয়, যেন দু'টি হাতল এসে যুড়ে গেছে—চায়ের পেয়ালায় যেমন হাতল থাকে ঠিক সেই রকম।

তখন অবশ্য ওর বেশি আর কিছু বোঝা গেল না, বোঝা গেল আরও বছর চল্লিশেক পরে। আর একজন বিজ্ঞানী, হিউগেন্‌স্ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন। আসলে দু'টি হাতল নয়,—একটা বিরাট পাৎলা আংটি গ্রহটিকে



হিউগেন্‌স্ প্রথম শনির আসল চেহারা আবিষ্কার করলেন।

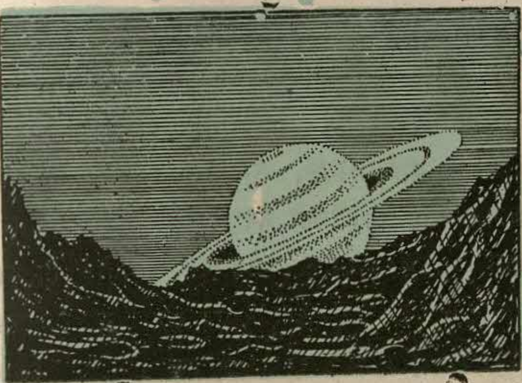
ঘিরে আছে, তাই তাকে শামলা-আঁটা মাথার মত মনে হচ্ছে। পৃথিবী থেকে শনিকে কখনও দেখা যায় ওপর থেকে, কখনও নীচে থেকে,



শনির আংটিকে কখনও কখনও এ রকম সোজা রেখার মতও দেখায়।

আবার কখনও সামনা সামনি। আংটিটাকেও তাই সব সময় এক রকম দেখায় না—কখনও বড় মনে হয়, কখনও ছোট মনে হয়, কখনও বা ডাণ্ডার মত দেখায়। আবার কখনও কখনও শনি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে খুব ভালো দূরবীন না হলে আংটিটা চোখেই পড়ে না।

পরবর্তী যুগে এই আংটিটি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গেছে। আসলে একটা নয়, তিন তিনটে আংটি ঘিরে আছে শনিকে। ঐ আংটিগুলির প্রত্যেকটির পর খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা থাকায় সেই ফাঁকগুলিকেও কালো আংটির মত দেখায় এবং সমস্তটা মিলে ডোরাকাটা আংটির মত মনে হয়। বিজ্ঞানীরা



শনির একটি চাঁদ থেকে শনিকে কেমন দেখায়
তারই কাল্পনিক ছবি

এ, বি আর সি এই তিনটি অক্ষর দিয়ে আংটি-গুলির নামকরণ করেছেন।

সবচেয়ে বাইরের আংটিটি, যার নাম 'এ', কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল নয়; উজ্জ্বলতায় ওর স্থান দ্বিতীয়। এটি ১০,০০০ মাইল চওড়া, আর ওর একদিক্ থেকে শনিকে ফুঁড়ে অপর দিকের প্রান্ত পর্যন্ত একটা কাল্পনিক রেখা টানলে সেটা হবে ১ লক্ষ ৭১ হাজার মাইল।

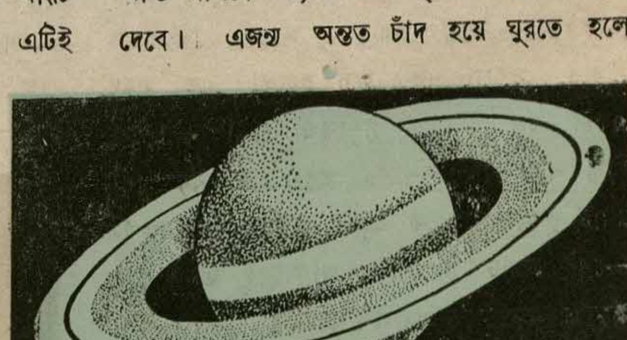
এই আংটির পর রয়েছে ২৫০০ থেকে ৩০০০ মাইল ফাঁকা জায়গা, তারপর আর একটা আংটি —'বি'-আংটি। আংটি তিনটির মধ্যে এটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এটি ১৬,০০০ মাইল চওড়া, 'এ'-আংটির মত শনির ভিতর দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় মাপলে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মাইল।

এর পর আবার ১০০০ মাইল ফাঁকা জায়গা। তার পর শনির গা ঘেঁষে রয়েছে 'সি'-আংটি,— ১১,৫০০ মাইল চওড়া। আগের মত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গ্রহ ভেদ করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় লাইন টানলে সেটা দাঁড়াবে ১ লক্ষ ২২ হাজার মাইল। শনি থেকে এই আংটিটির ভিতরের দিকের দূরত্ব ৭০০০ মাইল। এত চওড়া এই আংটি, কিন্তু পুরু কতটা শুনবে? মাত্র ১০ মাইল।

আংটি কি দিয়ে তৈরি

শনির এই আংটিগুলি কি দিয়ে তৈরি তাও জানা গেছে। পাথরের কুচি, এমন কি ধুলোর কণার মত অসংখ্য ছোট ছোট উপগ্রহ—লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি এক সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে, ঘেঁষাঘেঁষি করে, আশ্চর্য নিয়মে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে, আর সবটা মিলে দেখতে হয়েছে ঐ রকম আংটির মত।

এটা কি করে সম্ভব হ'ল সে বিষয়েও পণ্ডিতেরা গবেষণা করতে ছাড়েন নি। এটা ঘটেছে শনির প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তির জন্য। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে কোন গ্রহের ব্যাসার্ধের ২·৪৪ গুণ দূরে যদি কোন উপগ্রহ থাকে তা হলে সে গ্রহ তাকে আর আস্ত রাখবে না, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবে। এজন্য অন্তত চাঁদ হয়ে ঘুরতে হলেও



শনির তিনটি আংটি ও তার ভিতরকার ফাঁকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সব মিলে অতি বিচিত্র তার চেহারা। আংটিগুলো ধুলোর কণার মত কোটি কোটি ছোট ছোট উপগ্রহ দিয়ে তৈরি।

ঐ সব উপগ্রহকে ঐ দূরত্বের বাইরে থাকতে হবে। আমাদের চাঁদও পৃথিবী থেকে ঐ দূরত্বের বাইরে রয়েছে। সব গ্রহের বেলাই এই এক নিয়ম। এই নিয়মের আবিষ্কর্তা রকের নাম থেকে এই দূরত্বকে বলা হয় 'রকের দূরত্ব-মাত্রা'। এখন, শনির এলাকায়ও নিশ্চয়ই এক সময় একটা বড় উপগ্রহ বা চাঁদ ছিল—যেটা ঘুরতে ঘুরতে কোন এক সময় ওর খুব কাছাকাছি চলে আসে—ঐ রকের দূরত্ব-মাত্রার ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে, আর রেহাই নেই, শনির প্রচণ্ড আকর্ষণীতে সেটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং, তার পর থেকেই, সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলোই শনিকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। আজও তাদের সেই প্রদক্ষিণ করা সমানে চলছে।

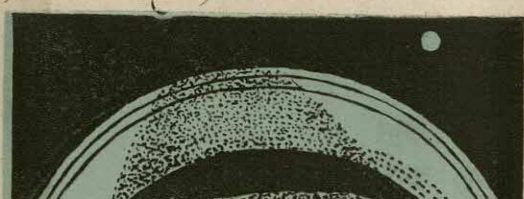
আর একদল বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে ঠিক ও-রকমটি নাও হয়ে সামান্য একটু অন্য ভাবেও এই আংটির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। হয়তো ওখানে ছড়িয়ে ছিল প্রচুর গ্যাস বা বস্তুকণা—ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে জমাট বেঁধে ছোট ছোট কঠিন উল্কাপিণ্ডের মত আকৃতি নিয়েছিল তারা। সকলে একত্র হয়ে হয়তো এক সময় একটা বড় উপগ্রহ গড়তেও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। শনির প্রবল আকর্ষণ সেই জমাট টুকরোগুলোকে একত্র হয়ে জমতে দেয় নি —সেই জমাট টুকরোর আকারেই তারা ঝাঁক বেঁধে এখন শনিকে প্রদক্ষিণ করছে।

শনির চাঁদ

বৃহস্পতির বারোটি চাঁদের কথা বলেছি। শনিরও আছে ন'টি চাঁদ—বলা বাহুল্য এরা সবাই রয়েছে রকের দূরত্ব-মাত্রার বাইরে। পণ্ডিতেরা এদের নামকরণও করে ফেলেছেন: মিমাস্, এন্‌সেলেডাম্, টেথিস্, ডাইওন, রিয়া, টাইটান, হাইপেরিয়ন, আয়াপেটাস্ আর ফিবি। এদের মধ্যে টাইটানই সবচেয়ে বড়। এর ব্যাস প্রায় ২৭১০ মাইল। আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চাইতেও এটি বড়, এবং সৌর জগতে যত চাঁদ বা উপগ্রহ আছে তার মধ্যে একমাত্র এইটিতেই কিছু বায়ুমণ্ডল আছে ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যেও রয়েছে মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস।

টাইটানের পরেই আকারে বড় হচ্ছে রিয়া (৮৮০ মাইল ব্যাস)। তার পর টেথিস (৭০০ মাইল ব্যাস), ডাইওন (৬২০ মাইল ব্যাস) ইত্যাদি। হাইপেরিয়ন হচ্ছে সবচেয়ে ছোট। এর ব্যাস মাত্র ২১০ মাইল। ফিবি ছাড়া সবাই একই দিকে মুখ করে শনিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

শনিতে যদি কেউ যেতে পারত তা হলে সে মজার মজার দৃশ্যও অনেক দেখতে পেত। সব-চেয়ে মজার অভিজ্ঞতা হ'ত যদি গ্রীষ্মকালের দুপুর রাত্রে শনিমণ্ডলের মেঘের ওপর চড়ে আকাশের দিকে তাকানো যেত। সমস্ত আকাশ যুড়ে ঠিক রামধনুর মত যেন আলোর খিলেন চলে গেছে—একটার পর একটা!

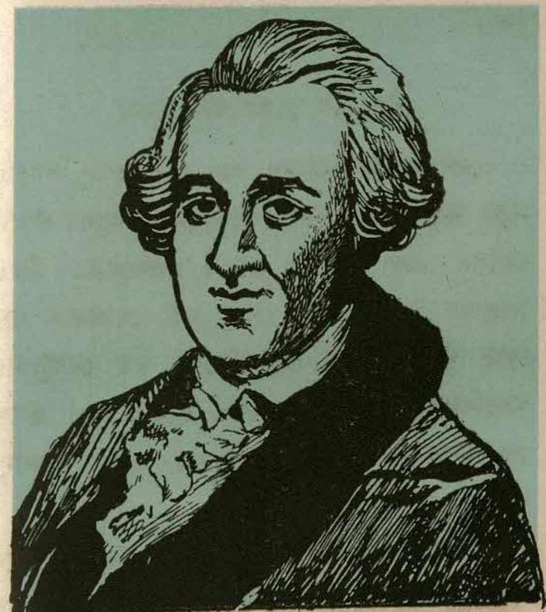


শনিমণ্ডলের মেঘের ওপর থেকে আংটিটাকে কেমন দেখাবে

শনির পরে ইউরেনাস্

দূরবীন আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত পণ্ডিতেরা শনিগ্রহকেই আকাশের দূরতম গ্রহ বলে জানতেন। তার পর ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্সেল আবিষ্কার করলেন ৬ষ্ঠ গ্রহ (পৃথিবী বাদে) ইউরেনাস্।

আকারে গ্রহদের মধ্যে শনির পরেই



ইউরেনাস্-আবিষ্কারক উইলিয়াম্ হার্সেল

ইউরেনাস্। অর্থাৎ সৌর জগতে এদিক্ দিয়ে তার স্থান তৃতীয়। আয়তনে সে ৬৫টি পৃথিবীর সমান। তার ব্যাস বিষুব রেখার কাছে ৩০,৯০০ মাইল। কিন্তু বহরেই ঐ, ওজনে কিন্তু সে ১৪টি পৃথিবীর বেশি নয়। তার কারণ, বৃহস্পতি-শনির মতই এই গ্রহটিরও শরীরের বেশির ভাগই গ্যাস দিয়ে তৈরি। তবে ভীষণ ঠাণ্ডা এই গ্রহ। তার উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেও ৩০০ ডিগ্রী নীচে।

বহুদূরের বাসিন্দা সে। পৃথিবী থেকে সূর্য যতটা দূরে, ইউরেনাস্ তার আঠারো গুণ দূরে। মাইলের হিসেবে সূর্য থেকে এর গড়পড়তা দূরত্ব ১৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। সেকেণ্ডে ৪ মাইল বেগে ছুটে সূর্যকে একটা চক্কর দিয়ে আসতে তার সময় লাগছে আমাদের বছরের হিসেবে প্রায় ৮৪ বছর। অথচ মাত্র ১১ ঘণ্টায়ই তার দিন-রাত কাবার। তা ছাড়া পৃথিবীর একটি চাঁদ, ইউরেনাসের রয়েছে পাঁচ পাঁচটি। তাদের নাম রাখা হয়েছে এরিয়েল, আম্‌ব্রিয়েল, টাইটানিয়া, ওবেরন্ ও মিরাণ্ডা।

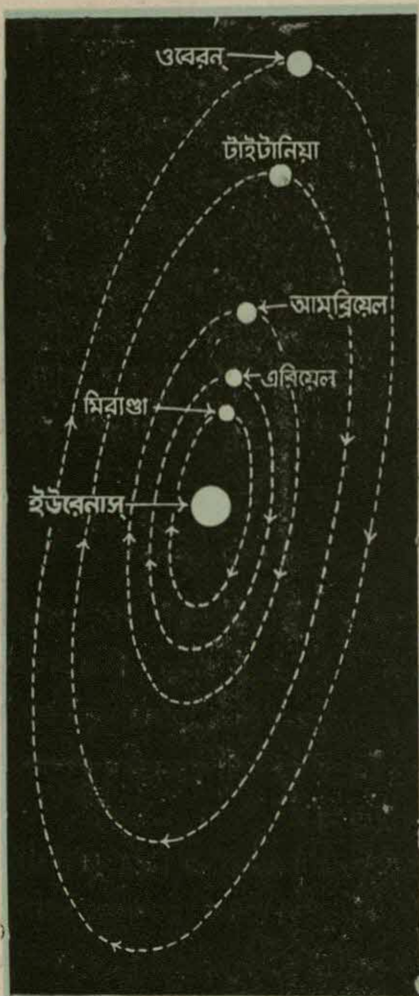
তারপর নেপচুন

ইউরেনাস্ আবিষ্কারের পর পণ্ডিতমহলে স্বভাবতই একটু হৈ-চৈ হ'ল। কিন্তু অবাক্ হবার আরও ছিল। দেখা গেল, হিসেব মত ইউরেনাস্‌কে যখন যেখানে পাবার কথা তখন ঠিক সেখানে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দু'টি তরুণ বিজ্ঞানী এ নিয়ে খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং একে অপরের অজ্ঞাতে ব্যাপারটার রহস্য-সন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। এঁদের একজন হচ্ছেন কেম্ব্রিজের অ্যাডাম্‌স্, অপর জন হচ্ছেন প্যারিসের লেভেরিয়ার। দু'জনেই নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নানা রকম অঙ্ক কষে বললেন, নিশ্চয়ই আকাশের কোন একটি জায়গায় আরও একটি অজানা গ্রহ আছে যে আড়ালে থেকে ইউরেনাস্‌কে আকর্ষণ করছে।

শেষে ১৮৪৬ সনে সেই গ্রহটির সন্ধান মিলল এবং ঠিক যেমন যেমনটি বলা হয়েছিল তেমন তেমনটি মিলেও গেল।

নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল নেপচুন। দেখা গেল, আকারে এটিও নেহাৎ কম যায়



ইউরেনাস্‌কে ঘিরে ঘুরছে তার পাঁচটি চাঁদ।

না। ইউরেনাসের পরেই এর স্থান। বিষুব রেখার মধ্যে দিয়ে এর ব্যাস ২৭,৭০০ মাইল, সূর্য থেকে গড়পড়তা দূরত্ব প্রায় ২৭৯ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল; গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩½ মাইল। সূর্যকে একবার চক্কর দিয়ে আসতে তার লাগে আমাদের বছরের হিসেবে প্রায় ১৬৫ বছর। নেপচুন ইউরেনাসের চেয়েও ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেও ৩৩০ ডিগ্রী নীচে।

পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত নেপচুনের হু'টি চাঁদের খোঁজ পেয়েছেন, আর তার একটির নাম রেখেছেন ট্রাইটন। ভীষণ ভারী এই ট্রাইটন—সৌর জগতের সমস্ত গ্রহের—সমস্ত চাঁদের চাইতে ভারী। এর ব্যাস ৩৩০০ মাইল, আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়। অপর চাঁদটির নাম নেরেইড্‌। এটি ট্রাইটনের চেয়ে অনেক ছোট এবং আছেও অনেকটা দূরে।

সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো

নেপচুন আবিষ্কারের পর পণ্ডিতেরা আবার নতুন করে ইউরেনাসের গতিবিধির হিসেব কষতে বসলেন এবং হিসেব করেও ফেললেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, কই, গোলমাল তো মেটে নি! এমন কি হিসেব মত নেপচুনের গতিবিধিরও কিছুটা হেরফের হচ্ছে। তা হ'লে কি নেপচুনের মত আরও কোন একটা অজানা গ্রহ এই গোলমাল বাধাচ্ছে?

আমেরিকার প্রফেসর লাওয়েল অঙ্কটঙ্ক কষে বললেন, আকাশের এই জায়গাটায় এক সময়

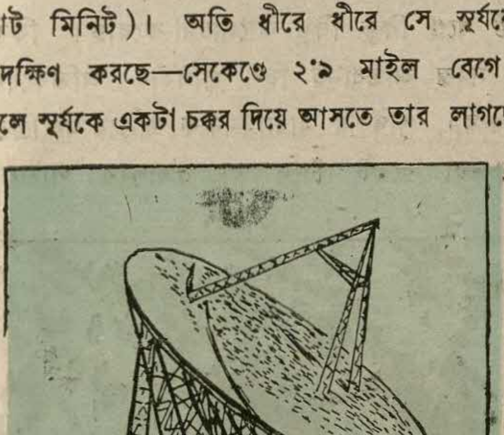

পালোমার মানমন্দিরের বাঘা দূরবীন

ঐ গ্রহটিকে পাওয়া যাবে—যদি সত্যি থাকে। তখন খোঁজ খোঁজ খোঁজ। বাঘা বাঘা দূরবীন দিয়ে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান চলল। দূরবীন-ক্যামেরা দিয়ে ঐ জায়গার অজস্র ফটো তোলা হ'ল। কিন্তু কই, কোথায় গেল গ্রহটি?

অবশেষে দেখা মিলল দীর্ঘ পনেরো বছর পরে, ১৯৩০ সালে। লাওয়েল যেখানে বলেছিলেন ঠিক সেইখানে। কিন্তু লাওয়েল তখন বেঁচে নেই।

নতুন গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল প্লুটো।

প্লুটো সূর্য থেকে এ-পর্যন্ত-জানা সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে দূরের গ্রহ। সূর্য থেকে ওর গড়-পড়তা দূরত্ব ৩৬৩ কোটি ১০ লক্ষ মাইল। সূর্য থেকে আলো গিয়ে পৌঁছতেই সেখানে লেগে যায় পাঁচ ঘণ্টা। (পৃথিবীতে আসতে তার লাগে মাত্র আট মিনিট)। অতি ধীরে ধীরে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—সেকেণ্ডে ২.৯ মাইল বেগে। ফলে সূর্যকে একটা চক্কর দিয়ে আসতে তার লাগছে



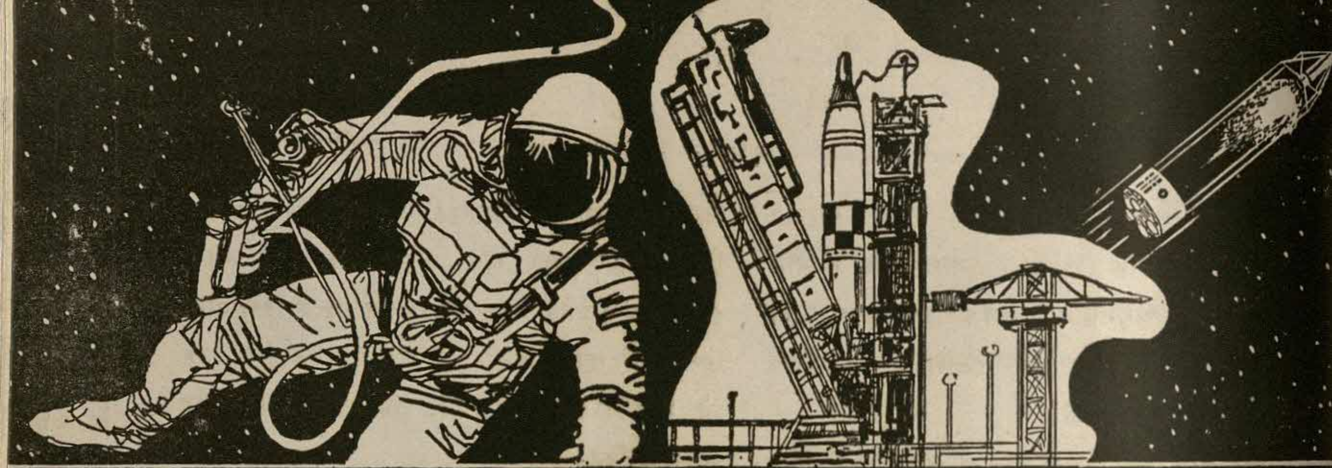
মহাকাশের রহস্যসন্ধানে আধুনিকতম বিরাট যন্ত্র—রেডিও-টেলিস্কোপ

আমাদের বছরের হিসেবে প্রায় ২৪৮ বছর। নিজের মেরুদণ্ডের চার ধারে এক-একটা পাক খেতে তার কতটা সময় লাগছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও নিঃসন্দেহ ন'ন। তবে কারো কারো মতে ঐ সময়টা হচ্ছে আমাদের দিনের হিসেবে প্রায় সাড়ে ছ'দিন।

অসম্ভব ঠাণ্ডার দেশ এই প্লুটো। ওর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেও ৩৪৮ ডিগ্রী নীচে। কখনও কখনও সে তাপ শূন্যের চেয়ে ৪০০ ডিগ্রী নীচেও নেমে যায়। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যদি প্লুটোয় জল-ডাঙ্গা-বাতাস বলে কিছু থাকে তবে তাও নিশ্চয় বরফের মত জমাট বেঁধে গেছে।

শনি, ইউরেনাস বা নেপচুনের তুলনায় প্লুটো কিন্তু আকারে খুবই ছোট—বুধের চেয়ে অল্প একটু বড়। ওর ব্যাস ৩৬০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকেরও কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লুটোর ওজন পৃথিবীর প্রায় দশগুণ। তার মানে প্লুটোর শরীর এমন কোন জিনিস দিয়ে গড়া যা আমরা পৃথিবীতে বসে ধারণাই করতে পারি না। এই জন্যই প্লুটোর পক্ষে তার ছোট্ট শরীর নিয়েও ইউরেনাস আর নেপচুনকে ধরে টানাটানি করা সম্ভব হয়েছে। তবে প্লুটোর কোন চাঁদের খবর পাওয়া যায় নি।

সূর্যের চারদিকে প্লুটোর ঘুরবার পথটিও ভীষণ চ্যাপ্টা। এ দেখে কোন কোন বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে প্লুটো হয়তো আসলে সূর্যের গ্রহই ছিল না, হয়তো একদা পুরাকালে সে নিজেই ছিল নেপচুনেরই একটি চাঁদ বা উপগ্রহ। কিন্তু নেপচুনের আকর্ষণ কাটিয়ে সে এখন পুরোদস্তুর স্বাধীন গ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।



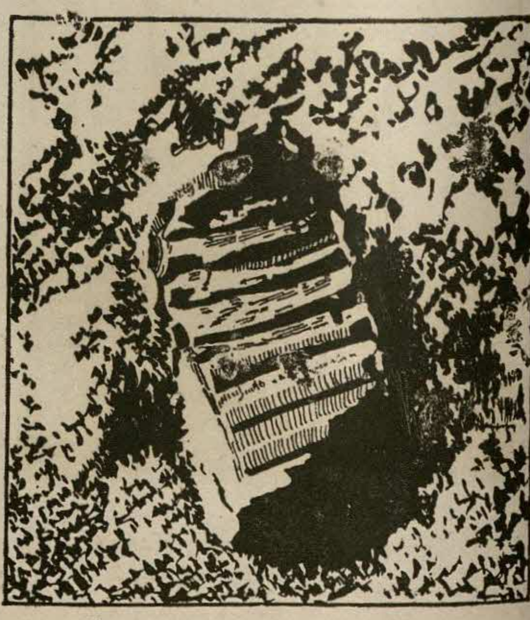
মহাশূন্যের পথে

চন্দ্রবিজয়

মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রার কথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এমন একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন যার সাহায্যে তাঁরা সত্যি সত্যি চাঁদের বুকে মানুষকে নামিয়ে দিতে পারবেন (ছোটদের বিশ্বকোষ : ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৪)। তাঁদের সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যিই ফলে যাবে, এবং এত তাড়াতাড়ি, তা কিন্তু আমরা ভাবতে পারি নি। কিন্তু সত্যিই তাই ঘটেছে। ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই, আমাদের ঘড়িতে যখন বেলা ৮টা বেজে ১৭ মিনিট, তখন মানুষ চাঁদের বুকে তার প্রথম পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছে।

"ছোট্ট একটি পদক্ষেপ, কিন্তু আসলে তা মানুষের ইতিহাসে বিরাট এক পদক্ষেপের সূচনা।" যিনি চাঁদের বুকে প্রথম নামলেন তাঁরই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এই কথা কয়টি। কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তাতে আর সন্দেহ কি ?

সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের এই চন্দ্র-বিজয় বিজ্ঞানের এক চরম সাফল্য। কিন্তু এই সাফল্য অর্জনের জন্য যে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল সে কথা ভাবতেও অবাক্ লাগে। মহাকাশযাত্রায় সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা কি রকম ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছিল সে কথা আমরা এই বইএর প্রথম দুটি খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু সে সমস্ত অভিযানই ছিল পৃথিবীর অভিকর্ষের ভিতরে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে এড়িয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-ভরা রকেট চাঁদে বা গ্রহান্তরে পাঠানো



চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন

সম্ভব হলেও জীবন্ত মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে ছিটকে যাওয়া এতদিন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এবারে শুরু হ'ল তারই প্রস্তুতি; আর, বলতে কি, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যে এদিক্ দিয়ে রুশ বিজ্ঞানীদের ওপর টেক্কা মেরেছেন তা আর অস্বীকার করার যো নেই।

পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে চন্দ্রলোক। কাজেই পৃথিবীর বাইরেকার কোন গ্রহ-উপগ্রহে যেতে হ'লে এই চন্দ্রলোক দিয়েই যে শুরু করতে হবে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ ছিল না।

ভাবতে অবাক্ লাগে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই চন্দ্রলোক নিয়ে কত রকম কল্পনাই না মানুষ করেছে! আমাদের পুরাণেও চন্দ্রলোক বলতে প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি একটি আনন্দধামের কথাই কল্পনা করা হ'ত—একমাত্র পুণ্যাত্মারাই যেখানে গিয়ে বাস করতে পারেন। তারপর বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যতই এই চন্দ্রলোক সম্বন্ধে সঠিক খবর সংগ্রহ করতে লাগল ততই তাদের ধারণা বদলাতে লাগল। ওটা যে সত্যিই পুণ্যাত্মাদের জন্য সংরক্ষিত আনন্দলোক নয়—নিতান্তই বায়ুহীন, জলহীন, শব্দহীন একটা জগৎ—পাথুরে কঙ্কাল ছাড়া সেখানে আর বিশেষ কিছুই পাবার আশা নেই এ খবরও অজানা রইল না। তবু এই চন্দ্রলোক সম্বন্ধে মানুষের যে অসামান্য কৌতূহল তা রয়েই গেল।

গত শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক জুল ভের্ন চন্দ্র-যাত্রা নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী রচনা করেছিলেন। অতিকায় কামানের গোলার ভিতরে ঢুকে তিনজন বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী কি করে চন্দ্রলোকের কাছে হাজির হয়ে চাঁদকে পরিক্রমা করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং কি করে তাঁরা প্রশান্ত মহাসাগরের জলে নেমে পড়েন তারই আশ্চর্য বর্ণনা ছিল ঐ গল্পে। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প হিসেবে যত কৌতূহলোদ্দীপকই হোক না কেন, গল্পটি কিন্তু ছিল একেবারেই জুল ভের্নের মগজের কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু আশ্চর্য, সত্যি সত্যি যেন তাই ঘটে গেল।

পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে অ্যাপোলো-৮

১৯৬৮ সালের একটি দিনে আমরা ফিরে আসছি। সেদিন ২১শে ডিসেম্বর। তিনজন আমেরিকান অভিযাত্রীকে নিয়ে এক বিরাট মহাকাশ-জাহাজ অ্যাপোলো-৮ আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে ছুটে বেরুল মহাশূন্যে। পর পর তিনটি খোলস দিয়ে তৈরি স্যাটার্ন-৫ রকেট, তারই ওপর সেটি বসানো। সব মিলে যেন এক নতুন কুতুব মিনার—ত্রিশতলা বাড়ীর সমান উঁচু, আর ওজনে প্রায় ২৮৮৬০০০ কে. জি.

পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষে, পরীক্ষা করে জানতে পেরেছিলেন যে কোন রকেট যদি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইলের কম বেগে ছোটে তা হ'লে সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে বাইরে যেতে পারে না, আবার তাকে নেমে আসতে হয় পৃথিবীর টানে। গতিবেগ যদি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল হয় তবে সেটি পৃথিবীর চারদিকে উপগ্রহের মত ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘণ্টায় অন্তত ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারলে তবেই সেটি পৃথিবীর টান এড়িয়ে ছিটকে যেতে পারে মহাশূন্যে। এর আগে যে সব মহাকাশ-

যাত্রী মহাশূন্যে ঘুরে এসেছেন তাঁরা কেউই অতখানি বেগে ছোটেন নি, কাজেই পৃথিবীর টানের বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় নি কারো পক্ষেই। কিন্তু অ্যাপোলো-৮ এবার তাই করল। ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীকে বার দুই চক্কর দিয়ে সে তার গতিবেগ বাড়িয়ে করে নিয়ে এল ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল, আর এইভাবে পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল পথ পেরিয়ে সে পৃথিবীর টান পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ছুটে এল সত্যিকার মহাশূন্যে। এই গতিবেগ আয়ত্ত করতে তাকে প্রতি সেকেণ্ডে কি বিপুল পরিমাণ জ্বালানী আর অক্সিজেন খরচ করতে হয়েছিল তার হিসেব শুনলে বিশ্বাস হতে চাইবে না। এই সব জ্বালানীর মধ্যে পেট্রোল-কেরোসিন ছাড়াও ছিল কয়েক শ' টন তরল হাইড্রোজেন, যা নাকি তরল রাখতে হলে শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকেও ২৫৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে নামিয়ে আনতে হয়। অক্সিজেনকেও রাখা হয়েছিল ঐ রকম তরল অবস্থায়। স্যাটার্ন-৫ এর তিনটি রকেট-খোলস তিনবার ধাক্কা দিয়ে মহাকাশ-জাহাজটিতে এই বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিল।

পৃথিবীর টান এড়িয়ে আসার পর তার গতিবেগ গেল অনেক কমে। ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে সে এসে পড়ল চাঁদের টানের ভিতর। গতিবেগ আবার বাড়তে লাগল। এখন আর পৃথিবী নয়, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানছে। গতিবেগ ক্রমেই বাড়ছে। সামলে নিতে না পারলে ভীমবেগে সে গিয়ে আছড়ে পড়বে চাঁদের পাথুরে গায়ে।

আবার নিয়ন্ত্রণ করা হ'ল তার গতি। প্রথমে চাঁদ থেকে ৭০ আর ১৯৬ মাইল ব্যবধান রেখে ডিমের মত চেহারার কক্ষপথে সে ঘুরতে লাগল চাঁদের চারদিকে। তারপর আর একটু নেমে চাঁদ থেকে গড়পড়তা ৬০ মাইল দূর দিয়ে সে ঘুরতে লাগল গোল হয়ে। পর পর দশবার প্রতি দু'ঘণ্টায় একবার করে চাঁদকে পাক খেয়ে তবে সে আবার রওনা হবে পৃথিবীর দিকে।



চন্দ্রোদয় নয়, চাঁদের বুকে পৃথিবীর উদয়,—অ্যাপোলো-৮-এর যাত্রীরা যেমনটা দেখেছিলেন।

ভিতরে বসে আছেন অসমসাহসী তিনজন মানুষ—ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেম্‌স্ লোভেল আর উইলিয়াম অ্যাণ্ডার্স। শুধু বসে নেই, সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত ভাবে করে চলেছেন নিজেদের কাজ। চাঁদকে পাঁতি পাঁতি করে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। কোথায় রয়েছে কোন্ ফাটল, কোথায় রয়েছে কোন্ আগ্নেয়গিরির গহ্বর, কোথায় রয়েছে কোন্ পাহাড়—৬০ মাইল দূর থেকে স্বচক্ষে দেখে নিচ্ছেন সব। সঙ্গে সঙ্গে ফটো তুলছেন আর টেলিভিশনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সে ছবি—সে বিবরণ সুদূর পৃথিবীতে। তারই মধ্যে চলছে খাওয়াদাওয়া, রঙ্গরসিকতা, ঘুমোনো আর

নিপুণ হাতে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ, যাতে সামান্য এক চুল ভুল হলে আর নিস্তার নেই। চাঁদের উল্টো পিঠ—যা নাকি পৃথিবী থেকে কখনও দেখা সম্ভব নয়—তাও দেখে আসছেন বার বার। লোভেল বললেন, "চাঁদকে দেখছি যেন ধূসর ছাড়া আর কোন রঙ নেই।" বোরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আকাশ দেখাচ্ছে পিচের মত কালো। সূর্য যেন একটা ধবধবে আলোর গোলা, আর পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় মনে হয় এখান থেকে পৃথিবীকে মনে হচ্ছে তার চার গুণ। অবশ্য তার আধখানাই শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি।"

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের শুভেচ্ছা ভেসে এল চন্দ্রলোক থেকে ; তারপর ফেরার পালা।

বিজ্ঞানীদের মতে এইটেই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সামান্য ভুল হলে রেহাই নেই। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার সময়েই ভয়টা সবচেয়ে বেশি। ছোট্ট একটি পথে, যাকে প্রায় সুড়ঙ্গপথই বলা চলে, বিশেষ একটি কোণ করে ঢুকতে না পারলে মহাকাশ-জাহাজখানা হয় মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে, নয় তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সত্যিকার অগ্নি-পরীক্ষা! কিন্তু কুশলী অভিযাত্রী তিনজন সে পরীক্ষায়ও ফুল নম্বর নিয়ে পাশ করে বেরিয়ে এলেন। বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার সময়ে মহাকাশ-জাহাজের বাইরেকার উত্তাপ হয়েছিল ৬ হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট। কেবিনের ভিতরের উত্তাপ কিন্তু বাড়ে নি, স্বাভাবিক ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইটই ছিল সেটা। অবশ্য ঐ জাহাজের বাইরের আবরণটা যাতে সে রকম উত্তাপেও গলে-পুড়ে ছাই হয়ে না যায় এমন জিনিস দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। তবু, যখন বায়ুমণ্ডলে ঢুকল, তখন মনে হ'ল বুঝি একটা জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড আগুনের গোলার মতই আকাশের বুকে এসে পড়ল। তারপর যথাসময়ে প্যারাশুট খুলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়।

লুনার মডিউল বা চাঁদের ভেলা

কিন্তু চাঁদে নামতে হ'লে অমন একটা মহাকাশ-জাহাজ নিয়ে নামলে তো চলবে না! সমুদ্রে জাহাজ নোঙর ক'রে, সেই জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় যাত্রী নামাবার সময় যেমন ছোট ছোট নৌকো বা লাইফ-বোট নামিয়ে তাতে ক'রে যাত্রী পারাপার করা হয় এখানেও সে রকম একটা কিছু করতে হবে। এই বোট মূল মহাকাশ-জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে, প্রায় ভাসতে ভাসতে এসে যদি চাঁদে নামতে পারে তবেই সব দিক্ রক্ষা হবে। নইলে, জোরে এসে যদি আছড়ে পড়ে, তা হ'লে তো সবই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

সেই ভাবেই তৈরি করা হ'ল হাল্কাভাবে সেই বোট। দেখতে অনেকটা মাকড়সার মত, তবে ঠ্যাং আটটা নয়, চারটে। এমন ভাবে সেই ঠ্যাং অর্থাৎ পায়াগুলো স্প্রিং দিয়ে তৈরি যে চাঁদের মাটিতে নামবার সময়ে কোন আঘাত না লাগে। তা ছাড়া ভিতরে কয়েকটা উল্টো-মুখী রকেট বসানো—যাতে ইচ্ছেমত এদিক্ ওদিক্ চালিয়ে নেওয়া যায়, গতিবেগও খুব ধীরে কমিয়ে আনা যায়। এই মহাকাশ-বোটের নাম দেওয়া হ'ল "লুনার মডিউল"। বাংলায় ওর নাম দেওয়া হয়েছে 'চাঁদের ভেলা'। মূল

জাহাজখানার নাম ঐ ভাষায় রাখা হ'ল 'কম্যাণ্ড মডিউল'।

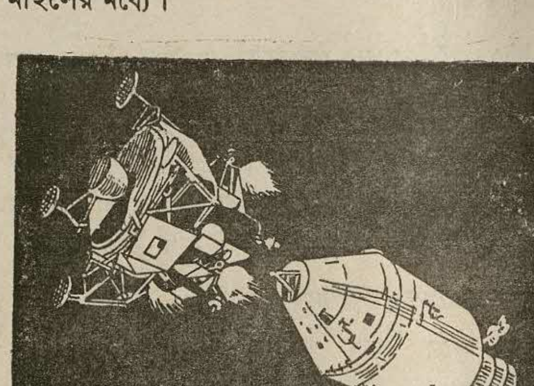
চাঁদ থেকে দশ মাইলের মধ্যে অ্যাপোলো-১০

মহাশূন্যে উঠে পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে রেখেই এই লুনার মডিউল বা চাঁদের ভেলাকে মূল জাহাজ থেকে পৃথক্ করা এবং আবার তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরীক্ষা করা হ'ল গোড়ায়, তার পর চাঁদের রাজ্যে গিয়ে পরীক্ষা করার জন্য আবার একদিন ছুটে বেরোল আরও ভারী (প্রায় ৩১০৮০০০ কে. জি.) ওজনের রকেট অ্যাপোলো-১০। ১৮ই মে, ১৯৬৯। এবারও তার মধ্যে রয়েছেন তিনজন অসমসাহসী যাত্রী, কিন্তু আগের তিনজন ন'ন। এঁরা হলেন ইয়ং, সারনান আর স্ট্যাফোর্ড। আর রয়েছে সেই চাঁদের ভেলা—লুনার মডিউল।

২০ হাজার মাইল ওপরে উঠেই তাঁরা সেখান থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাচ্ছে টেলিভিশনে তার রঙিন ছবি পাঠাতে শুরু করলেন। ঠিক হ'ল ইয়ং থাকবেন মূল জাহাজে বসে, আর বাকি দু'জন ভেলায় চড়ে চলে যাবেন চাঁদের কাছাকাছি। কিন্তু নামবেন না। দশ মাইল উঁচু থেকে চাঁদকে ভালো করে দেখে আসবেন, ঠিক করে আসবেন ভবিষ্যতে ঠিক কোন্ জায়গাটায় নামা চলবে।

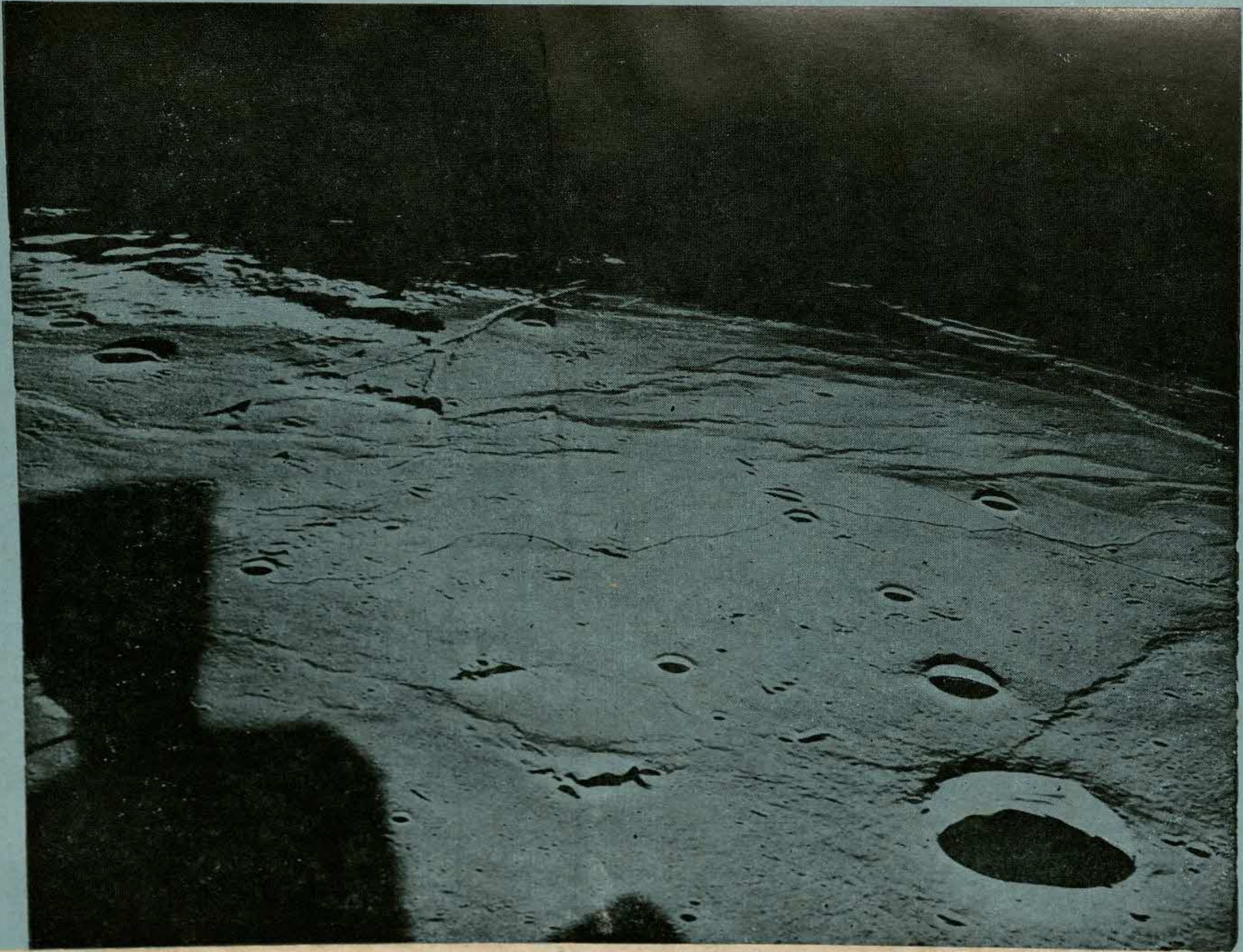
তাই করলেন তাঁরা। ছোট্ট একটুকু সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে দু'জনে নেমে এলেন ভেলায়। তার পরই হঠাৎ শুরু হ'ল গোলমাল। ভেলাটিকে মূল জাহাজ থেকে খুলে নিতে গিয়ে দেখেন সংযোগরক্ষাকারী ঐ সুড়ঙ্গ থেকে অক্সিজেন বার করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তা যদি না করা যায় তা হ'লে যে ভেলাটি ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে!

সঙ্গে সঙ্গে বেতারে সে খবর তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন হিউস্টনে, যেখানে বসে বিজ্ঞানীরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। খবর পেয়েই বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার যন্ত্র চালিয়ে দিলেন আর তাই থেকেই সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল কি ভাবে যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিতে হবে। নির্ভুল নির্দেশ! পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। চাঁদের ভেলা মহাকাশ-জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে নেমে এল চাঁদের দশ মাইলের মধ্যে।



চাঁদের ৭০ মাইল ওপরে মহাকাশ-জাহাজ থেকে চাঁদের ভেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দু'জন যাত্রী নিয়ে।

দশ মাইলের মধ্যে চাঁদ! আশ্চর্য সে দৃশ্য। সব কিছু যেন চোখের সামনে ভাসছে। নীচে মৃত আগ্নেয়গিরি, তারও মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই। চাঁদের বুকে যেখানটায় নামা সবচেয়ে নিরাপদ মনে করা গিয়েছিল সেখানেও দেখা গেল ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথর,—তার কোন কোনটা চওড়ায় অন্ততঃ ১০০ ফুটের কম হবে না। সংখ্যায়ও সেগুলি এত বেশি যে তা দিয়ে



চাঁদে নামবার আগে

অ্যাপেলো ১১ মহাকাশ জাহাজ থেকে চাঁদের ভেলা যেখানে চাঁদের বুকে নামবে সে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে

(ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে)

মহাশূণ্যের পথে

—ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড

পৃথিবীর একটা ছোটখাট সমুদ্র, হ্রদ বা উপসাগর ভরাট করে দেওয়া যায়। সুতরাং ওখানে নামা চলবে না, আরও ভালো জায়গা খুঁজে বার করতে হবে। এবড়োখেবড়ো, খানাখন্দ-ওয়ালা, পাথর-ছড়ানো জায়গা হ'লেও চলবে না—যতটা সম্ভব সমতলভূমি হওয়া চাই।

খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্। আট ঘন্টা ধরে চাঁদের আকাশের ওপর দশ মাইল উঁচু দিয়ে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা চলল। জায়গা বাছাই হয়ে গেল। এবার ফিরবার পালা। উঠবার জন্য পৃথক্ রকেট ঠিক করা আছে, সেটা চালু করে নির্ভুল পথে উঠে আসতে হবে ওপরের কক্ষপথে, মিলতে হবে মূল জাহাজের সঙ্গে ১২৬ ডিগ্রী কোণ করে। একটু এদিক্ ওদিক্ হলে চলবে না। নির্ভুল ভাবেই উঠে এলেন তাঁরা, মিলিত হলেন মূল জাহাজের সঙ্গে—এতক্ষণ ধরে ইয়ং যেখানে একলা বসে বসে আরও অনেক ওপর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। তার পর আবার নির্ভুল পথে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।

কৃত্রিম চাঁদে নামার মহড়া

এর পরের কাজ সটান চাঁদে গিয়ে নামা। কিন্তু বলা যতটা সহজ কাজে করা ততটা নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে, অপরিচিত পরিবেশে পদে পদে দেখা দেবে নতুন বাধা। তার জন্য তৈরি হয়ে নিতে হবে আগে। দস্তুর মত মহড়া বা রিহার্সাল না দিয়ে প্রথমেই স্টেজে নামতে গেলে যে কী দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে তা তো সবারই জানা। কিন্তু কি করে মহড়া দেওয়া যাবে —যদি না পৃথিবীতেই ঐ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়?

তাই করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। টেক্সাসের বিশাল এক প্রান্তরে ঠিক একটা নকল চাঁদ তৈরি করে ফেললেন তাঁরা। মৃত আগ্নেয়গিরির স্তূপ ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল এখানে ওখানে, পাথর দিয়ে ছেয়ে ফেলা হ'ল সেই নকল চাঁদের জমি —ঠিক যেমনটা আছে সত্যিকারের চাঁদে। ইতিপূর্বে কয়েক বছর ধরে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে অসংখ্য ফটোর সাহায্যে তাঁরা চাঁদের মানচিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি করে ফেলেছিলেন। নকল চাঁদের জমি হ'ল ঠিক তারই হুবহু অনুকরণ।

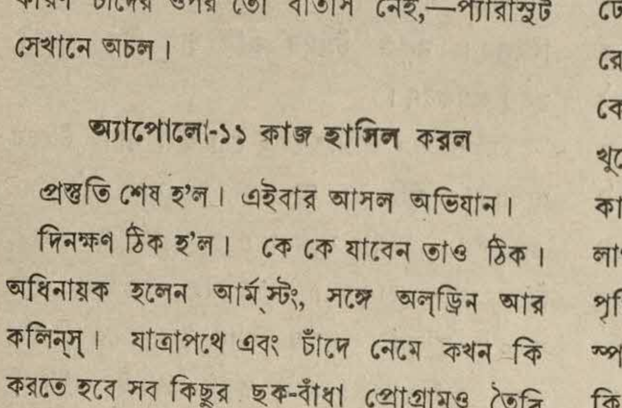
কিন্তু শুধু জমি হ'লেই তো হ'ল না। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মাত্র ছ'ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমাদের যা ওজন, চাঁদে গেলে তা কমে ছ'ভাগের একভাগ হয়ে যাবে। কৃত্রিম উপায়ে এমন ব্যবস্থা করা হ'ল যাতে অভিযাত্রীরা সেই রকম ওজনই এখানেই অনুভব করেন। সব রকম সরঞ্জাম, স্পেস্-স্যুট ইত্যাদি সমেত এক-একজন চন্দ্রযাত্রীর ওজন হবে পৃথিবীতে প্রায় চার মণ অর্থাৎ প্রায় দেড়শ' কে. জি.। চাঁদে পৌঁছলে সেই ওজনই হয়ে দাঁড়াবে বড় জোর ২৫ কে. জি-র কাছাকাছি। কাজেই ঐ ভাবে চাঁদে পৌঁছলে চলাফেরার সময় পদে পদে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অতএব আগেভাগেই তাতে অভ্যস্ত হয়ে নেওয়া দরকার। সেই রকম ভাবেই মহড়া দেওয়া হ'ল বারে বারে টেক্সাসের সেই কৃত্রিম চাঁদের ওপর। হাঁটা, চলা, প্রতিটি পদক্ষেপ অভ্যাস করানো হ'ল ভাবী চন্দ্রযাত্রীদেরকে। নীচু হয়ে কি করে চাঁদের ধুলো, চাঁদের পাথর চিমটে দিয়ে তুলে থলি বা পকেটে ভরতে হবে তাও অভ্যাস

করানো হ'ল। কৃত্রিম চাঁদের ভেলায় চড়ে কৃত্রিম চাঁদের কয়েক শ' ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার মহড়াও দেওয়া হ'ল বার বার। একবার তো একটা দুর্ঘটনাই ঘটে গেল—হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল নকল চাঁদের ভেলা। আরোহী চট্‌পট্‌ বুদ্ধি করে প্যারাসুট বেঁধে নেমে পড়লেন, তাই রক্ষা পেলেন। এ রকম দুর্ঘটনা যদি আসল চাঁদের বুকে ঘটত তা হলে রক্ষা ছিল না। কারণ চাঁদের ওপর তো বাতাস নেই,—প্যারাসুট সেখানে অচল।

অ্যাপোলো-১১ কাজ হাসিল করল

প্রস্তুতি শেষ হ'ল। এইবার আসল অভিযান।

দিনক্ষণ ঠিক হ'ল। কে কে যাবেন তাও ঠিক। অধিনায়ক হলেন আর্মস্ট্রং, সঙ্গে অল্‌ড্রিন আর কলিন্‌স্‌। যাত্রাপথে এবং চাঁদে নেমে কখন কি করতে হবে সব কিছুর ছক-বাঁধা প্রোগ্রামও তৈরি হ'ল। শেষে জুলাই-এর এক স্মরণীয় দিনে চার হাজার টন (প্রায় ৪১৪৪০০০ কে. জি.) ওজনের

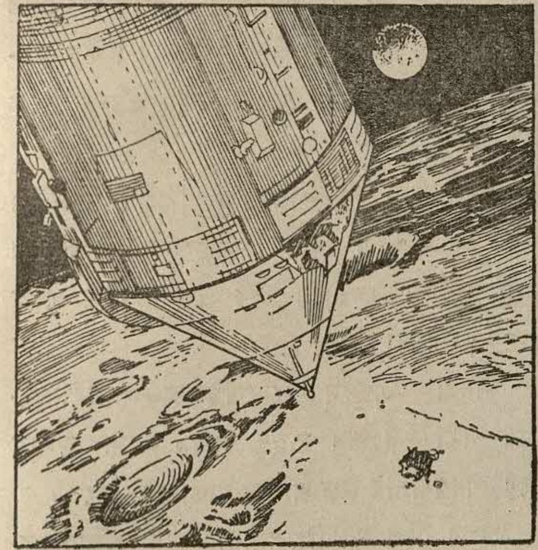


অ্যাপোলো-১১র তিনজন মহাকাশযাত্রী। বাঁ-দিকে অধিনায়ক আর্মস্ট্রং, মাঝখানে কলিন্‌স, ডাইনে অল্‌ড্রিন। আর্মস্ট্রংই পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি সবার আগে চাঁদে নামেন। তাঁর একটু পরেই নামেন অল্‌ড্রিন।

৩৬৪ ফুট উঁচু স্যাটার্ন্‌-৫ রকেট মহাকাশ-জাহাজ অ্যাপোলো-১১কে নিয়ে ছিটকে বেরোল কেপ্‌ কেনেডির স্টেশন থেকে,—প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ টন জ্বালানী পুড়িয়ে, ৯২ হাজার রেল-এঞ্জিনের শক্তি নিয়ে।

দেখতে দেখতে পৃথিবীর টান এড়িয়ে মহাশূন্যে পৌঁছে গেল জাহাজ। চন্দ্রযাত্রীরা যথাসময়ে তাঁদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলেন—স্যালাড, টোস্ট, চকোলেট, ফলের রস এবং আরও সব মুখরোচক খাবার,—পুষ্টির দিক্‌ দিয়েও যা মূল্যবান্‌। কেবিনের ভিতর এমন ব্যবস্থা যে স্পেস্‌-স্যুট খুলে রাখা যায়। একজন তো খুলে দাড়িও কামিয়ে নিলেন—নইলে নাকি বড় অসোয়াস্তি লাগছিল। ওদিকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে পৃথিবীর মাটিতে বসে ডাক্তারেরা তাঁদের হৃদস্পন্দন, রক্তের চাপ পরীক্ষা করে নিলেন। এমন কি ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ (ই. সি. জি.) পর্যন্ত বাদ গেল না।

চাঁদের টানের এলাকায় পৌঁছে অ্যাপোলো-১১ প্রথমে ৭০ থেকে ১৯৫ মাইল দূর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তার পর চাঁদের আরও কাছে, ৬২ থেকে ৭৫ মাইলের মধ্যে নেমে এল। এবারে আর্মস্ট্রং আর অল্‌ড্রিন ঢুকে পড়লেন চাঁদের ভেলা বা লুনার মডিউলে। ভেলাটির নাম দেওয়া হয়েছিল ঈগল, আর মূল জাহাজটির নাম কলম্বিয়া। কলিন্‌স্‌ রয়ে গেলেন কলম্বিয়ায়, সেটি চালাবার জন্য। অভিযানের শেষে আবার তো ওঁদের তুলে আনতে হবে ঈগল সমেত!



কলিন্‌স্‌ 'কলম্বিয়া'য় বসে দেখতে লাগলেন তাঁর চোখের সামনে চাঁদের ভেলা 'ঈগল' ধীরে ধীরে চাঁদে গিয়ে নামল।

ঈগল বিচ্ছিন্ন হ'ল

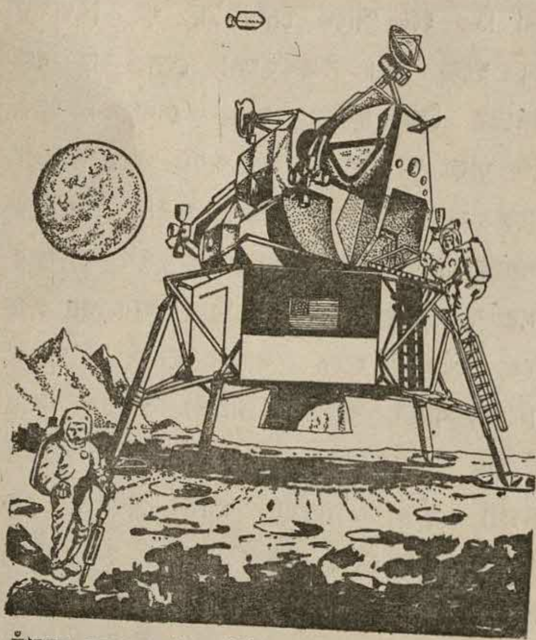
ঈগল কলম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের টানে ভীম বেগে নেমে আসতে লাগল চাঁদের বুকে। কিন্তু সে ভাবে নামলে তো চলবে না, তা হ'লে যে আছড়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে! তাকে নামতে হবে গাছ থেকে খসে-পড়া পাতার মত ধীরে ধীরে, ভাসতে ভাসতে। কিন্তু কিসে ভাসবে? চাঁদের ওপর তো বাতাস নেই! তাই ঈগলের মধ্যে লাগানো ছিল আর একটি রকেট এঞ্জিন, যা পেছন দিকে গ্যাস বার করে দিয়ে চাঁদের টানের উল্টো দিকে ঠেলে উঠতে পারে। এই বিপরীত দুই টানের ফলেই ঈগল ঝরা পাতার মত ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে নামতে লাগল।

কিন্তু চাঁদের জমির খুব কাছাকাছি এসে দেখা গেল চাঁদের "শান্ত সমুদ্র", যেখানটায় নামা ঠিক হয়ে আছে সেখানটা, খুব নিরাপদ মনে হচ্ছে না। কতকগুলো বেশ বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে। তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ঈগলের জখম হবার আশঙ্কা আছে যথেষ্ট। তখন উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে ঈগলকে চাঁদের ওপর সমান্তরাল ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল এদিক্‌ ওদিক্‌, আর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'তে লাগল কোথায় তাকে নামানো যায়। অবশেষে মাইল পাঁচেক দূরে শ' দুই ফুট চওড়া একটা মোটামুটি সমতল জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল—যেখানে বড় পাথরের চাঁই নেই, ছড়িয়ে আছে শুধু ছোট ছোট নুড়ি। সেইখানেই নেমে পড়ল ঈগল—তার স্প্রিং-বসানো মাকড়সার মত পা নিয়ে আলতো ভাবে।

চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষ

পূর্ব ব্যবস্থা মত বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রথম বেরিয়ে এলেন আর্মস্ট্রং। মই বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে এসে প্রথমেই স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরাটা চালিয়ে দিলেন; তার পর মইএর শেষ ধাপে নেমে, সন্তর্পণে এক পা চাঁদের ওপর রেখে, জমি নরম না শক্ত পরীক্ষা করে, যখন নিশ্চিন্ত হ'লেন যে এখানে পা বসে যাবে না তখন লাফিয়ে পড়লেন চাঁদের বুকে।

নেমেই বেলচার মত একটা যন্ত্র দিয়ে কিছুটা চাঁদের মাটি আর নুড়িপাথর তুলে নিয়ে থলিতে ভরে ফেললেন আর চালান করে দিলেন তাঁর পরনের স্পেস্‌-স্যুটের পকেটে। বলা বাহুল্য চাঁদে নেমে টিকে থাকবার জন্য যা যা দরকার সমস্ত ব্যবস্থাই করা ছিল ঐ



চাঁদের বুকে লুনার মডিউল বা চাঁদের ভেলা নেমে পড়েছে। অল্‌ড্রিন মই বেয়ে নামছেন, আর্ম্‌স্ট্রং আগেই নেমে পড়েছেন। মাথার ওপরে কলিন্‌স্‌কে নিয়ে মহাকাশ-জাহাজটি ঘুরছে। আকাশের মাঝখানে জল্ জল্ করছে পৃথিবী।

স্পেস্-স্যুটের মধ্যে,—প্রশ্বাস নেওয়া, নিঃশ্বাস বার করে দেওয়া, এমন কি বেতারে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত। কুড়ি মিনিট পরে অল্‌ড্রিনও নেমে এলেন মই বেয়ে। তার পর দু'জনে মিলে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন চাঁদের বুকে। হেঁটে না বলে একটু লাফিয়ে লাফিয়ে বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে।

চারদিকে ছোট ছোট গর্ত—গরুর পায়ের ক্ষুরে যেমনটা তৈরি হয়—সাধু ভাষায় আমরা যাকে বলি গোষ্পদ, আর তার চার পাশে ছড়ানো অসংখ্য ছোট ছোট নুড়িপাথর। তারই ওপর দিয়ে চলতে লাগলেন ওঁরা। ওঁদের ওজন তখন ভীষণ কমে গেছে—৭৫।৭৬ কে. জি. ওজনের এক একটা মানুষের ওজন হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে বারো কে.জি.র মত। লাফাবার ক্ষমতা বেড়ে গেছে ৬ গুণ, ১৫।২০ ফুট উঁচু এক-একটা লাফ দেওয়াও হয়তো তখন ওঁদের পক্ষে কঠিন নয়।

প্রথমেই ওঁদের কাজ হ'ল পৃথিবী থেকে ওঁরা যে ধাতুর ফলকটি নিয়ে গিয়েছিলেন সেটি চাঁদের গায়ে বসিয়ে দেওয়া। কি লেখা ছিল সেই ফলকে? লেখা ছিল:

আমরা এখানে নেমেছিলাম—পৃথিবী-গ্রহ-থেকে-আসা সর্বপ্রথম মানুষ, ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে—বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির বার্তা বহন করে।

তলায় ছিল আর্ম্‌স্ট্রং, অল্‌ড্রিন্ আর কলিন্‌স্‌এর, আর সেই সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বাক্ষর।

তার পর ওঁরা সেখানে পুঁতে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা আর বসিয়ে দিলেন কতকগুলি যন্ত্রপাতি। তার একটি ভূমিকম্পের মত চন্দ্রকম্প অর্থাৎ চাঁদের কাঁপুনিও ধরতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ওঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা ওখানে পুঁতে এলেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পৃথিবীর আরও ৭২টি রাষ্ট্রের ছোট ছোট পতাকা।

শুরু হ'ল চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়ানো

তার পর ওঁরা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চাঁদের ওপর, নিজেদের চোখে দেখে বেড়াতে লাগলেন চাঁদের গায়ের অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য। সূর্যের আলোয় আর্ম্‌স্ট্রংএর ছায়া ৬ গুণ বড় দেখাচ্ছিল, তাঁর গা থেকে ঝলকাচ্ছিল সেই প্রখর আলো, চোখে ধাঁধা লাগছিল সেই আলোয়। অল্‌ড্রিনের মুখোসের সামনের দিক্‌কার

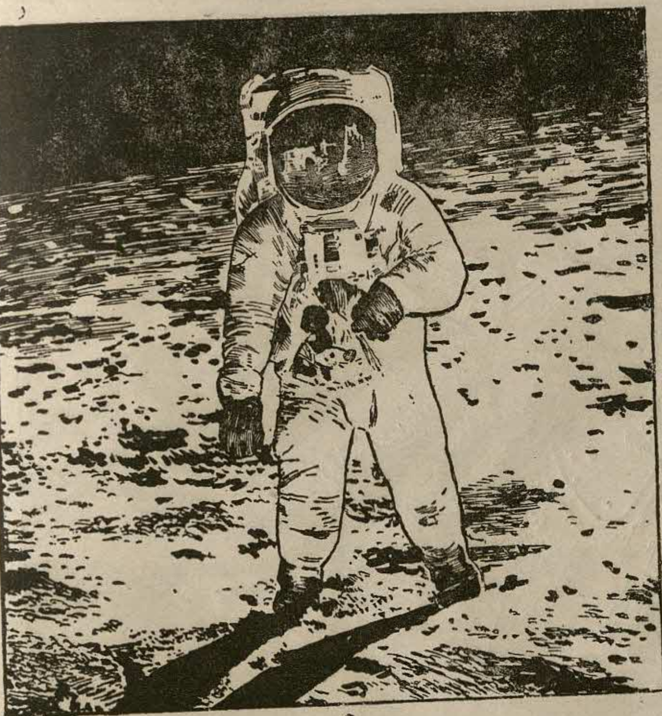


চাঁদের বুকে

অ্যাপেলো ১২ মহাকাশ জাহাজের জনৈক অভিযাত্রী চাঁদের বুকের ওপর যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য সেগুলো বয়ে নিয়ে চলেছেন। (ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে)

মহাশূন্যের পথে

—ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড



চাঁদের বুকে অল্‌ড্রিন্‌ হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মুখোসের স্বচ্ছ পাতে ঝলমল করছে গোটা জায়গাটার ছায়া-ছবি।

স্বচ্ছ পাতে ঝলমল করছিল গোটা জায়গাটার ছায়া-ছবি। আর্মস্ট্রং বলে উঠলেন, "কী অদ্ভুত আলোর খেলা এখানে! থেকে থেকে যেন রঙ বদলাচ্ছে! সূর্যরশ্মির বরাবর নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তামাটে মনে হচ্ছে, কিন্তু সোজা নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে সব যেন মিশমিশে কালো।" অল্‌ড্রিন্‌ বললেন, "চাঁদের মাটি এমনিতে বিশেষ শক্ত নয়—বরঞ্চ কিছুটা নরমই বলা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে বলা যায় ময়দার মত মিহি। আমাদের পা কোন কোন জায়গায় আধ ইঞ্চির মত মাটিতে বসে যাচ্ছে। তবে কতকগুলি গর্তের কিনারায় আরও নরম স্তর টের পাচ্ছি—জুতো সেখানে ৩/৪ ইঞ্চি বসে যাচ্ছে। এক জায়গায় মাটি বেশ চটচটে—অনেকটা আমাদের এঁটেল মাটির মত। পা সেখানে মাঝে মাঝে পিছলেও যাচ্ছে। তবে মাটির ওপরটাই নরম, ভিতরটা শক্ত। যন্ত্রপাতির নল তার মধ্যে ঢোকাতে বেশ জোর দিতে হচ্ছে।"

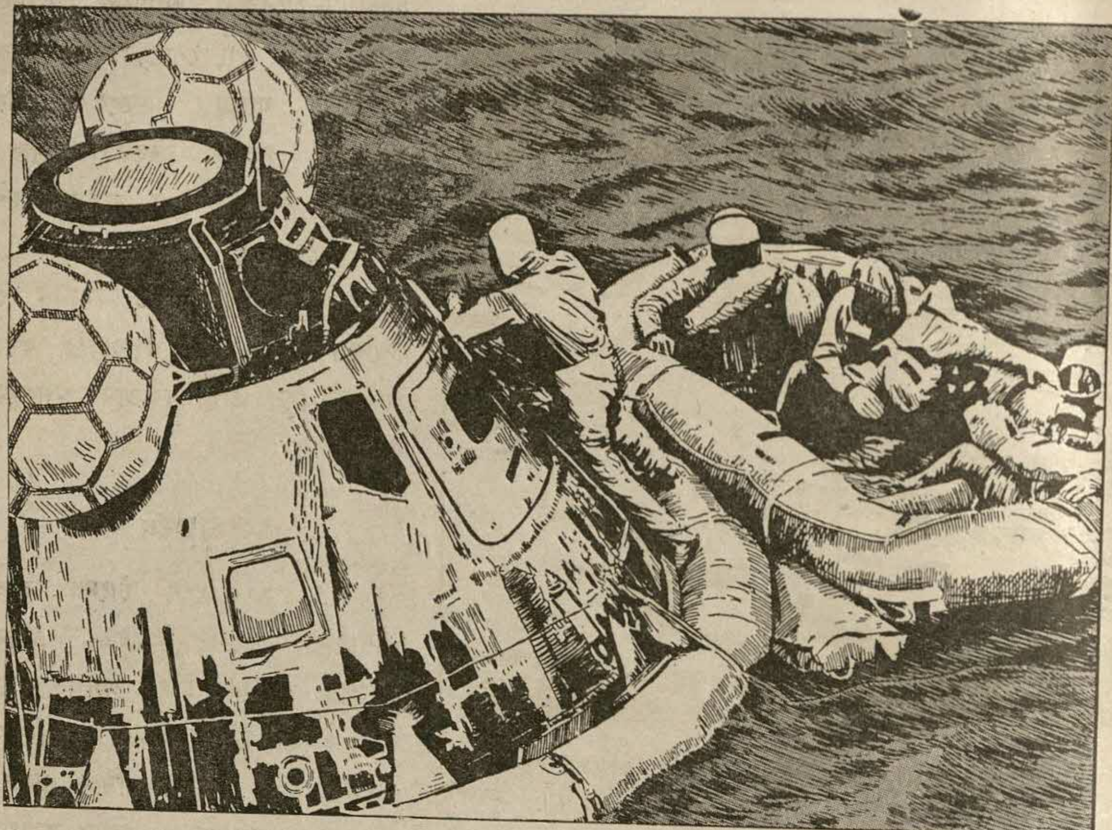
মোট ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড চাঁদের বুকে পায়চারি করে আবার এসে তাঁরা ঢুকলেন ঈগলের মধ্যে।

প্রত্যাবর্তন

প্রায় ২২ ঘণ্টা চাঁদের বুকে কাটাবার পর ঈগলের এঞ্জিন চালিয়ে দেওয়া হ'ল, ঈগল ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। কলিন্‌স্‌ এতক্ষণ তাঁর কলম্বিয়া নিয়ে সমানে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। এবারে কক্ষপথ বদলে আরও নীচে নামিয়ে আনলেন সেই জাহাজকে। সাড়ে সাত মিনিটের মধ্যে ঈগলও পৌঁছে গেল তার কক্ষপথে। এবার শুরু হ'ল একের অপরকে অনুসরণ। সাড়ে তিন ঘণ্টা এই রকম ছোটাছুটির পর ঈগল মিলিত হ'ল কলম্বিয়ার সঙ্গে। অ্যাপোলো-১১ আর্মস্ট্রং আর অল্‌ড্রিন্‌কে ঈগল সমেত তুলে নিল তার কোলে।

ঈগলকে টেনে বয়ে নিয়ে আর লাভ নেই। তাই একটু পরেই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হ'ল। মহাশূন্যে হারিয়ে গেল ঈগল।

এবার দ্রুতবেগে পৃথিবীর দিকে ফেরা। ভোর বেলা সূর্য উঠি-উঠি করছে, এমন সময় দেখা গেল একটি আগুনের গোলা যেন ছিটকে



প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যাপস্যুল এসে পড়েছে। তিন মহাকাশচারী সেখান থেকে বেরিয়ে রবারের বোটে উঠে বসেছেন। তাঁদেরকে হেলিকপ্টারে তুলে নেবার জন্য উদ্ধারকারীদেরও একজন এসে গেছেন।

এসে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল হেলিকপ্টার। ওঁরা ততক্ষণে ক্যাপস্যুল থেকে বেরিয়ে রবারের বোটে উঠে বসেছেন। হেলিকপ্টার ওঁদেরকে তুলে নিল। কিন্তু না, করমর্দন নয়; এখন ২১ দিন তাঁদের থাকতে হবে আলাদা ঘরে—সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। কে জানে কি জীবাণু বয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁরা চন্দ্রলোক থেকে!

চাঁদ থেকে ফিরে এসে

চাঁদের আবহাওয়া সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তাতে হাওয়া আর জল না থাকায় ওখানে কোনও জীবিত প্রাণী থাকার কথা নয়। তবু বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ছিল ওখানে এমন কোন ক্ষুদে চান্দ্রজীব থাকা অসম্ভব নয় যার অস্তিত্ব আমরা পৃথিবীতে কল্পনা করতে পারি না। যদি থাকে তা হ'লে তারা হয়তো একেবারে প্রাথমিক স্তরের জীবাণু বা ভাইরাস জাতীয় কিছু হবে। চাঁদ থেকে ফিরে আসবার সময় যদি সেগুলি মহাকাশযাত্রীদের জামাকাপড় বা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র কোনটার সঙ্গে কোন রকমে চলে আসে তবে পৃথিবীতে এসে তারা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটাতে পারে। কারণ পৃথিবীর পরিচিত অনুরূপ জীবের সঙ্গে তাদের কোনও

মিল নেই। হয়তো সেগুলি অ্যানেরোবিক জাতীয় জীবাণু—যাদের বাঁচবার জন্য অক্সিজেন দরকার হয় না। সেগুলি যদি বিষাক্ত হয় তবে তাদের সেই বিষক্রিয়া ঠেকাবার মত ব্যবস্থা পৃথিবীতে কারো নেই—না কোনও প্রাণীর, না কোনও উদ্ভিদের।

তাই ঠিক হয়েছিল চাঁদ থেকে ফিরে এলে চন্দ্রযাত্রীদের অন্তত ২১ দিন কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না। ক্যাপস্যুল থেকে বেরিয়ে সোজা একটা প্লাস্টিকের সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁরা প্রথমে উঠবেন জাহাজের-ওপর-রাখা একটি পৃথক্ ভ্যানে—যা নাকি বাইরের আব-হাওয়া থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা। জাহাজ থেকে সেই ভ্যানে চড়েই তাঁরা চলে আসবেন লুনার রিসিভিং ল্যাবরেটরীতে—যাকে বাংলায় বলা যায় 'চন্দ্রাগতদের পরীক্ষাগার'।

এই ল্যাবরেটরীটি আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল—অত্যন্ত কৌশলে। বাইরের আব-হাওয়া থেকে এটিও ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। অভিযাত্রীদের দেহের কোন কিছু—এমন কি নিঃশ্বাসের বাতাসটুকুও পরিশুদ্ধ না হয়ে এই পরীক্ষাগার থেকে বেরোবার উপায় ছিল না, তেমনি উপায় ছিল না বাইরে থেকেও কোন কিছুর ভিতরে ঢুকবার।

২১ দিন ধরে এই ঘরে চন্দ্রযাত্রীদের বন্দী হয়ে থাকতে হ'ল পরীক্ষার জন্য। বাইরে থেকে যাঁরা দেখা করতে এলেন তাঁরা একটা বিশেষ ধরনের তৈরি কাচের আড়াল থেকে কথাবার্তা বললেন, কাছে যেতে দেওয়া হ'ল না কাউকে—তাঁদের স্ত্রীদেরকেও নয়। যে সব ডাক্তার ও যন্ত্রবিদ্ তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন তাঁরা এবার সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়ে ঐ ল্যাবরেটরীতে ঢুকলেন এবং এর পর তাঁরাও ২১ দিন ওখানে বন্দী হয়ে রইলেন, কাউকে আর বেরুতে দেওয়া হ'ল না। ২১ দিন ধরে চলল চন্দ্রযাত্রীদের দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষার কাজ। দেহের রক্ত, পরিত্যক্ত ময়লা—কিছুই বাদ গেল না। চাঁদ থেকে ওঁরা কিছু নিয়ে এসেছেন কিনা কিংবা চাঁদে গিয়ে ওঁদের দেহযন্ত্রের কোন পরিবর্তন হ'ল কিনা সব খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হ'ল। না, কিছু পাওয়া গেল না। ২১ দিন পরে ওঁরা বহাল তবিয়তে বেরিয়ে এলেন ল্যাবরেটরী থেকে।

চাঁদের নুড়িপাথর পরীক্ষার ব্যবস্থা

চন্দ্রযাত্রীরা যে সব নুড়িপাথরগুলো চাঁদ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন সেগুলিও, ওঁরা ক্যাপস্যুল থেকে বেরিয়ে আসার পরই, পৃথক্ প্লেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষার জন্য। পৃথিবীর সব কিছুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে যত শীঘ্র এবং যত রকমে সম্ভব সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এজন্যও আগে থেকে তৈরি হয়ে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। রাসায়নিক এবং ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াও সেগুলির তেজ-স্ক্রিয়তা পরীক্ষা করার জন্য মাটির নীচে ৫০ ফুট গভীর গর্ত করে সেখানে একটি বিশেষ ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছিল। ঘরটি ৫ ফুট পুরু কন্‌ক্রিট আর ৩ ফুট পুরু ডিউনাইট দিয়ে ঘেরা। ডিউনাইট হচ্ছে এক বিশেষ জাতের খনিজ যার মধ্যে এ পর্যন্ত কোন তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এত করেও বিজ্ঞানীদের মন ওঠে নি, যেখানটায় পরীক্ষা হবে সেখানটা ঘিরে আট

ইঞ্চি পুরু একটা সীসের দেয়াল দিয়ে রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানীকে এই সব নুড়িপাথর পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তা থেকে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য সব তথ্য জানা গেছে। আরও জানা গেছে পরবর্তী কালে আনা ধুলো-মাটি-পাথর থেকে।

এর পর আবার অ্যাপোলো-১২

অ্যাপোলো-১১র অভিযান দিয়েই কিন্তু চন্দ্র-অভিযান শেষ হয় নি। ওটিকে বরঞ্চ শুরু বলা যেতে পারে। মাস চারেক যেতে না যেতেই অ্যাপোলো-১২ নামে আর একটি মহাকাশ-জাহাজ ছুটল চাঁদের দিকে। এবারেও তার মধ্যে রয়েছেন তিনজন মহাকাশচারী—অধিনায়ক কনরাড্, গর্ডন্ আর বীন্। ঠিক হ'ল গর্ডন্ মূল জাহাজটি চালাবেন, কনরাড্ আর বীন্ চাঁদের ভেলা নিয়ে চলে যাবেন চাঁদের মাটিতে। ১৪ই নভেম্বর যাত্রা শুরু হ'ল, ১৯শে তাঁরা চাঁদের মাটিতে নেমে পড়লেন। এবারকার অভিযানে বিশেষত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রথমত আগের বারের মত চাঁদের পূবদিকে 'শান্ত সমুদ্রে' না নেমে ওঁরা নামলেন চাঁদের 'ঝঞ্ঝা সমুদ্রে'—চাঁদের পশ্চিম দিকে। প্রথম বারে অভিযাত্রীরা চাঁদের ওপর মোট সময় কাটিয়েছিলেন প্রায় বাইশ ঘণ্টা, তার মধ্যে চাঁদে পায়চারি করেছিলেন ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২ সেকেণ্ড। এবারে তাঁরা কাটালেন প্রায় সাড়ে একত্রিশ ঘণ্টা—চাঁদে ঘুরে বেড়ালেন সাড়ে তিন ঘণ্টা। প্রথম বারের অভিযাত্রীরা চাঁদের ওপর তিনটি যন্ত্র বসিয়ে এসেছিলেন, এঁরা বসালেন ৬টি বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্র। তা ছাড়া প্রথম বারের অভিযাত্রীরা যে পরিমাণ নুড়িপাথর সংগ্রহ করেছিলেন (৪৯ পাউণ্ড) এবারে তার ডবলেরও অনেক বেশি পাথর সংগ্রহ করা হ'ল (১২৮ পাউণ্ড)। এবার চাঁদের বুকে তোলা টেলিভিশন ছবিও পাওয়া গেল অনেক উন্নত ধরনের। প্রথম বারের ছবিগুলো ছিল সাদা-কালো, এবারে রঙিন। ২৫শে নভেম্বর তিনজন অভিযাত্রীই নিরাপদে ফিরে এলেন পৃথিবীতে।

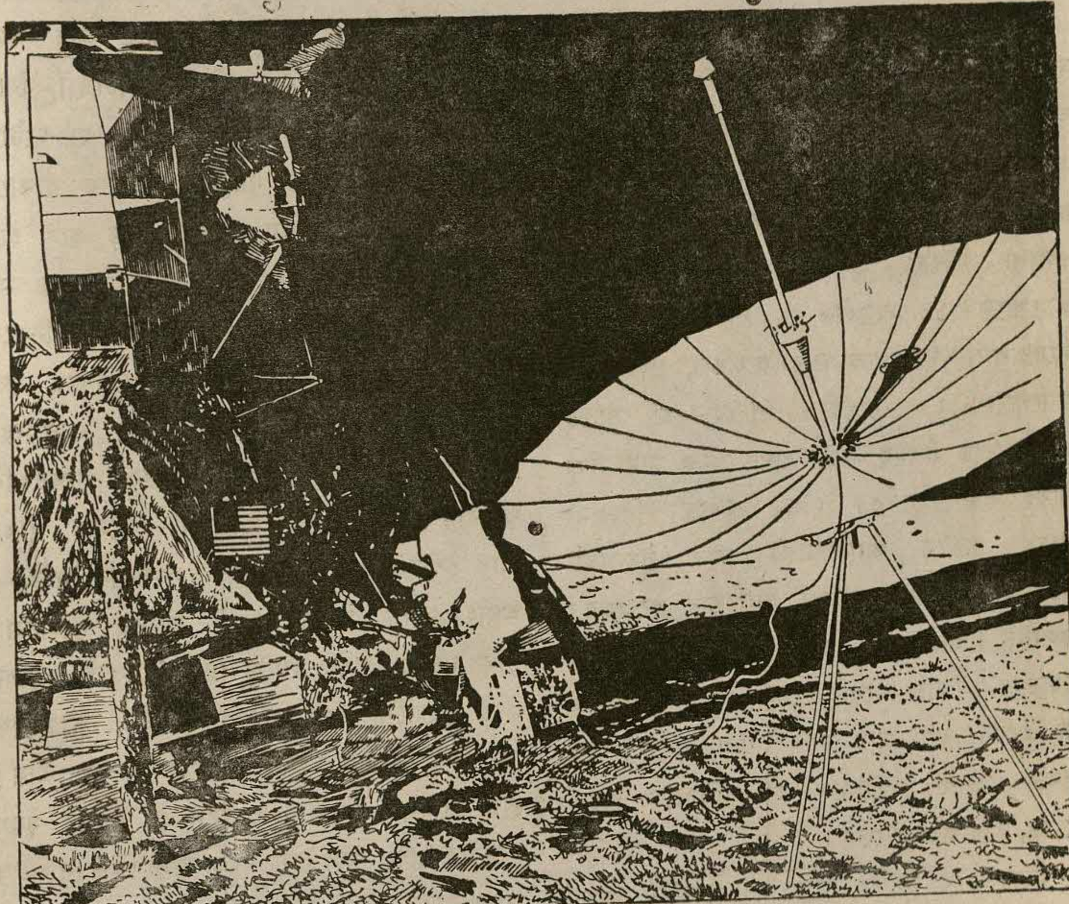


অ্যাপোলো-১২র অভিযাত্রী তিনজন। বাঁ-দিক্ থেকে অধিনায়ক চার্ল্স্ কনরাড্, রিচার্ড্ গর্ডন্ ও অ্যালান বীন্।

চাঁদের পাথর

চাঁদের পাথর পরীক্ষা করে কি কি খবর জানা গেল সে সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর কৌতূহলের অন্ত নেই। পরীক্ষার ফল যেটুকু জানা গেছে তাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের পাথরের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচিত পাথরের উপাদানে পার্থক্য এত বেশি যে চাঁদ যে এক সময়ে পৃথিবী থেকেই ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল এ মতবাদ আর মেনে



অ্যাপোলো-১২র অভিযাত্রীরা চাঁদের বুকে যন্ত্রপাতি বসাবার তোড়জোড় করছেন। পাশে চাঁদের ভেলা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা দেখা যাচ্ছে।

নেওয়া যাচ্ছে না। হয়তো তু'টো একই সময়ে গড়ে উঠেছিল, কিংবা চাঁদ হয়তো এক সময়ে মহাশূন্যে আর কোনও জায়গার বাসিন্দা ছিল, পৃথিবীর আকর্ষণে তার কাছে চলে এসেছে।

চাঁদে যে কোনও সময়ে জল ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবে একটি পাথরে বায়োটাইট্ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে সাধারণত শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ জল থাকে। অ্যাপোলো-১১র সংগৃহীত পাথরের মধ্যে কতকগুলি এত নরম যে হাতের চাপেই গুঁড়িয়ে যায়। ঐ সব পাথরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা তু'রকম আগ্নেয় শিলার সন্ধান পেয়েছেন। গলিত লাভা ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলে বাইরে যেমন বড় বড় দানা জমাট বেঁধে যায় এগুলোও সেই রকম। এর মধ্যে পাওয়া গেছে বেশ খানিকটা লোহা আর ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ ধাতু। পাথরকুচিগুলির গা কাচের মত মসৃণ পদার্থ দিয়ে ঢাকা—যা নাকি পৃথিবীতে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ওপর থেকে অবিরত উল্কার ঘা খেয়ে খেয়ে এ রকম হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

অ্যাপোলো-১২ কর্তৃক সংগৃহীত পাথরগুলির মধ্যে কতকগুলি আনা হয়েছে চাঁদের একটা বড় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা ক্রেটারের কাছ থেকে। এগুলির দানা খুব মোটা—বিজ্ঞানীরা মনে করেন চাঁদের ভিতরে অনেকটা নীচু থেকে এগুলো উঠে এসেছে। আবার মজা, অ্যাপোলো-১১র সংগৃহীত যে পাথর,—যা নাকি চাঁদের শান্ত সমুদ্র থেকে আনা হয়েছিল, তার সঙ্গে অ্যাপোলো-১২র সংগৃহীত পাথর,—যা সংগ্রহ করা হয়েছে চাঁদের ঝঞ্ঝা সাগর থেকে, নানা দিক্ দিয়েই অন্য রকমের। দু'জন জাপানী বিজ্ঞানী চাঁদের পাথরে অ্যাপেটাইট আর ট্রয়লাইট নামে ২টি দুষ্প্রাপ্য খনিজ আবিষ্কার করেছেন। ট্রয়লাইট (যার মধ্যে রয়েছে ফেরাস্ সালফাইড) সাধারণত উল্কার মধ্যেই দেখা যায়—পৃথিবীতে বড় একটা দেখা যায় না। তাঁরা অবশ্য চাঁদের পাথরে বেসল্ট পেয়েছেন—যা পৃথিবীতে প্রচুর রয়েছে, তবে অন্য জাতের।

চাঁদেও যে চুম্বকত্ব আছে এ খবরটিও জানা গেছে, যদিও তা পৃথিবীর তুলনায় খুবই কম। পৃথিবীর ভিতরকার তরল ধাতু ডায়নামোর মত চুম্বকশক্তি তৈরি করে চলেছে। চাঁদেও কি তা হলে সে রকম কিছু আছে?

রাসায়নিক পরীক্ষায় চাঁদের পাথরে ক্রোমিয়াম, টাইটানিয়াম, ইট্রিয়াম, জারকোনিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলি পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া গেছে। এগুলির কোনটাই প্রচুর উত্তাপ না পেলে গলতে পারে না। পক্ষান্তরে সীসে, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, বিস্মাথ প্রভৃতি যে সব ধাতু অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে গলে যায়—চাঁদের পাথরে তাদের বিশেষ পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডল থাকায় তার গায়ে ক্রমাগত ক্ষয়, ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে। চাঁদে সে রকম ক্ষয় কমই ঘটেছে—ওখানে যা ঘটেছে তা হচ্ছে উল্কাপাতের দরুণ। পৃথিবীর বাতাসে এসে উল্কাগুলি বেশির ভাগই পুড়ে ছাই হয়ে যায়; কিন্তু চাঁদে বাতাস না থাকায় তা হয় না, উল্কাগুলি সবই এসে প্রচণ্ড বেগে চাঁদকে আঘাত করে। কোন কোন অতিকায় উল্কা বিপর্যয় কাণ্ডও যে ঘটাতে না পারে এমন নয়। তবু পণ্ডিতেরা মনে করছেন চাঁদের পাথরগুলি পৃথিবীর তুলনায় বেশ পুরোনো—অনেক পাথর প্রায় সৌরজগতের সেই সৃষ্টির সময়কার তৈরি,—অর্থাৎ সাড়ে চারশ' কোটি বছরের পুরোনো। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সাড়ে তিনশ' কোটি বছরের চেয়ে পুরোনো পাথর পাওয়া যায় নি। আজকাল তো নিখুঁত ভাবেই পাথরের বয়স ঠিক করা যায়! তাই অনেকেই অনুমান করছেন যে চাঁদের বয়স পৃথিবীর চেয়ে কম তো নয়ই, বরঞ্চ কিছু বেশিই। অন্তত সমান সমান তো বটেই!

অভিযান আরও চলবে

এর পর তৃতীয় অভিযান। চাঁদে ২য় অভিযান হবার অল্প পরেই এই অভিযানের চেষ্টা হয়েছিল। এবারকার মহাকাশ-জাহাজটি হচ্ছে অ্যাপোলো-১৩। কিন্তু এ অভিযান সফল হয় নি। যন্ত্র বিকল হওয়ায় চাঁদের কাছাকাছি গিয়েও অ্যাপোলো-১৩ ফিরে এসেছে। তবে অভিযান একটার পর একটা চলছেই। হয়তো অদূর-ভবিষ্যতে পৃথিবীর কোন একটা দ্বীপের মতই চাঁদের সঙ্গে হবে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তবে সে দ্বীপটা সমুদ্রের দ্বীপ নয়, মহাকাশের দ্বীপ—এই যা তফাৎ।

দেশ বিদেশের ছড়া

মহারাষ্ট্র

খুকুমণি হাসে ওই—
সারা বাড়ি মাৎ,
বেদানার দানা তার
কচি কচি দাঁত।
তিলে তিলে বাড়ে শোভা
ভেঙ্গে সব বাঁধ,
খুকু বাড়ে আর বাড়ে
আকাশের চাঁদ।

*



আয় রে পাখি—দোয়েল, কোয়েল,
আয় রে চড়াই, কাক,
খাবার হাতে ডাকছে খোকা—
আয় রে পাখির ঝাঁক!
জল দিয়েছে, ফল দিয়েছে,
বলছে দু' হাত যুড়ে—
খাবার খাবি, কলকলাবি,
তার পরে যাস্ উড়ে।



*

ঘুমের দেশে আয় রে সোনা,
ঘুমের দেশে আয়,
কচি কালো চোখ যে ঢাকে
চোখের পাতাটায়।
চক্‌চকানো কাজলা-মণি—
ঢাকনা পড়ে তায়।

চড়াই ঘুমায়, টিয়া ঘুমায়,
ঘুমায় লতার ফুল
সবুজ পাতার কোমল কোলে—
নয়ন ঢুলু ঢুল।
ঘুমের চোখে টুকি দিতে
চাঁদের হ'ল ভুল।



রাশিয়া

ঐ দেখ আমাদের বাগানের পাশে
মাঠঘাট ভরা যেন রেশমের ঘাসে।
ঝোপেঝাড়ে আড়ে আড়ে গোলাপের ফুল
এদিকে ওদিকে হেলে দুলছে দোদুল।
খুকুমণি বোনে জামা সেই রাঙা সাঁঝে,
চুপ্ করে বসে থাকা ভালো লাগে না যে।

জার্মেনি

কার কাছে ভাই অমন খাসা
বাচ্চা ভেড়া আছে?
ও, বুঝেছি, তারার কোলে,—
চাঁদের কাছে কাছে।
ঐ চাঁদই তো আমার বাড়ির
পেছন দিকে থাকে,
মস্ত উঁচু—যায় না ছোঁয়া
নীল আকাশের ফাঁকে।



লক্ষ তারা ভাইবোনেরা
মিটমিটিয়ে হাসে,
ঝগড়াঝাঁটি কেউ করে না—
কেবল ভালোবাসে।

*



বাংলা

মেঘের ডাকে আকাশ কাঁপে,
চম্‌কে ওঠে বিজুরি,
অঝোর ধারে বৃষ্টি নামে—
ভাবনা তো নেই কিছুরই।
দম্‌কা হাওয়ায় গন্ধ আসে
আম, কাঁঠাল আর লিচুরই,
ঘরের ভিতর আমরা বসে—
কখন হবে খিচুড়ি।